

ওপার বাংলায় খেঁড়ে

নারায়ণ সান্যাল

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক

শ্রীমুনীল মণ্ডল

মণ্ডল বুক হাউস

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইম্প্রেসন্স হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

ব্রক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্ড গ্রাফিক্স কোং

কলকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিত্তামণি দাস লেন

কলকাতা-৯ ।

“গ্লোকার্কেণ প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভি”, বলেছিলেন নাকি আচার্য শঙ্কর তাঁর অপরিসীম আত্মবিশ্বাসের দাট্‌য়ে। যুগ যুগ ধরে বিশ্বের বাবতীয় পণ্ডিত কোটি কোটি গ্রন্থে যে সমস্তার কুলকিনারা করতে পয়েন নি মাত্র আধখানা গ্লোকে তার সমাধান দাখিল করেছিলেন শঙ্করাচার্য। গ্লোকার্কেণ সেই সমাধান: ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা!’ প্রায় তেমনিভাবে ভূতপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তান নামক ঐগ্নামিক রাষ্ট্রের কোটি কোটি অমুসলমান বাসিন্দাদের যে সমস্তা শতাব্দীর একপাদকাল ধরে আমাদের চোখে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়েছিল, এক কথায় তার জবাব নাকি দাখিল করেছেন বঙ্গবন্ধু। এক কথায় সেই সমাধান: ‘ও-পার বাংলা!’

আমি ‘ও-পার বাংলা’ নামক সৃজোজাত শিশুটিকে আজও চোখে দেখি নি। কিন্তু তার জন্মের পূর্বে জননীর গর্ভযন্ত্রনাটিকে খুব কাছের থেকে লক্ষ্য করবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। যা দেখেছি, বুঝেছি তার উপর এ-পর্যন্ত তিনখানি গ্রন্থ লিখেছি। ‘বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প’, ‘বন্দ্যাক’ ও ‘নৈমিষারণ্য।’ প্রথমটিতে উদ্ভাস্তদের স্থায়ী-পোশাক বা পি. এল. ক্যাম্পের জীবনীতে দ্বিতীয়টিতে উদ্ভাস্ত কলোনীতে; ওদের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা এবং শেষোক্তে বাংলার বাইরে ওদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। শুধু সমস্তার ধারাবাহিকতাই নয়, তিনটি উপস্তাসের কাহিনীতে একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে তবু প্রত্যেকটি উপস্তাসই যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হয় তাই সেই যোগসূত্রটি আমি প্রচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছি। বন্দ্যাকের সুরেখা দেবী যে বকুলতলার রেখা মিত্র এবং সুরেখা দেবীর টেবিলে ফ্রেমে-বাঁধানো ছবিটি যে ঋতব্রতের একথা তৃতীয় গ্রন্থ নৈমিষারণ্য পড়ার আগে বোঝা যায় না।

তিনটি উপস্তাসই দীর্ঘদিন ছাপা নেই। পুনর্মুদ্রণের প্রশ্ন যখন উঠল তখন দেখি মণ্ডল বুক হাউসের সুনীলবাবু আমার সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছেন না। সমস্তার অন্ধাঙ্কি-ভাবের জ্ঞান প্রথম দুটি উপস্তাসকে তিনি একসূত্রে গেঁথে ফেলতে চাইলেন। থান-ইন্টার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে আশঙ্কা করে বোধকরি ‘নৈমিষারণ্য’-কে আপাতত রেহাই দিয়েছেন।

আচার্য শঙ্করের গ্লোকার্কেণ শোনার পরেও লোকে অস্তান্ত গ্রন্থ পড়ে দেখে ; বঙ্গবন্ধুর জবাব শোনার পরেও হয়তো কেউ কেউ পড়ে দেখতে চাইবেন ‘ওপার বাংলার আগে’-র কথা।

‘ওপার বাঙলার আগে’র অগ্রজ :

ব্রাতা

মনামী (২য় সং)

অন্তর্লীনা (২য় সং)

নৈমিষারণা

নীলিমায় নীল (২য় সং)

অলকনন্দা

মহাকালের মন্দির (২য় সং)

দগুণ্ড শবরী (৪র্থ সং)

পথের মহাপ্রস্থান

সত্যকাম (২য় সং)

বাস্তবজ্ঞান (ঐ)

অপরূপা অজস্র (ঐ)

তাজের স্বপ্ন

নাগচম্পা

পাষণ্ড পণ্ডিত

‘আমি নেতাজীকে দেখেছি’ (৫ম সং)

নেতাজী রহস্য সন্ধানে (৩য় সং)

জাপান থেকে ফিরে

শার্লক হেবো

‘ওপার বাঙলার আগে’র অনুজ (যন্ত্রস্থ)

কালো-কালো

কলিকের দেব দেউল

আবার যদি ইচ্ছা কর

କାମ୍ପା, ୨୧ଶେ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୬



“অবশেষে কর্মস্থলে এসে পৌঁছানো গেল। নতুন পরিবেশে ভালই লাগছে প্রথমটা। কাল মাত্র এসেছি, ঘরদোর কিছুই গোছানো হ’য়ে ওঠে নি। আর ঘর বলতে তো দরমার বেড়া-ঘেরা দুটি খুপরি। শালকাঠের খুটির সঙ্গে বাঁধা দরমার দেওয়াল, উপরে পুরু ক’রে বিছানো উলুখড়। জানালা-দরজা সব বাঁপের, কক্ষির ঠেকনা দিয়ে বায়ু গমনাগমনের একটা প্রচেষ্টা মাত্র। একখানি ঘরে আমার সংসার, অর্থাৎ আহার নিদ্রা, লেখবার টেবিল পাতা—অপর ঘরখানা আমার অফিস। সেখানেও টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার। বারান্দায় পাতা আছে একটি টুল, ঘটা টিপলে টুল থেকে উঠে আসে বিমস্ত পিয়ন—খিদমৎ করতে। খাট-টেবিল-বেঞ্চি কোনটাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয় নি; মহাবীর কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতোই এরা এ গৃহের আঙ্গিক। এদের শ্রীচরণ হ’চ্ছে বংশদণ্ড, মাটির মেঝেতে হাত দেড়েক প্রোথিত। এসবের জন্তে সরকারী খাতায় কোন খরচের অঙ্ক পড়ে নি—আমার আগমন সংবাদে ঠিকাদার প্রভু স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে এগুলি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বানিয়ে রেখেছেন।

“কোথায় ছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের ধারে একটি কলেজের শাস্ত্র স্তবোধ ছাত্রটি—আর কোথায় হ’য়ে গেলাম কলমের এক খোঁচার একটা সাব-ডিভিসনাল অফিসের ইন্চার্জ! অবশ্য চাকরিটাই গালভারি—এস. ডি. ও. অথবা এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিস বললে যে ছবিটা সচরাচর মনের মধ্যে জেগে ওঠা স্বাভাবিক, আমার এই দরমার কুঠরির ছবিটা তার কাছে নেহাতই কার্টুন পিকচার! তবু বনগ্রামের শিবা সম্রাট তো হওয়া গেল! যতদিন না বদলি হচ্ছি এই উলুখড়ের রাজপ্রাসাদেই শেয়ালরাজকে রাজত্ব ক’রে যেতে হবে। ভাগ্যে ভগবান গৃহের সঙ্গে গৃহিণী দেন নি! এ বাড়িতে এসে রানীগিরি করবার মতো ইচ্ছে কোন বঙ্গললনার হ’তে পারে না। রেখা মিস্ত্রির মতো মেয়ের কথা এ পরিবেশে না ভাবাই ভালো। তবু স্বীকার করা উচিত যে সিংজী ঠিকাদার এগুলি ক’রে রেখেছিলেন বলেই তাঁর নির্মিত টেবিলে বসে তাঁর বাড়ির এ প্রশস্তি লিখবার স্যোগ মিলছে। স্তত্রাং হে সিংজী ঠিকাদার, তুমি শতায়ু হও!

“কাল যখন এসে নামলাম—এগুলি দেখিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ’য়ে সিংজী নিবেদন করলেন—ছজুরের অফিস ফার্নিচার যতদিন না এসে পড়ে ততদিন যাতে

কোনক্রমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, তাই এই দীন আয়োজন তিনি ক'রে রেখেছেন। খড়ের চালের নীচ দিয়ে একটা দরমার সিলিংও ক'রে দেবেন এবম্বিধ প্রতিশ্রুতি দিলেন একটা। তাড়াতাড়িতে নাকি ওটা হ'য়ে ওঠে নি।

“আমি বিব্রত বোধ করি। কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরিয়ে সবে এই চাকরি পেয়েছি। প্রথমেই এভাবে ঠিকাদার কর্তৃক অসুগৃহীত হওয়া উচিত হ'বে কিনা মালুম হচ্ছিল না। ঠিকাদার প্রভু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাইলেন। রনংজেন সাহেবের যন্ত্রটির সঙ্গে ঠর অক্ষিতারকার কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা জানি না; বললেন, ‘হুজুরকে এহী লিয়ে বলেছিলম কলকাতায়—একেবারে ক্যাম্পের বীচে অফিস না বানিয়ে রেল-টিসনে বনাইতে। উথানে উমদা কোয়াটার-ভি মিলে যেত। চার মি'ল রাস্তা, ও তো হুজুর সুবোসাম সাইকেলে মারতে পারতেন—হমার জীপ ভি ছিল।”

“সত্য কথা। রামশরণ সিংজীর প্রবল আপত্তি ছিল ক্যাম্পের ভিতর অফিস করতে। এখানে থাকার ইচ্ছা আমারও ছিল না। কথা বলার লোক নেই। নানান অসুবিধা। এর চেয়ে স্টেশনে থাকলে অনেক সুবিধা হ'ত আমার। বলেও ছিলাম কথাটা চীফ এঞ্জিনিয়ারকে। তিনি কানেই তোলেন নি। হেসে বলেছিলেন, ‘পরামর্শটা কার? রামশরণের নাকি?’

“কি জানি কি ভেবে তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, ‘না, আমিই ভাবছিলাম।”

“চীফ এঞ্জিনিয়ার পাইপটা কামড়ে ধরে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা পার হ'য়ে এসে আমার কাঁধটা ধরে বললেন, ‘ইয়ংম্যান, কলকাতাই যদি ছাড়তে পারলে, তখন ও স্টেশন আর ক্যাম্পে তফাতটা কি? বরং ক্যাম্পে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছেন, ডাক্তার আছেন, রিলিফ ডিপার্টমেন্টের আর পাঁচজন ভদ্রলোক আছেন। অ্যাসোসিয়েসন ওখানেও একটা গড়ে উঠবে। আর তা ছাড়া—”

“আবার কি ভেবে নীরবে পায়চারি করতে লাগলেন। এটি আমাদের সি. ই.র একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি পায়চারি করতে করতে কথা শোনেন, কথা বলেন, ডিক্টেশন দেন—এমন কি লাঞ্চ-আওয়ার্শে তাঁকে পায়চারি করতে করতে খেতেও দেখেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় সি. ই.-কে দেখি নি। অহুমান করি নিদ্রিত অবস্থায় অস্তুত তাঁর পদচারণা অব্যাহত থাকে না।”

“তা ছাড়া আই উইন্স যু সুড ডাইভ হেডলং ইনটু দি অ্যাফেয়ার্স। ক্যাম্পে না থাকলে তা সম্ভব নয়।”

“হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চাইলেন। ওঠে নয়, চোখছুটিতে তাঁর চাপা হাসি। ঠর

এই নিগূঢ় হাসি, এই ‘অ্যাফেয়ার্স’ শব্দটির বিশেষ বাচন-ভঙ্গিতে কিসের যেন একটা আভাস ছিল।

“সিংজীকে বললাম, ‘না না সিলিংএর কোন দরকার হবে না। টিনের ঘর হ’লেও না হয় গরম হ’ত; খড়ের ঘরে আবার সিলিং কি হবে? এমনিতেই এসব করতে আপনি কত বাজে খরচ করেছেন—’

“বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম। কারণ ছিল।

“ছাত্রজীবন থেকেই শুনে এসেছি কন্ট্রাকটরেরা চিরকালই দেখে থাকে এঞ্জিনিয়ারদের স্বাস্থ্যবিধা। এতে নাকি দৃশ্যীয় কিছু নেই। এ সম্বন্ধে ছাত্রজীবনে বহু মুখরোচক গল্প শুনেছি, ডাউনিং হোস্টেলে প্রণবের কাছে। তার বাবা ছিলেন একজন এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু জিনিসটা আমার প্রত্যক্ষ সত্য ছিল না। তাই হঠাৎ মনে হ’ল—এই যে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিল-খাট প্রভৃতি বানিয়ে রেখেছে ঠিকাদার, চালটা নতুন খড় দিয়ে ছেয়ে রেখেছে, এ সবই কি মোফৎসে? যদি না হয়? যদি সিংজী আশা ক’রে থাকে যে আমি এসে ওর যা খরচ হ’য়েছে সেটা নগদ মিটিয়ে দেব? এটাই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পর প্রতিবেশী বন্ধু যদি আপনাকে চিঠি লেখেন—‘ওহে আমি হুগুয়াক পরে ফিরছি, তুমি গলুমিস্তিকে ডেকে ঘরটা এককোণে চুনকাম করিয়ে রেখ—চাবি পাঠালাম।’ এবং সেই কাজ করাতে গিয়ে যদি গলুমিস্তিকে দু’বস্তা কলিচুন আপনাকে নগদ মূল্যে কিনে দিতে হয়—তাহলে আপনি কী আশা করবেন? দীর্ঘদিন প্রবাসবাসের পর বন্ধু যেদিন পাড়ায় ফিরে আসবেন, সেদিন অব্যবস্থার মধ্যে আপনি তাঁকে আপনার বাড়িতে দুটো খেতে বলবেন—আর তার জবাবে বন্ধু বলবেন—‘না না সেকি, এমনিতেই কলিচুন কেনা বাবদ আপনি কত বাজে খরচ ক’রে ফেলেছেন।’

“সিংজী বললেন, ‘এখানে গরম হুজুর বহুত কড়া আছে। সিলিং না হোলে আপনার বড় কষ্টো হোবে। ওর চিড়িয়াতে খড় কুঠা ছড়িয়ে নোংরা করবে হুজুর।’

“আমি ততক্ষণে মনস্তির ক’রে ফেলেছি। যেটুকু খরচ সিংজীর হ’য়ে গেছে তার আর চারা নেই। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে আর কিছু হ’তে দেব না। তাতে যত অসুবিধাই হোক। বললাম, ‘আরে না না, আমরা এঞ্জিনিয়ার মানুষ, এই অল্প বয়সে এত আয়েসী হ’লে আমার চলবে কেন?’

“একটু হেসে জিনিসটাকে সরল করবার চেষ্টা করি।

“টাকায় টাকা আনার মতো হাসিতে হাসি আনে, রসিকতায় আনে রসিকতা। সিংজী আমার হাসি দেখে নিজেও একটু হাসলেন। কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ

থেমে গেলেন। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে, পকেট থেকে একটা স্বদৃশ্য কমাল নিয়ে ঘমসিক্ত টাকটি মুছে ফেলে আবার পাগড়িখানা শিরোধার্য করলেন। বুঝলাম এ সময়টুকুর প্রয়োজন ছিল জবাবটাকে সাজিয়ে নিতে।”

“হুজুর এঞ্জিনিয়ার—লেকিন হামরা হাঁ-পোষা মানুহ। হুজুর নওজোয়ান আছেন, লেকিন হামার টাকটাতো দেখলেন স্তার! বুড়ার প্রতি এ কিরপাটুকু আপনাকে কোরতে হোবে।”

“এ আবার কি জাতীয় রসিকতা? ব্যাপারটা ঘুলিয়ে গেল। এ ঘরে থাকবো আমি; কচিং ঠিকাদারদের উপস্থিতিটা অবশ্য অনস্বীকার্য। কিন্তু সে দু’দণ্ডও কি উনি এটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না? বেশ বাগিয়ে একটা জবাব দিতে যাব—তার পূর্বেই রামশরণ বললেন—

“হামাদের ওয়ার্ক-সেডে সব ঘরে হামি সিলিং বানিয়ে দিলম। এখন আপনি যদি হুজুরের ঘরে সিলিং না-মঞ্জুর করেন তবে আমাদের সব ঘরের সিলিং তো খুলিয়ে নিতে হোবে—না কি বোলেন ওভারসিয়ার বাবু?”

“ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত একখানা কাঠের পুতুলের মতো নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়েছিল। তৎক্ষণ আমাদের এত কথার অর্থগ্রহণ যে তার হ’য়েছে মুখ দেখে তাও বোঝা যায় না। আমরা যেন এতাবৎকাল পুস্ত্র অথবা ফার্সীতে আলাপচারি করছিলাম। এবার বললে, ‘দরমা-ম্যাট সিলিং সিডিউল আইটেম। হাজারখানেক সিলিং বানানোই আছে সাইটে। ওর একটা লাগিয়ে দেওয়া যায়। কাজ শেষ হবার আগে খুলে নিয়ে অগ্ন ঘরে ফিট করলেই চলেবে।’

“বাস্ খুব! লেন স্তার! ফয়সলা তো ক’রে দিলেন ওভারসিয়ার বাবু! আপনাদের ওভারসিয়ারবাবুর ব্রেন খুব সাফ। একদিন হয়েছিল কি—

“এবার আমি চলি স্তার। আমার বাসের টাইম হ’য়ে গেল।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যান। কাল সকালে কথা হবে।”

“ওভারসিয়ার স্তরেন সেনগুপ্ত নমস্কার ক’রে চলে যান। উনি এই রিলিফ ক্যাম্পে থাকেন না। স্টেশনের ধারে একটা বাসা ভাড়া করেছেন। এখানে আমার দু’জন ওভারসিয়ার। অপর জন ক্যাজুয়াল লীভে আছে। অসুস্থ। তার নাম জীবেন কর।”

“সগর্জনে এসে দাঁড়ালো সিংজীর শেভলে ট্রাকখানা। ওরই গর্তে আমার বাস-বিছানা। সংসার-যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম। স্টেশন থেকে আমি ওর জীপেই চলে এসেছি। মালপত্র নামিয়ে, লগেজ ভ্যান থেকে সাইকেল ছাড়িয়ে সিংজীর লোক আর আমার অর্ডার্লি পিয়ন রতন পরে ট্রাকে আসবে, এই ব্যবস্থা ক’রেই

আমি আগে চলে এসেছিলাম—সিংজীর জীপে ! সিংজীও এসেছিলেন সেনগুপ্তের সঙ্গে আমাকে রিসিড করতে ।”

‘মনে পড়েছে ঋতব্রতের অসহায় স্বীকারোক্তিটা এই প্রসঙ্গে । ও বলেছিল, “প্রথম চাকরি-জীবনের কথা মনে হ’লেও হাসি আসে ভাই । স্টেশনে নেমে যখন দেখলাম আমাকে নিয়ে যাবার জন্ত একখানা ট্রাক আর একখানা জীপ নিয়ে ঠিকাদার অপেক্ষা করছে, তখন বড় বিব্রত বোধ করেছিলাম । তখন মনে হয়েছিল আগমন সংবাদটা টেলিগ্রাম ক’রে না জানালেই ভালো হ’ত । এখন ওর জীপ প্রত্যাখ্যান ক’রে অল্প কোনও যান ভাড়া করাটা অত্যন্ত বিসদৃশ দেখাবে । অথচ এক স্টেশন লোকের সম্মুখে ঠিকাদারের গাড়িতে ওঠাটাও ঠিক হ’ল কিনা মালুম হচ্ছে না ! এক্ষেত্রে সরকারী এঞ্জিনিয়াররা কি ক’রে থাকে ? এটা তো কলেজে শেখায় নি ! মনে হ’ল ল্যাটিশ-গার্ডার, প্লেট-গার্ডারের নোট মুখস্থ না ক’রে যদি এইসব সহবৎ শিখে রাখতাম কোনও সরকারী ঘাণ্ড এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে, তো কাজ হ’ত ।”

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—“শেষ পর্যন্ত কি করলে ?”

“এক্সপিরিয়েন্সড্ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করলাম । রতনের দিকে চাইতেই সে বললে, ‘আপনি জীপে চলে যান স্তর, আমি মালপত্র নিয়ে ট্রাকে আসছি ।’ অর্থাৎ আমার জীপারোহণ স্ট্রাংসন্ড্ এবং অ্যাপ্রুভড্ ! রতন আজ বিশ বছর অর্ডারলিগিরি করছে । আমার টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কিন্তু রতন পার্মানেন্ট সার্ভিসের লোক । এক ডজন গেজেটেড অফিসার চরিয়েছে সে । এসব ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জীপে আরোহণ যদি নিয়ম-বিরুদ্ধ হ’ত, তবে সে কিছুতেই তা রেকমেণ্ড করতো না ।”

যাক, ভাষ্যেরিতে ফিরে আসি আবার ।

“ট্রাক থেকে মালপত্র নামিয়ে একে একে ঘরে সাজিয়ে রাখছে রতন । সিংজীর লোক একটা লণ্ডন জেলে রেখে গেল । আর একজন একটা বকবক মগ, আর এক বালতি জল রেখে গেল বারান্দায় । সিংজী বললেন, ‘হুজুর এবার মুখ হাঁত ধুয়ে লিন—হামি দেখি আপনার খাবারের কি ইস্তাজাম করেছে হতভাগারা ।’

আমি বাধা দিয়ে বলি, ‘না না, খাবার আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি । আপনি ব্যস্ত হবেন না । আজ রাতে আর কিছু লাগবে না । রতন, আমার টিফিন-কেরিয়রটা ?’

“রতন এসে মাথা চুলকে বলে, ‘টিফিন-কেরিয়ারের খাবার সব পচে উঠেছে স্ত্র। যাবে না? যা গরম গেছে সারাদিন।’

“হতভাগার যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ওর সামনে এ কথাটা বলার কি দরকার! না হয় একটু পরেই দোকান থেকে কিছু কিনে আনতো।

“আপনি মুখ হাত ধুয়ে লিন স্ত্র, হামি দেখছে।”

“বাধা দিয়ে আমি বলি,—‘না’ না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। দোকান তো কাছেই আছে।’

“দুকান কাছে না থাকলেও দূর থেকে এনে লিতে পারতেন আপনি। সে কোথা নয়; লেकिन রামশরণ সিং থাকতে সে হোবে না হজুর। ইখানকার দুকান বড় নোংরা স্ত্র। খেলেই বিমার হোবে।’

“আমি তবু ইতস্তত করি।

“হঠাৎ হাত দুটি জোড় ক’রে সিংজী নিবেদন করেন, ‘দুকানদারকে আপনি যে আট দশ আনা পৈসা দিতেন, ওটা হামাকে বকশিশ দিবেন হজুর। হামি লিয়ে লিব। লেकिन দুকানের খাবার আপনাকে খেতে দিব না।’

“কথা বলতে জানে বটে রামশরণ!

“একটা বড় ডিশের উপর খাবার নিয়ে এবং অপর একটি ডিশে সেটা ঢাকা দিয়ে একজন ভৃত্য জাতীয় লোকের প্রবেশ এবং টেবিলের উপর সম্ভরণে স্থাপন। রামশরণ অতি সযত্নে ঢাকাটা খুলতে খুলতে বললেন, ‘ইখানে কুছুভি মিলে না স্ত্র। আপনার আজ খাওয়াই হোবে না।’

“যে ভঙ্গিতে জাহুর টুপীর ঢাকা খুলে দেখায় কমালের বদলে খরগোশ, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই ঢাকনাটা খুলে ফেলে রামশরণ দেখালেন ‘ক্যাম্প বাজারে কুছুভি মিলে না।’

“ছাড়ানো ফল ও মিষ্টান্নে পাত্রটি পূর্ণ! আম ও লিচু এ সময়ে কিছু দুর্লভ নয়—কিন্তু ছাড়ানো বেদানা, কমলালেবু, আপেল? বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এ জায়গায় ও জিনিস বাজারে মেলে না নিশ্চয়ই। তারপর ওগুলো কি? প্যাংস্টী না কেব? নিঃসংশয়ে এগুলি কলকাতা থেকে এসেছে সিংজীর সঙ্গেই। অথচ চতুর সিংজীর ভাবখানা যেন তাঁর অদন্তন হতভাগা কর্মচারীরা কি করছে না করছে সে খবরও রাখেন না।

“খাওয়া প্রসঙ্গে আমাকে আর কোনও কথা তিনি বলতে দেবেন না বলেই হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘ও হো! একটা ভুল হইয়ে গেছে। এ রামাওতার দো দশটো কাঁটি গুর স্বতলি তো লাও। সাবকো মচ্ছরদানি তো খটানে পড়েগি।’

“তারপর সলজ্জ হেসে বললেন, ‘আর দরমার দেওয়ালে কাঁটাই ফিন লগাবে কৈসে ? এহী লিয়ে আপনাকে বলছিলাম স্তর, টিসানের কাছে কোয়াটার লিন। ইখানে আপনার হরবখৎ তকলিফ্ হোবে।’

“আমি হেসে বলি, ‘আর এখানেই বেশ কেটে যাবে। পাকাবাড়ি নিয়ে কি করব আমি ? একা মানুষ, জরু গরু নিয়ে তো আর আসি নি ?’

“এক গাল হাসলেন রামশরণ, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, হামি শুনিয়েছে আপনি বচিলর আছেন। আচ্ছা, আপনি ঘবড়াবেন না—সব ব্যবস্থা হইয়ে যাবে।’

“লোকটা বলে কি ! থাকবার ঘর দিয়েছে, আসবার গাড়ি দিয়েছে, মুখ ধোবার জল, রাত্রেয় আহায, মায় মশারী খাটাবার দড়িও দিয়েছে ! এবার কি রাত্রেয় শয্যাসজ্জিনী—অর্থাৎ জরুর ব্যবস্থাও করতে বসবে না কি ? এটাও কি ঠিকাদারদের করণীয় তালিকাভুক্ত ?

“বললাম, ‘ব্যবস্থা আবার কি করবেন আপনি ? ঘটকালি করবেন নাকি ? এখানেই পাকাপাকি ঘর বানাতে হবে বোধ হয় বাকি জীবনের জন্তে ?’

“যেন অত্যন্ত উচুদরের একটা রসিকতা করেছি আমি। হো হো ক’রে হাসলেন প্রাণ খুলে। তারপর বললেন, ‘আপনাদের তামাম জিনিগি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোবে। একঘরে তো হোবে না স্তর আপনাদের কারবার। কতো ঘর বনাইবেন ? সব জগাহ্ তেই আপনাদের ঘর বনাতে হোবে। আপনাদের রবীন্দ্রনাথজী না বলিয়েছেন ‘সব ঠাই হমার ঘর আছে হামি স্তুরের পিয়াসী আছি।’

“সর্বনাশ ! এ যে দেখি একেবারে গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া ! মায় রবীন্দ্রনাথজীকে পর্যন্ত পেড়ে ফেলেছে ! এতটা মাথো মাথো হবার ইচ্ছা ছিল না আমার আদৌ ! তাই মারবার-তনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা এখানে স্থগিত রেখেই আমি মুখ ধুতে বেরিয়ে গেলাম।”

যার ডায়েরী থেকে উদ্ধৃতিটা তুলছিলাম, সেই ঋতব্রত বোস আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কেমন একটা ধারণা ছিল, পরিণত বয়সে সে দেশের একজন হ’য়ে উঠবে। ধারণাটা মাস্টারমশাই মহলেও ছিল। হয় উচুদরের কবি, লেখক, রাজনীতিক অথবা অমনি কিছু। স্কুলের গাণ্ডি পেরিয়েই তার সঙ্গে সাময়িক ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ; ও নিয়েছিল সায়েন্স। ছাত্র-জীবন সমাপ্ত ক’রে সে কিন্তু দশ জনের দশম জন হ’ল না, হ’ল মামুলি চাকরিজীবী। তার চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়টায় দূর থেকে চিঠিপত্রে যোগসূত্রটা বজায় রেখেছিল সে। পরে কলকাতায় বদলি হ’য়ে এলে প্রথম চাকরি-জীবনের

অভিজ্ঞতাটা সবিস্তারে বলেছিল আমায়। বেশ একটা উপস্থাসের উপকরণের সন্ধান পেয়েছিলাম যেন সে অভিজ্ঞতায়। তাকে জানালাম সে কথা। বললাম, ওর কাহিনীটা লিপিবদ্ধ করতে চাই। ও যতটা উৎসাহিত হ'ল, তার চেয়ে অনেক বেশী উচ্ছ্বসিত হ'লেন ম্যাডাম বোস অর্থাৎ মিসেস বহু।

এ কাহিনীর অধিকাংশ রসদই সংগ্রহ ক'রেছি ঋতব্রতের ডায়েরি থেকে। কিন্তু সেইটাই একমাত্র উপাদান নয়। ওদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষ্য চায়ের টেবিলে আলাপচারিতে শুনেছি অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনা—যা নাকি স্থান পায় নি ওর ডায়েরিতে। কিছু জেনেছি ম্যাডামের কাছ থেকে, যা নাকি নিজ মুখে বলে নি ঋতব্রত। কখনও সংগ্রহ করেছি ওর অর্ডালি পিয়ন রতনের কাছ থেকে কোনও সংবাদ, কখনও বা ওর দাদা অথবা বৌদির কাছ।

বাংলা বিহারের সীমারেখার কাছাকাছি ঋতব্রতের এই কর্মস্থলটি। যুদ্ধকালে এখানে গড়ে উঠেছিল একটি সেনানিবাস। শান্তিশিষ্ট পরিবেশে একদিন জেগে উঠেছিল কোলাহল—এল গাড়ি গাড়ি ইট, কাঠ, সিমেন্ট, বালি। তার চেয়েও বেশী এল বাঁশ, দরমা, শালের খুঁটি আর খড়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এল বিভিন্ন কারিগর। পাঞ্জাবী ছুতার, সিদ্ধি ঠিকাদার, উড়িয়া প্রাস্তার এবং মধ্যদেশীয় কুলি। সারি সারি তৈরী হ'য়ে গেল মিলিটারি ব্যারাক। আশপাশের গাঁয়ের মেয়েরা ভালদিঘি থেকে জল নেওয়া বন্ধ করল। গাঁয়ের লোকে উনো মাল চুনো দামে বেচে গেল মিলিটারিদের কাছে। গ্রাম্য বালখিল্য বাহিনী হুড়িয়ে নিয়ে গেল খালি টিন, বোতল, সিগ্রেটের কৌটা, কখনও বা দু'এক টুকরো অভুক্ত বিস্কুট—চিজ। রাতারাতি তৈরী হ'য়ে গেল পীচের রাস্তা, ইলেকট্রিক লাইন, এমন কি কংক্রিটের একটা ল্যান্ডিং স্টীপ পর্যন্ত। দিনরাত মিলিটারি কনভয় ছোট্টাছুটি করত। গ্রামবাসী বিশ্বয়-বিফারিত চোখে দেখতো দৈত্যপুত্রীর আজব কাণ্ড-কারখানা। যেদিন প্রথম ওখানে এরোপ্লেন নামলো সেদিন ছিল হাটবার। হাট ভেঙে লোক ছুটলো হাওয়াই জাহাজ দেখতে। কাঁটা তারের ওপার থেকে তারা বড় বড় চোখ ক'রে দেখলে বিশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বিশ্বয়! তারপর ক্রমে সেটা এতই গা-সওয়া হ'য়ে গেল, যে প্লেনগুলো নীচু দিয়ে যাবার সময়ও ঘাড় উঁচু ক'রে ফিরে দেখতো না কেউ।

রাতারাতি গড়ে ওঠা এই ময়দানবের নগরী একদিন আবার জনশূন্য হ'য়ে গেল। থামল কালযুদ্ধ। কালের রথচক্র ঘুরল আর এক পাক। দলে দলে মিলিটারিরা চলে গেল। কর্মচঞ্চল হঠাৎ-গড়ে-ওঠা অস্ত বড় শহর হয়ে গেল স্তব্ধ।

পড়ে থাকল পিছনে ভাঙা টিন, মরচে ধরা লোহার টুকরা, ঘর-বাড়ি, ওয়াটার টাওয়ারের জলের ট্যাঙ্ক ; আর পড়ে থাকলো হয়তো আশেপাশের গ্রামের কৃষক-বধূদের মনে কিসের যেন একটা বিভীষিকার স্মৃতি। দু'একটা নেপালী দারোয়ান শুধু পড়ে ছিল রাস্তার ধারের ঘরখানায়। সরকারী পাহারা। ওদের যেটা কন্ট্রোল বিন্ডিং ছিল, সেটা পরিণত হ'ল প্রোকিয়োরমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চালের গুদামে। বাকি ঘরগুলো হ'ল রিক্ত, পরিত্যক্ত। কালবৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেল খড়ের চাল ; বর্ষায় দেওয়াল গেল ধসে। কেউ খেয়াল করল না। জানালায় গরাদ একটি দুটি ক'রে অপহৃত হ'ল। কেউ বারণ করতে এল না। ক্রমে জানালা দরজা। শেষে গ্রামবাসী সাহস ক'রে এগিয়ে এল শাবল হাতে ;— দেওয়াল ভেঙে ইটগুলোও নিয়ে যাবে ওরা। এভাবে চললে আর দশ বছরেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত মিলিটারি ক্যাম্প।

কিন্তু তা ঘটল না।

আবার ঘুরল একপাক—মহাকালের রথচক্র !

গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখলে, আবার এল নানান জাতের ঠিকাদার। এল গাড়ি গাড়ি বাঁশ। এল গাদা গাদা খড়।

পরিত্যক্ত প্রাণহীন পল্লীটি আবার কর্মমুখর হ'য়ে উঠল। সারারাত পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে এখানে ওখানে। রাস্তার মোড়ে নৈশ ভ্রমণরত জীপের বাঁক নেবার সময় উজ্জ্বল আলোয় ধূমকেতুর পুচ্ছ ঘুরে যায় সমস্ত তল্লাটটার উপর। হাজার হাজার মিস্ট্রী মজুর কাজ ক'রে যায়। আবার সমবেত হয় পাঞ্জাবী ছুতান, সিন্ধি ঠিকাদার, উড়িয়া প্লাস্কার আর মদ্রদেশীয় কুলি। এবার বঙ্গবাসীরাও উপেক্ষিত থাকে না। তারাও আসে। বস্তুত তারাই এবার অতিথি। সারি সারি ট্রাক এসে দাঁড়ায় কন্ট্রোল বিন্ডিংটার সামনের মাঠে। অতিথিরা নামে। রণসেনা নয়, মরণ সেনা। ওদের পরনে খাঁকি পোষাক নেই—ছিন্ন মলিন বসন! ওদের কাঁধে রাইফেল নেই, কাঁকে কঙ্কালসার শিশু ! ওদের মনে যুদ্ধজয়ের ছুঁবার প্রেরণা নেই—আছে জীবন-যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ! ফেলে আসা অতীতের বিভীষিকা আর অনিশ্চিত অনাগতের আনন্দ ! ওরা এসে গেল দলে দলে। হাজার হাজার উদ্বাস্ত পরিবার। নবীনতম রাষ্ট্রের প্রবীণতম আদিম বিদেশী অধিবাসী ! সেনানিবাস পরিণত হ'ল আশ্রয়-শিবিরে !

আদিপর্বে এটার নামকরণ হ'য়েছিল ট্রান্সিট ক্যাম্প। অর্থাৎ দুদিনের মুশাফিরখানায় ওরা এসে আশ্রয় নিত মাত্র। তারপর বাছাই করা হ'ত ওদের। যারা শক্ত সবল, তারা চলে যেত পুনর্বাসনে। কেউ কেউ চলে গেল নিজের

চেঁচাতেই ; তাদের কারও বা ছিল পুঁজির জোর, কারও বা এ পারে মুক্খি-
পোছের আত্মীয়। সরকারী সাহায্য পেল অনেকেই নতুন ক'রে বাস্তব বাধার !
বাকি এখন যারা রয়ে গেছে তারা পঙ্কু অথবা অশক্ত। এরা এখন সরকারের স্থায়ী
পোস্ত। পার্মানেন্ট লায়েরবিটি বা সংক্ষেপে 'পি. এল.'।

মিলিটারি হাসপাতালটাই ওদের আরোগ্যালয়। পাওয়ার হাউসটা এখন
রেশনের গুদাম। ইলেকট্রিক লাইন উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মিলিটারি কন্ট্রোল
বিস্ত্রিটা এখন ক্যাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এরোপ্লেন নামবার চণ্ডা
ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডটায় এদের বাজার বসে। বাঁশের খুঁটির উপর টিনের ছাদ দিয়ে সারি
সারি দোকান বসে গেছে। পানবিড়ি, চাল-আটা, মিষ্টি-মসলার দোকান। মায়
চুলকাটার সেলুন, ডাইংক্লিনিং পর্যন্ত। ক্যাম্পের মেরুদণ্ডের মতো উত্তর-দক্ষিণ
পাকা সড়ক। এদিকে এটা শেষ হয়েছে চার মাইল দূরের রেল-স্টেশনে ; অপর-
দিকে বিসর্পিল গতিতে কালো পীচের সড়কটা থানা-সদর ছুঁয়ে স্বীয় সত্তা হারিয়েছে
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোহনায়। এই সড়কের উপরেই ক্যাম্প ঢুকতে বাঁ হাতে
পড়ে ক্যাম্প-অফিস, ডানদিকে হাসপাতাল। হাসপাতালের পিছনে দুটি ছোট
ছোট ঘর। ও দুটোর নাম আইসোলেশন ওয়ার্ডস্। সংক্রামক রোগীদের পৃথক
রাখার ব্যবস্থা।

বড় রাস্তাটিকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে তদোধিক চণ্ডা যে কংক্রিটের রাস্তাটা পূব-
পশ্চিমে প্রসারিত, ওটাটাই ছিল ক্রীট-ওয়ে—অর্থাৎ প্লেন নামবার ল্যাণ্ডিং স্ট্রীপ্।
এইটারই পূর্বতম প্রান্তে রাস্তাটা গোল হ'য়ে বিরাট এক চক্রর খেয়েছে। বোধহয়
প্লেন ঘুরবার জন্যই এই ব্যবস্থা। ক্রীট-ওয়ের এই অংশটাই এখন বড়বাজার। নাম
গোলবাজার। এটা ছাড়াও হাসপাতাল ও বড় অফিসের কাছে আর একটা
বাজার বসে। এর ঠিক পাশেই ছেলেদের মাইনের স্কুল। সেটার নামকরণ হয়েছে
স্কুলবাজার। স্কুলবাজারের পশ্চিমতম প্রান্ত ঋতব্রতের অফিস, তথা মোকাম।
উত্তর-দক্ষিণে বড় রাস্তা এবং পূব-পশ্চিমে লম্বা ক্রীট-ওয়ে যে পরস্পরকে সমকোণে
ছেদ করে নি তা ক্যাম্পের ব্লু-প্রিন্ট দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এদের পারস্পরিক
ছেদনে যে চারটি ভাগ হ'য়েছে, তাদের নাম আলাদা। ক্লকওয়াইস ভাবে পড়লে
এদের নাম দাঁড়ায় গলাদ', টিফেনপুর, বকুলতলা আর মেমপাড়া। সবটা মিলিয়ে
ক্যাম্পের নাম বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প।

এইখানে বলে রাখা ভালো বকুলতলা ক্যাম্পে যাবার সৌভাগ্য কোনদিন
আমার হয় নি। ঋতব্রতের কাছ থেকে শুনে আর তার দেওয়া ব্লু-প্রিন্ট দেখে
যে বর্ণনা দিলাম, জানি না তার সঙ্গে বাস্তবের কতটা সঙ্গতি। প্র্যানে দেখছি,

চারটে জোনাল ডিভিসনের মধ্যে আয়তনে সর্বগরিষ্ঠ হ'ল গলাদ', তারপর মেমপাড়া, তারপর বকুলতলা। আইনত, মানে ডেমোক্যাটিক্যালি এ ক্যাম্পের নাম স্মৃতিরং গলাদ'ই হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি না এর নাম হ'য়েছে বকুলতলা ক্যাম্প। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাতে খুশি। কারণ চারটে নামের মধ্যে ঐ নামটাতেই আছে কিছু পরিমাণে মাধুর্যস। ক্যাম্পবাসীর জীবনে শ্রী নেই, ছন্দ নেই, মাধুর্য দূর্লভ। অন্তত নামটাও যদি শ্রুতিমধুর হয় 'তাতে কিবা কার ক্ষতি?' তাছাড়া ক্যাম্পের ইতিবৃত্ত লিখতে বসে অহুসঙ্কান করেছিলাম নামগুলির উৎপত্তির ইতিহাস। তা থেকেও মনে হ'য়েছে, ওদের মধ্যে বকুলতলা নামটাই বরং বরণীয়। মেমপাড়ায় ছিল সেই সব অফিসারের বাস, ধারা পরিবার নিয়ে বাস করতেন মিলিটারি ক্যাম্পে। মেমপদরজ্জ্ব এ এলাকার কোলিঙ্গ অবশ্য সেদিক থেকে নিকষ! টিফেনপুর সম্ভবত কোনও 'সিফেন্সের' স্মৃতিসংযুক্ত। আন্দাজ করা যেতে পারে, তিনি ছিলেন কালযুদ্ধে নিহত কোন বড় জঙ্গী অফিসার। গলাদ'র নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন, ওখানে ছিল একটি দহ বা হ্রদ—গলা-জল থাকত তাতে। মিলিটারি আমলে সে জমি ভরাট ক'রে ফেলা হয়। তাই গলাদ' হচ্ছে 'গলাদহ' শব্দের অপভ্রংশ। ঋতব্রত এঞ্জিনিয়ার মাহুষ। ফিললজির নজির সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিয়েছিল। তিনদিকে বিস্তীর্ণ মুক্ত প্রান্তর থাকা সত্ত্বেও জমি ভরাট করিয়ে বাড়ি করতে যাবে কেন মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার? তাই সে খোঁজ করেছিল নামটার উৎপত্তির ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে এক বৃদ্ধ গ্রামবাসীর কাছ থেকে সে শুনেছিল স্থানীয় গ্রাম্য কৃষক-বধূর এক বিচিত্র করুণ কাহিনী। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সিফেন্সরাই শুধু শহীদ হয় নি; দেশের মিত্র সিফেন্সদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 'গলায় দড়ি' দিতে হ'য়েছে গ্রাম্যবধূকেও!

সে যাই হোক বকুলতলা নামটি সার্থক জোড়া বকুলগাছের উপস্থিতিতে। অহুর্বার লাল কঁাকরে জমির মধ্যে এই বকুলতলা অঞ্চলেই আছে একটি পুকুর। ক্যাম্পে ছড়ানো আছে অসংখ্য নলকূপ। তার অধিকাংশই অবশ্য অচল। তবু পানীয় জল নলকূপ থেকেই সংগ্রহ করে সবাই। সকাল থেকে সেখানে প্রতীক্ষমান কিউ সরীসৃপ। তবু এই পুকুরটিই ক্যাম্পের প্রাণকেন্দ্র। পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক আবহাওয়ায় ওরা মাহুষ। নলকূপের জলে কণ্ঠের তৃষ্ণাট শুধু মেটে। চোখের তৃষ্ণা মেটাতে বৃদ্ধরা বিকেলে এসে বসে পুকুরের ঢালু পাড়ে। অল্প-বয়সীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর নিস্তরঙ্গ জলাকে উর্মিমুখর ক'রে তুলতে। ঐ একফোঁটা গোম্পদই আজ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আড়িয়েলখা বিধৌত গ্রামবাসীর সাঙ্গনা!

এরা আসার পর, এদের মোটামুটি মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হবার পর আর এ ক'বছর বাড়িগুলির সংস্কারের কথা কারও মনে জাগে নি। দীর্ঘদিনের আবেদন নিবেদনের পর এ বৎসর বাড়িগুলিকে আত্মপ্রাপ্ত মেরামতের ব্যবস্থা হয়েছে। চাল ফেলে দিয়ে নতুন চাল হবে, দেওয়াল মেরামত, শালের খুঁটি বদলানো, দরজা-জানালা সংস্কার তো আছেই, উপরন্তু পুকুর কাটা, রাস্তা মেরামত, ড্রেন, পাকা স্থলঘর প্রভৃতি নিয়ে বিরাট একটা অঙ্ক অহুমোদন করেছেন সরকার। মাত্র মাস তিনেক কাজ চলছে, এমন সময়ে চাকরি পেয়ে এসে হাজির হ'ল ঋতব্রত। এতদিন কাজটা দেখেছিলেন মিস্টার ঘোষাল। মাস খানেক আগে সিনিয়র ওভারসিয়ার সুরেন সেনগুপ্তকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বদলি হ'য়ে গেছেন। সেনগুপ্তের কাছে থেকেই কর্মভার পেল ঋতব্রত, তার চাকরির প্রথম কর্মক্ষেত্রে।

ওখানে পৌছবার পরদিনই ঋতব্রত সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে দেখলে সাইকেলে চেপে। ব্লু-প্রিন্টটা সঙ্গে নিয়ে সমস্ত এলাকাটার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে নিল। মেমপাড়ার ঘরগুলো সব সারা হ'য়ে এসেছে। বকুলতলা অঞ্চলে খান ত্রিশেক বাড়িতে কাজ হ'চ্ছে। অন্ত্যন্ত এলাকায় এখনও কাজ শুরু হয় নি। কাল-বৈশাখীর আগে দুর্বল ঘরগুলোর খুঁটি পালটানো দরকার, আর বর্ষা নামার আগেই প্রয়োজন চাল সারাই করা। স্থল, রাস্তা বা পুকুর কাটার কাজ বর্ষার পরে হ'লেও চলতে পারে।

ঘরগুলোও আবার সব এক রকমের নয়। কিছু একেবারে পাকা, অধিকাংশই ঝাশের চটার উপর সিমেন্ট ধরানো। ড্যাব-ওয়াল বলে এদের। এছাড়া মূলিবাঁশ এক দরমার দেওয়ালও আছে। ছাদ অধিকাংশই খড়ের। টিন, টালি এবং পাকা ছাদও আছে। বাড়িগুলি ব্যারাক-টাইপ। লম্বা লম্বা হলঘর। কোনটার একদিকে, কোনটার বা দুদিকেই বারান্দা। হল-ঘরগুলিতে অনেকগুলির মাঝে দরমার পার্টিশন ছিল বোঝা যায়। দরমার ফসিল খুলছে কোথাও কোথাও। শতকরা আশীখানা বাড়িরই পার্টিশন নেই। তবু শালের খুঁটির চিহ্ন ধরে ওরা নিজ নিজ এলাকা ঠিক ক'রে নিয়েছে। এক হলঘরের মধ্যেই নির্বিচারে বাস করেছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণ, বৈজ্ঞ—এমনকি জল-অচল জাত পর্যন্ত!

এছাড়া আছে আর এক জাতের ব্যারাক। লোহার ক্রেমের উপর টিনের গোলাকৃতি শেড। হু'পাশের দেওয়াল ও ছাদ একটি অর্ধবৃত্তের রূপ নিয়েছে টিনের ছাউনিতে। এগুলো ছিল মিলিটারি গুদাম। প্রায় আঠার হাত চওড়া, পঁয়তাল্লিশ হাত লম্বা এই গুদামগুলির দুই প্রান্তে দুই নির্গমনদ্বার ভিন্ন এতবড়

দরঙুলিতে বায়ু গমনাগমনের কোনও জানালা নেই। এদের ইংরাজী নাম ‘নিশেনহাট’ অথবা ‘লাহোর শেড’। বাংলা নাম, ঋতব্রতের পরিভাষায়, ‘অন্ধকূপ’!

“স্তর!”

রতন এসে দাঁড়িয়েছে।

“ডাক্তারবাবু একবার দেখা করতে চান।”

“কোথায় তিনি? আসতে বল।” জবাব দেয় ঋতব্রত।

পরদা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে ধুতি, হাফশাট। পাশ পকেট থেকে স্টেথোটা মাথা উচিয়ে পরিচয় ঘোষণা করছে। ভদ্রলোকের মাথার সামনেটা কেশ-বিরল, পিছন দিককার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ চিক্কনির অমোঘ আকর্ষণে সামনে এসেছে উজ্জান বেয়ে ঘাটতি মেটাতে। গৌফন্দাড়ি কামানো। গলায় তুলসীর কণ্ঠি। সোম্য মাংসল মূর্তি। যুক্ত-করে বিনয়াবনত নম্র নমস্কার ক’রে আসন গ্রহণ করেন ডাক্তারবাবু।

“আপনি আজ প্রায় দিনসাতেক এসেছেন অথচ আপনার সঙ্গে, আলাপ করতে আসা হয়ে ওঠে নি।”

“দৌরটা আপনার একার নয়; আমিও যেতে পারি নি আপনার কাছে।”

“আপনি কি ক’রে যাবেন? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি তো সাইকেলে চেপে কাজ তদারক ক’রে বেড়ান—আপনার সময় কোথা?”

“কাজ সকলেরই থাকে। সেটা প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচিত হবার প্রতিবন্ধক হলে চলবে কেন?”

ডাক্তারবাবু চোখদুটি বন্ধ করলেন, যেন প্রণিধান করছেন ওর কথার সারমর্ম। তারপর ধীরে স্বস্থে চোখ খুললেন, কিন্তু ঋতব্রতের দিকে না তাকিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন তার মাথার আন্দাজ ছয় ইঞ্চি উপরে।

“কথাটা বলেছেন ভালো। কিন্তু কি জানেন মিষ্টার ববু—সকলেই কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে, এই স্বাভাবিক সত্যটা বোঝেন না। আট মাস হ’ল আমি এখানে এসেছি, অথচ কারও সঙ্গে মেলামেশাটা জমে ওঠে নি। সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত। আলাপ করবার মতো সময় কারও নেই। এক ভৈরববাবুর সঙ্গে একটু গল্পসল্প করি।”

“ভৈরববাবু কে?”

“ডেপুটি ক্যাম্প-সুপার। অমায়িক ভদ্রলোক।”

বলে অমায়িক মুখ ক’রে তিনি চোখ বুজে রইলেন। অলঙ্কণের আলাপেই

ঋতব্রত বুঝতে পারলে, এটা ভদ্রলোকের একটা মারাত্মক মূদ্রাদোষ। অপরের কথা শোনার সময় উনি নিম্নলিখিত-নেত্র, আর কথা বলার সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ে শ্রোতার মাথার উপরের কোন এক স্থির বিন্দুর প্রতি। ক্রমশই ঋতব্রত গলদঘর্ম হ'য়ে উঠল এই অদ্ভুত মূদ্রাদোষের জন্তে। কত রকম ইডিওসিনক্রেসিই না থাকে লোকের! গত আট মাসের মধ্যে ডাক্তারবাবুর বন্ধু না জোটার এটাই কি কারণ নাকি?

“আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার অপর একটি বিশেষ কারণও ছিল। প্রথম আলাপেই সেকথাটা বলা সম্ভব হ'বে কিনা বুঝছি না।”

এই পর্যন্ত উর্বরমুখ হ'য়ে নিবেদন ক'রে ডাক্তারবাবু নিম্নলিখিত নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। স্মিত হাসিটি লেগে রয়েছে গুণ্ঠপ্রান্তে। অর্থাৎ এবার ঋতব্রতকে বলতে হবে: “না, না, তাতে কি হয়েছে? বলুন না।”

ঋতব্রত বললও তাই।

“হয় নি কিছুই। তবে আপনার হয়তো মনে হ'তে পারে আপনার সঙ্গে এই আলাপ করতে আসাটা শুধু সৌজন্মের খাতিরেই নয়—স্বার্থ প্রণোদিত।”

আবার হাসি হাসি মুখে উনি চোখ বোজেন।

অর্থাৎ তুমি বল—‘বারে, সে কি কথা, তা মনে করব কেন?’

ঋতব্রত কিন্তু এবার আর তা বলল না। দেখিই না কি হয়, ভাবখানা গুর। ডাক্তারবাবু ধ্যাননিম্নলিখিত লোচনে প্রতীক্ষা ক'রেই রইলেন। এ তো বড় অস্বোয়াস্তু। এতক্ষণে ঋতব্রত বুঝে নিয়েছে কেন লোকে ভদ্রলোককে এড়িয়ে চলে। মুদিত নেত্রে সহাস্ত বদনে বসে আছেন তো বসেই আছেন তিনি। আর ঋতব্রত ভাবছে অল্প কথা—আচ্ছা, ঠর এই মূদ্রাদোষের স্বযোগ নিয়ে কোনও বিড়ম্বিত আলাপনরত ব্যক্তি কখনও স'রে পড়ে নি?

“কি? তাও তো মনে করতে পারেন আপনি?” চোখ বুজেই তাগাদা দেন উনি। ভারী রাগ হ'য়ে গেল ঋতব্রতের। বললে, “দেখুন ডাক্তারবাবু, এ সন্দেহ যখন আপনার মনে জেগেছে, তখন আমার মনে হোক আর নাই হোক, আজ নাই বললেন কথাটা। জরুরী কিছু নয় নিশ্চয়ই।”

ডাক্তারবাবু চোখ খুললেন। মাথায় ছয় ইঞ্চি উপরে নয়—এই প্রথম তাঁর দৃষ্টি সোজা এসে পড়ল ঋতব্রতের চোখের উপর। একবার ঢোক গিলে বললেন, “না, ব্যাপারটা জরুরী তো বটেই। তাছাড়া আপনি যখন বলছেন যে তেমন কিছু মনে করবেন না, তখন বলেই ফেলি, কি বলুন?”

“বলুন।”

“ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমার কোয়ার্টারটা রিপেয়ার করবার সময় কয়েকটি কাজ করিয়ে দিতে হবে যা নাকি এস্টিমেটে ধরা নেই। একটা বাউণ্ডারি দেওয়াল তুলতে হবে;—বাথরুমটা একটু বাড়াতে হবে, আর ইয়ে, চাকরদের জন্য একটা বাড়তি ঘর করাতে হবে।”

গম্ভীর হ’ল ঋতব্রত। বললে, আচ্ছা দেখি স্টিংসন্ড্ এস্টিমেটে কত টাকা ধরা আছে ওটা রিপেয়ারের জন্যে।”

“এই যে দেখুন না”, ডাক্তারবাবু বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা কয়েকখণ্ড কাগজ বার করলেন, তাতে এস্টিমেটের খানতিনেক পাতা কপি করা ছিল। তাঁর বাড়িটা মেরামতের অংশটুকু। অবাক হ’ল ঋতব্রত। এস্টিমেটের কপি ডাক্তারবাবুর কাছে যায় কি ক’রে?

“অত্যন্ত কাজগুলি ওভারসিয়ারবাবুই ক’রে দিতে রাজী হয়েছেন, শুধু ঐ বাড়তি ঘরটা বানাতে তিনি রাজী নন। বলেন, সাহেবের পারমিশন লাগবে। আপনি স্তর একটু—”

“ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত বলেছে এস্টিমেটের বাইরের ঐ কাজগুলি আপনাকে ক’রে দেবে?”

“ইচ্ছা করলে আপনারা তো সবই পারেন স্তর!”

ঋতব্রত মনে মনে চটে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত কোন্ সাহসে কথা দেয় ডাক্তারবাবুকে?

“তাহ’লে আজ উঠি। আপনি স্লেনবাবুকে একটু বলে দেবেন স্তর—”

“আমি দুঃখিত ডাক্তারবাবু। ঐ বাড়তি কাজগুলো করানো সম্ভবপর হবে না। স্টিংসন্ড্ এস্টিমেটে এর জন্যে টাকা ধরা নেই।”

ডাক্তারবাবু ঐ অপ্রত্যাশিত উক্তি শুনে আহত হন। বলেন গম্ভীর হ’য়ে, “সেটাই যদি আপনার একমাত্র অস্ববিধা হয়, টাকার ব্যবস্থা আমি করব। আপনি গুণ্টা করিয়ে দেবার অর্ডার দেবেন শুধু।”

“আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাজ করবে আমার ঠিকাদার, আর টাকা দেবেন আপনি! মানে?”

“মানে আবার কি? মানে ঐ?”

“কী আবোল-তাবোল বকছেন মশাই! নিজের পয়সায় বাড়ি সারাতে চান তো আমার কাছে এসেছেন কেন?”

এবার উঠলেন ডাক্তারবাবু—

“সরকারী বাড়ি নিজের পয়সায় সারাতে গেলেও এস. ডি. ও-র অস্বমতি লাগে।

আপনাকে আমি শুধু বলছি এই কাজগুলো করিয়ে দিন, টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। অর্থাৎ আমার হাসপাতাল মেরামতের কয়েকটা আইটেম কম করিয়ে খরচটা পুষিয়ে দেবো। কোন্ এঞ্জিনিয়ার আপনাদের এই এস্টিমেট করেছেন জানি না, কিন্তু ডাক্তারের বাড়ির বেড়া, বাথরুম যার নজরে পড়ে না—যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি অল্পগ্রহ করে একবার হাসপাতালে আসবেন, তখন কথা হবে। আচ্ছা নমস্কার।”

ডাক্তারবাবু মেদবল্ল বপুটি নিয়ে রওনা দিলেন। ঋতব্রতের মনে হ’ল, নাক থেকে ওলন ধরলে ভুঁড়ির কাছে ছ’ ইঞ্চি বেধে যাবে। মনে মনে হাসলে সে। ভগবান যদি রাজমিস্ত্রি হতেন, তবে এমন “আউট-অফ-প্লাস” গাঁথনির দাম দিত না সে।

ডোল অফিসের সামনেটার প্রচণ্ড ভিড়।

দরমার বেড়া দেওয়া অফিসের সামনে গাদাগাদি করে বসে আছে জনতা। পরিবার পিছু ওরা পাবে একখানা করে কবল। একধারে কবলের স্তুপ, অপর ধারে প্রতীক্ষমাণ ক্যাম্পবাসী;—মাঝখানে ছোট্ট হাইফেনের মতো একটা টুল নিয়ে বসে আছেন ডিস্ট্রিবিশন করানী ললিতবাবু। একটা বৈজ্ঞানিক উপমা মনে পড়ল ঋতব্রতের। ললিতবাবু আজ ‘ক্যাটালিটিক এজেন্ট’ মাত্র! দ্বন্দ্ব-সমাসের হাইফেন-সদৃশ ঐ ক্যাটালিটিক এজেন্টই রেশন-কার্ডে লিখিয়ে পরিবার-পিছু একখানা করে কবল বিতরণ করছে। কবলগুলো শীতকালে আগার কথা ছিল। ওয়াগন বিভ্রাটে এতদিনে এসে পৌঁছেছে। কি একটা বচসা বেধেছে প্রতীক্ষমাণ জনতার মধ্যে। সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ঋতব্রত ফিরে যাবার উত্থোগ করছে, দেখা হ’লে গেল ক্যাম্প-স্থপার তফাদারের সঙ্গে।

“কি হ’ল? ফিরে যাচ্ছেন যে?”

“হ্যাঁ; ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করব, কিন্তু আপনারা এখন ব্যস্ত—”

“কিছু না, কিছু না। ও তো লেগেই আছে। আসুন ভেতরে।”

ক্যাম্প-স্থপারের সঙ্গে ঋতব্রত ঘরে গিয়ে বসে। তফাদার চায়ের হুকুম দিলেন।

“তারপর আপনার কাজকর্ম কেমন বুঝছেন?”

“এই তো সব এলাম—এখনও কিছু দেখে উঠতে পারি নি।”

তফাদার মিশুকে লোক। দরাজ দিল। অল্পক্ষণের আলাপেই খুশি হয় ঋতব্রত।

নানান আলাপের পর হঠাৎ গলাটা নামিয়ে নিয়ে তফাদার বললেন,

“মিস্টার নরু দেখলাম আপনার অফিসে গিয়েছিল আজ। ব্যাপার কি?”

“মিস্টার নক্সটি কে?”

“ওঃ, এখনও নামটা কানে যায় নি বুঝি? ক্যাম্পে ডাঃ সাধুচরণের নাম শ্রীমান নক্স।”

হাসলেন ঋতব্রত। বললে, “নামকরণটা কে করেছে জানি না। তবে শুঁকে দেখে আমার অল্প একটি নামকরণ করতে ইচ্ছা হয়েছে। আউট-অফ-প্রাশ।”

“সেটা আবার কি?”

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাখিল করে ঋতব্রত। দিলখোলা হাসি হাসেন তফাদার। তারিফ করেন নামকরণের। ঋতব্রত জানালো ডাক্তারবাবু হাসপাতালের লেডিস ওয়েটিং রুমটা করাতে চান না। তিনি চান ঐ টাকায় তাঁর কোয়ার্টার্সে একটা চাকরদের ঘর ক’রে দিতে। তফাদার বলেন,—ভুল বুঝেছেন আপনি। মিস্টার আউট-অফ-প্রাশ লেডিস ওয়েটিং রুমটাই করতে বলেছেন। তবে সাইটটা হাসপাতাল সংলগ্ন না হয়ে গৃহ-সংলগ্ন হবে মাত্র।”

“আমি ঠিক বুঝলাম না।”

আবার হা হা ক’রে হাসেন তফাদার। “বুঝবেন মশাই বুঝবেন। যাক না দুদিন। একদিনে বেশী বোঝা ভালো নয়। আহুন, আপনার চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে।”

চা খেতে খেতে হুড়মুড় ক’রে ঘরে ঢুকে পড়ে একজন বৃদ্ধ। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে উদাস অন্ধ দৃষ্টি। গায়ে অসংখ্য তালি দেওয়া ধূলিমলিন একটা কামিজ; ছিন্ন বসন। বৃদ্ধ সোজা এসে উপুড় হ’য়ে পড়ল ঋতব্রতের প্রায় পায়ের উপর। সামলাতে সামলাতে খানিকটা চা পড়ে গেল ওর গায়ে। সারা অফিস হাঁ হাঁ ক’রে উঠল। অন্ধ দৃষ্টি মেলে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন ব’লে যাচ্ছিল বৃদ্ধ, বিন্দু-বিসর্গও বোঝা যায় না। অফিসের দারোয়ান এসে জামার কলার ধরে টেনে তুলল। তফাদার ধমক দিলেন, “কেন ঢুকতে দাও এমন ক’রে? কি হয়েছে ওর? ললিত!”

বারান্দার টুল থেকে উঠে আসেন ললিতবাবু। হাতে কলম। বলেন, “আর বলেন কেন স্ত্র! ও নিজের নামে একখানা কার্ড করিয়েছে আবার ছেলের নামে একখানা। কার্ড পিছু দুখানা কব্বল দাবি করছে। অথচ এভাবে দিতে গেলে সকলের কুলাবে কেন?”

“সেটা শুকে বুঝিয়ে বললেই পারো!”

“এক বন্টা ধরে তাই তো বোঝাচ্ছি স্ত্র। তাছাড়া এই কি একটা কেস? এ বেটোরা সবাই এমনি ক’রে কার্ড বাড়িয়েছে। মায়ের নামে একটা কার্ড, মেয়ের নামে আর একটা। হু’ ভাইয়ের আলাদা কার্ড। কি করব বলুন?”

তফাদার বুদ্ধকে ডেকে পাঠালেন। অন্ধ দৃষ্টি মেলে বুদ্ধ এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালো ঋতুরতের সামনে। ঘোলাটে চোখ ছটোর কোনায় পিঁচুটি লেগে আছে, মুখের কস্ বেয়ে নেমেছে সাদা একটা দাগ।

“আবার গুর কাছে গেলে কেন—আমি ডাকছি তোমায়।”

“আইজ্ঞা?” বুদ্ধ ঘুরে দাঁড়ায় শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

“তোমার নিজের নামে একখানা কার্ড করিয়েছ, আবার তোমার ছেলের নামে আর একখানা কার্ড কেন?”

“আইজ্ঞা এ হজুর আমার ছের্যা না।”

দরজার কাছ থেকে হৈ হৈ ক'রে ওঠে জনতার মিশ্র কণ্ঠ। ‘...পোলা নয়? ... ছেইল্যা নয়? ... ছের্যার মাথায় হাত রাইখ্যা কও দিকিন চাঁদু! ...’ দূর থেকে ভেসে আসে আরও কতকগুলি মন্তব্য—অশ্লীল ইঙ্গিত তাতে ভরা।

গর্জন ক'রে ওঠেন তফাদার। ছুটে আসে দারোয়ান। ভিড় ফাঁকা হ'য়ে যায়।

“হরিদাস তোমার ছেলে নয়?”

“আইজ্ঞা না।”

“ওর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারো এ কথা?”

ঠোট ছোটো ঈষৎ নড়ে ওঠে বুদ্ধের। কি যেন বলতে যায়। তারপর বসে পড়ে। দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কৈঁদে ফেলে সে।

“কি হ'ল তোমার?” প্রশ্ন করেন তফাদার।

কান্নায় ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলায় কি যেন জবাব দেয় বুদ্ধ। সব কথা বোঝা যায় না। ভাবার্থটা—এত বড় কথা! ... আজ না হয় সে দুর্দশায় পড়েছে ... গাঁয়ে তারও পাঁচ বিঘা জমি ছিল ... গাই ছিল ... আজ তার দুয়বস্থা দেখে হজুর পর্যন্ত বলেন ছেলের মাথায় হাত দিয়ে কথা বলতে ... বুদ্ধ বয়সে একমাত্র সন্তানকে হারালে কি খুশি হন হজুর?

তফাদার বলেন, “কি আশ্চর্য! তুমিই তো বললে তোমার ছেলে নয়!”

“আইজ্ঞা, আমার ছের্যা না তো কার ছের্যা? অহন এ্যারে আমি ত্যাজ্যাপুত্রুর করছি।”

হেসে ফেলেন তফাদার। ঘরের ও-কোনা থেকে রসিকতা করেন ডেপুটি সুপার ভৈরবচন্দ্র, “করেছ কি? অত বড় সম্পত্তি থেকে একমাত্র ছেলেকে ত্যাজ্যাপুত্র করলে! আবার দত্তক নেবে নাকি? বল তা, হ'লে রাজী হ'য়ে যাই আমি।”

হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে গেল তফাদারের। ভৈরবচন্দ্রের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত

ক'রে তিনি বুদ্ধকে বললেন, “এখন যাও। সব বিলি হয়ে গেলে যদি বাঁচে, তবে আর একখানা কবুল পাবে তুমি।”

বাহাদুর ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ঘরে ক্ষণিক নীরবতা। তফাদার যেন ভৈরবচন্দ্রকে কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। হঠাৎ ঋতব্রতের দিকে ফিরে বলেন, “আসবেন এক সময়ে আমার বাগান—আলাপ করা যাবে।”

ঋতব্রতও যেন রেহাই পেয়ে বেঁচে গেল।

সাইকেলে চেপে কাজ দেখতে বের হ'ল সে। ...ছোট বড় ব্যারাক বাড়ি। পাশাপাশি। ওর কোর্টরে আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য ভূতপূর্ব-মালুখ। ওরাও নাকি একদিন আমাদেরই মতো হাসতো, খেলতো, রোজগার করতো, খরচ করতো, তুলে রাখতো ভবিষ্যতের সঞ্চয়।

হঠাৎ চিন্তাশ্রোতে বাধা পড়ল। ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত নমস্কার ক'রে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। কাজের সম্বন্ধে কি জানতে চায় সে। সাইকেল থেকে নেমে ঋতব্রত এগিয়ে যায় কাজের ওখানে। পি/৩৭ নম্বর ব্যারাক। মিলিটারি আমলের নামেই ব্যারাকের পরিচয়। খালের খুঁটির উপর খড়ের চাল, বিরাট বড় একটা হলঘর। মাঝে পিঠা-মুলা বাঁশের ছোঁচা বেড়া।

সেনগুপ্ত বলে, “একত্রিশটা খুঁটি বদলাবার কথা আছে এটায়। সবসম্বন্ধ একশো সতেরটা খুঁটি আছে। সবগুলোই প্রায় পচে গেছে। কি করব, একটু দেখে দিন।” সত্যিই তাই। যে গোটা দশেক খুঁটির গোড়া খুঁড়ে রাখা হয়েছে তার সব কটির তলাই পচে গেছে। ঋতব্রত বললে, আপাতত একত্রিশটা বদলে দিন। পরে এক্সিকিউটিভকে জানিয়ে দেখব।”

একসঙ্গে চিংকার ক'রে কথা বলে ওঠে আশপাশ থেকে কয়েকজন। “একত্রিশটা খুঁটি বদলানো যা, না বদলানো তাই...মরতাম হয় এইহানয়ই মরবাম্...আম্রার পরান পরান না...আমরা তো রিক্সা...বড় বহন আইয়ে আপনারা তো থাকেন পাকা কোঠার তলায়।”

বিত্রত বোধ করলে ঋতব্রত। কোথা থেকে ধমক দিয়ে ওঠে সিংজী ঠিকাদার। ওরা চুপ ক'রে যায়।

“কটা পোস্ট বদলালে ঘরটা যথেষ্ট শক্ত হয় মনে করেন স্মরেনবাবু?”

‘সবগুলোই বদলানো দরকার স্তর।’

‘কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।’

ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত নিরুত্তর। সিংজী বললে, “হামি বলবে হুজুর? পাঁচাশটা দলিয়ে দিন।”

“পঞ্চাশটায় কিছু হবে না।” সেনগুপ্তের সাফ জবাব।

“হোবে ওভারসিয়ারবাবু হোবে। পঁচাশটা বদলিয়ে দেন, ঔর বাদ বাকিমে ঠেকা দিইয়ে দেন। না কি বলেন স্তর?”

অকূলে কূল পায় ঋতব্রত। হাঁ তাই করা হোক। সে আবার সাইকেলে উঠবার উপক্রম করে। সিংজী সেনগুপ্তকে মনে করিয়ে দেয়, “কোল্টারিটার কোথা ভি বলেন।”

“ও হ্যাঁ, শালের খুটিতে আলকাতরা মাথাবার জন্তে সিংজী দু' ব্যারেল আলকাতরা এমেছিল। অতি রদ্দি মাল। আমি রিজেক্ট করেছি। সেই সম্বন্ধে সিংজী আপনাকে কি বলবে।”

ঋতব্রত সিংজীর দিকে মেলে ধরে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি। সিংজী পাগড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে ফেলে বলে, “হ্যাঁ জী, মাল খারাপ আছে—ই বাত হামি মানিয়ে নিলম। লেকিন হাতের পাঁচটা আঙ্গুলভি তো একসাইজ হোয় না স্তর। ও দু' ব্যারেল ভি মিশায়ে লিই?”

ঋতব্রত গম্ভীর হ'য়ে যায়। না, তা সে হ'তে দেবে না। ভালো মাল নেবার জন্তে পয়সা দেওয়া হবে ঠিকাদারকে। দু' ব্যারেল রদ্দি মালই বা সে নেবে কেন? আলকাতরার আবার ভালো-খারাপ মাল থাকে নাকি? ভাগ্যে সিংজী নিজেই মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা। না হ'লে মুশকিলে পড়তে হ'ত তাকে। বললে, ‘হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচরকম হ'তে পারে—কিন্তু সরকারী নোটগুলো—যা আপনি বিনিময়ে পাবেন, তা সব এক মাপের। ওটা চলবে না।’

“দু' ব্যারেল আলকাতরা নষ্ট হোবে স্তর?”

“নষ্ট হওয়াই উচিত। আপনি মাল ফেরত পাঠিয়ে দিন।”

“দু'বার যাতায়াতে মালের ভাড়া যে দামের চেয়ে বেশি হোবে স্তর?”

“তার জন্তে আমি দায়ী নই। কলকাতার যে এজেন্ট আপনার মাল খরিদ করে, তার কমিশন বা মাইনা থেকে কেটে নেবেন লোকসান।”

অতি কাতরভাবে আরও দু' একবার অস্থরোধ করে সিংজী। ঋতব্রত কিন্তু নাছোড়বান্দা। এইসব ঠিকাদারের প্রতি একবিন্দু কক্ষণ নেই তার। সে কিছুতেই একফোটা খারাপ মাল নিতে দেবে না। তখন বাধ্য হয়ে সিংজী প্রস্তাব করল—ছজুর যদি অস্থমতি করেন, তবে পুরানো শালবল্লাগুলোতে লাগিয়ে দেবে ওটা। দাম সে চায় না। মালটা ফেলে দিলেও লোকসান, ফিরিয়ে দিলেও তাই। যাক ওটা ওভাবে খরচ হ'য়ে। এতে আপত্তি করার কোন কারণ ঋতব্রত খুঁজে পেল না। নতুন শালখুটিতেই শুধু আলকাতরা মাথাবার কথা। পুরানোগুলোতে

যদি সিংজী নিজের খরচে আলকাতরা মাথায় এবং দাম না চায় তবে তার আবার আপত্তি কিসের? সে অহুমতি দিল। সেনগুপ্ত সাইট-অর্ডার বইখানি এগিয়ে দিল। লিখিত অর্ডার চায় সে।

“লিখিত-অর্ডার? বেশ।” খসখস ক’রে লিখে দিল সে। এর জন্তে দাম পাবে না, ওভারসিয়ার যেন এই আলকাতরা মাথানোর জন্তে কোথাও কোনও মাপ না তোলে এম. বি. তে, এ কথাও লিখল এবং আণ্ডারলাইন ক’রে দিল সেটা।

কলম থেকে মুখ তুলে দেখে সিংজী এবং সেনগুপ্তের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল একটা। ওকে তাকাতে দেখে দু’জনেই সামলে নিলে। ব্যাপার কি? সন্দেহ স্বতন্ত্র বললে, “কিন্তু এতে আপনার লাভ?”

লাভ সিংজীর কিছু নেই। ওটা দরিয়াকে চেলে দেবার চাইতে এটাই ভালো হ’ল না কি? অর্থাৎ কিছু পুণ্য-সঞ্চয় করল ঠিকাদার রামশরণ।

স্বতন্ত্র খুশি হয়। সাইকেলে উঠতে উঠতে ভাবে এই ধর্মজ্ঞানটুকু না থাকলে এই শ্রেণীর লোককে মাছষ বলে চেনাই যেত না। রওনা হ’য়ে পড়ল সে দ্বিচক্রযানে।

নামতে হ’ল কিন্তু একটু পরেই।

পথের উপর একটি বিধবা মহিলা তাকে নামতে বলছেন। নিরাভরণা প্রৌঢ়া ভদ্র-মহিলা। ক্যাম্পের বাসিন্দা। মাথায় আধো ঘোমটা।

“আমায় বলছেন?”

“হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি বাবা।”

স্বতন্ত্র এগিয়ে আসে। প্রৌঢ়া বলেন, তাঁর ঘরে একটি দরমার পার্টিশন দিয়ে দেবার জন্তে ঠিকাদারের লোকজনকে অহুরোধ করেছিলেন তিনি। তারা রাজী হয় নি। ওভারসিয়ারবাবুকেও তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর আবেদন। ফল হয় নি। স্বতন্ত্র বুঝিয়ে বললে পার্টিশন করার আদেশ নেই। যেখানে পুরানো পার্টিশন দেওয়াল আছে সেটাই শুধু মেরামত করা চলবে। নতুন পার্টিশন দেওয়াল করা যাবে না। প্রৌঢ়া কয়েকবার বিনীত অহুরোধ করলেন। স্বতন্ত্র ক্রমে বিরক্ত হ’ল। এরা সবাই চায় নিজের ঘরটিকেই খালি ভালো ক’রে সারাতে। শেষে বললে, “দেখুন, এখন কালবৈশাখীর সময়—যে কোনও দিন ঝড় আসতে পারে। আগে ঘর মেরামত শেষ হ’য়ে যাক। পরে টাকা থাকলে পার্টিশন দেওয়াল করা যেতে পারে। এখন ও অহুরোধ করবেন না।”

প্রৌঢ়া আর আপত্তি করেন না। স্বতন্ত্র সাইকেলে চেপে সোজা চলে আসে

হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু অত্যন্ত খুশি হ'য়ে ঋতব্রতকে আপ্যায়ন করলেন। সেদিনকার স্মৃতি তিনি মনে রাখেন নি বোধ হয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর হাসপাতালটা দেখালেন। ডিসপেনসারিতে একটা কাউন্টার জানালা বসাতে হবে। মেল-ওয়ার্ডটা ঝড়ে কাত হয়ে পড়েছে। ভগবান জানেন কটা খুঁটি বদলাতে হবে তার। ঋতব্রত ওভারসিয়ারকে বললে আজ বিকেলেই কয়েকটা শালখুঁটি দিয়ে বাইরে থেকে ঠেকা দিতে। ঝড় এলে এটা ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। স্টেরিলাইসিং রুমের ওপাশের একটি ঘর মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। ঋতব্রত বললে, ওটি কি ছিল?"

“ওটি ও, টি. ছিল।”

“মানে?”

“অপারেশন থিয়েটার।” একচালা ঘরটা মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। ডাক্তারের বসবার ঘরের পিছনে আলমারি দিয়ে আড়াল ক’রে অস্ত্রোপচার এবং প্রসবঘরের বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ি হাসপাতালের লাগাও। সাধুচরণ নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন অতিথিকে। নিজেই চায়ের জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভ জ্বলে। ডাক্তার সাধুচরণ বিবাহিত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কাউকেই তিনি এই ক্যাম্পে নিয়ে আসেন নি। সাধুচরণের মতে ক্যাম্পের নৈতিক জীবন পরিবারভুক্ত অপরিণতদের মনে রেখাপাত করতে পারে। তাই তিনি একেবারে একাই থাকেন।

চা পানাস্তে ডাক্তার সাধুচরণ তাঁর বাড়ির কাজগুলি দেখাতে লাগলেন। ঋতব্রত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তাঁর বাড়ির চারদিকে পুরানো টিনের বেড়া দেওয়া হ’য়ে গেছে। বাথরুমটাও ভেঙে সম্প্রতি বড় করা হয়েছে। এ বিষয়ে সেদিন ডাক্তারবাবুর অহুমতি নিয়ে খাওয়া বাছল্য মাত্র।

“এগুলো স্ত্র ওভারসিয়ারবাবুই ক’রে দিয়েছেন। এখন শুধু আমার সার্ভেন্টস রুমটা করিয়ে দিন আপনি। আপনার এস্টিমেটে একটা লেডিস ওয়েটিং রুম করার কথা আছে হাসপাতালে; সেটা আমার প্রয়োজন নেই। তার বদলে এখানে একটা বাড়তি ঘর ক’রে দিন শুধু।”

“দেখুন ডাক্তারবাবু, মেয়েদের বিশ্রামাগারে আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে কিন্তু ক্যাম্পের মেয়েদের সেটা প্রয়োজন। এটা আপনি অস্ত্রায় অহুরোধ করছেন।”

“আজ্ঞে না। আপনিই অস্ত্রায় জিদ করছেন। হাসপাতালে কি করার দরকার না দরকার সেটা আমিই বিবেচনা করব।”

“বিবেচনা আপনি করতে পারেন। আমি কিন্তু সরকারী স্তাংসন্ড এস্টিমেটের একবিন্দু এদিক ওদিক করতে পারব না। এস্টিমেটের বাইরে এ কাজগুলোই বা ওভারসিয়ার কেন করেছে আমি খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু আর ওগব চলবে না।”

চোখছুটি বুজে গেল ডাক্তার সাধুচরণের। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে বিগলিত হ’য়ে নিমীলিত নেত্রে তিনি বললেন, “দেখুন, সম্ভাব বজায় রেখে আপনি এটা ক’রে দেবেন, এটাই আশা করেছিলাম আমি। আপনি রাজী না হ’লে, উপর থেকে অর্ডার করিয়ে আনতে হবে আমাকে। সেই করবেন শেষ পর্যন্ত, মাঝের থেকে খামোখা হয়রানি হবে আমার।”

“উপর থেকে হুকুম নিয়ে এলে আমি আপনার ঘর ক’রে দেবো ডাক্তারবাবু। তবে উপরওয়ালাকে আমিও জানাবো যে আপনার বাড়তি ঘরের চেয়ে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমটার প্রয়োজন অনেক বেশি।”

হাসি হাসি মুখেই জবাব দেন সাধুচরণ, “গায়ে পা তুলে দিয়ে বগড়া করাটা যদি বাঙ্কনীয় মনে করেন আপনি, ক’রে দেখতে পারেন। তবে আমি বলছিলাম কি, বিদেশে বিভূঁইয়ে মাছুষের হঠাৎ অসুখ বিস্ময়ও তো হয়, তাই কি-বলে-ভালো জলে বাস ক’রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদটা না করাই উচিত নয় কি ?

ঋতব্রত চটে নি। ভারি হাসি পেল তার, বললে, “আপনি কিন্তু ভুল করছেন এবার ডাক্তারবাবু। জলে যদি কোনও মাছুষ কখনও বাস করতে বাধ্যও হয়, তবু নক্র-জাতীয় কোন জীবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সম্ভব হয় না।”

“কি বললেন ? কি জাতীয় জীব ?” বৈষ্ণব সাধুচরণের মূর্তি তখন ঠিক তুণাদপি স্তনীচেন নয়।

ঋতব্রত প্রকাশ্যেই হেসে ফেলেছে, “ঐ যে, আপনি বলছিলেন না জলে বাস ক’রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ না করাই ভালো। তাই বলছিলাম নক্র-জাতীয়। নক্র মানে কুমীর।”

চোখ দিয়ে আঙুল ছুটছে সাধুচরণের। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের হ’ল না। ‘নক্র’ শব্দটা প্রকাশ্যে কেউ তাঁর সামনে উচ্চারণ করতে পারে—একটাকেই উদ্দেশ্য ক’রে বলতে পারে এটা যেন বিশ্বাস হয় নি তাঁর।

ছোট একটা নমস্কার ক’রে পথে নামল ঋতব্রত। রাস্তায় এসেই ওভারসিয়ারের কৈফিয়ত তলব করল সে। ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত বললে—আগের এস. ডি. ও-র মৌখিক আদেশ মতো এটুকু বাড়তি কাজে সে হাত দিয়েছে। সেনগুপ্ত বলে, “কিন্তু ডাক্তারবাবুটি...মানে...লোক খুব ইয়ে নন...”

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বললে, “জানি ; কুমীরের ভয় থাকলে তাঁকে বলবেন

আপনি—আমার ছকুমৈ করতে পারেন নি। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার—”

মিস্টার নক্স! না, তফাদারেরই জিত হয়েছে। ঐ নামটাই ভালো। ছেলে-মামুষের মতোই আপন মনে ঋতব্রত হেসে ফেলে।

রান্না করবার জন্তে একটি লোক খুঁজছিল ঋতব্রত। অগ্ন্যস্ত্র সমস্ত কাজ রতনই করে; কিন্তু রান্নায় সে কলির-দ্রোপদী! রতনের বোধহয় বক্তব্য খাওয়াটাই আর্ট—রান্না করাটা কিছু না। ডালে লবণাধিক্য এবং বোলে লবণাভাব ব’লে হাল্হতাশ করলে পাচকের কুখ্যাতির চেয়ে ভোক্তার নিবুদ্ভিতাই প্রকাশ পায় বেশি। এটুকুও কি ব’লে দেবার প্রয়োজন, যে ডাল ও বোল একত্রিত করলেই লবণের পরিমাণ সমান হবে? এঞ্জিনিয়ার হ’লে কি হবে, রতনের বিশ্বাস, ঋতব্রত অঙ্কশাস্ত্রে ঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ করে নি। ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দু’টি সমসংখ্যার সমন্বয়ে কোন্ সংখ্যার উদ্ভব হয়, এটা যদি ঋতব্রত না বোঝে, তবে তার অঙ্কশাস্ত্রের পরীক্ষার খাতায় সেই সংখ্যাটারই উপস্থিতি প্রমাণিত হয় নাকি?

এ জটিল প্রশ্নের সমাধানে মনোনিবেশ করে নি ঋতব্রত। সে খুঁজছিল একজন রান্না করার লোক। অবশেষে তফাদার সাহেব একটি পাচিকার বন্দোবস্ত করেন। তাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল সিংজী ঠিকাদারের সঙ্গে। সিংজী ঋতব্রতকে অহুরোধ করেছে যেন ঐ বিধবা মেয়েটাকে অবিলম্বে জবাব দেওয়া হয়। হেতুটা খোলাখুলি বলা হয় নি। তবে যেটুকু ইঙ্গিত করেছে, তাতে বোঝা যায় গুড-কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না কুসুমকে—সিংজীর মতে। কারণটা নৈতিক।

কুসুম এই ক্যাম্পেরই একজন পি. এল। বিধবা। বয়স ঋতব্রতের চেয়ে বছর চার পাঁচ বেশিই হবে বোধ হয়। ঋতব্রত ওর সঙ্গে কখনও কথাবার্তা বলে নি, প্রয়োজনও হয় নি। নিজের মতো এসে আপন মনে কাজগুলি সেয়ে সে চলে যায়। কোন কিছুর প্রয়োজন হ’লে ঋতব্রত ভাববাচ্যে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কপাল পরিস্থিতি ঘোমটা টেনে কুসুম নীরবে ছকুম তামিল ক’রে যায়।

রতন বাজারে গেছে জেনেও ঋতব্রত হাঁক পাড়ে, “রতন এক মাস জল।” কুসুমও জানে যে বাবু জানেন রতন বাজারে গেছে। হাতের কাজ ফেলে এক মাস জল গড়িয়ে সে রেখে আসে নীরবে, ওর নাগালের মধ্যে। এই নতনয়না, অনলস-কর্মী, নীরব সেবাত্রতীর প্রতি একটা কোমল ভাব জাগে। সহানুভূতির পর্দায় ফেলা যায় সেটাকে।

কুসুমের কথা ঋতব্রতের প্রবাস-জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে। স্মরণে তার

প্রাক-পি. এল. পর্বটার একটা পর্যালোচনার প্রয়োজন। কুসুমের উপকথা সে সংগ্রহ করেছিল অনেকের কাছ থেকে। তার মধ্যে শ্রীমান রতনের অবদানই সবচেয়ে বেশী। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বাঁশের ছয়পায়াতে যখন সে এলিয়ে দিত ক্লাস্ত দেহটা, তখন রতন এসে বসতো তার হিসাবের খাতা নিয়ে। সারা-দিনের খরচের হিসাবটা দাখিল করার থাকতো একটা অজুহাত; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তার গল্প করার। এইজন্তে হিসাবের খাতা ছাড়াও সুপুরির খলি আর ষাতিটাও নিয়ে বসতো সে। হিসাব চুকতো অল্পেতেই, কিন্তু মিটেতে চাইতো না সুপুরি কাটার অল্পপান হিসাবে তার গালগল্প। সারাদিন ক্যাম্পের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে যতো আজগুবি গল্প সংগ্রহ ক’রে আনত রতন, আর সেগুলিতে আপনার মনের মাদুরী মিশিয়ে নিবেদন করত সাক্ষ্য-আসরের একক প্রোতাটিকে। ঋতব্রতের কবিতা লেখার বাতিক ছিল, বাই ছিল ডায়েরী রাখার। এ ছাড়া ক্যাম্প থেকে বড় বড় চিঠি লিখত সে কলিকাতাবাসিনী কোন একজনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসব কাজই তাকে মূলতুবি রাখতে হ’ত, যে শুভসাক্ষ্য রতন এসে হাজির হ’ত তার সুপুরি তথা গল্পের বাঁপি নিয়ে।

যাক, যা বলছিলাম। কুসুমের পূর্ব-ইতিহাস। সেকথা নিজের ভাষায় বলার চেয়ে একখানা চিঠির অল্পলিপি তুলে দেওয়া যেতে পারে। এর লেখক ঋতব্রত। ক্যাম্প-জীবনের গোড়ার দিকে লেখা। সেই কলিকাতাবাসিনী কোন এক বিশেষ জনকে উদ্দেশ্য ক’রে। এটা কি ক’রে আমার হস্তগত হ’ল, এ প্রশ্ন জাগতে পারে আপনাদের মনে। আচ্ছা, বলব সেকথাও। তবে বিশ্বাস করুন, ম্যাডাম বোসের কোন সেন্ট-সুরভিত বাস্তু থেকে নিজে হাতে চুরি করি নি।

“সুচরিতাসু,

তোমার চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ আছে। জবাবে অনেক কথাই বলতে পারি আমি। বস্তুত যুক্তিতর্কে প্রত্যেকটিকেই খণ্ডিত করা যেতে পারে। প্রথমত, তোমার কাছ থেকে যতো চিঠি উজান বেয়ে আসে তার বেশী চিঠি বয়ে যায় ভাঁটার টানে কলকাতার মোহনায়—এ কথার নজির আছে আমার ডায়েরিতে। দ্বিতীয়ত, তোমার চিঠিগুলোর চেয়ে আমার খামগুলো গতরে ভারি;—প্রমাণ, আমার গত চিঠি তুমি বেরানিং পেয়েছিলে। তবে স্বীকার করি চিঠির পরিচয় তার ওজনে নয়, তার আন্তরিকতায়। শ্রামলীর ভাষায় ‘তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।’ তা কি করবো বলো অমন মুক্তোর মতো হরফ বা অমন দরদভরা ভাষা আমার কলমের ডগায় আসে না। লোহা-পেটা কাঠ-খোটা এঞ্জিনিয়ারের আঙুলের চাপে কলম বেচারী পাল্লা দেবে কি ক’রে

তোমার মতো নরম হাতের লেখনীর সঙ্গে। কলম আমার হেরে গেল জঁকির দোষে !

তোমার তৃতীয় অভিযোগ, তোমাদের, মানে আমাদের ‘অভিযাত্রিক’ কাগজে আমি লেখা দিচ্ছি না। বিশ্বাস কর রেখা, একেবারে সময় পাই না। মানে সময় পাই, কিন্তু লেখবার মতো মনের প্রেরণা পাই না। ইঁট, কাঠ, চুন, স্তরিকির মধ্যে আমার সব কবিতা, সব সাহিত্য হারিয়ে গেল। তুমি আগামী সংখ্যার জন্তে একটা গল্প চেয়েছো আমার কাছে। বলেছো—‘অভিযাত্রিকের জন্ম মুহূর্তে ছিল তোমারও স্বাক্ষর—আজ লেখা না দেওয়া মানে তারই মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করা।’ অতটা বিশ্বাস করি না। যাই হোক, গল্পের একটা প্লট পাঠালাম। একটু সাজিয়ে গুছিয়ে এটাকে অভিযাত্রিকে প্রকাশ করতে পারো। অবশ্য প্লটটা যদি সম্পাদিকার মনোমত হয়।

পূর্ববঙ্গের কোন এক নদীর ধারে কি এক গ্রামে কুসুমের বাস। মনে করা যাক নদীর নাম ধলেশ্বরী, গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর। কুসুমরা ছিল দুই বোন, ভাই ছিল না তাদের। ওর বাপ ছিলেন গ্রামের পণ্ডিতমশাই। কুসুমের চরিত্রটা বিচিত্র। অস্বাস্থ্য পোড়ো ছেলেদের সঙ্গে কুসুম ছেলেবেলা থেকেই দুষ্টামি করে বেড়াতো। ছেলের অভাব মেটাতে মা তাকে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরাতেন, চুল বেড়া-বিহুনী ক’রে বাঁধা থাকতো মাথায়। সঙ্গিনী ওর একটিও ছিল না ; সব ছেলেদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। পাঠশালায় ছেলেরা তাকে দলে টানত। তবে ঐ বেড়া-বিহুনীটার জন্তেই তাদের ছিল কেমন একটা খুঁতখুঁতে ভাব। শেষে একদিন কুসুম রেগে মেগে কাঁচি চালিয়ে কেটে ফেললে তার চুলের বোঝা। বাবা বকলেন ; মায়ের হাতপাখার বাঁট ভাঙলো ওর পিঠের উপর, তবু কুসুম ভারি খুশি। পাঠশালার ছেলেরা উচ্ছ্বসিত হ’য়ে ওকে অভিনন্দিত করেছে। একমাত্র বিশ্বনাথদা ঠোঁট উন্টে বললে, ‘রূপ খুলেছে !’

বিশ্বনাথ পাঠশালার পাঠ শেষ ক’রে আত্ম পড়ছে তখন ওর বাপের কাছে। বিশ্বনাথকে কুসুম দু’চক্ষে দেখতে পারতো না। জোয়ান হ’লে কি হবে কুসুমের কোন কিছুই যেন প্রশংসার নয় বিশ্বনাথের কাছে। তা বয়েই গেল কুসুমের। সকলের সাথে দল বেঁধে কুসুম যেতো ধলেশ্বরীতে মাছ ধরতে। স্নাত্তরে গিয়ে কতদিন মহাজনী নৌকার গলুই ধরে চলে যেত মাঝনদীতে। কালবোশেখীর ঝড়ে আম কুড়ানো, এমন কি নষ্টচক্ষের রাত্রে পাকা কলার কাঁদি চুরি করার মধ্যেও তাকে খুঁজে পাওয়া যেতো। প্রথমটায় পণ্ডিতমশাই কান করেন নি ; কিন্তু প্রতিবেশীদের মধুবর্ণণে কান যখন তাঁর উপচায়মান বোধ হ’ল, তখন

তিনি বাধ্য হয়ে কস্তার কানের দিকে হাত বাড়ালেন। কান সমেত কস্তার মাথাটা ততদিনে তাঁর নাগালের বাইরে। ফলে ছোট মেয়ে কামিনীর উপর শাসন হ'ল দৃঢ়তর। কুসুম তখন শাসনের বাইরে। সে ছেলে হয়ে গেছে!

পিতামাতার হাত এড়ালেও কুসুম শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল আর একজনের হাতে। তিনি প্রকৃতি। চুল কেটে ফেললেই যে ছেলে হওয়া যায় না, এ গত্য সে বুঝলে একদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। তখন ওর বয়স কতই বা? এই বারো, তোরো। ওকে মাঝে রেখে বেশ একদফা মারামারি হ'য়ে গেল দু'পক্ষ ছাত্রদের মধ্যে। বগড়াটার সূত্রপাত অতি সামান্য বিষয় নিয়ে। খেলোয়াড়দের মধ্যে দু'দলের কোন্ দলে কুসুম যোগ দেবে এটাই ছিল বিবদমান দু'টি দলের বিচার্য বিষয়। বগড়াটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণত হ'ল দুই বিপক্ষ দলের ক্যাপটেন আবদুল গনি আর নির্মলের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব। কুসুমের মালিকানা স্বত্বই সেখানে বগড়ার বিষয়বস্তু। কুসুম চুপ করে লক্ষ্য করছিল বগড়াটা, একপাশে দাঁড়িয়ে।

এখানটায় তুমি তোমার গল্পে দুই বিবদমান আদিম নরের মাঝে আদি অকৃত্রিম চিরন্তন নারীর একটা উপমা দিতে পারো। অথবা আধুনিক যুগের একটা বাস্তব উদাহরণ দিতে পারো নিরপেক্ষ নদর গাভীর। কলকাতার রাস্তার রণক্ষেত্রে যাদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় মল্লযুদ্ধরত অনডানদ্বয়ের অনতিদূরে।

আবদুল অপেক্ষাকৃত শক্তিমান। মার খেয়েছে নির্মলই বেশি। বিজয়ী বীর আবদুলের হাত ধরে কুসুম খেলতে যাচ্ছিল,—অতর্কিতে কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল বিশ্বনাথ। হেঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল কুসুমকে। আবদুল ঘুরে দাঁড়ালো ঘুষি পাکیয়ে। ফিরে দাঁড়ালো বিশ্বনাথও অগত্যা। তারপর আবদুল মাথা নিচু করে চলে গেল সেখান থেকে। বিশ্বনাথ শুধু জোয়ান নয়—অসীম বলশালী বলে খ্যাতি ছিল তার। গ্রামের আখড়ায় ছেলেদের কুস্তি শেখাতো বিশ্বনাথ। ক্রুর দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করা ছাড়া গতাস্তর ছিল না শেখের পো'র।

আবদুলের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল দলের বেশীর ভাগ ছেলেই। ওরা সবাই মুসলমান পাড়ায় থাকে। আবদুল গনিই ওদের দলপতি। গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর হ'লেও মুসলমানপ্রধান স্থান সেটা।

কুসুম হেসে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড ধমক দিলে তাকে বিশ্বনাথ। ভয়ে, বিস্ময়ে, বিহ্বলতায় কুসুম নির্বাক হ'য়ে গেল। বিশ্বনাথের ধমক শুনে নির্মলের দলের বাকি ক'জনও রণস্থল ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলে। বিশ্বনাথ বজ্রমুঠিতে কুসুমের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ি পর্যন্ত। ফটক পর্যন্ত

শৌছে দিয়ে ছেড়ে দিল ওর হাত। কুসুমের তখন ভারি কান্না পাচ্ছে। জলভরা চোখদুটো হাতের উটোপিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে গৌজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে বাগানের ফটকের সামনে; একপাও নড়ল না। বিশ্বনাথ অল্প ইতস্তত ক'রে বললে, “বাড়ি যাও কুসুম। তোমাকে দলে নেবার জন্তে ছেলের দল মারামারি করে...ছি ছি...তুমি বোঝ না কেন?...আর শোন,...ইয়ে, তুমি শার্ট পরো না, বুঝলে...শাড়ি পরলেই হয় এখন...”

মাথা না তুলেই কুসুম বুঝতে পারে বিশ্বনাথ চলে গেছে অনেকক্ষণ। লজ্জায়, অস্থশোচনায় একটা ছিছিকারে মাটির সঙ্গে কে যেন মিশিয়ে দিয়েছে তাকে। পায়ে পায়ে বাড়িতে নিজের শোওয়ার ঘরে এসে ঢোকে। সামনের বড় আয়নাটার পড়েছে ওর প্রতিকৃতি! ছিঃ ছিঃ! ছুটে গিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে সে খাটের উপর! তারপর ফুলে ফুলে কী কান্না তার।

এখানেই শেষ করছি আজ কুসুমের উপাখ্যান। তার কারণ কাহিনীর এটুকুই সংগৃহীত হয়েছে এ পর্যন্ত। পরে বাকিটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

নিজের কথাই আসি। কাজ চলছে একরকম। ভালো লাগছে না আর। এখন এতো পুরানমে কাজ চলছে যে ছুটিও নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ভারি দেখতে ইচ্ছা করছে তোমায়। তুমি এতক্ষণে হয়তো দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসেছো। আচ্ছা, লেডি হিলিংডন গাছটার ফুল ফোটে নি এখনও? আজকাল বিকালে কোথায় যাও? সিনেমা দেখছো নিশ্চয়ই;—কার সঙ্গে? ‘ভারতের সিংহাসন খালি নাহি রবে’—তা জানি। আচ্ছা, আমিই না হয় যেতে অপারগ, তোমার পক্ষে চলে আসাটা কি এতই অসম্ভব? তোমার কলেজ তো বন্ধ। মেশোমশাইকে বল'না যে তোমার এক বান্ধবীর বিয়ে মধুপুর অথবা আসানসোলে। বলে বেরিয়ে পড়ো। হুট ক'রে এসে হাজির হও যদি ক্যাম্পে আমি ভারি চমকে যাবো। এখানে কিছু অসুবিধা হবে না। বাথরুম একটা বানিয়ে দেবো টিন দিয়ে ঘিরে। আরে ইঁা বাপু, দু'খানা শোবার ঘরই আছে। মাঝের পার্টিশনে দরজা থাকলেও তা ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়।

আজ এখানেই থামছি। ওভারসিয়ারবাবু আসছে দেখতে পাচ্ছি জানালা দিয়ে। এবারও বাড়তি টিকিট দিলাম না। বেরারিং চিঠি খোয়া যায় কম। ভালোবাসা জানাতে সাহস পাচ্ছি না। গ্রহণ তো করলে না কোনদিন, তাই রইল আমার শুভেচ্ছা।

—ইতি”

স্বর্ঘ মাখার উপরে উঠেছে। সাইকেলে চেপে কাজ দেখে ফিরছিল ঋতব্রত। কোথাও ঘরের চাল নামাচ্ছে কেটে কেটে। কোথাও পোয়ালগুছি দিচ্ছে বাতায়। কোথাও শালের খুটি পাচ্ছে নবকলেবর, কোথাও বা বানানো হচ্ছে ক্ষতগতিতে—গরম হাওয়া বইছে উষ্টোদিক থেকে। বৃষ্টি এখনও নামে নি। বাঁ দিকে এল/২০ ব্যারাকে পুরানো টিন বদলে নতুন টিন চাপাচ্ছে মিস্ত্রীরা। হাতুড়ির আওয়াজ উঠছে ঠক্-ঠক্-ঠক্। হঠাৎ ব্রেক কষলে ঋতব্রত। সাইকেল থেকে নেমে ঘুরে ঘরখানার পিছন দিকে গেল। যা ভেবেছে তাই! পাঞ্জাবী ছুতার মিস্ত্রী হাতুড়ি মেরে জু বসাচ্ছে টিনে। ধমক দিয়ে ওঠে ঋতব্রত। তার শিক্ষায়-সহবতে যতখানি তীক্ষ্ণ হওয়া সম্ভব—গালাগাল দেয় সে। পাঞ্জাবী মিস্ত্রী চালের উপর থেকে বারবার কসম খায়। হাতুড়ি পেটেনি সে। জু-ড্রাইভার ঘুরিয়েই টিনগুলোকে ঝাঁটছে নাকি সে পার্লিনের সঙ্গে। জু কখনও হাতুড়ি মেরে বসাতে পারে! তা'হলে তা জোরই হ'বেনা কিছু। জুতো খুলে মই বেয়ে চালে উঠে পড়ে ঋতব্রত। বিব্রত হয় পাঞ্জাবী মিস্ত্রী। তার হাতের কাছে একটাও জু-ড্রাইভার ছিল না। কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হুকুম দিল ঋতব্রত। ওয়ার্ক-সরকার কই?

সে নাকি খেতে গেছে। ঋতব্রত ঘড়িতে দেখলো সকালের কাজ ছুটি হ'তে তখনও কুড়ি মিনিট বাকি! ওয়ার্ক-সরকারের নাম, ব্যারাকের নাম নোট-বইতে টুকে নিয়ে সাইকেলে উঠতে যাবে হঠাৎ ঘর থেকে বের হ'য়ে এল একজন যুবক। অগতিত তৈলচিঙ্কন মসৃণ চেহারা। মশীকৃষ্ণ ব্যাক-ব্রাশ চুল, ঘাড়ের কাছে একেবারে ছাঁটা। পরিধানে একটি সবুজ লুঙ্গি ও হাতকাটা শ্রাণ্ডো গেঞ্জি। বললে, “দেউখ্যাইন স্তর! এয়ারার কাণ্ডটা দেউখ্যাইন! খালি ফাঁকি দেওনের লগ্যা আছে হারামির বাচ্ছারা।”

হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠলো পাঞ্জাবী মিস্ত্রী, “তু চুপ রহ্ শালে শয়তান!”

বাঙালের পো-ও তখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে একটা থান ইঁট হাতে! পাঞ্জাবীও দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছে তার হাতুড়িটা। ঋতব্রতের গালাগাল সে নির্বিবাদে হজম করেছিল—কারণ তার কাছে সে ছিল অপরাধী। তাছাড়া সাহেব আদমির গালাগালটাও কিছু বাপ মা তুলে নয়! ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একে মোড়লি করতে দেখেই সে রুখে দাঁড়িয়েছে। জনতা ঘিরে দাঁড়িয়েছে চারদিকে।

মুহূর্তে ঋতব্রত গিয়ে পড়লো ওদের ছ'জনের মাঝখানে। ছ'জনকে পৃথক ক'রে পাঞ্জাবীকে বললে, “আপ্ খামোশ্ হো যাইয়ে!”

আর নওজোয়ানের দিকে ফিরে বললে, “আপনি ওকে গাল দিলেন কেন? ও

কাজে-কাজি দিয়ে থাকে তা দেখবার জন্তে অন্ত লোক আছে। আপনি ওকে গাল দেবার কে ?”

“দিতাম না ? গাইল দিতাম না ? এ্যাকশো বার দিয়াম !”

ঘরের ভিতর থেকে আর একজন মহিলা এগিয়ে এসে গুর হস্তাকর্ষণ করে—“কারে ক’স বড়খুহা ? ছাহস না চৌখু মেইল্যা ?”

“অগ্নাঘাটা কি কইলাম ?” প্রতিবাদ করে বড়খোকা।

“আপনি কোথায় থাকেন বলুন তো ?” প্রশ্নটা ঋতব্রতের।

“থাকবাম্ ফিরাবার কই ? এ ঘরই থাহি।”

“এই ঘরে ? আপনি এ ক্যাম্পের বাসিন্দা ?”

“হ ! পাঁচ বছর থাহ্ কলে যদি বাসিন্দা কয় তা বাসিন্দাই।”

“আপনি পি. এল ?”

“হ !”

অবাক হ’য়ে যায় ঋতব্রত। এই ঘাঁড়ের মত তাগড়াই জোয়ান মদ পি. এল ? অর্থাৎ পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি ? যাবৎ জীবৎ সরকারী ডোল ভক্ষেৎ ? হেসে ফেলছে সে অতি দুঃখেও। পাঞ্জাবী মিস্ত্রী তখনও থামোন্ হ’য়ে প্রতীক্ষা করছে সুবিচারের। তার দিকে ফিরে ঋতব্রত বললেন, “এই দুর্বল পি. এল. লোকটার উপর তোমার মতো জোয়ানের রাগ করা শোভা পায় না। গুর শরীরে কোনও পদার্থ নেই বলেই না সরকারী ডোল খেয়ে জীবন-ধারণ করে বেচারী।”

মুখ কালো ক’রে ঘরে ঢুকে যায় বড়খোকা। অহুচ কণ্ঠে বলে শুনিয়ে শুনিয়ে, “আমারে যেন আসামী পাইছে ! কুথায় থাহো ? কিতা কর ? অত কথা ক্যান রে বাপু ? এইডা যেন কাঠগড়া।”

ঋতব্রত সাইকেলটা ঠেলে বড় রাস্তায় তুলতে থাকে। পাঞ্জাবী তার যজ্ঞপাতি গুছিয়ে তোলে। কাটা চালের খড়ের গাদায় ঋতব্রতের সাইকেলের চাকাটা আটকে যায়। নীচু হ’য়ে ছাড়াতে ছাড়াতে জনতাকে উদ্দেশ্য ক’রে বলে, “এগুলো আপনারা সরিয়ে রাখেন না কেন ? বাড়ির চারপাশ এত নোংরা করে রাখে ?”

ফৌস ক’রে ওঠে ভীড়ের মাঝে একজন, “ক্যান্ ? আমরা কি মশয় মুন্ডোফরাস ? ময়লা ফ্যালাইমু ক্যান্ ?”

ঋতব্রত নরম হ’য়ে বলে, “ময়লা তো নয়, আপনাদেরই ঘরের চাল। নিজের ঘরের খড় কি সরাতেন না নিজের বাড়িতে ? খড়কুটো এত চারপাশে ছড়ানো থাকাটা কি ভালো ? গরমের দিন কে কোথায় একটা বিড়ি খেয়ে ফেলবে—”

“প্যাটে খাতি পাইনা, আমরা রিফু, আর আমাগোরে কন্ বিড়ি খায়ী ফালাইবে !”

বিরক্ত হয় ঋতব্রত। লক্ষ্য করে সামনের সারিতেই একজন বিড়িটাকে হাতের তালুতে লুকিয়ে ফেলে। বলে, “কি আশ্চর্য! খামখা তর্ক করছেন কেন? আপনারা কেউ বিড়ি না খেলেও পথচল্টি মাহুখেও তো ফেলতে পারে। তাছাড়া সাপথোপ-পোকামাকড় হয়। একটু পরিষ্কার থাকতে পারেন না নিজেরা? এত নোংরা কেন?”

প্রতিবাদটা এবার শত কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে: “পেড়ে পুলাও কালা পড়লি বেবাকই পরিষ্কার থাক্টি চায়।”

অর্থাৎ ওদেরই কি ইচ্ছা করে না শার্ট প্যান্ট পরে সাহেব সাজতে?...ওদের গাঁয়ে গেলে দেখতে পেতেন পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে...একটি কুটো খুঁটে তুলুক তো কেউ বাড়ির দশ হাতের মধ্যে?...এটা তো ওদের গাঁয়ের বাড়ি নয়...এখানে এসব সাফা করার জন্তে সরকারী ঠিকাদার রাখা হয়েছে কেন?

এর পরেও ধৈর্য থাকা অসম্ভব ঋতব্রতের মতো। রগচটা লোকের। তবু সে মিষ্ট কথায় বোঝাতে গেল। ময়লাগুলো যদি ওরা নিজেরাই সবাই সাফা করে তবে সাইট-ক্লিয়ারেন্স বাবদ সরকারী টাকাটা দেবেন সে ঠিকাদারকে। সে প্রমাণ করতে চায় পি. এল. মার্কা দেওয়া হ'লেও এরা মহুয়া হারায় নি আজও। স্বযোগ সুবিধা পেলে আবার মানবিকতার পরিচয় এরা দিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ একটা মন্তব্যে ওর সব সংযম হারিয়ে গেল। কথাটা বলেছে ঘরের ভিতর থেকে—সেই বড়খোকা নামধারী যুবকটি।

“হ, হ, জানি! আমরা ময়লা ফালাইলাম আর হেই ট্যাছাড়া ঠিকাদারের নামে লেইখা তুমরা দুইজনে ভাগ্ বাটোয়ারা করবা!”

সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে পীচের রাস্তায় উঠে এল ঋতব্রত। পীচ তখন গলতে শুরু করেছে। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। নিজের ঘরে এসে পৌছালো ক্রমে। এ বেলার মতো চাকরি শেষ হয়েছে তার। রতন সাইকেলটা ঘরে তোলে। তার স্পোকে তখনও জড়িয়ে আছে কয়েক টুকরো খড়—এল/২৯ ঘরের ঘানি। জুতো জামা না খুলেই সে চিত হ'য়ে শুয়ে পড়লো।

অফিসে একা বসে কাজ করছিল ঋতব্রত। পাঁচটা বেজে গেছে। সবাই চলে গেছে। বাইরে বেশ মেঘ করেছে আকাশে। আজ ঝড় হ'তে পারে। এ বৎসরের প্রথম কালবৈশাখী। প্রতি বৎসর এই প্রথম বর্ষণের দিনটি ওর ভাবি আনন্দের। সারাদিনের দুর্দান্ত গরমের পর যখন আকাশের কোণ থেকে মস্ত মাতঙ্গের মতো শুঁড় নাড়তে নাড়তে মেঘের দল ধরে আসে ও তখন ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে

প্রকৃতির বিপুল সমারোহ। বিশাল বনস্পতি মাথা নিচু করে অভিবাদন ক'রে
ঝড়কে। হৈহৈ ক'রে এসে পড়ে ঝড়। ওড়ে খড়কুটে, ধুলো, বালি—আর সজে
সজে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা! প্রতি বছরই সে ভিজতে ভালোবাসে প্রথম বর্ষণের
খান্না-পাতে। আবৃত্তি করে রবিঠাকুরের কবিতার বিশেষ অংশ।

এখনও ঝড় আসে নি। শুধু কালো ক'রে থমকে আছে আকাশটা। এলোমেলো
হাওয়া বইছে। ঢুলছে অফিস ঘরের পর্দাটা। পাশের ঘরে স্টোভে চায়ের জল
বসিয়েছে রতন ;—একটানা শব্দ ভেসে আসছে তার—শোঁ।

কলকাতার ডাক দেখছিলো সে। সময়ে প্রেগ্রেস রিপোর্টে পাঠানো হয় নি বলে
কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। অডিট অবজেকশনের কপি। এটা কি? ট্যার
প্রোগ্রাম। এক্সিকিউটিভ ইনস্পেকশনে আসছেন আসছে বুধবার। ওয়ার্কচার্জ
স্বাসন। নাঃ, আর পারা যায় না। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—বৃষ্টি বোধহয় শুরু
হয়েছে দূরে কোথাও। না, দূরে নয় কাছেই। ঐ তো ভিজে মাটির একটা সোঁদা
গন্ধ ভেসে আসছে। ডাক-ফাইলটা দূরে সরিয়ে রাখলো সে। একটা কবিতা লিখতে
হবে তাকে। আজই, এফুনি! লেটারহেডের একটা পাতা নিয়ে শুরু করতে
যাবে হঠাৎ দমকা পূবের হাওয়ায় কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে যায়। হাত থেকে
উড়ে যায় অলিখিত কবিতার কাগজটাও। ছুটে আসে রতন। বন্ধ ক'রে দেয়
পূবদিকের দরজাটা। চলে যায় একটা লণ্ঠন রেখে। বাইরে নেমেছে বড় বড় বৃষ্টির
ফোঁটা। থস্ থস্ ক'রে চলে কলম—

“স্বপতিবিদের পরিচয় নিয়ে নেমেছি রক্তালয়ে

বলে যাই ভয়ে ভয়ে

সাবধানে শেখা পাট্টুকু মোর ফুটলাইটের কাছে ;

ইট কাঠ আর চুন-সুরকির হিসাব সাজানো আছে।

নাট্যকারের বাধা গৎ আছে জানা

বাইরে তাহার আপন খেয়ালে কোন কথা বলা মানা ॥

অফিসের চেয়ারেতে

স্মার্ট-ফাইলের নেশায় যখন একলা উঠেছি মেতে

দেখিনি তখন ব্যস্ত চক্ষু তুলে

পূবালী-পবন চাপরাশি হাত কার্ড দিয়ে যায় ভুলে।

আপন খেয়ালে ঢুকে

পথের ধূলায় চূর্ণ-মুষ্টি ছুঁড়ে মারে মোর মুখে ॥

হাট-র্যাক হ'তে ফেলে দেয় হাট—ওড়ায় নক্সাগুলি
টেবিলেতে জমে ধূলি।

ক্যাপা মেরেটির অকল দোলে ঘরের পর্দাটিতে
খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে দেখি আপন ছুটামিতে।
এমনি ক'রেই জালায়েছে দিবারাতি

ও যে এ কবির ছেলেবেলাকার সাথী ॥

টেবিলের উপর রতন চা রেখে গেল। হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা দিল ঋতব্রত।
সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মতো বাঙলা হরফের লাইনগুলো দেখলে রতনের পক্ষেও বোকা
অসম্ভব নয় সাহেব কি কাণ্ডটা করছে। ঝাড়ন দিয়ে টেবিলের ধুলার প্রলেপটা
মুছে দিয়ে রতন চলে যায়। রুদ্ধ দরজার বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি।
ঘরে তার প্রবেশ বন্ধ হয়েছে।

“হঠাৎ ও যায় ঘামি,

লজ্জা ও ভয়ে রাউসের নীচে উঠেছে বেচারা ঘামি,

জড়িয়ে আঁচল ধূলামাথা এলো চুলে

এ কার ঘরে ও প্রবেশ করেছে ভুলে?

এতো সে তো কভু নয়!

কোট-প্যাণ্টের তলায় কোথায় সেদিনের পরিচয়?

এ ঘরে তো নাই খাতা ছবি রঙ তুলি!

চাপরাশি এসে ঝেড়ে দিয়ে যায় ধূলি।

সামলে আঁচল ধূলামাথা মুছ পায়

পুবালী-পবন ধীরে ধীরে চলে যায়।”

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে জলকানার মধ্যে ছপ্ ছপ্ ক'রে লঠন হাতে লোকজন
যাতায়াত করছে। বুষ্টিটা ধরেছে। বর্ষণের মধ্যে ওরা বোধহয় আটকে পড়েছিল
এতক্ষণ। একশো তের নম্বর ঘরটার কথা মনে পড়লো ঋতব্রতের। আজই সকালে
চালটা নামিয়েছে। মনে পড়লো একশো তের নম্বর ঘরের হাঁপানি রোগীটার
কথা—আর এদিকে সজোজাত শিশুকোড়ে উদ্বাস্ত জননীটিকে। এই প্রবল
ঝড়বুষ্টিতে কোথায় মাথা গুঁজলো তারা?

রতন এসে দাঁড়ালো। রাত্রে কি রান্না হবে? ঢালা হকুম দিল ঋতব্রত, খিচুড়ি
আর পঁপরভাজা।

“পঁপরভাজা? এখানে পঁপর কোথায় পাব স্ত্রয়?”

“তবে আলুভাজা।”

রতন চলে গেল ওঘরে।

দূরে কে যেন ডাকছে “বুধনা—এ বুধনা!”

একটা গরুর গাড়ি চলে গেল জলকান্দা ভেঙে। ছত্রির ভিতর ঘোলাটে চোখ মেলে লণ্ঠনটা তাকিয়ে আছে একচক্ষু দৈত্যের মতো। দুটো বাদলা পোকা ও টেবিলের কাছে ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরছে লণ্ঠনটাকে। সেই চিরস্তন খেলা! রূপবহি! নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও, উত্তাপ প্রতি মুহূর্তে গায়ে লাগছে জেনেও পোকা দুটো দূরে সরে যাচ্ছে না। দীপশিখাই ওদের অন্তিম গতি। কী মূর্খ পোকা দুটো! মূর্খ? সে নিজেও কি ঐ রকম মূর্খ নয়? তবে রেখা মিস্ত্রির রূপবহির চতুর্দিকে পাক খেয়ে মরছে কেন আজও? তিন-পুরুষের অভিজাত ঘরের ঐ মেয়েটি কি কোনদিন দাঁড়াবে ওর পাশে এই দরমার বেড়া দেওয়া ঘরে? যেখানে পিয়ানো নেই, সিনেমা সাপ্তাহিক নেই, যেখানে সেতার বাজানো চরম রসিকতা—যেখানে বৃষ্টির দিনে পাঁপরাভাজার কথা মনে হলে ধমক খেতে হয় চাকরের কাছে! দূর হোকগে রেখা মিস্ত্রির। তার কথা ভাবা যাবে পরে। আজকে তার কবিপ্রিয়া রেখা মিস্ত্রির নয়—পূবালী-পবন! অভিমান ক’রে সেই যে চলে গেল আর তো ফিরে এল না সে?

“ওরে ও পূবালী হাওয়া

বিকিয়ে দিয়েছি ইট-কাঠ-চুনে যতকিছু চাওয়া পাওয়া!

তবু ওরে শোন—কিছু আছে আজও বাকি,

স্নাইডরুলের নিভুল মাপে আছে হিসাবের ফাঁকি!

প্রখর রবির কিরণের জালে দিবসে রয়েছে ঢাকা

আমার গোপন কৃষ্ণপক্ষ রাঁকা!

মন-কেমনের ওরেও পূবালী মেয়ে

সাথীহীন রাতে কবির কুটিরে অমনি আসিস ধৈর্যে।

অভিমানিনীর অভিমান করি জয়

মুহু চুপনে ফিরে দেব তোকে সেদিনের পরিচয়।”

ছড়মুড় ক’রে ঘরে ঢুকে পড়লো পাঁচ সাতজন লোক।

“শিগগির চলুন স্ত্রী! হাসপাতালের মেল-ওয়ার্ডটা ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। দু’জন লোক চাপা পড়েছে। একজনের অবস্থা খুব খারাপ।”

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ঋতব্রত। গামবুটের মধ্যে পা চালাতে চালাতে প্রাথমিক সংবাদটা সংগ্রহ করে। অনেক লোক নাকি জমায়তে হয়েছে অকুস্থলে। সমস্ত ঘরটাই ভেঙে পড়েছে। রুগীদের সরিয়ে আনা হয়েছে রেশন-গুদামের বারান্দায়।

টর্টো নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে।

রতন ডাকতে এসেছিল। তার খিচুড়ি তৈরি হ'য়ে গেছে। অবস্থা দেখে থেমে গেল। এতক্ষণে একটা দমকা হাওয়া উঠেছে।

খোলা দরজা দিয়ে শৃঙ্খরে ফিরে এসেছে পূবে-হাওয়া। ঋতব্রত তখন অগ্রমনস্ক হ'য়ে হনহন ক'রে ছুটে চলেছে হাসপাতালের দিকে। তার শুধু চিন্তা স্মরেন সেনগুপ্ত কি শালের প্রপুণ্ডলো লাগায় নি ওর কথামতো? খিচুড়ি জুড়িয়ে যায়। টুলে বসে কিম্বায় রতন, লক্ষ্য করে না দমকা হাওয়ার সাহেবের টেবিল থেকে উড়ে যায় একখানা কাগজের টুকরো—জানালা পার হ'য়ে পড়ে গিয়ে রাস্তায়। অস্তিম গতি লাভ করে জলকাদার মধ্যে।

কাজ দেখে বেড়াচ্ছে ঋতব্রত। অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছে ক্যাম্পবাসীদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে স্থপারেগুন তফাদারের কাছে। এ বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ও বাড়ির খড় নয় ইঞ্চি পুরু হয় নি, সে বাড়িতে আরও খুঁটি না বদলালে ঘর পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। দরখাস্তগুলি ফরোয়ার্ড করেছেন তফাদার ওর কাছে, ওর জ্ঞাতার্থে। সেগুলি পকেটে নিয়ে সরজমিনে তদন্ত ক'রে বেড়াচ্ছিল। ভারি মজার সমস্ত আবেদনপত্র। উপরে “মাননীয় বকুলতলা ক্যাম্প-স্থপার বাহাদুর সমীপেশু” এবং নীচে “হজুর মালিক নিবেদন ইতি” থাকলেও অন্তরার লাইন কটা সি-সার্প স্কেলেও কুলায় না। রীতিমতো জালাময়ী ভাষায় বলা হয়েছে ক্যাম্প-রিপেয়ারের নাম ক'রে যথেষ্টভাবে অর্থের অপব্যয় করা হচ্ছে শুধু। যে তীব্র ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি আছে আবেদনপত্রগুলিতে তাতে মনে হয়—আর কিছু না হোক খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লিখেও এরা অল্পসংস্থান করতে পারত। সদাশয় সরকার বাহাদুরের অর্থ এমনভাবে নষ্ট হ'তে দেখে সকলেরই প্রাণ কেঁদে উঠেছে। অথচ মাসে মাসে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্যাস ডোল হিসাবে বিতরণ করা হচ্ছে ঐ বড়খোকা মার্কা পি. এল.-দের, তার বেলা—

“একটু শুনছেন?”

ব্রেক কষলে ঋতব্রত। সেই বিধবা ভদ্রমহিলা। একটা চটের থলিতে বাজার ক'রে ফিরছেন। রেশন ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আছে লাউভাগার মাখা। সঙ্কুচিত হ'য়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে ওকে ডাকছেন। ঋতব্রতের মনে হ'ল এর আগের দিন ‘তুমি’ বলে কথা বলেছিলেন।

“আপনার কি চাই? দরমার পার্টিশন তো? বলছি তো সেদিন।” মহিলা যেন লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে যান। কি জানি, হয়তো ভদ্রঘরের বধু, এভাবে অল্পগ্রহ

চাওয়াটা তাঁর অভ্যাস হ'য়ে যায় নি আজও। একটু নরম হ'ল ঋতব্রত।

“তা আমি কি করব বলুন—একজনকে দিতে গেলে সবাই চাইবে। সব ঘরে পার্টিশন দেওয়াল করা তো সম্ভব নয়।”

“তা তো বটেই! না, আমি তা বলছিলাম না আজ। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম আমাদের ঘরের উত্তর দিকে এল/৩০ ঘরটা কি মেরামত করানো হবে? ওখানে কেউ থাকে না, চাল নেই বলে। ওটা যদি সারানো হয়, আমরা স্থপারেগুনকে বলে ওখানে সরে যেতাম।”

“এল/৩০ নম্বর? সেটা কোন্টা?”

“এই তো কাছেই। এখন দেখবেন?”

“চলুন দেখেই আসি।”

সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে মহিলার পিছু পিছু সে এসে দাঁড়ায় তাঁর ব্যারাকটার সামনে।

“আপনি এই ব্যারাকে থাকেন? এল/২২এ?”

“হ্যাঁ বাবা। এখানেই থাকি আমি। এসো’ না ঘরে। আমি বাজারটা রেখেই যাবো তোমার সঙ্গে।”

আবার কখন আপনি এসে ঠেকেছে তুমিতে।

এল/২২ হচ্ছে সেই ঘরটা যেটার বাস করে সেই বড়খোকা নামধারী লোকটা। ব্রজেন নায়েক, যে ছেলেটি ওয়ার্ক-সরকার-ইন-চার্জ, তাকে ধরে ঋতব্রত এমন ধমক দিয়েছে কাজে ফাঁকি দেবার জন্তে যে ওকে দেখলেই ছেলেটি ঘেমে ওঠে। ঘরের ভেতরটা কেমন কাজ হয়েছে দেখবার জন্তে মহিলার পিছন পিছন, ঋতব্রতও ভিতরে যাচ্ছিল। পর্দার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটা চটের থলি ঝুলছে দরজার সামনে। না পর্দার বিকল্প তো নয়, পাল্লায়ই প্রতিভূ ওটা। দরজাটার পাল্লাই ছিল না। পর্দা সরিয়ে ভিতরে মাথা গলিয়েই বিদ্যাপুস্তকের মতো বেরিয়ে এল ঋতব্রত। মহিলাও যেন অগ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছেন। একটু সময় নিয়ে ফের বললেন, “এসো এসো বাবা, ভিতরে এসো।”

আরও একমিনিট সময় দিয়ে, পর্দা সরিয়ে ঋতব্রত ঘরে ঢুকলো। ভিতরের মেয়েটি ততক্ষণে ভিজ়ে কাপড় ছেড়ে নতমুখে কি একটা কাজ করছে। ঋতব্রত চোখ ভুলে চাইতে পারলো না তার দিকে।

বিরিট লম্বা হলকামরা। অস্তুত আশি ফুট লম্বা এবং বিশ ফুট চওড়া। আটটা পরিবার বাস করে এটার। একেবারে এদিকের কোণটার থাকেন এই মহিলা। মেয়েটি তাঁরই এলাকাতুঙ্গ বলে মনে হয়। একটা নারকোলের দড়ি টাঙানো

রয়েছে অন্ত্রাঙ্গ অংশ থেকে তাঁর এলাকাটা পৃথক ক'রে। দড়ির উপর আড়াআড়ি ক'রে ঝুলছে একখানা শাড়ি। দ্বিতীয় খোপটার বসে আছে বড়খোকা। শালের খুটিতে হেলান দিয়ে একটা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল অসমভাবে। ও দিককার অংশগুলিতে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর সাধারণ সংসারযাত্রা, নির্বাহের দৃশ্য। কেউ ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে; কেউ রেণনের চালের কাঁকর বাছছে; ও পাশে একটা তোলা উলুনে ফুটছে সেদ্ধভাত। তার গন্ধে আমোদিত হ'য়ে আছে সারা হল-কামরাটা। কোনায় এক বুদ্ধ বসে বিড়ি পাকচ্ছেন। একগাল সাদা ধপধপে দাড়ি। অনেকটা ব্রজেন শীলের মতো চেহারা। মার্কখানে একটা খুপরিতে চিত হ'য়ে শুয়ে আছে একটা পাগল। লোকটা বিড়বিড় ক'রে আপন মনে কি বকছে। দুটো বেড়াল বাচ্চা খেলা করছে এ কোনায়। ওরা বোধহয় পি. এল-দের স্থায়ী পোস্ত। পাগলটার পাশে ঘুমাচ্ছে একটা শ্রাংটো ছেলে—তারই এলাকাভুক্ত মনে হয়। অঙ্ককারে সমস্ত হলকামরাটা ধম্‌ধম্‌ করছে। জানালা-গুলোর অধিকাংশতেই পাল্লা নেই—সারানো হয় নি এখনও। পচা দরমা, ভাঙা টিন—যে যা পেয়েছে চাপিয়েছে জানালার ওপর। বৃষ্টির ছাটি থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে ওদের। ফলে সমস্ত হলকামরাটা পরিণত হয়েছে অঙ্ককারায়। কিন্তু সেই অঙ্ককারের মধ্যেও হিংস্র স্বাপদের মতো জ্বলছে বড়খোকার চোখ দুটো—লেহন ক'রে ফিরছে সত্ত্বান্নাতা নতমুখী মেয়েটার সর্বাঙ্গ।

ঋতব্রত বুঝতে পারলে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতেই মেয়েটি টাঙানো কাপড়ের আড়ালে ভিজে কাপড় ছাড়ছিল তখন। ওর দিকে পিছন ফিরলে যে দরজার দিকে মুখ করতে হয়, একচক্ষু হরিণের মতোই তা খেয়াল করে নি বেচারী।

“আম্নন আমার সঙ্গে।”

মহিলা ঋতব্রতকে সঙ্গে ক'রে পথে নামেন। দু'পা গিয়েই উত্তর দিকে দেখিয়ে দেন এল/৩০ নম্বর বাড়ির ভগ্নস্বূপ। বলেন, এই ভগ্নস্বূপটি যদি সারাই করা হয়, তাহ'লে তিনি এটা'র উঠে আসবার চেষ্টা করবেন।

ঋতব্রত এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে—কেন উনি বার বার পার্টিশন দেওয়ালের কথা বলেন। কেন ঐ পাকা হলঘর ছেড়ে এই ভগ্নস্বূপের মধ্যে আশ্রয় নেবার ব্যাকুলতা। কিন্তু ঋতব্রত নিরুপায়। এ ঘরটি মেরামতের কথা নেই। বললে, “এটা তো মেরামত করা হবে না। তবে আমি দেখছি, আপনার ঘরটার একটা পার্টিশন দেওয়াল দিয়ে দেবো আমি। আপনার পরিবারে ক'জন লোক?”

“আমি আর আমার ঐ মেয়ে কমলা।” তারপর একটু ইতস্তত ক'রে ফের বলেন,

“দেখলেই তো বাবা সব নিজের চোখে। অমন হাটের মধ্যে কি থাকে যায় সোমস্ত মেয়ে নিয়ে? সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারি না। না আমি, না মেয়ে। একা মাছুষ, হাটে বাজারে যাই, ডোল আনতে যাই—মনটা পড়ে থাকে বাড়ির দিকে। সরলা মরে বেঁচেছে—কমলাও যদি—”

কি ভেবে চুপ ক’রে যান আবার। ওর দিকে ফিরে বলেন, “সরলা আমার বড় মেয়ে। পার্টিশনের পরেই মারা যায়।”

“ও!” ঋতব্রত চুপ ক’রে যায়।

“আর ওরই বা দোষ কি? ভগবান শুধু রূপই দিয়েছেন, কিন্তু...যাক, তুমি বাবা যা হয় একটা কাঁপটাঁপ টাঙিয়ে একটু আড়াল ক’রে দিও আমার দিকটা।”

দেবে। ঋতব্রত তা নিশ্চয়ই দেবে। কথা বলতে বলতে ওরা ফিরে আসে এল/২০ ব্যারাকে। মেয়েটি, কমলা নাকি যার নাম, তখন বাইরে একটা বাঁশের উপর মেলে দিচ্ছিল ভিজ়ে কাপড়খানা। হঠাৎ চোখোচোখি হ’য়ে গেল ঋতব্রতের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ সে দৃষ্টি নত করলে। সত্যিই সুনন্দরী মেয়েটি। বছর সতেরো বয়স হবে। ঠিকই বলেছে ওর মা। যে রূপ হ’তে পারত ওর পক্ষে পরম কাম্য নিজের বাড়িতে—এখানে এই পরিবেশে সেই রূপ-যৌবনই হয়তো হয়ে পড়েছে তার চরমতম শক্তি! এই হলাহলপ্রভব পঙ্ক-সমুদ্রের মাঝ থেকে কি ক’রে উঠে এল এমন সত্ত্বান্নাতা কমলা সুখাভাও হাতে? মনের পটে ভেসে উঠল ঋতব্রতের গ্রীক-ভাস্কর্যের সত্ত্বান্নাতা ভেনাসের ছবি—আর তারই পাশাপাশি ফুটে উঠল আর একখানা চিত্র! ছিঃ! অন্তরবাসী পশুটার গলা টিপে ধরেছে ঋতব্রত।

অন্ত কোনও সন্দেহের কথা মনে করবার চেষ্টা করল সে—বোটানিক্যাল গার্ডেনের ফুলের সম্ভার—গন্ধায় সূর্যাস্ত! অত্নদিকে মন দিতে হবে তাকে। অত্ন কোনও দৃশ্য—কোনও ছবির কথা। মনের নেগেটিভটার উপর বার বার নিতে লাগলো অত্নাত্ন ছবির অ্যাপসট—যাতে প্রথম আলোখ্যটার আর পাঠোদ্ধার করা না যায় কোনওদিন!

কথা হচ্ছিল স্বপারেঙেন তফাদারের বাড়ির বারান্দায় বসে। সান্ধ্য-আসরে ওরা দুজনে বসে গল্প করছে। ঋতব্রত বললে, ‘এবার আপনার বাড়িটার হাত দেওয়া যাক। আপনার ঘরের চালটা তো কাঁজরা হ’য়ে গেছে। এটা এতদিন সারায় নি কেন সেনগুপ্ত?’

“আমিই বারণ করেছিলাম।”

“আপনিই? কারণ?”

“এমনিতেই মশাই কত কথা শুনতে হয় আমাদের। আমি আপনার ঠিকাদারকে ডেকে বলে দিয়েছি—সব ব্যারাক সারিয়ে, সব স্টাফ কোয়ার্টার মেরামত ক’রে তবে আমারটার হাত দেবে। কোন শালা না বলতে পারে কিছু।”—বলে হা হা ক’রে হাসলেন থানিক। তারপর বললেন, “তা যেন হ’ল, কিন্তু মিস্টার আউট-অব-প্রাশের পিছনে আপনি লেগেছেন কেন বলুন তো? দিন না মশাই ওর লেডিস রুমটা ক’রে—”

“না, উনি তো লেডিস ওয়েটিং রুমটা চান না। উনি বলেন ওর বাড়িতে চাকরদের একটা ঘর ক’রে দিতে।”

“আঃ! আবার আপনি উন্টোপান্টা কথা বলেন। সেদিন বললাম না আপনাকে, যে চাকরের ঘর নয়—ওটাই লেডিস ওয়েটিং রুম। বউকে আনেন নি—মাঝে মাঝে গুঁকে লেডিসদের এন্টার্টেন করতে হয় না কি? একখানা ঘরে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। পাশে আর একটা ছোট কামরা থাকলে কত সুবিধা।”

স্তুভিত হ’য়ে যায় ঋতব্রত। এত কথা জানতো না সে।

“আপনি আর জানবেন কোথা থেকে। এ ক্যাম্পে শ্রীমান নরু এক শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র হচ্ছেন যুগল কেইট ঠাকুর। রামলীলার অনেক খবরই পাই। এক একবার ইচ্ছাও হয় হাতে-নাতে ধরে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিই। তারপর ভাবি মরুগুণে যাক। ক্যাম্পের মেয়েরা যদি দু’পয়সা রোজগার করে আমি বাধা দেবার কে? তবে মাঝে মাঝে এমন বিশি খবর আসে! মানে অর্থনৈতিক চাপে তিল তিল ক’রে ভদ্রঘরের মেয়েকে এমন ছিপে খেলিয়ে গাঁথে ওরা, যে ভাবলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আপনি জানেন, ক্যাম্প থেকে দৈনিক রেল স্টেশনে মেয়ে চালান যায়! তারা ফেরে ভোরের বাসে।”

ঋতব্রত বিহ্বল হ’য়ে পড়ে। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না তার।

“আপনি কি ক’রে জানলেন এত কথা? আমি তো কই শুনি নি কিছু?”

“আপনার না শুনলেও চলে। আমার পক্ষে সব খবর রাখতে হয়। কার হাঁড়িতে কত চাল মাপা হয় তা পর্যন্ত খবর রাখতে হয় আমাকে। ও হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনার বিরুদ্ধে সাধুরণ ডাক্তার কিন্তু গুরুতর অভিযোগ এনেছে উপরওয়ালার কাছে।”

“তাই নাকি? আমার বিরুদ্ধে? কেন?”

“আপনি নাকি তার মেলওয়ার্ডটা সময়মতো সরিয়ে দেন নি ঘর চাপা পড়ে দু’জন লোক জখম হয়েছে। ব্যাপারটা কি মশাই?”

ব্যাপারটা যে কি হয়েছিল ঋতব্রতও ঠিক জানে না। সেনগুপ্ত বলেছিল তার

কথামতো ছ'টা পুরানো শালের খুঁটির বাট্টেস দিয়ে দিয়েছিল বাইরে থেকে। তা সন্ধ্যা ঘরখানা পড়ে গেছে। ওয়ার্ক-সরকারই তাই বলেছে। মেজারমেন্ট বইতে উল্লেখ আছে ছ'টা বল্লার কথা। অথচ ডাক্তারবাবু এবং তাঁর লোকজনেরা বলে শালের খুঁটি আদৌ দেওয়া হয় নি। চাপাপড়া ঘরটার তলা থেকে অবশ্য অনেক শালের খুঁটিই বেরিয়েছে। তবে সেগুলো আগে থেকেই ছিল কিনা বলা শক্ত। সেনগুপ্তের সঙ্গে এই নিয়ে সাধুচরণের বেশ মতান্তর হ'য়ে গেছে।

ওকৈ চুপ ক'রে যেতে দেখে তফাদার নিজেই কথার মোড় ফেরালেন।

“হ্যাঁ, আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব।”

“বলুন।”

“ওই মেয়েটাকে—কি নাম যেন? কুসুম—ওকে আমিই দিয়েছিলাম আপনাকে। আপনি ওটাকে আজই জবাব দিন। আজ-কালের মধ্যেই আপনাকে আর একটা নতুন লোক দিচ্ছি আমি।”

“কেন বলুন তো? মেয়েটি তো কোন দোষ করে নি।”

“করেছে মশাই করেছে! সে খবর আপনি রাখেন না। গত বুধবার ও অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায় নি আপনার কলতলায়?”

“হ্যাঁ, আপনি কি ক'রে জানলেন সে কথা?”

“ওই তো বললাম, ক্যাম্পের সব খবর আমাদের রাখতে হয়।”

“তা, অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়াটা কি অপরাধ?”

“অপরাধ সেটা নয়। অজ্ঞান হ'য়ে যাবার পর আপনারা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে সে অসুস্থ।”

“অসুস্থ? কিন্তু কাজকর্ম তো করছে ঠিকই।”

“আপনি মশাই বড় বাজে বকান। খবর পেয়েছি মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়।”

একথা সেদিন রামশরণও বলেছিল বটে। সেদিনও ওর কথা বিশ্বাস হয় নি, আজও হ'ল না। ও তখন আগ্রহ দেখালো কুসুমের কাহিনী বিস্তারিত জানবার জন্তে। কুসুম এখানে প্রথম আসে একটি বছর তিনেকের শিশু নিয়ে। অল্পদিন পরেই ওর ঘরে যাতায়াত করতে দেখা গেল একটি লোককে। কঙ্কালসার প্রৌঢ় একটি। কুসুম ক্যাম্পে ভর্তি হবার সময় বলেছিল, তার বাপ-মা, তাই বোন অথবা স্বপ্নরকুলের কেউ জীবিত নেই। তিন বৎসরের শিশুপুত্রটি নিয়ে একেবারে একা এসে সে আশ্রয় নেয় এই আশ্রয়শিবিরে। পরে এই বিধবাটিকে পি. এল. তালিকাভুক্ত করা হয়। তাই হঠাৎ এই প্রৌঢ় লোকটির যাতায়াতে সন্দেহ হ'ল

তফাদারের। ডেকে পরিচয় নিলেন। লোকটি নাকি কুসুমের মামাতো বড় ভাই। নাম তারাপদ। কুসুম থাকতো এইচ. কিউ. ব্যারাকে। মাঝে মাঝে ওর দাদা তারাপদ আসে, খোঁজখবর নেয়। দু'একবার জামা কাপড়ও এনে দিয়ে যায়। শেষে একদিন এইচ. কিউ. ব্যারাকের কয়েকজন বাসিন্দা এসে নালিশ করল কুসুমের সঙ্গে তারাপদ সম্পর্কটা সন্দেহজনক। অবাহিনীর পরিস্থিতিতে নাকি দেখা গেছে ওদের দু'জনকে দু'একবার। কথাটা তফাদার কানে তোলেন নি ; কারণ এ জাতীয় অভিযোগ কানে তুলতে গেলে ক্যাম্পের পরিচালন করা অসম্ভব। মাসের ত্রিশদিনই উপস্থিত হয় এই রকমের অভিযোগ। দিন যায়। আবার নালিশ আসে তাঁর কাছে। তারাপদ নাকি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। তার ক্যাম্পে আসা বন্ধ করতে হবে। এবার অভিযোগটা উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না—কারণ সেটা এসেছিল এবার লিখিতভাবে। ডাক্তার সাধুচরণ এবার অভিযোগকারী। কুসুমের বাচ্ছাটার হয়েছিল টাইফয়েড। তাকে চিকিৎসা করতে গিয়ে কুসুমের শুভাশুভের প্রতি আকৃষ্ট হন সাধুচরণ। তারাপদের উপস্থিতিটা তাঁর বরদাস্ত হয় নি। তাকে পরীক্ষা ক'রে ঐ পত্র পাঠান তিনি ক্যাম্পের মঙ্গলাকাজ্জক্য। তারাপদকে ডেকে পাঠানো হ'ল। এসে দাঁড়ালো আবার কঙ্কালসার লোকটি। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হ'য়ে আছে। চোখ দু'টো গভীর গর্তের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়।

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বললে, “আচ্ছা, লোকটার কি ডান গালে বড় একটা আঁচিল আছে ?”

“হ্যাঁ, আপনি কি ক'রে জানলেন ?

এই লোকটাকেই তাহ'লে ঋতব্রত দেখেছে। লোকটা প্রায়ই আসে। ওর বাড়ির সামনে গাছতলায় বসে থাকে উবু হ'য়ে। কখনও কথা বলতে দেখেছে বাড়ির পিছনে কুসুমের সঙ্গে। এত কথা ঋতব্রতের হয়তো মনেই থাকতো না—শুধু লোকটার কঙ্কালসার চেহারাটাই স্মরণ করিয়ে দিল সব কথা। কি ক'রে যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে শীর্ণ পা দু'টো এটাই যেন বিস্ময়। অবশ্য ওজনই বাক্য হতে তার !

“নিম চা খান—এটি আমার মেয়ে উমা। কলকাতায় স্থলে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে এসেছে বাপের কাছে।”

হাত দু'টি তুলে নমস্কার করে উমা। কতই বা বয়স ! লীলার বয়সী হবে বোধহয়। লীলা ঋতব্রতের ভাইঝি। ওর মেজদা দেবব্রতের বড় মেয়ে। উমা নীরবে দু'কাপ 'চা' নামিয়ে রেখে চলে যায়। ঋতব্রত তখন অগ্নমনস্ক হ'য়ে পড়েছে। তার মনে

পড়ছে লীলার কথা। মেজদা চিঠি লিখেছেন, লীলাকে পছন্দ ক'রে গেছেন শ্রীরামপুরের সেই ভদ্রলোক। ঠুঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসে ছেলের বিয়ে দেবেন না। পাত্র পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। আষাঢ় মাসে বর্ষা নেমে যাবে। তাই ত্রিশে বৈশাখ ঠুঁরা দিন দিয়েছেন। ঋতব্রতকে দিনদশেকের ছুটি নিয়ে অবিলম্বে যেতে লিখেছেন মেজদা। আর তাছাড়া হাজার দুই টাকা আর যোগাড় করতে হবে মেজদাকে। ঋতব্রত কি কিছু ধার দিতে পারে না?

“কই চা খান। বিস্কুট নিলেন না যে?”

“হ্যাঁ নিই।”

আবার গল্প শুরু করেন তফাদার।

“বুঝলেন মশাই। তারাপদকে তো ঢালা হুকুম দিয়ে দিলাম আমার ক্যাম্প এলাকায় যেন না আসে কখনও। বেটা আমার পা জড়িয়ে ধরলে। কুসুমের ছেলে তাহ'লে নাকি বাঁচবে না। কুসুমের ছেলের তখন তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। বুঝলাম সবই; পিসতুতো বোনের ছেলের জন্তে তো প্রাণ কাঁদছে তার! ধমক দিয়ে বের ক'রে দিলাম বেটাকে। তারপর থেকে আর সে কখনও আসে নি। আমি ভেবেছিলাম এরপর বুঝি কুসুমের মতিগতি বদলেছে। তাই আপনার ওখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন শুনছি,—স্বভাব না যায় ম'লে।”

“কুসুমের ছেলেটির কি হ'ল?”

“কে? ওর সেই বাচ্চাটা? সেটা ডাক্তারবাবুর ডেখ রেটের অঙ্কটাকে একঘর এগিয়ে নিয়ে গেল মাত্র। আর বলিহারি ডাক্তার, মশাই, ঐ সাধুচরণ! বাচ্চাটা মারা যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই খবর পেলাম জাল পড়েছে এইচ. কিউ. ব্যারাকে। ক্যাম্প-অবতংসের বিচিত্র বীতংসে আটকা প'ড়ে ছটফট করছে মেয়েটা। তার কিছুদিন পরেই আপনি এলেন। আমি ওকে এনে ঢুকিয়ে দিলাম আপনার ওখানে। এইটাই হচ্ছে আপনার উপর ডাক্তার সাধুচরণের চটবার তৃতীয় কারণ।”

“প্রথম ও দ্বিতীয় কারণ দু'টি কি জানতে পারিনে?”

“এক নম্বর লেডিস ওয়েটিং রুম, আর দু'নম্বর তাকে 'নক্স' বলা।”

বলে হোহো ক'রে হাসলেন ভদ্রলোক প্রাণ খুলে। ঋতব্রত সত্যিই অবাক হ'ল। খবর রাখেন বটে তফাদার! কোথায় নিতৃত কক্ষে সে ডাক্তারকে হুকথা শুনিয়ে দিয়েছে তা পর্যন্ত খবর রাখেন উনি। অথচ এটা জানেন না যে, রাত্রের অন্ধকারে আজও আসে এখানে তারাপদ।

“আচ্ছা, কুসুমের পূর্ব-ইতিহাস জানেন না কিছু? ওর স্বামী মারা যায় কি ক'রে?”

“আজ উঠুন। রাত ন’টা বেজে গেছে। মেয়েটাকে তাহ’লে কালই বিদায় করছেন তো?”

“ওকে কেন তাড়াবো তা তো বললেন না?”

“বললাম যে ও অসুস্থ।”

“কিন্তু আমার ওখানে তো তেমন কোনও ভারী কাজ করতে হয় না।”

“ভারি মুশকিল তো মশাই আপনার মতো ব্যাচিলরকে নিয়ে। ওকে তাড়াবেন না তো কি সব দায়-বাক্তি নিজের কাঁধে নেবেন? শেষকালে লোকে যে আপনাকেই কলঙ্ক দেবে।”

ঋতব্রতের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে হোহো ক’রে হাসলেন তফাদার।

“কি, এখনও বোঝেন কি কিছু? বিধবা কুসুম অন্তঃসত্ত্বা! যান, বাড়ি যান।”

এককিউটিভ এঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডাট এসেছেন কাজ পরিদর্শনে। বিলাতী যুনিভার্সিটির তিলক আছে দস্তশাহেবের ললাটে। বিংশ-শতাব্দীতে জন্মালেও ঊনবিংশ শতকের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ছাপ রয়েছে তাঁর দেহে মনে। কথা বলতে গিয়ে বার বার মেরিকার কথা উঠে পড়ে। ম্যাসাচুসেট্‌স-এর দিনগুলো তিনি ভুলতে পারেন নি আজও। সমুদ্রপারের দেশটাকে ‘হোম’ বলে উল্লেখ করেন যখন তখন। হেসে ফেললে কিন্তু আর রক্ষা নেই! চলনে, বলনে, টুপিতে, টাইয়ে তিনি পুরোদস্তুর সাহেব। বাংলা উচ্চারণে একটু বাধ বাধ ভাব—ইরাজী ইয়াক্বিদের মতো! পাইপটাকে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো তাঁর অঙ্গের একটি অংশ মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কথা বলার সময় লোকে মুখ থেকে পাইপটা হাতে নেয়—উনি কথা শুরু করার আগে হাতের পাইপটা মুখে তোলেন।

এসে নামলেনই তিনি তিরিফি মেজাজ নিয়ে। কি জানি জংসন স্টেশনে কেলনারের ছইক্ষি ফুরিয়ে যাওয়াই এটার কারণ কিনা! দস্তশাহেবের পিছন পিছন দুই ওভারসিয়ার আর ঠিকাদারের মিছিলের পুরোভাগে ঘুরছিল ঋতব্রত। কথা-বার্তা হচ্ছিল আত্মোপ্রাস্ত ইরাজীতেই। তর্জমা ক’রে দিলাম কিছু কিছু—

“এল/২৯ ব্যারাকটা কোনদিকে?”

“এগিয়ে গিয়ে বাঁ-হাতি।”

“আই সী।”

ওরা সদলবলে চলল এল/২৯ ব্যারাকের দিকে। এত ঘর থাকতে এটাই বা দেখতে চাইলেন কেন দস্তশাহেব? ভাবে ঋতব্রত। ওঁর পক্ষে তো কোনও ঘরের নম্বর

জানা বা মনে রাখা সম্ভবপর নয় !

ওদের পিছু পিছু চলেছে একপাল ছেলে-বুড়ো। অকাজের খেয়ালখুশিতে দিন কাটে ওদের। এ এক নৃতন দৃশ্য। চল, মজাটা দেখাই যাক, ভাবখানা তাদের। দত্তসাহেব এল/২২ ব্যারাকে এসে পৌঁছলেন সদলবলে।

বড়খোকা উবু হ'য়ে বসে দাঁতন করছিল বারান্দায়। রাস্তার টিউবওয়েলে কমলা বসে ঐটো বাসনগুলো ছাই দিয়ে মেজে তুলছিল। ওদের আসতে দেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গায়ের কাপড় একটু টেনেটুনে নিল। ঘরের ভিতর সেই আবক্ষ দাড়িওয়ালা লোকটি কি একটা বই পড়ছিল জোঁরে জোঁরে। দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে খালি গায়ে পাগলটা একমনে যেন শুনছে তা। বেড়ালের একটা বাচ্চাকে ধ'রে টানাটানি করছে দু'টি উলঙ্গ শিশু।

ওদের চুকতে দেখে সবাই যে যার হাতের কাজ বন্ধ রেখে এগিয়ে এল। এল না কমলা। আর এল না পাগলটা; একটা শিশুকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে থাকল সে একটু দূরে।

“এ ঘরে ক'টা শালবল্লি বদলানো হয়েছে?” প্রশ্ন করেন দত্তসাহেব।

“একচল্লিশটা স্ত্রী।” জবাব দেয় জীবন কর। এম. বি. খুলে পাতাটা বের ক'রে ধরে সে।

“লেট মি সী। দেখি, কোন্ একচল্লিশটা?”

জীবন আর ব্রজেন একে একে গুণে যেতে লাগলো। বাধা দিয়ে দত্তসাহেব বললেন, “কিন্তু সবগুলোতেই তো আলকাতরা মাখানো। কোনটা নতুন, কোনটা পুরানো বুঝবো কি ক'রে? পুরানো বল্লার আলকাতরা দিয়েছ কেন?” জীবন তাকায় সেনগুপ্তের দিকে। সেনগুপ্ত ফিরলো ঋতব্রতের দিকে।

“আর যু অল ডাম্? বোবা নাকি সব? পুরানো বল্লার আলকাতরা দেওয়া হয়েছে কার হুকুমে জানতে পারি কি?”

ঋতব্রত এগিয়ে আসে, “আমিই বলেছিলাম স্ত্রী!”

“অ্যাগু হোয়াই? কেন?”

“ঠিকাদারের মাল বেশি এসে গিয়েছিল। তাই কিছু বল্লাতে লাগিয়েছে। তার মাপ তোলা হয় নি।”

“হাঙ্ ইণ্ডর মেজারমেন্ট ফর কোলটারিং! আলকাতরার মাপ চুরি ক'রে কেউ লাভ করতে বসে না। একচল্লিশটাই নতুন খুঁটি দেওয়া হয়েছে তা আমি বুঝবো কি ক'রে? সব ক'টার রঙই তো নিগারের মতো কালো ক'রে তুলছে।”

সমস্ত দায়িত্বটা ঋতব্রতের। ওর অনভিজ্ঞতার স্বযোগ নিয়ে সেনগুপ্ত আর সিংজী†

মিলে এই কাণ্ডটা করেছে। মনে পড়ল লিখিত অর্ডার দেবার সময় ওদের ছ'জনের ইজিতপূর্ণ হাসির কথা।

দত্তসাহেব ঋতব্রতের দিকে ফিরে বললেন, “নাউ টেল মি বাবা মুন্ডাকা, হইচ ইস্ আলিবাবাস্ কোয়াটার্স?”

কান হুঁটো ঝাঁ ঝাঁ করছে ঋতব্রতের। মরিয়া হ'রে মিথ্যা কথা বললে সে। চাকরি-জীবনে তার প্রথম অনূতভাষণ!

“পুরানো শালের খুঁটিগুলোতে আলকাতরা লাগাবার আগে আমি গুন্তি ক'রে নিয়েছিলাম।”

“তবে বইতে সই করা হয় নি কেন?” ওর নাকের ডগায় মেলে ধরেন মেজারমেন্ট বইটা।

“তখনও মাপ ওঠে নি এম. বি-তে। আমার নোটবইতে টুকে রেখেছি।” মিথ্যা-ভাষণের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে কিন্তু এস. ডি. ও. সাহেব! খাতাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মিটার ভাট। কুড়িয়ে নিল জীবন কর। লজ্জায়, অপমানে ঋতব্রতের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছিল। দেখলে ঘরস্বদ্ধ লোক ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। মুখভঙ্গি ক'রে তখনও দাঁতন করছে বড়খোকা। একগোছা ঝকঝকে বাগন হাতে নিয়ে ঘারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কমলা। চোখোচোখি হ'তেই সরে গেল আড়ালে। শ্মশদারী বৃদ্ধ উসখুস করছে ও কোনায়। পাগলটা উঠে দাঁড়িয়েছে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে। তার বাঁধন আল্গা ক'রে গ্যাংটো ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে দত্তসাহেবের পায়ের কাছে।

“আমার একটা দরখাস্ত আছে স্তর।”

দত্তসাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। ভিড় ঠেলে বড়খোকা সামনে এগিয়ে এল।

“আমরার হকল ঘরই পার্টিশন করতে হইব।”

“টেল'এম নো পার্টিশনন্স উড্ বি কন্সট্রাক্টেড।”

সেনগুপ্ত তর্জনা ক'রে বললে, “পার্টিশন করা হবে না কোথাও।”

“এইডা তবে কি?” কমলাদের ঘরের অসমাপ্ত পার্টিশনটার দিকে দাঁতনটা উচু ক'রে দেখাল বড়খোকা।

“ইয়েস্! হোয়াটস্ ইট? আই থিংক্ ইটস্ নট্ এগেন ইন্ য়োর ডাইরেকশনন্স বোস?”

“হ্যাঁ, এটাও আমিই বলেছি। বিশেষ কারণ ছিল।”

“স্পিক্ ইংলিশ্, বোস। আই ডোন্ট লাইক দীস্ হিডেন্ন্স্ জ্বাড্ ফলো আস্।”

“আই জ্বাড্ স্পেশাল্ রিসনন্স্ স্তর।”

“স্পেশাল রিসন্স মাই ফুট!”

তারপর জীবনের দিকে ফিরে বললেন, “এটাকে ভেঙে দাও।”

অপমানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ঋতব্রতের মুখ। পাশ ফিরতেই নজরে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ব্রান হয়ে যাওয়া মা ও মেয়ে। আবার চোখোচোখি হ’ল ঋতব্রতের সঙ্গে। খুক খুক ক’রে কেশে উঠল ওপাশ থেকে বড়খোকা। হাক থুঃ! বাইরে থুতু ফেলে এল সে।

“না, ওটা ভাঙবে না জীবন!” হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঋতব্রতের মুখ দিয়ে।

“বাই জোভ। হোয়াট ড্যু মীন!” ঘুরে দাঁড়ালেন এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার মিস্টার ডাট্, কড়া মেজাজের অফিসার ব’লে সারা ডিপার্টমেন্টে ষাঁর স্বখ্যাতি আছে। ঋতব্রত তখন মরিয়া! মুহূর্তের মধ্যে চরম অবস্থাটাও ভেবে নিয়েছে সে। পদত্যাগপত্র? হ্যাঁ, তাতেও সে পেছপাও হবে না। তারপর দেখল জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আছেন মিস্টার ডাট।

“আই মীন আই শ্রাল বেয়ার দি কস্ট্ ফ্রম্ মাই ওন পার্স। আই হাভ অন্‌রেডি গিভন্ হার ওয়ার্ডস্।”

“হার?” চকিতে মিস্টার ডাটের নজরে পড়ে কমলা একদৃষ্টে চেয়ে আছে অপমানে লাল হ’য়ে যাওয়া ঋতব্রতের মুখের দিকে।

“আই সি! এ লেডি ইন্ কোশেন। ওয়েল দেন অ্যান্‌স্‌য় প্লীজ।”

খুশি হ’য়ে ওঠেন মিস্টার ডাট। নিজের যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সম্ভবত। হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো গ্যাংটো ছেলেটাকে প্রশ্ন করেন, “তোমার নাম কি আছে?”

হয়তো সাহেব দেখতে অভ্যস্ত নয়, নয়তো অনভ্যস্ত এ জাতীয় খাস্তা বাংলায়। ছেলেটি ফ্যালফ্যাল্ ক’রে চেয়ে থাকে শুধু। দত্তসাহেব হিপ্ পকেট থেকে একটি আধুলি বের ক’রে গুঁজে দিলেন গ্যাংটো ছেলেটার হাতে—“মিষ্টি খাবে তুমি।” হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ে ওপাশ থেকে পাগলটা। ছেলেটার হাত থেকে আধুলিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়, ঠিক যে ভঙ্গিতে মিস্টার ডাট ছুঁড়ে ফেলেছিলেন মাপের খাতাখানা। তারপর নয় শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে বললে, “Time o Dána os et dóna fe-ren’tes, My boy.”*

সমস্ত ঘরটা তখনও নির্বাক বিষ্ময়ে স্তব্ধ! অশিক্ষিত পাগলটু যে হাট্-ম্যাট্-ফ্যাট্ ক’রে ইংরাজী বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে এটা যেন অবিস্মৃত! সকলের উপর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে পাগল তার শিশুকেই আবার বললে, “আই অ্যাম স্পিকিং

* গ্রীকরা যদি উপহারও নিয়ে আসে তবে তাদের বিবাহ করা চলে না, খোকা।

ল্যাটিন, মাই চাইল্ড! আই ডোন্ট লাইক ছাট কন্ভারসেসন্স অফ্ দি হিদ্দেন্স
বি ফলোড বাই দীস ইংলিশম্পিকিং জেন্টলমেন ট্যু!

এবার কান লাল হবার পালা মিস্টার ডার্টের! আপমানে, লজ্জায় তিনি বেগুনী
হ'য়ে গেলেন।

ঋতব্রত পরে জেনেছিল পাগল মৈমনসিং জিলা স্কুলের রিটার্ড হেডমাস্টার।
ডবল এম. এ.!

কুসুমের জীবনের মাঝের অংশটা, অর্থাৎ যৌবনাংশ সংগ্রহ করেছিলাম ম্যাডাম
বোসের কাছে। গিয়েছিলাম ঋতব্রতের বাসায় ওটা যোগাড়ের চেষ্টায়। সে
বাড়ি ছিল না। মিসেস বোস বসালেন আমাকে। চা খাওয়ালেন। আমার
উপস্থাপন কতদূর অগ্রসর হ'ল সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বার বার বললেন,
“আমার কথাটা লিখেছেন তো? কই, কি লিখেছেন দেখি? আমার কিন্তু অনেক
কোয়ালিফিকেসন্স আছে। সব কথা লিখছেন তো?”

আশ্বাস দিলাম তাঁকে। যথাযোগ্য সম্মান দেবো প্রত্যেক চরিত্রকেই। অর্থাৎ
আমার রচনাশৈলীতে যতখানি সম্ভব। একটু পরেই বললাম, “আজ উঠি।
এসেছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা তো আজ হ'ল না দেখছি।”

উদ্দেশ্যটার বিষয়ে উনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শুনে বললেন, “ওমা, তাই
নাকি? কুসুমের কথা সেই পর্যন্ত লিখে ফেলে রেখেছেন? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি
আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা।”

উঠে গিয়ে আঁচল থেকে চাবি নিয়ে আলমারিটা খুললেন। তারপর একটা কাঠের
ছোট বাক্স খুলে বের করলেন একতাড়া চিঠি। বেছে বেছে একখানি নিয়ে বসলেন
আমার সামনে।

“শুধুন। মানে, সবটা শুনে কাজ নেই আপনার। না হ'লে এটাই দিয়ে দিতে
পারতাম আপনাকে।”

তারপর নিজের মনেই পড়তে লাগলেন। কোথা থেকে শুরু করবেন বোধহয়
তাই স্থির করতে পারছিলেন না। জানি তো ঋতব্রতকে। এত এলোমেলো কথাই
লিখতে পারে! হয়তো মিসেস বোসের লজ্জা পাবার মতো কোনও কথা আছে
ওটায়। হঠাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপল মাথায়। অতর্কিতে ছোঁ মেরে তুলে নিলাম
চিঠিখানা। হৃৎকম্পে উঠলেন মিসেস বোস। খানিকটা হাত কাড়াকাড়ির পর
চিঠিটা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করল আমার বুকপকেটে।

“এ আপনার ভারি অসুখ কি? ছি ছি, দিয়ে দিন বলছি ও চিঠি! না, ওখানা
কিছুতেই দেখতে পাবেন না আপনি। উনি ভীষণ রাগ করবেন কিন্তু।”

“উনি যদি ভীষণ রাগই করেন তবে সামলাবেন আপনি। চিঠিখানা যার লেখা তার আবার মালিকানা স্বত্ব কিসের? যার বাস্তু থেকে খুঁজে পাওয়া যার স্বত্বটা তারই। আর আপাতত যখন আমার বুকপকেটে আছে তখন মালিক আমিই।” এখানা মনে হয় স্বতন্ত্রের আগের চিঠিখানার ঠিক পরেই লেখা। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকেও গুরু একখানা চিঠি এসেছে দেখা যাচ্ছে—

“সুচরিতাসু—

তোমার একুশে বৈশাখের চিঠি এই মাত্র পেলাম। তোমার পত্রপ্রাপ্তি এবং আমার কলম বার ক’রে লিখতে বসার মধ্যে আমার ঘড়ির বড় কাঁটাটা একটা সমকোণ রচনা করবারও সময় পেল না। বোঝ, কত ভালো ছেলে হয়েছি! কুসুমের গল্পটা কি হবে জানতে চেয়েছ তুমি। অর্থাৎ ছোট গল্প, বড় গল্প, অথবা উপহাস। এবার ভারি মুশকিলে ফেলেছ তুমি। সেটা আমি কি জানি? আমার কাছে তো এ তিনের বার—একটা জীবনী। তোমার কলমের ডগায় সেটা কি রূপ পরিগ্রহ করবে তা আমি কি ক’রে বলবো? কুসুমের কথা বলছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে জানাতে চাই, ইতিমধ্যে তোমাদের কাগজের জন্তে একটা কবিতা লিখেছিলাম। নিশ্চয়ই যত্ন ক’রে তুলে রেখেছি কোথাও। তবে কোন্ বাস্তব কোন্ খোপে অথবা কোন্ বইয়ের কোন্ ভাঁজে, তা এখনও উদ্ধার করতে পারি নি। তুমি কুসুমের কথা জানতে চেয়েছ, কিন্তু এখন আর তার গল্প লিখতে ইচ্ছা করছে না। এখন লিখতে ইচ্ছা করছে অল্প একটি মেয়ের কথা। তার নাম কমলা। মেয়েটি সত্যি যেন কমলা! এই পঙ্কিল পরিবেশে কি ক’রে ফুটল অমন কমল, তাই ভাবি। অবশ্য পক্ষেই তো কমল জন্মায়! মেয়েটিকে দূর থেকে আমি কয়েকবার দেখেছি মাত্র। কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় নি। প্রথম তাকে দেখি একটি অসতর্ক মুহূর্তে। সব কথা তোমাকে আজ লিখতে পারলাম না। ভগবান যদি দিন দেন তখন জানাবো। তবে প্রথম দর্শনের পর থেকেই গুরু নামে একটা কবিতা লিখবো লিখবো ভাবছি। ঈস, অত চটে যাচ্ছ কেন? আরে না, না, মিথ্যা গল্প বানাচ্ছিলাম। কমলা ব’লে কোনও মেয়েই নেই ক্যাম্পে।

হ্যাঁ, কুসুমের কথা। কোথায় শেষ করেছিলাম যেন? সেই ‘বহুধালিঙ্গন ধূলরস্তনী বিলাপ বিকীর্ণমূরজা’ অবস্থায়। আরে, হ্যাঁ বাপু! তেরো বছরের মেয়ের প্রতি ও বর্ণনা খাটে না, সেটা আমিও বুঝি।

শিশু ভাবে ‘যে দিন আমি প্রথম বড় হবো’। শুনে তোমরা হাসো। মাহুষ কি এক দিনে বাড়ে? মাহুষের বয়স বাড়ে দিনে দণ্ডে, পলে অল্পপলে। তা কিন্তু সব

ক্ষেত্রেই ঘটে না। অস্তুত কুসুমের বয়স একমুহূর্তেই বেড়েছিল পাঁচ বছর—গ্রায় রিপ্‌ভ্যান উইক্ল-এর মতো। পরদিন থেকে সে একেবারে অল্প মানুষ।

ঘর থেকে বার হয় না। মায়ের হাতে হাতে কাজ করতে যায়। অনভ্যস্ত হাতে কিছুই করা সম্ভব হয় না। গাল খায় মায়ের কাছে। ছোট বোন কামিনীর কাছে শুনতো অভিযোগ—‘মেজদি তুমি কী বোকা!’ কামিনীর কাছে সংসারের পাঠ নিতে শুরু করল কুসুম। শিখল ড্রেস ক’রে কাপড় পরতে গেলে আঁচলের জন্তে কতখানি কাপড় হাতে রেখে কোমরে কুঁচি গুজতে হয়। বাঁট দেওয়া থেকে, বিছানা পাতা, মোচা-এঁচড় কোটা। ক্রমে রান্না করা, বড়ি দেওয়া, আচার বানানো। ঘরের জানালা থেকে বসে বসে দেখত বাপের পাঠশালায় বসে স্নর ক’রে নামতা মুখস্থ করত ছেলের দল। কখনও কখনও বিশ্বনাথ আসত। পণ্ডিতমশায়ের কাছে নিত কাদম্বরী অথবা বিক্রমোর্বশীর পাঠ। “অপর্যাপ্তপুস্তকবাবনম্রা—” শ্লোকটা পড়বার সময় বিশ্বনাথের দৃষ্টি বই থেকে উঠে আটকে যেত পাশের বাতায়নে। সেখানে সঞ্চারিণী পল্লবিনী কোন লতা সরে যেত বিদ্যুৎচমকের মতো। কিশোর বয়সের বন্ধুরা কুসুমকে ভুলল সহজেই। ভুলল না বিশ্বনাথ। সে তখন তারুণ্যের মধ্যাহ্ন গগনে। নতমুখী ভংসিতা বালিকার মুখখানা আর কিছুতেই ভুলতে পারলে না সে।

কুসুম তার বিচরণ ক্ষেত্র সংকীর্ণ করল বটে, কিন্তু বাহির বিশ্ব তাকে ক্ষমা করল না। ওকে মাঝে নিয়ে যে বগড়াটা হয়েছিল সেটাকে বালস্বলভ চপলতা বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ ছিল বালকদের পক্ষেই। সমাজপতিরা অত সহজে ক্ষান্ত হলেন না। আবহুলের বাপ এসে পণ্ডিতকে শাসিয়ে গেল। পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোকও এসে পাঁচ-কথা শুনিয়ে গেলেন নিরীহ পণ্ডিতকে। ঘরের মধ্যে চুপ ক’রে সব সহ করলে কুসুম।

পল্লীগ্রামে তেঁরো বছরের মেয়েকেই অরক্ষণীয়া ব’লে গণ্য করা হয়। কুসুমের জন্ম পাত্রের সন্ধান করছিলেন পণ্ডিতমশাই, কিন্তু গেছো-মেয়ে বলে একটা দুর্নাম তার আগেই ওর সহজ পরিণয়ের পথটিকে ক’রে রেখেছিল কটকিত। যে মেয়ে গাছে ওঠে, ফুটবল খেলে, ক্ষেত থেকে অনায়াসে কপি চুরি ক’রে নিয়ে যায়—সে পণ্ডিত বংশসম্ভূতা হলেও গ্রহণীয়া নয়! কুসুমের বর জোটে না।

এ ভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ দু’টি বছর। বার্থ সন্ধানে পণ্ডিতমশাই হতাশ হয়ে পড়েছেন। ইদানীং ‘মহিমার্গবেষ্ণু’ মার্কা চিঠিপত্র আর দিয়ে যায় না ডাকপিয়ন। তিনিও বন্ধ করেছেন চিঠিপত্র লেখা। পণ্ডিতগৃহিণী এসে মাঝে মাঝে তাগাদা দেন, “ওগো অমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থেক না। যা হয় কিছু করো।”

পণ্ডিত জবাব দেন না। নস্তুদানি থেকে একটিপ নস্তু নাসারঞ্জে প্রবেশ করিয়ে পরিপাটিকপে নাসাপ্রাস্ত মুছে নিয়ে বলেন, “গোবিন্দ! গোবিন্দ!”

পণ্ডিতমশায়ের পরিবারে দুটি বছরে পরিবর্তনটা দৃষ্টিগোচর না হ’লেও লক্ষ্মীপুর গ্রামে এসে গিয়েছিল এরই মধ্যে যুগান্তর। যুনিয়ন বোর্ডের ইলেক্‌সনে প্রবীণ জমিদার হরিহর গাঙ্গুলীর পরাজয় এবং আবদুল গণির বাপের প্রেসিডেন্ট পদ-প্রাপ্তিই লক্ষ্মীপুরের সমাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। কিন্তু রাজ-নৈতিক ইতিহাসের সংবাদ অল্প রকম। ঢাকার রায়টের নানান মুখরোচক সংবাদ পল্লবিত আকারে এসে পৌছাত লক্ষ্মীপুর গ্রামে। পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ধুমায়িত হচ্ছিল অন্তরালে। গোপন বৈঠক বসছিল এ-পক্ষে ও-পক্ষে। একদিন হরিহর গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে শান্তি-সম্মেলনও হ’য়ে গেল একটা। হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হ’য়ে শপথ নিলে গ্রামে তারা কোন অশান্তি আসতে দেবে না। হরিহর গাঙ্গুলীর বাড়ির বড় আজিনায় জমায়েত হলেন গ্রামের গণ্যমান্ত অতিথিবর্গ। আবদুলের বাপ হলেন সে সভার সভাপতি। হরিহর গাঙ্গুলী সকলকে মিষ্টিমুখ করাবার আয়োজনও করেছিলেন। শান্তি-সম্মেলনের আয়োজনে আশ্বস্ত হ’ল সবাই। সভার উদ্বোধনে বিশ্বনাথের ক্লাবের ছেলেরা এল উদ্বোধন সংগীত গাইতে। বিশ্বনাথ তখন ব্যস্ত ছিল ভাঁড়ারে। সমবেতকণ্ঠে ‘বন্দেমাতরম্, স্ফুলাং স্ফুলাং’ গান শুরু হ’তেই সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল সভাস্থ সবাই। চিকের পর্দার ওপাশে কুসুমরা বসেছিল। তারাও উঠে দাঁড়াল। গান তখন চলেছে ‘মলয়জ শীতলাং শস্ত্র শ্রামলাং’—সভাপতি মগুপ ছেড়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন। নেমে এলেন অস্ত্রাণ্ড গণ্যমান্ত মুসলমান অতিথিরা। ছুটে আসেন হরিহর প্রমুখ উত্তোক্তারা। “ব্যাপার কি, চললেন কোথায়?”

“মাপ করবেন গাঙ্গুলীমশাই। খোদা আপনায় দয়া করবেন। কিন্তু আমরা তো এ গান শুনতে আসি নি। এ গান সম্বন্ধে সব কথাই তো জানেন। অপমান করাবার জন্তেই যে আমাদের ডেকেছিলেন তা বুঝতে পারি নি।”

“সে কি? সে কি?”

বন্ধ হয়ে গেল বন্দেমাতরম্ সংগীত।

আপোসে ঠিক হ’ল, ‘সারে যঁহাসে আচ্ছা’ গাওয়া চলতে পারে। কিন্তু সে গান কারও জানা নেই। অগত্যা আবার আপোসে ঠিক হ’ল ‘ধন-ধাত্তে পুষ্পে ভরা’ গাওয়া হোক। এ গান জানতো ক্লাবের ছেলেরা—কিন্তু কেউ রাজী হ’ল না গাইতে। বিশ্বনাথ এসে বললে, “বন্দেমাতরম্ গাওয়া যেখানে পাপ, আমি বা আমার ক্লাবের ছেলেরা সেখানে থাকবে না।”

তেড়ে এলেন হরিহর গাঙ্গুলী, বাধা দিলেন সভাপতি।

“ওদের যেতে দিন গাঙ্গুলীবাবু। আমরা কিছু মনে করি নি।”

তিনি খবর রাখেন অনেক গুঁড় ইতিহাসের। জানতেন, এ জাতীয় ছেলেদের মুখের ‘বন্দেমাতরম’ সংগীত লাঠি চার্জ ক’রে, গুলি চালিয়েও থামানো যায় না। বিনা সংগীতেই সভার কাজ সারা হ’ল। ক্লাবে ফিরে গিয়ে ছেলেরা সার দিয়ে শেষ করলে তাদের অসমাপ্ত সংগীত।

এই ঘটনার সাতদিন পরে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে বসল ‘মিলাদ শরিফ’। গ্রামের ইতরভদ্র সমস্ত হিন্দুর নিমন্ত্রণ ছিল সেদিন। বিশ্বনাথ ক্লাবে বসেই শুনতে পেল গান হচ্ছে ও পাড়ায় সমবেত কণ্ঠে ‘সারে য়াহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থানী হমারা হ্যায়।’ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দিল সে মহাকবি ইকবাল রচিত মহাসংগীতকে—সে দৃশ্য দেখল না কেউ।

কেউ দেখে নি একথা বলা চলে না। নির্জন কুস্তির আঁখড়ার অনতিদূরে ছিল একজন লোক। মাসাধিক কাল ধ’রে বিশ্বনাথের প্রতিটি পদক্ষেপ লে নোট ক’রে যাচ্ছে।

এর পরেই লক্ষ্মীপুর গ্রামে দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা। সবিস্ময়ে একদিন সকলে শুনল সদলবলে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার ক’রে নিয়ে গেছে পুলিশ রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার ছিল নাকি গোপন যোগাযোগ। শাস্তি-সম্মেলন আর মিলাদ শরিফ দিয়ে কিন্তু অনিবার্য দুর্দৈবকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। কালবৈশাখীর মতোই এসে গেল দাক্ষার ঢেউ লক্ষ্মীপুর গ্রামেও।

স্মরণাতীত কাল থেকে যারা পাশাপাশি বাস ক’রে এসেছে, কি আশ্চর্য, দেখা গেল তারা দুই জাতি। পরম্পরের শত্রু। যে বিজ্ঞানী এই অভূততম আবিষ্কারটি করলেন কলম্বুস্, নিউটন, আইনস্টাইনের পাশে তাঁর স্থান হ’ল কিনা জানি না, কিন্তু ওঁদের আবিষ্কারের চেয়ে তাঁর আবিষ্কারের ফলাফলটা কম চমকপ্রদ নয়। দাক্ষার দাবানল এসে পৌঁছাল লক্ষ্মীপুরেও। ডাকাতি হ’য়ে গেল একদিন গ্রামে।

লক্ষ্মীপুরে সবচেয়ে ধনী হরিহর গাঙ্গুলী—তারপর রায়রা। গণিরাও বড়লোক। ডাকাত পড়ল কিন্তু এ তিনবাড়ি বাদ দিয়ে পণ্ডিতের বাড়িতে। পণ্ডিতের পাঠশালা ঘরে আগুন দিয়ে, গৃহ-দেবতাকে বিকলাঙ্গ ক’রেই তারা চলে গেল। টাকাকড়ি নিয়ে গেল না কিছু—কারণ তা তারা নিতে আসে নি। তারা যা নিতে এসেছিল, তা কিন্তু নিয়ে গেল ঠিকই। নির্মল অথবা বিশ্বনাথের কানে খবরটা অবশ্য পৌঁছয় নি; তারা তখন লৌহ-কপাটের অন্তরালে।

ভাগ্যক্রমে সেই দিনই ধলেশ্বরী দিয়ে নৌকা ক'রে যাচ্ছিলেন ফণী হাজরা—
 কি একটা তদন্তে। ফণী হাজরা থানার ছোট দারোগা। তাঁর প্রচেষ্টায়
 তালপুকুরের পাড়ের লখা সা'র পোড়ো ভিটে থেকে উদ্ধার ক'রে আনা হ'ল
 বন্দিনীকে। মেয়েকে ফিরে পেয়ে মা কপাল চাপড়ালেন, বাপ বসেছিলেন
 বিকলাঙ্গ গৃহ-দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে মাথায় হাত দিয়ে। ছোট বোন কামিনী
 রোয়াকের খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখছিল। বিস্ফারিত চোখে। উঠান ভরে গেছে
 এক গাঁ লোকে। ধূলা-কাদার মাঝখানেই উঠানের উপর বসে আছেন মা। তাঁর
 কোলে মাথা গুঁজে নিশ্চল পড়ে আছে দিদি—একরাশ খোলা চুল লুটোচ্ছে
 কাদায়।

কলঙ্কিনী কুসুমের গল্প এখানেই আপাতত শেষ করছি। চিঠিটা এমনিতেই বেশ
 বড় হ'য়ে গেছে। শীঘ্রই একবার কলকাতা যেতে পারি। তোমার চিঠিতে
 অভিযাত্রিকের সম্পাদনার অমল ঘোষের সাহচর্য পাচ্ছ লিখেছ। তাঁকে তো
 চিনলাম না। এটি কি তোমার গগনের নবাবিকৃত তারকা? আলাপ করার
 বাসনা রইল। লীলার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। ত্রিশে বৈশাখ। মেজদা লিখেছেন।
 দিন সাতেকের ছুটি নিচ্ছি তাই। আচ্ছা, তুমি কি মাসীমা অথবা মেসোমশাইকে
 আমাদের কথাটার কোনও ইঙ্গিত দিয়েছ? নাকি আমি লিখব? কয়েক দিনের
 মধ্যেই অবশ্য কলকাতা যাচ্ছি। মুখেই গিয়ে বলা চলতে পারে। তাতে কিন্তু
 ভারি লজ্জা করবে আমার। তুমি পত্রপাঠ জানিও। যাতে কলকাতা যাবার
 আগেই খবরটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। তাহ'লে তাঁদের জবাবটাও
 মৌখিক শুনে আসতে পারি। অবশ্য তুমি যখন আমার সহায় আছ তখন জবাবটা
 এখনই আন্দাজ করতে পারি।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রইল—

ইতি—”

“আপনার সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চায় স্মার।”

“ডেকে দাও।”

রতনের পিছন পিছন প্রবেশ করে একজন লোক। হাতে একটা ক্যাশিশের
 ব্যাগ—একটা ভাঙা ছাতা। পায়ে ক্যাশিশের জুতো—তার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে
 আছে পায়ের দুটি আঙুল। ধূতিটা খাটো ক'রে পরা, কৌচাটা পাট ক'রে ফের
 কোমরে গাঁজা। হাত জোড় ক'রে এসে দাঁড়ালো।

খতব্রত দেখেই চিনতে পারল তাকে—তারাপদ।

একটু মজা করবার জন্তেই পরিচিত সুরে ঋতব্রত বললে, “কি খবর তারাপদ ? আবার তুমি ক্যাম্পে যাতায়াত করছ কবে থেকে ?”

লোকটা হতভম্ব হ’য়ে গেল। বোকার মতো চেয়ে রইল শুধু। গলার কাছে কণ্ঠার হাড়টা ওঠানামা করতে লাগল কেবল।

“কি হ’ল ? কি বলবে বল না ? তোমার বোনের কথা তো ?”

বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা কোনক্রমে বললে, “হুজুর কি আমাকে চেনেন ?” ঋতব্রত হাসল, বললে, “তোমাকে কি আজ থেকে চিনি ? যাক্, বল তোমার কি আর্জি।”

“হুজুর আমার সম্বন্ধে কি জানেন ?”

“সেটা এ ক্ষেত্রে বিচার্য নয়। তুমি যেজন্তে এসেছ তাই বল।”

“আপনি আমার কথা কার কাছে শুনেছেন ?”

বিরক্ত হয় ঋতব্রত। এক কথা বার বার ভালো লাগে না তার। বলে, “বাজে কথা বল না। কাজের কথা কি বলতে চাও বল।”

হঠাৎ বদলে যায় কঙ্কালসার লোকটা। হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে বললে, “নমস্কার। আমার কিছুই বলার নেই।”

লোকটা চলে যাবার জন্তে পা বাড়ায়। তাকে ফিরে ডাকে ঋতব্রত।

“কি হ’ল তোমার ? চলে যাচ্ছে কেন ? কি বলবে বল না।”

তারাপদ ফিরে আসে। একটু ইতস্তত ক’রে বলে, “আজ্ঞে কুসুমের কথাই বলতে এসেছিলাম। ওর শরীরটা খারাপ। সুনলাম তফাদার সাহেব ওকে অবলা-আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। তাই বলছিলাম—” মাঝপথে চূপ করে যায়।

“তাই কি বলছিলে—বল না।”

হঠাৎ লোকটা জড়িয়ে ধরে ঋতব্রতের দুটি পা, বলে, “আপনি আমাদের বাঁচান স্তার।”

“কি হ’ল ? আঃ, পা ছাড়।”

ওকে সোজা ক’রে বসিয়ে সমস্ত খবরটা খুটিয়ে খুটিয়ে সংগ্রহ করে ঋতব্রত। কুসুমকে অবলা-আশ্রমে পাঠাতে তারাপদের ঘোর আপত্তি। অথচ এরকম অসুস্থ মেয়েকে হয়তো ক্যাম্পে রাখতেও রাজী হবেন না তফাদার সাহেব। তাই তারাপদের অস্বরোধ, যেন ঋতব্রত আর কিছুদিন কুসুমকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়। ইতিমধ্যে তারাপদ কলকাতায় কোনও বস্তিতে বাসা ঠিক ক’রে ওকে নিয়ে যাবে। স্থণায় কুক্ষিত হ’য়ে যায় ঋতব্রতের সর্বাঙ্গ ! তবে তো তফাদারের অহুমান মিথ্যা

নয়। এ অবস্থায় কুসুমকে নিয়ে গিয়ে কোনও বস্তিতে তোলার কল্পনা করে কি ক’রে এই কঙ্কালসার লোকটা? আর সেই প্রস্তাবে ও সাহায্য প্রত্যাশা করে ঋতব্রতের কাছে!

“কুসুমের অসুখটা কি?” প্রশ্ন করে ঋতব্রত।

ইতস্তত করে তারপদ। হাপরের মতো বুকটা ওঠাপড়া করে তার।

“তুমি জানো তার অসুখটা কি?”

নীরবে নতনেত্রে লোকটা মাথা নেড়ে জানায়, সে জানে।

“এ অসুখ তাকে কে এনে দিয়েছে তাও জানো অহুমান করি?”

হঠাৎ হুহু ক’রে কেঁদে ফেললে লোকটা। কান্নায় ভাঙা অনেক কথা বলে ওঠে একসঙ্গে।

“বিশ্বাস করুন, তার কোনও দোষ নেই। পাপ কুসুমি করতে জানে না।...ওকে যারা চিনতো তারা কল্পনাও করতে পারে না...আমি হলপ ক’রে বলতে পারি কোন অন্ডায়, কোন পাপ করে নি কুসুমি। আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি আজ, তবে যেন বজ্রাঘাত হয় আমার মাথায়।” হাত দুটো শূণ্ণে উৎক্ষিপ্ত করে নাটকীয় ভঙ্গিতে।

এক ধমকে থামিয়ে দেয় তাকে ঋতব্রত।

“সমস্ত জেনেশুনে কুসুমকে নিয়ে একসঙ্গে কোনও বাড়িতে ওঠার কল্পনা করছ কি ক’রে তুমি? কলকাতায় কি সমাজ নেই? সেখানে পাড়ার ছেলেরা তোমাকে গুঁড়িয়ে ফেলবে না?”

“কেন? অসহায় দুঃস্থা বোনকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকা কি অন্ডায়? পাপ? কুসুম আমার বোন, নিকট আত্মীয়।”

“নিকট? কত নিকট?”

“আজ্ঞে?” লোকটা হয়তো শুনতে পায় নি ঋতব্রতের প্রশ্ন।

“দেখ, হাড় ক’থানির মায়্যা রাখ? তা যদি রাখ, তা হ’লে আর ওপথে যেও না। পিসতুত বোনের প্রতি যেটুকু কর্তব্য তুমি করেছ, তাই যথেষ্ট। এটুকুর জন্তেই তোমাকে চাব্কে বের ক’রে দেওয়া উচিত ক্যাম্প থেকে।

মাথা নীচু ক’রে বসেছিল সে উবু হ’য়ে ওর চেয়ার থেকে অনতিদূরে। একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে নীরবে মাটিতে দাগ কাটতে থাকে।

আশ্চর্য! এই প্রেতযোনিসম্বৃত চরিজহীন যক্ষারোগীটাকে কী ক’রে সহ্য করে কুসুমের মতো মেয়ে! ভেবে বিশ্বয় লাগে। কুসুমও এমন কিছু সুন্দরী নয়—কিন্তু অপূর্ব স্বাস্থ্যবতী। ছেলেবেলা থেকে তার ব্যায়ামপুঙ্খ শরীরটা একটা বলিষ্ঠতা লাভ

করেছে। বয়সের অঙ্কে হয়তো তার অতিক্রান্ত যৌবন, কিন্তু শরীরে কোথাও ছাপ পড়ে নি এক তিল। পড়লে আজ হয়তো তার এ দুর্দশা হ'ত না। সাধুচরণের লোলূপ দৃষ্টি থেকেও হয়তো সে আত্মরক্ষা করতে পারতো। আর ছিল তার চুল। কোমর ছাড়িয়ে নিতম্বের ওপর পড়তো খুলে দিলে। ঘনকঞ্চ কেশদাম যেন একটা চালচিত্র রচনা করতো। আশ্চর্য! অথচ এই চুলই একদিন কেটে ফেলেছিল সে নিজের হাতে। সেই অল্পশোচনাতেই পরবর্তী জীবনে বোধহয় বেশী যত্ন নিয়েছে চুলের। কতবার অসময়ে বাড়ি ফিরে ঋতব্রত দেখেছে ভিতরের বারান্দায় একটা আরশি আর চিরুনি নিয়ে সে বসেছে চুল আঁচড়াতে। ওকে দেখে ক্ষতপদে উঠে গেছে রান্নাঘরে। এটী সব অসংলগ্ন মুহূর্তেই কুসুমের ঘনকঞ্চ কবরী নজরে পড়েছে ঋতব্রতের। না হ'লে সামনে সে সর্বদা মাথায় ঘোমটা তুলে থাকতো।

“স্মার?”

“হ্যাঁ, বলো।”

“তা হ'লে?”

“বললাম তো। তাছাড়া তুমি চাইলেও কুসুম তোমার সঙ্গে যেতে রাজী হবে না।”

“হবে স্মার। সে মত দিয়েছে। ডাকব তাকে?”

“না, সে মত দেয় নি। দিতে পারে না। দেওয়া অসম্ভব। ডাকতে হবে না তাকে।”

ঘরে ক্ষণিক নীরবতা। হঠাৎ নড়ে উঠল ভিতরে ঝাঁপের দরজাটা।

হু'জনেই চোখ তুলে দেখল সাদা থানের প্রাস্তভাগ দেখা যাচ্ছে দ্বারের পার্শ্বে।

সমস্ত আলোচনাটাই তাহ'লে তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হয়েছে।

“ভেতরে এস কুসুম। বলো সাহেবকে যদি কিছু বলতে চাও।” বললে তারাপদ। কুসুম তখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

ঋতব্রত জোর দিয়ে বললে, “তুমি ভুল করছ তারাপদ। তুমি যে রাস্তা ওকে দেখাচ্ছ তাতে ওর সমূহ সর্বনাশ। অবশ্য সর্বনাশের বাকিও তুমি রাখ নি কিছু। তুমি যাও। ওকে অবলা-আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবো। ভদ্রভাবে, যতদূর সম্ভব এ অবস্থার, জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করবো আমি।”

আবার চুপচাপ।

ধীরে ধীরে ঘরে এসে দাঁড়াল কুসুম। মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়ে বললে, “আমি ওঁর সঙ্গেই যাবো। আপনি শুধু ব্যবস্থা ক'রে দিন।”

নতনেত্রে বললে কথা ক'টা। তারপর আনতনয়নেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঋতব্রত উঠল চেয়ার ছেড়ে। পায়চারি করতে লাগল চেয়ারের পিছনে। থানিক-পরে থেমে বললে, “বেশ, তবে তুমি ব্যবস্থা ক’রে এসে নিয়ে বেও।”

তারাপদকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে গেল সে। পথে নেমেই খেলল হ’ল হাটটা নিতে ভুলেছে। প্রথর হ’য়ে উঠেছে তখন রৌদ্রতাপ। ফিরে এসে টেবিল থেকে তুলে নিল হাটটা। ওকে ফিরতে দেখে তারাপদ উঠে দাঁড়াল, বললে, “বিশ্বাস করুন স্ত্রীর, কুসুমের সর্বনাশ আমি করি নি। তার সঙ্গে কোনও অবৈধ সম্পর্ক নেই আমার। ঈশ্বরের দিবি।”

কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত আবার পথে নামল।

প্রস্তাবটা শুনে বিরক্ত হলেন তফাদার। বললেন, “এটা কি রকম হ’ল মিস্টার বোস? অবলা-আশ্রমের সেক্রেটারি রাজি হয়েছে ওকে নিয়ে যেতে। আমিও সব রকম ব্যবস্থা ক’রে ফেলেছি। এখন তো আর রদ হ’তে পারে না। আর তা ছাড়া ওকে রেখেই বা আপনার লাভ কি?”

“কুসুম যেতে চায় না।”

“না, চাইলেও আপনার বোঝা উচিত যাওয়ারটাই ওর পক্ষে মঙ্গল। ক্যাম্পের ভেতরে ওকে আর রাখা চলে না। ক্যাম্প হ’লেও এখানে একটা সমাজ আছে। সেখানে সে ক্ষমা পাবে না। এসব বিষয়ে আলোচনা কত মুখরোচক তা তো বোঝেনই—বিশেষ যারা নিষ্কর্মা বসে ডোল খায়। তারাপদ হতভাগ্য আর ক্যাম্পে আসে না। সময়েই স’রে পড়েছে সে।”

“না, তারাপদ এ জন্তে দায়ী নয়।”

“তারাপদ নয়? আপনি কি ক’রে জানলেন?”

ঋতব্রত চুপ ক’রে যায়।

“আপনি যে মশাই আরও ঘুলিয়ে দিলেন ব্যাপারটা! আপনি কিছু জানেন?”

“না, তবে তারাপদ নয়, এটুকু জেনেছি।”

“আই সী!” দ্রুত কণ্ঠস্বরে তফাদার।

“যাই হোক। ও নোংরা ব্যাপারে আমাদের যাবার দরকার কি? কিন্তু ক্যাম্প-স্থপার হিসেবে ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমি কর্তব্য মনে করি। ওকে কেন্দ্র ক’রে এখানে একটা অসন্তোষ অথবা কেলঙ্কারি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।”

“সরিয়ে অবশ্য আমিও দিতে চাই। তবে অবলা-আশ্রমটা আপনি বাতিল ক’রে দিন।”

“আপনি সরিয়ে দেবেন ? কোথায় পাঠাবেন ওকে ?”

“ওর একজন আত্মীয়ের কাছে, কলকাতায়।”

তফাদার তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন ঋতব্রতের দিকে। ভাবছিলেন তিনি অশ্রুমনস্ক-ভাবে—এ ছোকরাকে তো সে রকম মনে হয় নি প্রথমে ! প্রসঙ্গটা এখানেই চেপে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হ’ল তাঁর। আবার তাকালেন তিনি ঋতব্রতের দিকে। নাঃ ! প্রাচীন অফিসার হিসাবে এই নাবালকটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দেওয়াটা অধর্ম হবে।

“একটা কথা বলব ঋতব্রতবাবু, কিছু মনে করবেন না ?”

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল ঋতব্রত।

“আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক অনেক বড়। আজ বাদে কাল রিটারায় করব আমি। সংসারে অনেক কিছু আমি দেখেছি বা দেখবার সুযোগ আপনার হয় নি। সেই দাবিতেই বলতে চাই কয়েকটা কথা—”

“বলুন। আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতোই দেখেছি এখানে এসে পর্যন্ত।”

“দেখুন, আপনার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। আপনি এ বিষয়ে কত দূর অবহিত, আমার জানা নেই। এর সঙ্গে আপনার অফিসিয়াল পোজিসন কতখানি জড়িত, তাও আমার অজানা। সে-কথা আলোচনা করাও আমার পক্ষে অশাস্য। চাকরিজীবীদের একটা ‘মর্টো’র কথা হয়তো আপনি শুনে থাকবেন : “যু শুড নট ওনলি বি অনেস্ট বাট শুড প্রিটেণ্ড টু বি দি সেম।” আপনার বিরুদ্ধে কতগুলি দরখাস্ত উপরে গিয়েছে জানেন ? জানেন না। আপনার ডিপার্টমেন্টে ক’খানা পড়েছে আমার জানার কথা নয়। যদিও আন্দাজ করি সেখানেও যাচ্ছে ওগুলো। তা না হ’লে আপনার দস্তসাহেব সোজা এসে এল/২৯ ব্যারাকের নাম করতেন না—”

“আমি অবশ্য এতকথা কিছুই জানতাম না। তবে শন্দেহ হয়েছিল আমারও।”

“আমার কথা এখনও শেষ হয় নি ঋতব্রতবাবু। আমি তো বলেছি, আপনার ডিপার্টমেন্টে কি দরখাস্ত যায় তা আমি জানি না, জানা সম্ভবও নয়, কিন্তু আমাদের হেড অফিসে আপনার নামে যে-ক’খানা দরখাস্ত গেছে প্রত্যেকটিই দেখেছি আমি।”

“কি কি অভিযোগ এসেছে আমার নামে ?”

এতক্ষণে হা হা ক’রে হেসে ওঠেন মিস্টার তফাদার।

“এটা যে আমার ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল সিক্রেট !”

❖ অপ্রস্তুত হ’ল ঋতব্রত। কথাটা আগে খেয়াল হয় নি তার।

“তাই বলছিলাম, কুসুমকে আটকে রাখা আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। এমনিতেই এল/২২ ব্যারাকে নিজের পরসায় একথানা পার্টিশন তুলে দেওয়ার আপনার নামে যথেষ্ট মুরোচক কাহিনী তৈরি হ’য়ে গেছে।”

“কিন্তু আপনি তো জানেন না—এল/২২ ব্যারাকে—”

“আবার ভুল করছেন ঋতব্রতবাবু। আমি সব জানি। কিন্তু ঐ ; শুধু সাধু হ’লেই চলবে না, আপনি যে সাধু এটার প্রচার চাই। এ বড় বিচিত্র জায়গা। তিল অনায়াসে গালগল্লে তালে পরিণত হয় এখানে। শুনবেন? সেদিন লেডি স্পারের ফেরারওয়েলে আপনি কয়েকটা ফটো তোলেন মনে আছে? সেটাকে বলা হয়েছে,—”

গট গট ক’রে ভেতরে চলে যান তফাদার। একগুণ্ড কাগজ নিয়ে এসে পড়ে শোনালেন মাঝখান থেকে—“ক্যামেরা হস্তে যিনি দিব্যরাত্র ক্যাম্পের ঘোড়শী এবং যুবতী মেয়েদের ফটো তুলিয়া বেড়ান তাঁহার পক্ষে এই প্রকার গর্হিত কার্য অস্বাভাবিক নহে। হ্যাঁ, ইনি পরিদর্শক বটে ;—সমস্ত ক্যাম্পটিকেই চুটাইয়া পরিদর্শন করিতেছেন, স্নানরতা যুবতীর ফটো তোলা তো সামান্য কথা—দিব্যরাত্র যখন তখন যে কোন ঘরে ঢুকিয়া নারীর রূপ সন্দর্শন করাই নাকি ইহার একমাত্র কার্য। কোনও একটি যুবতী ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতেছে জানিয়াও ইহাকে বিনা সংবাদে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াছে, এমন প্রত্যক্ষদর্শীর সংবাদ আমরা রাখি। বাস্তব হারাইয়াছি বলিয়া কি আমরা শালীনতাবোধও হারাইয়াছি?”

কাগজখানা ভাঁজ ক’রে পকেটে রেখে তফাদার একটা সিগারেট ধরালেন। দু’জনেই নীরব। ঋতব্রতই প্রথমে কথা বললেন, “না, কুসুমকে পাঠানোতে আমার আপত্তির অল্প কোনও কারণ নেই। আচ্ছা তবে খুলেই বলি আপনাকে—”

“থাক না!” বাধা দিলেন তফাদার, “আমার তরফের অফিসিয়াল সিক্রেট যেমন আপনাকে জানালাম না—তেমনি আপনারও যদি কোন বাধা থাকে, তবে থাক না। আমি শুধু বলছিলাম কাজটা করার আগে ভেবে দেখুন দুদিন। তার পরেও যদি ওকে রাখতে চান, সে দেখা যাবে তখন।”

“আচ্ছা বেশ, তবে তাই হোক। আজ উঠি।”

পায়ে পায়ে ঋতব্রত নিজের ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চলে। কিউ. সি. আই. ব্যারাকের চালটা ছাওয়া হচ্ছে। উপরে উঠে পাঁচ ছয় জন লোক খড়ের আঁটি গুঁজে দিচ্ছে বাতার গায়ে। নীচে থেকে জন দুই লোক ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে পোয়ালগুছি। স্তুপাকার করা আছে খড়ের আঁটি। এন/৩ বিল্ডিংটার চাল নামানো

হয়েছে। এটার রানীগঞ্জ টালি বসবে। একটা লোক নীচে বসে পুরানো টালি থেকে সিমেন্টের চটা ছাড়াচ্ছে। ছুতার মিস্ত্রি রাফটারের ওপর পার্লিনগুলো আঁটছে জু ক'রে। ঋতব্রতের নজরে পড়ল পার্লিনগুলোতে রঙ করা নেই। রাফটারেও রঙ করা হয় নি। অথচ তার বার বার ক'রে বলা ছিল প্রাইম কোট রঙ না দিয়ে কোনও ট্রান্স-মেশার ওঠাতে পারবে না। ওয়ার্ক-সরকার গদাধর ছাতি মাথায় দিয়ে কাজ তদারক করছে। ঋতব্রতের মনে পড়ল এই গদাধরকেই সপ্তাহ খানেক আগে ও বুঝিয়েছিল কেন রঙ না দিয়ে কাঠ চাপাতে বারণ করছে সে। বুঝিয়েছে যে আগে রঙ করা না থাকলে রাফটারের উপর পার্লিন যেখানটায় বসে লেই সক্রমস্থলটি আর পরে কিছুতেই রঙ করা যায় না। দুদিন আগে হ'লে সে ছুটে গিয়ে পড়তো ঐখানে। কৈফিয়ত তলব করতো ওয়ার্ক-সরকারের। বাধ্য করতো ঠিকাদারকে সব কাঠ পার্লিন খুলিয়ে, রঙ করিয়ে ফের লাগাতে। কিন্তু আজ আর তার কোনও উৎসাহই নেই। দেখেও মুখ ঘুরিয়ে সে চলে গেল। ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবন চলেছে একই ছাঁদে। সিংজীর ট্রাকখানা চলে গেল পাশ দিয়ে। করোগেটড টিন আসছে কলকাতা থেকে সোজা ট্রাকে। হাত তুলে ইয়াসিন নমস্কার করল তাকে। ইয়াসিন রামশরণের ড্রাইভার। স্টেশন থেকে ইয়াসিনই ওকে ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিল প্রথম দিন, রামশরণের জীপ চালিয়ে। রাস্তার পাশে টিউবওয়েলে স্নান করছে কয়েকটি মেয়ে। বালতি, ঘড়া, হাতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। এক নজর দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিল ঋতব্রত। স্নানরতা যুবতীর কানে পার্শ্ববর্তী একজন কি একটা কথা বলল। কলকণ্ঠে হেসে উঠল সবাই নিজেদের মধ্যে। দ্রুতপদে পার হ'য়ে গেল সে এই এলাকাটা। পীচের রাস্তার উপর গুল, ঘুঁটে, ধান বিছিয়ে শুকোতে দিয়েছে ওরা। ঠিক রাস্তার মাঝবরাবর; যাতে দুদিকে গাড়ির চাকা দুটো চলে যেতে পারে। এর পরেই রাস্তার বাঁ হাতি কয়েকটা পাবলিক ল্যাট্রিন। অ্যাসবেসটস নীটের ছোট ছোট শেড। পাশাপাশি আট দশটা। সামনের একটার চটের পরদা সরিয়ে বেরিয়ে এল একজন মেয়ে। ওকে দেখে অ্যাবাউট-টার্ন করল। এক হাতে মগ অপর হাতে মাটি। ঘোমটা টানার উপায় নেই। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাই এসব ক্ষেত্রে এদের লজ্জা প্রকাশের প্রকৃষ্টতমভঙ্গী। এ এলাকাটাও ঋতব্রত দ্রুতপদে পার হ'ল।

দুপাশে দুঃস্থ নরনারীর সংসার যাত্রা নির্বাহের সাধারণ দৃশ্য। দেওয়ালময় ঘুঁটে। টিনের চালে উঠিয়ে দিয়েছে লাউ-কুমড়ার ডগা। কাঁথা, কাপড়, বড়ি শুকোচ্ছে রোদুদুরে। তেল মাখিয়ে পিঁড়ি পেতে বারাগুয় শুইয়ে দিয়েছে সতোজাত শিশুকে। দড়ির উপর একটা কাপড় টাঙিয়ে রোজ থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে

রেখেছে। পিটপিট ক'রে দেখছে নবাগত অতিথিটি আজব ছুনিয়াকে। এদের দেখলে মনে হয় না এগুলো এদের ঘর নয়, এরা এখানেই মানুষ হয় নি ;—এরা এখানে প্রবাসী। বরং মনে হয়, এরা যেন এখানে এমনভাবে আবহমান কাল ধরে বসবাস ক'রে আসছে। কংক্রিটের চওড়া ক্রীট-ওয়েটার উপর খাপরা দিয়ে ঘর কেটে কি একটা খেলা খেলছে অর্ধ উলঙ্গ শিশুর দল। কে জানে ওদের খেলার আইন কেমনতর! একটা বাচ্চা মেয়ে চোখ বুঁজে একটা একটা ক'রে ঘর এগুচ্ছে আর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করছে—‘আউট?’ তার সঙ্গীরা বলছে ‘নট!’ আউট-নট, আউট-নট ক'রে খেলা এগিয়ে চলেছে। স্নান হালি হাসলে ঋতব্রত। ওর মনে হ'ল ওই চক্ষুস্বতী মেয়েটির বাধ্যতামূলক অঙ্কপদক্ষেপের আর্ত-জিজ্ঞাসায় যেন গভীরতর কোন করুণ রাগিণীর মুহূর্ত আছে। পদস্থলন ওর অনিবার্য নিয়তি। দাগের বাইরে ওর পা পড়বেই, আর সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ হৈ-হৈ ক'রে উঠবে “আউট! আউট! আউট!”

ওপাশে এল/২২ ব্যারাকে একজন কাকে উদ্দেশ্য ক'রে যেন চোখা চোখা গাল পাড়ছে। অশ্রাব্যতম ভাষা তার। সেখানে জটলা পাকিয়েছে মেয়ে-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। অঙ্গুলি ভাষাটার প্রতিবাদ নেই কারও। বস্তিজীবন সম্বন্ধে ঋতব্রতের অভিজ্ঞতা নেই। উপাঙ্গাসলক জ্ঞানমাত্র। কিন্তু এরা তো বস্তিবাসী নয়। এদের মধ্যে আছে ভদ্র, শিক্ষিত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। ওরা বিড়ি পাকাতে পাকাতে গীতাপাঠ করে, অল্পানবদনে ল্যাটিন উদ্ধৃতি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। এদের পক্ষে অশিক্ষিত বস্তিবাসীর ক্লেদাক্ত রুচি তো স্বাভাবিক নয়। দুদিন আগেও ছিল এরা সমাজবদ্ধ জীব। পূজা-অর্চনা করতো, সত্যনারায়ণ, কথকতা, পাঁচালী গান শুনতো। ছেলের পড়াতে পাঠশালা। ক্ষেত-খামারে, কোটে-কাছারিতে নিজের নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতো। ঐশ্বর্য হয়তো ছিল না, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। স্বাচ্ছন্দ্যও হয়তো সব ঘরে ছিল না—ওপারেও হয়তো ছিল অভাব-অনটনের সংসার। তবু সংযম-শালীনতাবোধ ছিল। অন্তত পাকা-সড়কের উপর দাঁড়িয়ে মেয়েপুরুষে মিলে অঙ্গুলি গালাগাল উপভোগ করবার মতো রুচি ছিল না। কেন এমন হয়? মনে আছে এই নিয়ে তর্ক করেছিল একদিন তফাদারের সঙ্গে।

তফাদার বলেছিলেন, “কোনও ‘গেইনফুল অকুপেশনে’ ওদের রাজী করাতে পারবেন না মশাই।”

ঋতব্রত সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল। খুঁজে খুঁজে সে আবিষ্কার করেছিল তিনচার ঘর লোককে। নিজের গ্রামে তারা ঘরামির কাজ করতো। বেতের কাজ, বাঁশের

কাজ করতে জানে, জানে চাল ছাইতে। ওদের কিন্তু কিছুতেই রাজী করাতে পারে নি। রামশরণ অবস্থা ফুরনে খাটায় তার ঘরামিদের। কিন্তু তাদের ডেলি রোট দাঁড়ায় সওয়া তিন টাকার মতো। ঋতব্রত পাঁচ টাকা পর্যন্ত দর দিয়েছিল। হাজারিতে কাজ করাবে সে। রাজী হয় নি। সাড়ে পাঁচ? ছয়? সাড়ে ছয়? রোখ চেপে গিয়েছিল ঋতব্রতের। দৈনিক মজুরি মিটিয়ে দেয় যদি? শেষে ছ'টাকা বারো আনার দু'জন মাত্র রাজী হ'ল। বিজয়ীর হাসি হেসে ঋতব্রত ফিরেছিল অফিসে। সে হাসি কিন্তু ফুরিয়েছিল রাত পোহালেই। কেউ কাজে আসে নি! কোতুহল হয়েছিল ওর। কেমন যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছিল সে। বিশ্বাস হয় নি, নগদ টাকার লোভ সত্ত্বেও এই লোকগুলো কর্মবিমূখ হ'য়ে থাকবে। পরদিন সকালেই সে আবার গেল সেই দু'জনের খোঁজে। একজন বাসায় ছিল না। অপর জন বসে বসে গল্প করছিল। ওকে দেখে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে গেল। ঋতব্রত কিন্তু নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। ডেকে পাঠাল তাকে। লোকটা এসে বললে, “জর হয়েছে স্ত্রীর। আজ যেতে পারব না।”

নতশিরে ফিরে এসেছিল ঋতব্রত। ঘটনাটা অকপটে জানিয়েছিল তফাদারকে। শুনে হা হা ক'রে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, “আরে মশাই, ছ'টাকা বারো আনা কেন—দশটাকা ক'রে আগাম মজুরি মিটিয়ে দিলেও ওরা রাজী হবে না।” বিশ্বাস হয় নি ঋতব্রতের; কিন্তু প্রতিবাদও করে নি। কারণ যেটুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে পেয়েছে সেটাই যে অবিশ্বাস্য!

“বুঝছেন না, আপনি যত টাকাই দিন না—আপনি তো দেবেন তিন চার মাস। তারপর?”

“তারপর? তারপর কি?”

তারপর তো আর তাকে পি. এল. রাখব না আমি। রোজগার করবার ক্ষমতা আছে প্রমাণিত হ'য়ে গেলে স্থায়ী পোষ্য হবে কি ক'রে? ডোলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা কেউ অত সহজে খোয়াতে চায়? পাঁচ সাত বছরেই আমরা এদের ক'রে তুলেছি এক সৃষ্টিছাড়া জীব। পৃথিবীর ইতিহাসে জানি না এমন শ্রেণীর জীব কোনও যুগে কখনও ছিল কিনা। দে আর এ ক্লাস অফ পারপেচুয়াল প্রফেসনাল লিগালাইজড বেগারস্!”

কথাটা আজও বাজে ওর কানে। ওরা নাকি আইনসম্মত চিরস্থায়ী এক শ্রেণীর ভিক্ষাজীবী প্রাণী!

“তোমাকে একটা কথা বলছিলাম বাবা। শুনছ!”

, ঘুরে দাঁড়ালো ঋতব্রত। এতক্ষণে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছেছে সে। সেই প্রোচা

বিধবা ভক্তমহিলাটি। কমলার মা।

“বলুন।” বিরক্তভাবে তাকালো সে।

“বলছিলাম কি...ইয়ে...শুনলাম দরমার বেড়াটা আপনি নিজের খরচে ক’রে দিচ্ছেন। দেখুন, এ নিয়ে নানান কথা...মানে, তাছাড়া আপনিই বা কেন... অর্থাৎ—”

“প্রয়োজন হ’লে খুলে টান মেরে ফেলে দেবেন ওটা।”

সশব্দে কাঁপের দরজাটা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল সে। অসহ্য! এরা কি তাকে এক মুহূর্তও স্থির হ’তে দেবে না?

ঋতব্রত জানতেও পারল না, বাইরে দাঁড়িয়ে নতমুখী একটি মহিলার সমস্ত মুখ অপমানে, লজ্জায় লাল হ’য়ে উঠেছে!

মেজদা আবার তাগাদা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। জবাব দিতে হবে একটা। ছুটির দরখাস্ত আগেই করেছে। ক্যাজুয়াল লিভ সে পাবেই। টাকাটার কিন্তু কোনও কুলকিনারা করতে পারে নি। মেজদা অবশ্য এবারের চিঠিতে লিখেছেন হাজার খানেক টাকা অফিস থেকে ধার পেয়েছেন। বাকি এক হাজার টাকা তিনি ধার হিসেবে আশা করছেন ঋতব্রতের কাছে। প্রথম মাসের মাহিনা এখনও এসে পৌঁছয় নি। এ মাসেই ছাত্রজীবন সমাপ্ত ক’রে সবে চাকরিতে ঢুকেছে ঋতব্রত। শীঘ্রই শ’তিনেক টাকা সে মাহিনা পাবে। তাও যদি এ. জি. বি -র পে-স্লিপ এসে পৌঁছয়। ট্রেনিং পিরিয়ডে শ’ আড়াই টাকা জমেছে তার পোস্ট অফিসে। হাজার টাকা রাতারাতি সে কোথা থেকে যোগাড় করবে? ভরসার মধ্যে আছে একটা ইন্সিওরেন্স পলিসি। বছর দুই চলছে সেটা। শুনেছে, পলিসি বন্ধক দিয়ে কোম্পানি থেকে নাকি টাকা ধার নেওয়া যায়; কিন্তু ওর পলিসির এখন শৈশবাবস্থা। এ অবস্থায় কি ধার দেবে কোম্পানি? কি জানি! অভিজ্ঞ একটা লোকও নেই যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া চলে।

“স্মার, ঠিকাদার সাহেব একবার দেখা করতে চায়।”

“কে রামশরণ? আসতে বল।”

“কি খবর সিংজী?”

“হামার ইনডেন্টটা স্মার? আজ সাতদিন হইয়ে গেল সতীশবাবু ওটা পাস করাচ্ছেন না। হমার লরি আজ বসিয়ে গেল।”

“সতীশ?”

ও পাশের টেবিল থেকে সব-ডিভিশনাল ক্লার্ক সতীশ উঠে আসে।

“ইনডেন্টটা তৈরি হ’রে আছে স্মার—উনিই হ্যাণ্ড-রিসিটে সই করছেন না।”

“হ্যাণ্ড-রিসিট তো কালিবাবুকে দিয়ে সই করিয়ে লিতে পারেন সতীশবাবু।”

“কালিবাবু কেন রাম, শ্রাম, যদ্দু, মধু যে কোনও বাবু সই করলেই চলতে পারে ; কিন্তু যাকে সই করতে পাঠাবেন তার নামে একটা অথরাইজেশন লেটার থাকবে তো ?”—জবাব দেয় সতীশ।

“ব্যাপারটা কি ?” প্রশ্ন করে ঋতব্রত।

“ব্যাপার কিছুই নয়। আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি। কনট্রাক্ট অফিসারী আমরা ঠুকে চব্বিশ গেজি টিন সরবরাহ করব এখানে, অর্থাৎ সাইটে। বিল থেকে প্রতি হন্দরে সাতাশ টাকা ক’রে রিকভারি হবে। এ ভাবেই চলছিল। একবার ওয়াগন আসতে দেরি হওয়ায় উনি ঘোষাল সাহেবের আমলে দরখাস্ত করেন যেন মালটা ঠুকে কলকাতাতেই ডেলিভারি দেওয়া হয়। উনি নিজ ব্যয়ে ওটা সাইটে আনেন নিজের লরিতে।”

ঋতব্রত জিজ্ঞাসা করলে সিংজীকে, “তাই নাকি ? এতে আপনার লাভ ?”

“হ্যাঁ স্মার ! লাভ কুছু নাই আছে। लेकिन ওয়াগনে মাল আসতে দু’তিন মাস কোরে দেরি হোবে আর হমার মিস্ত্রি বসে থাকবে ই কেমন কোরে চলে ? ফিন কাজ যেতোদিন দেরি হোবে, হমার এসট্যাবলিস্মেন্ট ভি বাড়তে চলবে।”

এই জগ্লেই এ পরিশ্রমটুকু স্বীকার ক’রে নিয়েছে রামশরণ। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চায় সে। ঠিকাদার রিকুইজিশন দেয়, ওভারসিয়ার রেকমেণ্ড করে তখন ঠিকাদারের কাছে হ্যাণ্ড-রিসিটে সই করিয়ে এস. ডি. ও. একটা রিকুইজিশন দেয় কলকাতায় স্টোরের উপর। সেখান থেকে সিংজী লরিতে মাল আসে। লিস্ট মিলিয়ে সেটা ঠিকাদারের স্টোরে ওঠে। টিনের সংখ্যা, সাইজ, রোড-পারমিট প্রভৃতি মিলিয়ে দেখে নেয় স্টোরের ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ক-সরকার।

হ্যাণ্ড-রিসিটে সই ক’রে ইনডেন্টটা নিলে রামশরণ। বললে, “রোড পারমিট দিলেন না সতীশবাবু ?”

ঘরের ও প্রাস্ত থেকে জবাব দিলে সতীশ, “ওর সঙ্গেই পিন দিয়ে গাঁথা আছে।” আবার ব্যাগ খুলে কাগজগুলি দেখে মিলিয়ে নিয়ে উঠল রামশরণ।

“আচ্ছা রাম রাম স্মার।”

“আপনি কি এখনই কলকাতা যাচ্ছেন ?”

“হ্যাঁ, কেন ?”

“তা’হলে বসুন। একটা চিঠি দিয়ে দিই। খুব জরুরী। এটা পৌছে দিতে হবে।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ জরুরী।”

প্যাড বার ক'রে চিঠি লিখতে বসল ঋতব্রত। একখানা নয়, দুখানা চিঠি লিখল সে। মেজদাকে লিখল শনিবার সন্ধ্যাবেলা পৌছাবে। টাকার যোগাড় এখনও হয় নি। দ্বিতীয় চিঠিখানা সে লিখল এক বন্ধুর কাছে। যে বন্ধু মারফত জীবনবীমাটা করেছিল। তাকে খুলে লিখল হাজার খানেক টাকার তার বিশেষ প্রয়োজন। পলিসিটা বাঁধা রেখে টাকাটা ধার করা চলে কিনা এটাই তার জিজ্ঞাস্তা। খামদুটো বন্ধ ক'রে উপরে ঠিকানা লিখে রামশরণের হাতে দিল। বললে, “আজই যেন পৌছয় এ দুটি।”

“বহুত খুব” বলে সসজ্জমে চিঠি দুটো ব্যাগে পুরে রামশরণ রওনা দিল। তারপর জীপটা দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই খামদুটি বার ক'রে খুলে ফেললে রামশরণ। রামশরণ যে চিঠিদুটি খুলে পড়েছিল এ কথা আমি, এ কাহিনীর লেখক আমি তা কি ক'রে জানলাম এ প্রশ্নটা জাগা স্বাভাবিক। বলছি। মেজদার চিঠিখানা যে সে খুলেছিল তার প্রমাণ যথাস্থানে দেবো। বন্ধুর চিঠিখানা যে খুলে পড়েছিল তার প্রমাণ আমি নিজে।

অফিসে বসে কাজ করছি। বেয়ারা এসে কার্ড দিল—“আর. এস. সিং. কন্স্ট্রাক্টর অ্যান্ড জেনারেল অর্ডার সাম্রায়ার্স।” বেহারার পিছন পিছন যে ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন তিনি আমার পূর্ব পরিচিত নন। হাতের ইঙ্গিতে বসতে বলে জিজ্ঞাস্তা-নেত্রে তাকালাম।

“হামি রিংবাবুর কাছ থেকে আসছে।”

“রিংবাবু? তিনি কে?”

“রিংবাবু!” ব্যাগ থেকে একখানি চিঠি বার ক'রে দিলেন মাড়োয়ারী অথবা সিদ্ধি ভদ্রলোক। খামটা উন্টে পাল্টে দেখলাম। হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত। কে এই রিংবাবু অথবা হুদবাবু? খামখানা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল ঋতব্রতের চিঠিখানা। ভাবলাম, খামটা বন্ধ ক'রে ঠিকানাটা বোধ হয় ডিক্টেট করেছিল কাউকে, হয়তো ক্লাঁককেই। অপর সম্ভাবনাটা মনে জাগে নি। সেটা বুঝি আজ, যখন পরে শুনলাম ঠিকানাটা ঋতব্রত স্বহস্তেই লিখেছিল। আমি তখন চিঠিটার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেছি। পড়ে বললাম, “আচ্ছা এর জবাব ডাকে দেবো আমি। আর কিছু কথা আছে?”

একটু ইতস্তত ক'রে ভদ্রলোক বললেন, “কি বলব রিংবাবুকে? রূপেয়ার ইন্সজাম হয়ে যাবে?”

বুঝলাম ঋতব্রত চিঠির মর্ম পত্রবাহককে জানিয়েছে। এবং জেনে আসতেও বলেছে। আর্থিং ব্যাপারটা জরুরী। ভদ্রলোককে বসিয়ে আমি ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের ঘরে

খবরটা জানতে গেলাম। ঘুরে এসে জবাবটা তখনই লিখে দিলাম স্বতন্ত্রতাকে।
ব্রাহ্ম-ম্যানেজারের ঘরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম গত দুটো প্রিমিয়াম না পড়ায় তার
পলিসিটা ল্যাপস্ হ'য়ে পড়ে আছে। কলেজ-হোস্টেল থেকে আনডেলিভার্ড হ'য়ে
ফিরে এসেছে প্রিমিয়াম নোটিশ। কোম্পানি ওকে দেশের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে
তারপর। সেটা ফিরে আসে নি বটে, কিন্তু জবাবও আসে নি। এক্ষেত্রে পলিসি
নতুন ক'রে চালু না হওয়া পর্যন্ত ঋণের প্রস্তুতি ওঠে না। এই কথা কটা জানিয়ে
খামটা ভদ্রলোকের হাতে দিলাম।

ভদ্রলোক শুধালেন, “রূপেয়ার কি হোবে স্তার?”

“এখন হবে না।”

“ছচার রোজ বাদে ভি হোতে পারে না?”

ভাবলাম, টাকাটা ঐরই গর্তে যাবে বোধহয়, না হ'লে ঐর এত গরজ কেন?

বললাম, “আমার যা লেখার চিঠিতেই লিখেছি।”

“বহুত খুব” নমস্কার ক'রে নিষ্ক্রান্ত হলেন ভদ্রলোক।

মেজদাকে লেখা চিঠিখানাও যে রামশরণ খুলেছিল তার সাক্ষী ইয়াসিন।

“তুমি সত্যি কথা বলছ?”

“হ্যাঁ স্তর, মিথ্যা বলে আমার লাভ?”

“লাভ আছে বই কি! রামশরণ তোমাকে অপমান ক'রে, জুতো মেরে তাড়িয়ে
দিয়েছে বলছ—রামশরণের নামে দুটো মিথ্যা কথা বললে আমি যদি তার উপর
বেশী রাগ করি, তাহ'লেই তোমার লাভ।”

“আমি যদি মুসলমানের বাচ্চা হই, তবে যা সত্যি বলছি জুজুর! আপনি আপনার
দাদাকে, আর সেই বীমা কোম্পানির অফিসে দু'খানা চিঠি খামবন্ধ ক'রে দিলেন;
গাড়ি ক্যাম্প এলাকা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই হারামি সেই দুটো খামই খুলে
পড়ল। কলকাতায় পৌঁছে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাকে পরলা
দিল। আমি খাম কিনে আনলাম। তার উপরে ঠিকানা লিখে আবার বন্ধ ক'রে
দিলে স্তর!”

“আচ্ছা তুমি যেতে পারো।”

অবশ্য ইয়াসিনের সঙ্গে স্বতন্ত্রতের এ কথোপকথন হয়েছিল অনেক পরে। সে কথা
যথাসময়ে বলব।

স্মৃতিচিহ্ন,

কলকাতা থেকে আমি আজই ফিরলাম। লীলার বিষয়ে নির্বিশেষে সম্পন্ন হ'য়ে গেছে।

তার বিয়ের খবর দিয়ে এবং আমার চারদিনের ছুটিতে কলকাতা যাবার খবর দিয়ে ইতিপূর্বে অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ তোমাকে যে চিঠি দিই তা নিশ্চয়ই তুমি পেয়েছ এতদিনে। আশা করছি, আর শুধু আশা করছি কেন নিশ্চিত জানি আমার চিঠি পাওয়ার আগেই তুমি রওনা হ'য়ে গিয়েছিলে। কিন্তু তুমি কলকাতা ত্যাগ করেছিলে ২৭শে। দুদিনেও কেন আমার চিঠিখানা পৌঁছলো না, তা বুঝলাম না। চিঠি আমি নিজে হাতে ডাকবাঞ্চে দিয়েছি এবং তারিখটাও মনে আছে। কারণ ডাকবাঞ্চে চিঠি ফেলে দিয়ে ফিরছি, দেখলাম মাইনর স্কুলের প্রাঙ্গণে একটা জনতা। ভাবলাম 'আমাদের দাবি মানতে হবে' জাতীয় মিটিং বুঝি। অগ্রমনস্ক হ'য়ে চলে আসছিলাম। বক্তার কয়েকটি কথা কানে গেল, 'তিনি স্মদ্র চীন থেকা, জাপান থেকাও নানান সম্মান পাসিলেন।' কে এই ভাগ্যবান পুরুষ? তবে কি কোন শোকসভা? একটু আগিয়ে যেতেই দেখলাম টেবিলের উপর একখানি ফটো। ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে মুখখানি। তবু সাদা ফুলের মধ্য থেকেও দেখা যাচ্ছে শুভকেশ, সিত-শ্মশ্রু! প্রণাম করলাম কবিকে। এই কর্মহীন লোকগুলি এটুকু আয়োজন না করলে আমার মতো কর্মবীরের খেয়ালই ছিল না সেদিন পঁচিশে বৈশাখ! প্রতি বৎসর, গত বৎসরও এ দিনটা কি উদ্‌যাপন মধ্যাহ্নে কেটেছে। আর আজ?

যাই হোক স্মরণ্য, পঁচিশে বৈশাখ চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই—অথচ সাতাশের আগে সেটা নিশ্চয়ই কলকাতা পৌঁছায় নি। কারণ, পলে আমি কলকাতা যাচ্ছি জেনেও তুমি বান্ধবীর বিয়েতে মধুপুর চলে যেতে না। এর আগের চিঠিতে লিখেছিলাম, বাড়িতে মধুপুর যাচ্ছি বলে আমার এখানে চলে এস। তোমাদের বাড়ি গিয়ে যখন শুনলাম মাসীমার কাছে, যে তুমি বান্ধবীর বিয়েতে মধুপুর চলে গেছ, তখন ছায়া ক'রে উঠল মনের মধ্যে। ভাবলাম বৃন্তচ্যুত ক্যাম্পে সত্যিই যাও নি তো? অসম্ভব মনে হ'লেও তোমাদের মতো ছুঁসাহসিকাদের পক্ষে সবই স্বাভাবিক! তাই যে ক'দিন কলকাতায় ছিলাম ঘুরে ফিরে ঐ কথাই মনে হ'ত। ভাবতাম, না, তাহ'লে তো ক্যাম্প থেকে পরদিনই ফিরে যেতে তুমি।

অভিযাত্রিক অফিসে গিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল ঘোষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শুনলাম কয়েকদিন ধরে তিনি আসছেন না। তাঁরও কোন বন্ধু বিয়ে করছিল নাকি ঐ সময়ে জসিডি অথবা দেওঘরে? কুসুমের গল্পটা এ সংখ্যায় প্রকাশ করছ দেখলাম। আমি গ্যালি প্রফ সংশোধন ক'রে দিয়ে এসেছি। বাকি গল্পটা এই সঙ্গে পাঠালাম।

হ্যাঁ, কোথায় যেন শেষ করেছিলাম ? ও এবারও তো সেই “বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমুখজা” অবস্থায় ।

দিন কেটে যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে । দাক্ষার বিভীষিকা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক
জীবনযাত্রায় ফিরে আসে গ্রামবাসী । তবু দু’পাড়ায় সেই আগেকার দিনগুলো
আর সত্যিই ফিরে এল না ! অত সহজে কি ভোলা যায় ? যায় হয়তো, কিন্তু
যাতে ভোলা না যায়—একদল লোক সেই প্রচেষ্টাই ক’রে বেড়াতে লাগলো ।
কিন্তু ওদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে বসি নি আমি । আমার কাহিনী
একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । সে কথাই বলি । পণ্ডিতমশাই অল্পদিন
পরেই শয্যা নিলেন । মাস দুই তিন রোগ ভোগের পর সংসারের ভাবনা ভাবার
হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন তিনি । পণ্ডিতের বিধবা দুটি অনুচা কন্ঠা নিয়ে
পড়লেন অগাধ জলে । পণ্ডিতের কিছু ব্রহ্মোত্তর ছিল পিতৃপুরুষের কাছ থেকে
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া । তারই আদায়ে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত ।
সমাজে গুঁরা ছিলেন পতিত । দুটি অনুচা মেয়েকে নিয়ে বিপদগ্রস্ত হলেন বিধবা ।
পণ্ডিতের মৃত্যুসময়ে বিধবার ভ্রাতৃপুত্র তারাপদ এসেছিল দেখাশুনা করতে । এ
অবস্থায় এ পরিবার ছেড়ে তার চলে যাওয়া সম্ভব হ’ল না অচিরে । বিধবার
ভাই লিখলেন সপরিবারে তাঁর সংসারে চলে যেতে, কিন্তু কুসুমের মা তাতে
রাজী হলেন না । প্রথমত তা হ’লে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির আদায়পত্র যাবে সম্পূর্ণ
বন্ধ হ’য়ে, আর দ্বিতীয়ত ভ্রাতৃবধূকে তিনি চিনেছিলেন ভালোরকমই । খরসগনা
সেই রমণীটির সম্মুখে কলঙ্কিনী অরক্ষণীয়া অষ্টাদশী কন্ঠা নিয়ে উঠতে কিছুতেই
তিনি রাজী হলেন না । অগত্যা তারাপদই থেকে গেল এ সংসারে । ভ্রাতৃবধূর
তাতে আপত্তি নেই । আদায়পত্র ক’রে যদি টিকে থাকতে পারে, থাকুক না ।
গেল কেটে আরও বছর তিনেক । কুসুম একেবারে বাড়ি থেকে বার হয় না ।
সাত আট বছর পরেও কোনসূত্রে সেই একদিনের কলঙ্কের কথা যদি কোথাও
উঠে পড়ে ! বাড়ির পিছনের ছোট ডোবাটার স্নান করতে যাওয়া ছাড়া বাড়ির
চৌকাঠ পার হ’ত না সে । বাইরের যা কিছু কাজ করতেন বিধবা নিজে অথবা
তারাপদ । কামিনী শুধু ধলেশ্বরী থেকে জল নিয়ে আসতে যেত । কুসুমের গোটা
ইতিহাসটা একমাত্র কুসুমই জানে । বাড়ি থেকে ডাকাতেরা নিয়ে যাবার পর
তাকে উদ্ধার করবার পূর্বে পর্যন্ত কি ঘটেছিল কিছুই সে বলে নি কাউকে । ফণী
দারোগার কাছেও সে বার বার মাথা নেড়ে অস্বীকার করেছিল । না, সে কাউকে
চিনতে পারে নি । তাকে অপহরণের সময় সে নাকি চীৎকার ক’রে ওঠে । তখন

ডাকাতদলের মধ্যে একজন তার মাথায় আঘাত করে এবং ফলে সে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। জ্ঞান হ'লে দেখে পুলিশে তাকে ঘিরে আছে। তার কথা বিশ্বাস করলে মেনে নিতে হয় পুরো আঠারো ঘণ্টা সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। না, শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন সে দেখে নি। ফণী দারোগা ডাক্তার দিয়ে তাকে পরীক্ষা করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দুটি হাত ধরে পণ্ডিত বলেছিলেন, “যা হ'য়ে গেছে তারপর আর টানা হেঁচড়া করবেন না দারোগাবাবু। মা তো বলছেন তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।”

যারা নির্ধাতিত তারা কেস চালাতে চায় না। বড় দারোগা কাশেম আলিও কেসটা চেপে যেতে পারলেই বাঁচেন। অগত্যা নিবৃত্ত হ'তে হ'ল ফণী দারোগাকেও। অথচ অনেকেরই বিশ্বাস, পুরো আঠারো ঘণ্টা সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল না। তবে সে স্বীকার করলো না কেন? কেন করবে? নিজের কলঙ্কের কাহিনী নিজ-মুখে স্বীকার করা কি এতই সোজা? কামিনীও মাঝে মাঝে আড়ালে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছে—কিন্তু লজ্জায় পারে নি। ছি ছি, কি ভাববে মেজদি! কুসুম নিজে থেকেই বরং কখনও বলেছে কামিনীকে, “অজ্ঞান যদি না হ'য়ে পড়তাম, তাহ'লে নিশ্চয়ই চিনতে পারতাম ওদের! গাঁয়ের কেন—ভিনগাঁয়ের অনেক ছেলেকেই তো আমি চিনি। ওরা প্রায় সবাই আমার ছেলেবেলার বন্ধু।” বন্ধু! কথটা উচ্চারণ ক'রে হাসে সে। কামিনী হঠাৎ ইচ্ছা ক'রেই অল্প কথা পাড়ে, “আমার টেবিলকুথটায় স্নতো তুলে দিবি মেজদি?”

“দে।” হাত বাড়ায় কুসুম।

আবার একটা বজ্রপাত হ'ল এ সংসারে!

একদিন সন্ধ্যায় ধলেশ্বরীতে জল আনতে গিয়ে কামিনী আর ফিরল না। পরদিন তার লাশ পাওয়া গেল ইসলামপুরের ঘাটে। কামিনী মাতার জানত না। আগেই বলেছি, পণ্ডিতমশায়ের সংসারে এই মেয়েটিকে দৃঢ়-শাসনে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাই নদীমাতৃক দেশ ধলেশ্বরী-বিধৌত লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেই ছিল বোধহয় একমাত্র নারী যে মাতার জানত না। এটাকে সবাই আকস্মিক দুর্ঘটনা বলেই মেনে নিল। কিন্তু সেটা যে দুর্ঘটনা নয়, কুসুম তা জানতে পেরেছিল অনেকদিন পরে। সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

বাড়িতে আবার একটা শোকের ছায়া পড়ে। কি জানি নিভুতে বিধবা জননী যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তখন ‘মেয়েটা মরে বেঁচেছে’ ভাবখানা আসে কিনা! কামিনীর মৃত্যুর মাস দুই পরে একদিন তিনি কুসুমকে বললেন, “বৃন্দাবনে যাবি কুসুমি? চল, এখানকার সব বেচে দিয়ে জগন্নাথকে নিয়ে আমরা বৃন্দাবনে চলে যাই।

সেখানেই পড়ে থাকবো ছুটি প্রাণী। রাধারমণের দেশে কি ভিক্ষা মিলবে না?”
 গৃহদেবতা গোবিন্দের নতুন নামকরণ করেছিলেন পণ্ডিত—জগন্নাথ! অন্ধহানি
 হবার পরও পণ্ডিত গৃহদেবতার নিতাপূজা অব্যাহত রেখেছিলেন। গ্রামের অস্ত্রান্ত
 পণ্ডিতেরা এসে বলেছিলেন, “এ কিসের পূজা ভূমি করছ পণ্ডিত! তোমার গোবিন্দের
 হাত ভেঙে গেছে। অন্ধহানি হলে পূজা করা যায় না ঠাকুরের! ভূমি নবদ্বীপ থেকে
 বিধান আনাও।”

পণ্ডিত হেসেছিলেন ওদের মূর্খামিতে।

“পাগল? এ আমার ঠাকুরের লীলা! লুকোচুরি খেলাই স্বভাব যে ঠাণ্ড। গোবিন্দ
 আমার হাত গুটিয়ে জগন্নাথ সেজেছেন।”

তার নিতাপূজা অব্যাহত ছিল। উপরন্তু ভোগের সময় নিম্নলিখিত নেত্রে তিনি
 ভোগ খাট্টিয়ে দিতেন ঠাকুরকে। গোবিন্দ যে হাত গুটিয়ে জগন্নাথ হয়েছেন!
 ফলে পরিবারবর্গের কাছে সেদিন থেকে ৬গোবিন্দের নতুন নামকরণ হয়েছিল—
 ‘জগন্নাথ’। পরিবারের বাইরেও নতুন নামকরণ হয়েছিল পণ্ডিতের—‘পাগল’!

মায়ের প্রস্তাবে রাজী হ’য়ে গেল কুসুম। তারও আর ভালো লাগছিল না লক্ষ্মী-
 পুরের বিষাক্ত বাতাস! ঠিক হ’ল মাসখানেকের মধ্যেই সমস্ত বিক্রয় ক’রে,
 টাকটি পোস্ট-অফিসে রেখে, সামান্য পাথের সন্ধ্যা ক’রে ওরা বেরিয়ে পড়বে
 বৃন্দাবনের তীর্থপথে। হয়তো হ’তও তাই। কিন্তু আবার একটা ঘটনায় ছেদ
 পড়ল এ ব্যবস্থায়।

একদিন সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনের পুকুরে স্নান ক’রে ভিজে কাপড়ে ফিরছে কুসুম—
 কাঞ্চন গাছের আড়াল থেকে কে যেন এসে পথরোধ ক’রে দাঁড়াল। অন্ধুটে
 কুসুম বললে, “বিশুদা!”

“ই্যা আমি। চিনতে পেরেছ দেখছি।”

দীর্ঘ চার বছর পরে ওদের সাক্ষাৎ।

“তুমি কোথা থেকে এলে বিশুদা? কবে এসেছ গ্রামে?”

“গ্রামে আমি এসেছি আজই। রাত ভোর হবার আগেই আমি চলে যাব।
 আমার সময় অল্প। শোন, আমি ফেরারী আসামী, এ অঞ্চলেই গোপনে অর্গানাইজ
 করছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কাউকে বলবে না। বুঝেছ?”

কুসুম ঘাড় নেড়ে জানায় সে বুঝেছে।

“আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে। ই্যা, হরিহর
 গাঙ্গুলীমশাই। তিনি আমাদের পিছনে না থাকলে এ গ্রামে কাজ করা অসম্ভব
 হ’ত আমাদের পক্ষে। শোন কুসুম, তোমাকে এসব কথা বলছি বটে কিন্তু এগুলি

অত্যন্ত গোপনীয় খবর। কখনও কাউকে কোনও কথা বলবে না।”

প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও অল্পেই স্থৈর্য ফিরে পেয়েছে কুসুম। ছেলেবেলা থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে কুসুম হ'য়ে উঠেছিল কুলীশকঠোর। সে হেসে বললে, “তবে কথা বলছ কেন আমাকে? জান না, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না?”

বিশ্বনাথের কথা শুনে ওর মুখের হাসি কিন্তু মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

“তোমাকে তো সে জাতের মেয়ে বলে ভাবি না আমি। জানো কুসুম, আমাদের দলে এমন মেয়েও আছে যারা—যাক, তোমাকে যা বলতে চাই বলে নিই এই বেলা। আমার সময় অল্প—”

বাধা দিয়ে কুসুম বলেছিল, “আমাকে তোমাদের দলে নিতে পার না বিস্মদা?”

“না, এখন নয়। মাসীমার কথাটাও ভেবে দেখো!”

“তবে আমি কি করব? বৃন্দাবনে চলে যাব?”

“না, তাহ'লে তুমি আমাদের দলে আসবে কি ক'রে? তুমি এখানেই প্রতীক্ষা কর—”

“কিন্তু—” ইতস্তত করে কুসুম।

“হ্যাঁ, আমি বুঝি। তুমি বরং এক কাজ কর। আমাদের দলের কোনও ছেলেকে বিয়ে ক'রে আপাতত গ্রামেই থাক।”

হাসলে কুসুম।

“তুমি কি আমার সব কথা এখনও শোন নি বিস্মদা?”

“হ্যাঁ শুনেছি।”

“তবে যে ও কথা বলছ? সব কথা জেনে আমাকে কে বিয়ে করবে?”

“আমি যদি পাত্র এনে দিই? তুমি রাজী আছ?”

আবার হেসে ফেললে কুসুম, “পাত্রটি কি রকম না জেনে বলি কি ক'রে?”

“তুমি...তুমি আমাকে বিয়ে করবে কুসুম?”

বিদ্রোহপুষ্টের মতো এক পা, স'রে গেল কুসুম, কথাটা শুনে।

“না।”

“না? ...তবে অবশ্য অগ্র পাত্র দেখতে হবে। আমি ভেবেছিলাম...হয়তো আমারই ভুল হয়েছে...তুমি আমাকে মাপ কর কুসুম।”

“মাপ চাইবার কি আছে এতে? কিন্তু তুমি কি ক'রে ভাবতে পারলে বিস্মদা, আমার সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিয়ে তোমার নির্মল জীবন কালিমালিপ্ত করতে রাজী হব আমি?”

“ও শুধু এই জগ্গেই—”

“নিশ্চয় !”

“অন্য কিছু নয় ?”

“অন্য আবার কি ?”

“ও বুঝেছি ! শোন, ভুল বুঝেছ তুমি। তোমার ও ঘটনাটাকে কলঙ্ক ব’লে মনে করি নি আমি। সে রকম গুরুত্ব কাছে শিক্ষা পাই নি তো। তুমিই বা কি ক’রে ওটাকে কলঙ্ক বলে মেনে নিয়েছ তাই ভাবি।”

একটু হেসে আবার বলে, “হবেই তো ! বাপের পাঠশালায় গিয়ে তো বস নি কোনদিন ! তাঁর শিক্ষা আর পেলে কোথায় ?”

“আমার এতবড় কলঙ্কটাকে তুমি হেসে উড়িয়ে দিতে চাও ? তুমি জানো, সে আঠারো বছর আমি কোথায় ছিলাম ? কি ভাবে ছিলাম ? সত্যিই আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম কিনা ? সম্ভানে আমার উপর—?”

“না, তা জানি না। তবে এটা জানি, যে তা ঘটে থাকলেও তুমি সত্য প্রস্তুতি কুসুমেরই মতোই অপাপবিন্ধ।”

এত মধুর কথা জীবনে শোনে নি কুসুম। আবেশে তার চোখ মুদে এল। স্বপ্নাবেশে সে শুনলে বিশ্বনাথের কথা—“জান না আমার গুরুদেব বলতেন হাত ভাঙলে ঠাকুর অশুচি হয় না। হাত যে ভেঙেছিল সেটা তো প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু তাতে তো তাঁর নিষ্ঠা একতিলও কমে নি। সমাজের চোখে তোমার বাবার ঠাকুর বিকলাঙ্গ বর্জনীয়, তুমি কলঙ্কিনী। সমাজের চোখে আমিও পতিত—জেলফেরত আসামী ! জেলে বসে পাঁচ জাতের সঙ্গে লপসি খেতে হয়েছে আমায়। তুমি যদি কীটদষ্ট কুসুম হও, তবে আমিও নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ ! থাক কলঙ্ক, তুমিই আমার কলঙ্কিনী রাই !”

মধু ! মধু ! এত মধুর কথা সহ্য করতে পারবে না কুসুম। তার সত্যসত্য সিন্ধু মাথাটা আশ্রয় খোঁজে কুস্তিগীর বিশ্বনাথের কবাক্ষ বক্ষে।

এর পরে কুসুমের বিবাহের কথা বলতে হয়, কিন্তু সে বিষয়ের খবর কে রাখে ? পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের বিয়েতে বাজল না সানাই। বাজল না শাঁখ। হলুধ্বনি দিল না কেউ। ভূরিভোজে আপ্যায়িত হ’ল না গ্রামের ইতরভদ্র। হরিহর গাঙ্গুলীর উপস্থিতিতে গোপন কক্ষে রাজির তৃতীয় যামে মন্তোচ্চারণ করলেন পুরোহিত ;—মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা উচ্চারণ ক’রে গেল কুসুম আর বিশ্বনাথ। বিধবা জননী দাঁড়িয়েছিলেন দ্বারের পাশে—তারাপদ পুরোহিতের নির্দেশমতো ফাইকরমাস বোগান দেয়, আর বাইরের দ্বারে দাঁড়িয়ে ঘড়ি হাতে প্রতীক্ষা করছিল একজন

ছেলে। বিশ্বনাথের দলের লোক। বিবাহ অস্ত্রে সে বরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে রাত ভোর হবার আগেই।

পূর্ব আকাশ ফর্সা হ'য়ে আসে। তারাপদ কয়েক গ্রাস শরবত নিয়ে এল। তাই পান ক'রে পথে বের হ'তে গিয়ে বিশ্বনাথ দেখল রাস্তার লোক চলাচল শুরু হ'য়ে গেছে। সঙ্গী একাই চলে গেল। বিশ্বনাথকে সমস্ত দিন অপেক্ষা ক'রে যেতে হ'ল। লুকিয়ে থাকতে হ'ল বিশ্বনাথকে গোয়ালে। পরদিন সে বেরিয়ে পড়ল রাস্তার অন্ধকারে। কালরাত্রি!

এরপরে কুসুমের বিবাহিত জীবন। যতদূর আন্দাজ করছি রঙ চড়িয়ে গল্প করবার অবকাশ সেখানে অল্প। কচিং কখনও আসত বিশ্বনাথ রাতের অন্ধকারে—আবার বেরিয়ে পড়ত রাত পোহাবার আগেই। প্রতিবেশীরা কোন সূত্রে খবরটা পেল জানি না—কিন্তু বোঝা গেল আঁধার রাতের বরের স্বরূপ জেনে ফেলেছে অনেকেই। ফলে নবদম্পতির বিচ্ছেদগুলি দীর্ঘতর হ'তে লাগল শুধু।

চিঠিটা এমনিতেই বড় হ'য়ে গেছে। সংক্ষেপে শেষ করছি তাই কুসুমের ইতিকথা। কুসুমের বিয়ের বছর চার পাঁচ পরে ওর মা মারা যান। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় ধরা পড়ে বিশ্বনাথ। বছর তিনেক সে-ছিল এবার জেলে। তারাপদই কুসুমকে দেখাশুনা করত। পয়তাল্লিশ সালের মাঝামাঝি ওরা দেশের বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে মনস্থ করলে। অনেকেই তখন ক্রমে ক্রমে চলে আসছে বাংলা-দেশের পশ্চিম প্রান্তে—অনিবার্য কারণে। জিনিসপত্র, আসবাব, গরু, একে একে বিক্রি ক'রে দিল তারাপদ। বিশ্বনাথ তখন হিজলির জেলে। জমি ও বাড়ির জগ্গেও খন্ডের খুন্ডে বেড়ায় তারাপদ। এই সময়ে পুরানো বাস ঘাঁটতে গিয়ে কামিনীর একটা লক্ষ্মীর কোটো খোলে কুসুম। কোটোটোর চাবি ছিল না! মাঝে মাঝে আনি দোয়ানি ফেলতো ঐ কোটায়। দুই বোনে আন্দাজ করত কত জমল। কামিনীর মৃত্যুর পর এটা খোলে নি কুসুম। বিশ্বনাথের জেল হবার পর—যুদ্ধের বাজারে, দুর্ভিক্ষের বাজারে যখনই খুলতে গিয়েছে—কামিনীর স্মৃতি এসে বাধা দিয়েছে তাকে। আজ বাড়িঘর ছেড়ে যাবার আগে কোটোটা ফেঙে ফেলল সে। একরাশ আনি দোয়ানির মাঝ থেকে বের হ'ল একটুকরা জীর্ণ চিঠি—

“মেজদি! তুই কবে এই চিঠি পড়বি জানি না। ততদিনে আমার শোকটা সামলে যাবে—আমার অপঘাত মৃত্যুর কারণটাও সহিতে পারবি তুই। মাকে কিছু বলিস না লক্ষ্মীটি! কথাটা না বলে যেতে পারছি না। যে তোর সর্বনাশ করেছে, সেই আমার এই পরিণামের জন্ম দায়ী। যে কারণে মুখ ফুটে তুই স্বীকার করতে পারিস নি, সেই কারণেই আমিও কিছু বলতে পারলাম না তোকে মুখ ফুটে।

তার চিঠিগুলো সব পুড়িয়ে দিয়ে গেলাম—নইলে দেখতিলু অঙ্গীল প্রস্তাবটার বিনিময়ে কী পরিমাণ লোভ আর ভয় সে দেখিয়েছে প্রতিনিয়ত। সমাজে একঘরে পতিত পরিবারের অরক্ষণীয় একটি মেয়ের অনেক রকম পরিণামই হ’তে পারত। তবে আবদুল গণির অক্শায়িনী হওয়ার চেয়ে ধলেশ্বরীকেই বরণ ক’রে নিলাম। যতদিন পরেই পাস্ এ চিঠি, আমার জন্তে দুফোঁটা চোখের জল ফেলিস্।

—ইতি হতভাগিনী তোর কুম্।”

কুম্ শেষ অহুরোধ কুম্ রাখতে পারে নি। চোখ দিয়ে তার একফোঁটা জল আসে নি। জ্বালা ক’রে জলে উঠেছিল তার চোখ দুটো। কতকগুলো বিস্মৃতপ্রায় দৃশ্য মনে পড়েছিল তার—আর মনে পড়েছিল সদাহাস্তময়ী তার স্নেহের-বোনটিকে—কামিনী, তার আদরের কুম্!

তারাপদকে চিঠিখানা কুম্ দেখায় নি। দেখিয়েছিল বিশ্বনাথকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর সে যখন জেল থেকে ছাড়া পেল। বিশ্বনাথ চিঠি পড়ে একটা কথাও বলে নি। চোয়ালের হাড়দুটো শুধু কঠিন হ’য়ে উঠেছিল তার।

দলে দলে গ্রামবাসী তখন বেরিয়ে পড়ার জন্তে উদগ্রীব। সছোজাত শিশুরাষ্ট্রের সন্তান তখন উদ্ভাস্তের মতো ছোট্টাছুটি করছে। এপার ওপার! বিশ্বনাথের ক্লাবের সত্তমুক্ত কয়েকটি সভ্য আবার ধরা পড়ল জননিরাপত্তা আইনে। কুম্ আর দেরি করতে রাজী নয়। বললে, “ওগো চল আজই বেরিয়ে পড়ি। ফিরে এসে পরে সম্ভব হ’লে জমি বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে। এখানকার দেনা-পাওনা তো চুকলো।”

বিশ্বনাথ শুধু বললে, “দেনাপাওনা সব এখনও চোকে নি কুম্। একটা বড় কাজ এখনও বাকি আছে! তুমি আর তারাপদ আজ রাতেই রওনা হ’য়ে যাও। যেমন ক’রে পার কলকাতায় পৌঁছে এই ঠিকানায় উঠো। আমি কয়েকদিন পরে গিয়ে মিলব তোমাদের সঙ্গে। আমার হাতের কাজটা সেরেই যাব।”

“কি আবার তোমার এমন জরুরী কাজ? শুধায় কুম্।

“ঐ যে বললাম একজনের ঋণ শোধ করতে হবে।”

“কে সে?”

“আবদুল গণি।”

শিউরে উঠেছিল কুম্। বারণ করেছিল বিশ্বনাথকে। তার পায়ে মাথা খুঁড়েছিল—কিন্তু সংকল্প থেকে একপাও টলাতে পারে নি তাকে। সেই রাতেই তারাপদের সঙ্গে শিশুগুজের হাত ধরে রওনা হয়ে গেল কুম্। বিশ্বনাথও রওনা

হ'য়ে গেল তার আরক কাজের উদ্দেশ্যে। বিদায় নিল স্বামিস্ত্রী।

এই বিদায়ই ওদের চিরবিদায়। কুসুমের সঙ্গে বিশ্বনাথের নাকি আর দেখা হয় নি। আবদুল গণি খুন হবার খবরটা সে পড়েছিল কাগজে, কারণ আবদুল তখন একটি রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা। বিশ্বনাথের ফটোগ্রামে পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিটাও সে দেখেছে। বিশ্বনাথকে কিন্তু পুলিশে খুঁজে পায় নি। কুসুমও নয়। যে ট্রেনে বিশ্বনাথরা কলকাতা রওনা হয়েছিল কোন দুর্ঘটনায় সে ট্রেনের কোন হিন্দু যাত্রীই পৌঁছতে পারে নি তাদের এপারের নিরাপদ আশ্রয়ে!...

ঋতব্রতের সে চিঠিতে কুসুমের কথা ছিল ঐটুকুই। বাকি যা, তা এ কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। এ চিঠিখানা সে কলকাতা থেকে ফিরে এসে লিখেছিল দেখা যাচ্ছে। কাহিনীর পারস্পর্য রাখতে হ'লে ঋতব্রতের কলকাতা যাবার আগে যে ঘটনাটা ঘটে, সেটা এখানে লিপিবদ্ধ করা দরকার।

করোগেটেড টিনের ইনডেন্ট আর দু'খানা চিঠি নিয়ে রামশরণ যেদিন চলে গিয়েছিল তার পরের দিনই সম্ভাব্যে সে ফিরে এল ক্যাম্পে। ঋতব্রত তখন তার হ'পায়াতে চিত হ'য়ে শুয়ে ভাবছেন নানান কথা। কলকাতার ডাকে ক্যাজুয়েল লীভের কোনও জবাব আসে নি তখনও। জবাব পায় নি রেখা মিস্ত্রিকে লেখা চিঠিখানারও।

রতন এসে খবর দিলে সিংজী দেখা করতে চায়। ঋতব্রত উঠে বসে। গায়ে একটা গেঞ্জি চড়ায়। রামশরণ এসে ব'সে নমস্কার করে।

“সিংজীর কি খবর?”

“খবর তো আচ্ছাই। আপনার চিঠি ভি লিয়ে এসেছি।” শাটের কানাটা তুলে ফতুয়ার পকেট থেকে দুখানা চিঠি বার ক'রে রাখল টেবিলে। ঋতব্রত ক্ষিপ্ত হাতে চিঠি দুখানা নিয়ে পড়তে লাগল। প্রথমেই মেজদার চিঠি; সেখানা শেষ ক'রে আমার লেখা চিঠিখানা পড়তে লাগল। অত্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল রামশরণ। ঋতব্রতের কপালে যে কুসুম-রেখা জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে ঋতব্রত সচেতন ছিল না—কিন্তু সমস্তই নজরে যাচ্ছিল রামশরণের, টেবিলের উপর রাখা শেভিং-সেটের গোল আয়নাটার।

রতন এসে দাঁড়াল, “চায়ের জল বসাব?”

রামশরণ তাকে ডাকলে, “এ রতন ভাই, শুনোতো। পহিলে মেরে লিয়ে এক পাকিট সিগ্রেট লাও। দেখো ভাই কাঁচি মত লানা—ক্যাপটান্ লাও গে।”

একটা টাকা সে গুঁজে দিল রতনের হাতে।

রতন একটু বিরক্ত হ'ল হয়তো, কারণ কাঁচি ছাড়া ক্যাপস্টান সিগারেট কাছের স্কুলবাজারে পাওয়া যাবে না। তাকে যেতে হবে সেই গোলবাজার অবধি। তবু টাকাটা নিয়ে রতন বেরিয়ে পড়ে।

ঋতব্রতের খেয়াল হ'ল রামশরণের উপস্থিতিটা সে অগ্রাহ করেছে এতক্ষণ। বললে, “সিংজী আবার সিগারেট ধরলে কবে থেকে?”

“খাই না হামি, আবার কভি কভি ভি খাই।”

জানালা দিয়ে গলা বার ক'রে কি যেন দেখল রামশরণ। রতন ততক্ষণে বড় রাস্তার উঠে পড়েছে।

“আপনার ঔর ভি একটা চিট্টি আছে স্মার।”

“আরও চিঠি? কই দেখি?” হাত বাড়ালে ঋতব্রত।

আংরাখার আর এক পকেট থেকে বার ক'রে আনল সিংজী একটা মোটা খাম। দিল ঋতব্রতের হাতে। নাম ঠিকানা কিছুই লেখা নেই উপরে। ঋতব্রত খামটা খুলতে লাগল। খুক্ খুক্ ক'রে কাশল রামশরণ। হঠাৎ খুতু ফেলতে উঠে গেল বাইরে। ঘরে যখন ফিরে এল খামের অবগুণ্ঠন তখন আবার বন্ধ হ'য়ে গেছে। সিংজী আসন গ্রহণ করল। পকেট থেকে একটা ডিবা বার ক'রে একখিলি পান ফেলে দিলে মুখগহ্বরে, বললে, “একটা লিবেন নাকি স্মার?”

ঋতব্রত স্থির হ'য়ে বসে রইল, হ্যাঁ না জবাব দিলে না। একটু ইতস্তত ক'রে সিংজী ফের বললে, “কবে কলকাতা যাচ্ছেন স্মার?”

“এটা আপনি নিয়ে যান।”

বন্ধ ভারী খামটা ঋতব্রত ছুঁড়ে দিলে রামশরণের কোলের উপর। একটু চমকে উঠল সিংজী, “কেন স্মার? কি কসুর হ'ল হমার?”

“কসুর আপনার নয়, আমার! আপনার সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। আপনি ভুল বুঝেছেন মিষ্টার সিং, আমি ও জাতের লোক নই।”

“এতে এ্যাগায় কি আছে স্মার? আপনি হমার জন্তে এত পরিসন করলেন—”

“আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনা করব না। আপনি যেতে পারেন।”

উঠে দাঁড়াল ঋতব্রত। চোখমুখ তার লাল হয়ে উঠেছে।

“আপনি হমার জন্তে পরিসন করেন নাই?”

“না! আপনার জন্তে আমি কিছুই করি নি। যা করেছি, তা শুধু আমার কর্তব্য বলেই করেছি। তার পারিশ্রমিক আমি ঠিকই পেয়ে থাকি। ছিঃ, এ বিষয়ে—”

“লেকিন—,” বাধা দিয়ে বললে রামশরণ, “—কোলটারিং? ওহি রোজ আপনি হমাকে না বাঁচাইলে তো আমি মরতম্ শ্রার!”

হা হা ক’রে হাসলে রামশরণ। আপাদমস্তক জলে গেল ঋতব্রতের। সেদিনকার অপমানের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল বুঝি। বললে, “আমি আবার বলছি আপনি ভুল বুঝছেন মিস্টার সিং। পুরানো বস্ত্রাতে আলকাতরা লাগাতে দেওয়ার পিছনে যে হীন ষড়যন্ত্র ছিল, তা আমি তখন বুঝি নি। হ্যাঁ, আপনারা আমাকে বোকা বানিয়েছেন! তার জন্তে যথেষ্ট অপমানও হয়েছে আমার সেদিন। কিন্তু আজকের এই অপমান—এ আমি জীবনেও ভুলব না। আপনি যেতে পারেন।”

যাবার কিন্তু কোন লক্ষণ রামশরণের দেখা গেল না।
“যো হইয়ে গেছে, ও তো হইয়েই গেছে শ্রার! বিলু তো আমি পাইয়েই গেছি। এখন তো ও ফিন্ লোটানো যাবে না। লেকিন আপনি ভি কুছু না নিলে যে হমার মন মানবে না। ও তো শ্রিক অধরম্ হোবে।”

“জানি না ধর্মজ্ঞান বলতে আপনি কি বোঝেন! টাকাটাই বোধহয় আপনাদের কাছে চরম ধর্ম! কিন্তু টাকার উপরেও একটা জিনিস আছে দুনিয়ার, যার নাম ইমানু। কথাটার মানে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না—তাই ও আলোচনা থাক। কিন্তু এক্ষুনি আমার ঘর থেকে আপনি চলে না গেলে, আমি লোকজন ডাকতে বাধ্য হব।”

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল রামশরণ।

“আপনি হমাকে ঘরসে নিকাল দিলেন শ্রার?”

“এই সোজা কথাটা আরও আগে বুঝতে পারবেন আশা করেছিলাম।”

অপমানে এতক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে রামশরণ ঠিকাদার। ঋতব্রত যে এতটা রূঢ় হতে পারবে এটা সে কল্পনাই করে নি। তবু অদ্ভুত তার সংঘম। কোনও কথা না বলে ধীরপদে সে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে বললে, “আজ আপনি আমীর এস. ডি. ও. আছেন;—হামি গরীব ঠিকাদার আছি। আজ আপনি হমাকে ইনসন্ট করতে পারেন। লেকিন হামি ভি কুস্তা নেই, হামি ভি আদমি আছি।”

“সে পরিচয় পেলে খুশি হব।”

দপ্ করে জলে উঠল সিংজীর চোখ দুটো। ঠোঁট দুটো ঈষৎ উন্মোচিত হ’ল—কিন্তু কিছু বললে না। যুক্তকর অবহেলাভরে কপালে ঠেকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল রামশরণ সিং।

অন্ধকার ঘরে ঋতব্রত পায়চারি করে। রতন লণ্ঠন জেলে রেখে যায় নি। কথায়

কথায় সন্ধ্যা উৎরে গেছে। পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই জ্বালে ঋতব্রত। সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজতে থাকে। একটা সিগারেট না ধরালে উত্তেজনাটা কমবে না। আঃ, কোথায় যে ফেলে কাজের জিনিস! টেবিলের উপরে নেই, বালিসের তলায় নেই, ছাড়া বৃশ-কোটটার পকেটে? তা-ও নেই।

“কি খুঁজছেন স্ত্রীর?” রতন এসে দাঁড়ায়।

“আমার সিগ্রেটের প্যাকেট?”

“এই যে।” রতন এগিয়ে দেয় আনকোরা একটা নতুন প্যাকেট। আগ্রহে সেটা থেকে খুলে একটা মুখে দিতে গিয়ে কি ভেবে হঠাৎ থেমে যায় ঋতব্রত। সিগারেট সমেত প্যাকেটটা টান মেরে ফেলে দেয় বাইরে। থমকে দাঁড়ায় রতন, “স্ত্রীর?”

“যা এক প্যাকেট ক্যাপস্টান নিয়ে আয়।” একটা টাকা বার ক’রে দেয় ঋতব্রত। একটুখানি অবাক হয়ে চেয়ে থেকে আবার পথে নামে রতন।

তাকে গোলবাজার যেতে হবে। স্থলবাজারে ক্যাপস্টান পাওয়া যায় না।

লীলার বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। ঋতব্রতের বন্ধু হিসাবেই নয়! ওর মেজদা এবং মেজবোদির পরিচিত গণ্ডীর একটা নিকটবর্তী স্থলেই ছিল আমার অবস্থিতি। বিয়েবাড়িতে ঋতব্রতের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলার সময় ছিল না; কাজের ভিড়ে একবার শুধু বললে, “কাল তোর অফিসে যাব বারোটা নাগাদ। বিশেষ জরুরী দরকার।”

পরদিন সে সত্যিই এসেছিল আমার অফিসে। আমার কাছে ও হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। তার নাকি তখনই এক হাজার টাকা ধার চাই। যে কোনও সূদে, যে কোনও শর্তে। সন্দেহ হ’ল। পীড়াপীড়ি করলাম। ভাঙলে না কিছু। শুধু বললে, লীলার বিয়েতে তাকে একজনের কাছ থেকে টাকাটা ধার নিতে হয়েছে; কিন্তু তার কাছে অধমর্ণ থাকতে চায় না। লোকটা কে, সেখানে কত সূদ দিচ্ছে কিছুই বলবে না। অগত্যা নিজের একাউন্ট থেকে টাকাটা দিতে হ’ল। জিজ্ঞাসা করল, কত সূদ? বললাম, “টাকাটা আমারই; পোস্টাফিসের সেভিংস খাতা থেকে তুলে দিয়েছি মাত্র।” বৎসর খানেক ধরে ইনস্টলমেন্টে টাকাটা ফেরত পেয়েছিলাম। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ! সেভিংস ব্যাঙ্ক হারে সূদ কষে সে শেষ ইনস্টলমেন্টে সে টাকাটাও যোগ দিয়ে দিয়েছিল। মনে আছে, মনি-অর্ডার কুপনে লিখেছিল, “জানি এ ক’টাকায় তুমি কিছু বড়লোক হবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে থাকলে তোমার যে টাকাটা জমত, আমিই বা তার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব কেন?”

এটা ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য! ওর বিবেকটার একমাত্র উপযুক্ত উপমান শজারুর কাঁটা। তার জন্ত কষ্টও পেয়েছে সারাজীবন। ‘আদর্শ’ বলে কি একটা অবাস্তব জিনিসকে আঁকড়ে ধরে কতকগুলো মূর্খ লোক দুনিয়ার যাবতীয় অত্যাচার সহ্য ক’রে যায়—ও হচ্ছে সেই মূর্খ দলেরই একজন। ঐ আদর্শে আঘাত লাগলে শজারুর কাঁটার মতো ওর বিবেকটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই জন্তেই হয়তো চাকরিজীবনে সকলের সঙ্গে শুধু ঝগড়াই ক’রে গেছেন দেখেও দেখতে না পাওয়াটা যে একটা বড় বিচার অন্তর্গত, তাতে যে প্রত্যক্ষ দৃষ্টটাকে সম্পূর্ণ পার ক’রে দেখবার পারদর্শিতা চাই, এটা বুঝতে অমিত রায়ের মতো পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। সংসারের চৌদ্দ আনা লোক এ সত্যটা বোঝেই। দুনিয়ার এ চৌদ্দ আনা অংশের কত ভগ্নাংশ অন্বেষণ করে তা জানি না, তবে বাকী অংশটা যে নির্বিচারে ‘অন্বেষণ সহ’ তা হলপ ক’রে বলতে পারি। জগতের তাবৎ অন্বেষণ দৃষ্টের সম্মুখে এরা সটনাইট—অনুচিত কাজের বাজারে অল্পমনস্ক। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ‘অ্যান্‌জেলরা’ যেখানে পদক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্ত—বাকী দু’আনা সেখানে ছড়মুড় ক’রে ঢুকে পড়ে। তাদের সংজ্ঞা মূর্খ। ঋতব্রত এই-মূর্খের দলের একজন। আর সেই মূর্খামিটি করতে পারার জন্তেই তার যেন একটা বেপরোয়া বড়াই আছে। পাঁচজনের মতের তোয়াক্কা না রেখে এই বেপরোয়া ভাবপ্রকাশটার সংজ্ঞা সাধুভাষায় দুষ্টিকটু। ক্যাম্পজীবনে সে যে বাড়াবাড়িটা করেছিল তার পিছনে ছিলেন সমধর্মাবলম্বী আর একজন মূর্খসম্রাট! তাঁর কথাই বলব এবার; কিন্তু তার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে ওর টাকা ধার করার ব্যাপার দেখে আমার কেমন সন্দেহ হ’ল। এ সন্দেহের নিরসন করে নি কোনও দিন ঋতব্রত। তবে সন্দেহটা নিরাকরণ হ’ল মেজবোদির সঙ্গে আলাপচারিতে একদিন। মেজবোদি বললেন, “ঠাকুরপো তো আজকাল চিঠিপত্রই লেখে না। তোমাদের লেখে-টেকে নাকি?”

বললাম, “কই না। লীলার বিয়ের আগে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল লোক মারফত। সেটাও কাজের চিঠি। কে এক আর. এস. সিং নিয়ে এসেছিল চিঠিটা।”

“ও রামশরণ সিং? ওকে চেন না? ও হচ্ছে ঠাকুরপোর ঠিকাদার। লীলার বিয়েতে একটা জড়োয়া হার দিয়েছিল। এমন চমৎকার হারটা, জানলে, একটা করে ফুল আর তার পাশে—”

গহনার প্যাটার্নের প্রসঙ্গ খামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “এ লোকটাকে চিনলেন কি ক’রে আপনারা? ঋতব্রতই নিমন্ত্রণ করেছিল বুঝি?”

“কে ঠাকুরপো? ওরে বাবা! তাকে নেমস্তন্ন করার জন্তে ঠাকুরপোর কি রাগ।

কি ক'রে জানব বল ভাই? ও লোকটাকে তো ওই পাঠিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। একবার চিঠি নিয়ে এল। পরের বার ওর হাতেই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। টাকাটা যেদিন নিয়ে এল সেদিন কী কাণ্ড! তোমার দাদা সেদিন বাড়িতে। টাকাটার ভাবনায় উনি তখন উদ্ভ্রান্ত। বিশ্বের মাত্র তিন দিন বাকি। হঠাৎ ঠাকুরপোর পাঠানো টাকাটা এসে পৌঁছাল। উনি এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভদ্রলোককে বসিয়ে নিয়ে রসগোল্লা সন্দেশ খাওয়ালেন।”

খিলখিল ক'রে নিজেই হেসে ওঠেন মেজবৌদি, “তোমার দাদাকে তো চেন ভাই। হাত দিয়ে একটা পরসা কখনও গলতে দেখি নি। হঠাৎ ভিতরে এসে হুকুম করলেন বাইরে ছুঁকাপ চা পাঠিয়ে দাও শিগগির! বন্টুকে নগদ একটা টাকা দিয়ে খাবার কিনতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম লীলার খন্তরবাড়ির বুঝিবা এল কেউ। বললেন, ‘না, রিতু টাকা পাঠিয়েছে।’ জিজ্ঞাসা করলাম, ‘চিঠি দেয় নি?’ বললেন, ‘না। মুখে বলতে বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে!’ তা ভদ্রলোক লোক ভালো। চা-টা খেয়ে অনেক গল্পসল্প করল। কোথায় লীলার বিয়ে দিচ্ছি, পাত্র কি করে। এর পর ওকে মৌখিক নিমন্ত্রণ না করা খারাপ দেখাতো না?”

“নিশ্চয়ই।” জবাব দিলাম অশ্রুমনস্কের মতো, “কেন, ওকে নিমন্ত্রণ করার কি অসম্ভব হয়েছিল রিতু?”

“অসম্ভব? ভাগ্যিস সম্পর্কে বড়, তাই মারতে বাকি রেখেছে! তোমার দাদা বারণ না করলে উপহারটাও ফেরত দিয়ে দিত। আমার জিজ্ঞাসা করল, ‘মেজদা ওকে চিনল কি ক'রে?’ বললাম, ‘বারে! ওর হাতেই তো তুমি প্রথমবারে চিঠি পাঠালে, তারপর টাকা পাঠালে।’ শুনে ঠাকুরপো চুপ ক'রে গেল। সব কথা ওর মনে পড়ল বোধ হয়। শুধু জিজ্ঞাসা করল, ‘টাকাটা কবে দিয়ে গিয়েছিল।’ হিসাব করে তারিখটা বললাম। ও চুপ ক'রে গেল।”

এখন বুঝতে পারি আমার দেওয়া হাজার টাকা কোথায় গিয়েছিল। ভারি ইচ্ছে হয় দৃশ্টা জানতে। নোটের বাঙালিটা কি ছুঁড়ে মেরেছিল রামশরণের মুখে? টাকাটা ফেলে দেওয়ার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে কিছু বাণী দান করেছিল নিশ্চয়ই! দুর্ভাগ্য আমার, সে দৃশ্টা আমার অজানা। ঋতব্রত সেকথা বলে নি আমাকে।

কিউ. সি. আই. ব্যারাকটা সরানো শেষ হয়ে গেছে। এল/৩ বিজিটার উপরের টালিগুলি বসানো হয়ে গেছে। মূলিবাশের দেওয়াল নতুন ক'রে বাঁধছে ঘরামিয়া। আগেকার দেওয়ালটা অহুমোদন করে নি ঋতব্রত। কারণ বাঁধুনি নয় ইকি

সমচতুষ্কোণ নয়। এই দেওয়ালটা তৃতীয়বার বাঁধছে ঘরামিরা। প্রথমবার ঋতব্রত ওটা খুলতে আদেশ দেয়, কারণ সেটা ছিল “বুকা বাঁধুনি”; অর্থাৎ মূলিবাণ ফাটিয়ে তার অমসৃণ ভিতর দিক, বুকের দিক দিয়ে সেটা তৈরি করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার মসৃণ অংশ, অর্থাৎ পিঠা-মুলির বাঁধুনি দেওয়া হ’ল বটে, কিন্তু বাঁধুনির খোপগুলো নয় ইঞ্চির জায়গার দশ, সাড়ে-দশ ইঞ্চি ফাঁকে বাঁধা হয়েছে। স্তবরাং রিজেক্টেড!

ওয়ার্ক-সরকার নির্দেশ জানাতে গেল ঘরামিদের। ফলে একটা রীতিমতো বগড়ার সৃষ্টি হ’ল। ঘরামি মিজিরা ক্রোধে উঠেছে, এ কি অত্যাচার! বাঁশের চাটাই বুনানিতে আবার এক আধ ইঞ্চি কি? এ কি ঢালাই ছাদের রড সাজানো? গুণগোল শুনে ছুটে এল ওভারসিয়ার সেনগুপ্ত। ব্যাপারটা শুনে স্পষ্টই বিরক্ত হ’ল সে। বিরক্তি প্রকাশ করতেও বিরত হ’ল না। বস্তৃত তার মতেও এটা অস্বাভাবিক। ফলে ঘরামি মিজিরা জো পেয়ে গেল। তারা আরও চড়া গলায় অস্বীকার করল আবার বদল দিতে। জিনিসটা হয়তো ঘনিয়ে উঠতো। সমাধান হ’ল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। রামশরণ সমস্তটা শুনে ঢালা হুকুম দিলে, “ফিন বদলে দেও!” ঘরামিরা ফুরনে কাজ করে, তারা অস্বীকার করল। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলো রামশরণ, “অত কোতার তোমার কাম কি বাবা? এটো হামি তুমার কাছে লিয়ে লিলম। তুমি হামার কাছে এর নাপি পাবে। লেকিন সাবকো ফিন বদল দেও।” এর পর আর কথা চলে না। ওয়ার্ক-সরকারের দিকে ফিরে হেসে বললে, “আপনার সাহেবকে বলবেন—নাফা হামি জরুর করবে। সূঁচ না যাইতে দিলে কি হোবে—হাঁথি আমি জরুর চালিয়ে লিবে!”

প্রতি পদে ঠোকাঠুকি চলেছে তখন ঠিকাদারের সঙ্গে। প্রতিটি আইটেম এত খুটিয়ে পরখ করছে, যে সন্দেহ হতে পারে—রিফ্রাজিদের বাড়ি নয়—তাজমহলের মেরামতি কাজ তদারক করছে কেউ। মাপে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ কম হ’লেও শালখুটি নাকচ হয়ে যায়—নির্ভেজাল মগরা বালি ছাড়া কাজ হয় না—এমন কি এই কাজের জন্যও এস. ডি. ও ‘ব্লাম-টেস্ট’, ‘সিভি-টেস্ট’ করিয়ে কাজ করাতে হবে বলে হুকুমজারি করতেও দ্বিধা করল না। রামশরণ কোনও প্রতিবাদ করে নি! অননুমোদিত মাল গাদা দেওয়া থাকল ঠিকাদারের গুদামে। একটা প্রত্যাঘাত প্রতিনিয়তই আশঙ্কা করছিল ঋতব্রত। অচিরেই দেখা দিল সেটা। মিস্টার ডাট আর একবার পরিদর্শনে এলেন। হাতে রামশরণের দেওয়া ক্ষতিপূরণের একটা লম্বা ফিরিস্তি। বিভাগীয় গাফিলতিতে তার কি কি ক্ষতি হয়েছে তারই লম্বা লিষ্টি! রামশরণকে ডেকে ধমক দিলেন দস্তগাহেব, “এসব কি ছেলেমানুষি

করছেন? তিন লাখ টাকার কাজে পাঁচ টাকা সাত টাকার ছুশো খেসারত দাবি করতে দেখি নি কখনও আমার বিশ বছরের চাকরি জীবনে!”

কথাটা তিনি জানিয়েছিলেন ইংরাজীতেই এবং যে জবাবটা রামশরণ দিয়েছিল তার বিচিত্র ভাষার—তার মর্মার্থ হ’ল লাখো শালবল্লার ভিতর বেছে বেছে এক সুতো মাপে ছোট বক্স বাদ দিতে সেও দেখে নি তার ত্রিশ বছরের ঠিকাদারী জীবনে! কথাটা বলেছিল সে বিনীত ভঙ্গিতেই, কিন্তু অকুক্ষিত হ’ল দত্তসাহেবের।

স্টোর ঘুরিয়ে রামশরণ দেখাল অননুমোদিত মালের গাদা। দত্তসাহেব বিস্মিত হয়ে ঋতব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন সেগুলো কেন বাতিল হয়েছে।

“ওগুলো আগার স্পেসিফিকেশনের মাল স্তর।”

“আগার স্পেসিফিকেশন? মাই ফুট! দে আর শর্ট বাই ফ্রাকশনস অব ইঞ্চেস! অ্যাকসেস্ট দেম অল।”

“আপনি তাহ’লে লিখিত অর্ডার দিন স্তর।”

“ছোট আই কাস্ট, যু নো!”

এক আরও কুক্ষিত হ’ল ছোট সাহেবের। পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, “আমি আই দেন টু বিলিভ দি স্টোরি অব্ দি কন্ট্রাক্টর ছোট যু হ্যাভ পারসোনাল মোটিভস্ ইন হারাসিং হিম, বোস?”

“ইটস্ আপ্ টু যু টু বিলিভ এনিথিং যু থিন্স।”

“আই সী!”

কোনও কাজ পরিদর্শন না ক’রেই জীপে গিয়ে বসলেন দত্তসাহেব। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, “বাই দি ওয়ে, হু কুক্স য়োর ফুড?”

“আমার একজন মেইডসার্ভেন্ট আছে এখানে; সেই রান্না করে।”

“মে আই নো হার নেম?”

সেনগুপ্ত শুনতে না পাওয়ার ভান ক’রে এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিলে রামশরণ। কান দুটো বাঁ বাঁ ক’রে উঠল ঋতব্রতের, বললে, “নো যু মে নট! বিকজ চাটস্ এগেন অ্যাবসোলিউটলি মাই পার্সোনাল অ্যাকফেসার্স!”

“আই সী!” জীপে উঠে ডাটসাহেব শুধু বললেন, “যু শ্যাল হ্যাভ টু পে হেভিলি ফর য়োর ইনসোলেন্স!”

“ইফ্ অনেস্টি ইজ ইনসোলেন্স ইন য়োর ডিক্লনারি আই অ্যাম রেডি টু পে ডিয়ারলি ফর মাই অ্যাকসন্স!”

একরাশ ধুলো উড়িয়ে জীপ রওনা হ’য়ে গেল।

ঘরে ফিরেই একটা ক্যান্ডিয়ার লিভের দরখাস্ত লিখে ডাকে দিয়ে রওনা হ’য়ে

পড়ল ঋতব্রত। তাকে চীফ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবে তাঁকে, তারপর দরকার হয় পদত্যাগ করবে সে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটার সামনে ঋতব্রত পায়চারি করছিল। স্টেশনের বাস কখন আসবে জানা নেই। তাড়াতাড়ি কলকাতা যাওয়ার প্রয়োজন, হুতরাং অবিলম্বে বেরিয়ে পড়েছে। কখন বাসের টাইম আছে, স্টেশনে ট্রেনই বা আসবে কখন, খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। খেয়াল হয় নি ট্রেন বা বাস না থাকলে তাকে অহেতুক অপেক্ষা করতে হবে পথের মধ্যে।

ওর ওই সব ছোটোখাটো কাজেই বুঝতে পারি কেন সে চাকরিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে শুধু বাগড়াই ক'রে গেল সবার সঙ্গে। যেটা করণীয় মনে করেছে, তখনই করেছে সেটা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই এবং কোনও রকমে রেখে ঢেকে করার চেষ্টা করে নি। ফলাফল বা লোকে কি ভাববে ভেবে দেখাটা যেন ওর প্রয়োজন নেই। এর জন্তে যেন কোনও খেদও নেই তার। এই যে একফটা ধরে রাস্তার উপর পায়চারি করছে আর সিগারেট ধ্বংস করছে এর মাঝে কি একবারও অনুশোচনা হয়েছে তার—কেন কোনও খবর না নিয়ে রওনা হয়েছিল? আমার তো মনে হয় না!

“এককিউন্ট মি, আপনিই কি কন্সট্রাকশন এস. ডি. ও. মিস্টার জয়ব্রত ঘোষ?”

ঘাড় ঘুরিয়ে ঋতব্রত দেখল একটা ল্যাণ্ড-রোভার এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। এক ভদ্রলোক, নিজেই চালক, ওকে জিজ্ঞাসা করছেন মুখ বাড়িয়ে। এগিয়ে এল সে, বললে, “আমার নাম ঋতব্রত ঘোষ।”

“ঠিকই ধরেছি!” ল্যাণ্ড-রোভার থেকে নেমে এলেন ভদ্রলোক। পরনে একটা কর্ডের প্যান্ট আর ব্লেজ-কোট। মাথায় একমাথা প্লাটিনাম-ব্লু পাকা চুল, মুখে ধূমায়মান মস্ত চুরুট।

“আমার নৈনাম সঞ্জীব চৌধুরী। আপনার সহপাঠী ত্রিদিব চৌধুরী আমার বড় ছেলে।”

“তাই নাকি? ও, ত্রিদিব এখন কোথায়?”

“ডি. ডি. সি-তে চাকরি পেয়েছে একটা। বাই দি ওয়ে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? চলুন, আমি একটা লিফট দিয়ে দি।”

“আমি যাবো স্টেশনে। কলকাতা যাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। ত্রিদিবের বাবা আপনি।”

“ডাটস্ অল, ডাটস্ অল! কলকাতা যাচ্ছেন? তাহ'লে স্টেশনে কেন—আমি বাই রোড কলকাতা যাচ্ছি। আমার সঙ্গেই যাবেন চলুন।”

সঞ্জীব চৌধুরীর ল্যাণ্ড-রোভারে ঋতব্রত চলল কলকাতামুখো। সঞ্জীববাবু অত্যন্ত আমুদে লোক—গল্পটা একটু বেশীই করতে ভালোবাসেন। সারা রাত্তা তিনি নাগাড়ে ছাইভ করতে করতে চুরুট খেলেন এবং চুরুট খেতে খেতে গল্প চালানেন। কোন একটি বিখ্যাত টার অ্যাণ্ড পেন্ট প্রডাক্টস-এ কাজ করেন তিনি। চার অঙ্কের মাহিনা পান। এ গাড়িখানা কোম্পানির। বার তিনেক সাগরপাড়িও দিয়েছেন কোম্পানির টাকায়। টার ম্যাকাডাম্ হাই-ওয়ে হচ্ছে বকুলতলা ক্যাম্পের ছ'মাইল উজানে। সেখানেই কাজ দেখতে আসেন তিনি প্রায়ই। জিদিবের কাছেই শুনেছিলেন তিনি, তার এক সহপাঠী হৃদয়ব্রত ঘোষ ক্যাম্প রিপেয়ারের কাজের তদারকিতে আছে। শুকে দেখে তাই আন্মাজে ধরেছিলেন। ঋতব্রত দেখল ওর নামটা আবার বিকৃত করেছেন ভদ্রলোক। সংশোধন করে দিল আবার : “আমার নাম ঋতব্রত বোস।”

“সো য়ু সেড জাস্ট নাউ। আই নো।”

সঞ্জীববাবু খোঁজ নিলেন কেমন কাজকর্ম চলছে। কি বুঝে সে। নতুন চাকরি-জীবন কেমন লাগছে তার। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার স্বর ছিল যে, এই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের কাছে অকপটে অনেক গল্পই ক'রে গেল ঋতব্রত। দৈর্ঘ্য ধরে সবটা শুনলেন চৌধুরী সাহেব। বললেন, “অ্যাণ্ড হি আসকড হার নেম ; এ ?”

“হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।”

“উড য়ু টেক মাই অ্যাডভাইস ?”

“বলুন।”

“সেই লোকটা—কি যেন নাম, তারাদাস না কি বললে, সে এলে মেয়েটিকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না।”

“ক্যাম্প-সুপারের পরামর্শ মতো নারী-আশ্রমেই পাঠিয়ে দেবো ?”

“সার্টেনলি নট !”

“তবে ?”

“ভালো রান্না করে যখন, রাখ না তোমার কাছে। পরে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিও। অবশ্য আমার একথা বলা উচিত নয়। তোমার বিবেক যা বলে তাই কর। তবে আমি হলে ঐ রকম করতাম।”

“কিন্তু লোকে তো অল্প রকম ভাবতে পারতো আপনার সম্বন্ধে ?”

“আই কেয়ার এ ফিগ্‌ ফর ছাট্ ! ভাবলো তো বয়েই গেল। কে কি ভাবছে তার কি জান তুমি ? এই তো আমি। আমি তো তোমার কাজে অগ্নায় কিছু

দেখি নি।”

উৎসাহিত হ’ল ঋতব্রত। এই তো, তার মতো দৃষ্টিভঙ্গির মানুষও তো আছে দুনিয়ায়! সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তায়, পাশে। চৌধুরী সাহেব পিছনের সীট থেকে ক্লাস্টার তুলে নিয়ে তরল মতো ক’কি একটা গলাধঃকরণ করলেন।

“উড যু লাইক টু হ্যাভ সম্ ড্রিংক?”

তীব্র গন্ধে পানীয়টার জাত সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা করা যায় অনায়াসে। মাথা নেড়ে ঋতব্রত অসম্মতি জানানয়।

“দেন হ্যাভ সম্ স্মোক আর্ট লীস্ট।”

সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে ধরলেন চৌধুরী।

“না থাক।” ত্রিদিবের বাবার সঙ্গে বসে ধূমপান করতে ইতস্তত করা অস্বাভাবিক নয়। দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব। কন্ঠাপেক্ষের লোক যে ভঙ্গিতে দুটি হাত বাড়িয়ে বরকর্তাকে অভ্যর্থনা করেন ‘আন্তাজা হোক’ বলে—সেই ভঙ্গিতে চৌধুরী বললেন, “দেন গেট ডাউন প্লীজ!”

বিস্মিত ঋতব্রতের কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দটার কোনও আক্ষরিক রূপ নেই। ‘জ্যা’—‘আজ্ঞে’ জাতীয় কি একটা বলতে চাইল সে। জবাবটা আসলে তার?

গম্ভীরভাবে বলেন চৌধুরী, “আই ভোস্ট এটারটেন সচ্ কম্পানি।”

“কেন কি দোষ করলাম আমি?”

“ক্যাম্পের সামনে দেখলাম সিগারেটের স্মোকস্ক্রীন রচনা করছিলে, আর আমার অফার করা সিগারেট তুমি খাবে না?”

হেসে ফেলে ঋতব্রত। বললে, “কী আশ্চর্য! সিগারেট খেতে ইচ্ছে না করলেও জোর ক’রে খাওয়াবেন আপনি?”

“নিশ্চয়ই না। সিগারেট খেতেই হবে এ কথা তো বলি নি। আমি বলেছি সিগারেট না খেলে তোমাকে নেমে যেতে হবে শুধু।”

ধূকরা প্রান্তরটার দিকে তাকিয়ে অগত্যা ঋতব্রত সিগারেট নিয়ে ধরালো, বললে, “হ্যাঁ, আপনি যেন কি বলছিলেন?”

গিয়ার বদলাতে বদলাতে চৌধুরী সাহেব বললেন, “লোক কি ভাবছে না ভাবছে না ভেবে, যা মন চায় ক’রে যাবে।”

“আমি তো তাই করি—”

“ছাই কর! তা হ’লে এতক্ষণ সিগারেট ধরাচ্ছিলে না কেন? ইচ্ছে করছিল না ব’লে? দিবিয়া তো ধোওয়া গিলছ এখন! অপরে কি ভাবছে না ভাবছে তোরাঙ্গা

না রেখে চললেই জীবনে উন্নতি করা যায়। যু অলওয়েস্ গেইন বাই স্ট্রাইট।”

“কিন্তু আমার তো তাতে বরাবর ক্ষতিই হয়েছে।”

“আল্টিমেটলি লাভ হবেই। এ অনেকটা ইংরেজদের যুদ্ধনীতির মতো, মাইণ্ড নট লুজিং অল দি ব্যাটলস্ বিকস্ যু শ্যাল আল্টিমেটলি উইন দি ওয়ার! বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা তবে আমার গল্প শোন। আঃ সিগারটা নিঙে গেল। উড যু হেল্প মি?”

ঋতব্রত দেশলাইটা জ্বলে হাতের আড়াল করে ধরে। সমান বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে সিগারটা ধরিয়ে নিলেন চৌধুরী সাহেব। আশ্চর্য চৌধুরী সাহেবের ধূমপান স্রীতি। ল্যাণ্ড-রোভারে দূর পাল্লার ড্রাইভ করার সময় যত ধোঁয়া বের হয় একজস্ট পাইপ দিয়ে, তার চেয়ে বেশী ধোঁয়া ছাড়ে তাঁর চুরুট। চেন-স্মোকিং-এর অপকারিতা সম্বন্ধে কেউ কিছু উপদেশ দিতে এলে বলতেন, “কি করব বল? দেশলাই কিনতে কিনতে ফোত হয়ে গেলাম। দিস্ ইজ ওনলি টু কাট ডাউন বাজেড-হেড এক্সপেন-ডিচার অন ম্যাচবক্স।”

তাঁর গল্প শুরু করলেন চৌধুরী সাহেব।

“কি বলছিলাম? আমার নিজের অভিজ্ঞতা? আজ আমি মন্ত অফিসার। অনেকের ঈর্ষার পাত্র। কিন্তু কি ভাবে আমি জীবন শুরু করি জানো? একজন সাধারণ রোড-সরকার হিসাবে। ছাব্বিশ বছর বয়সে এনট্রান্স পাশ করি, জিপি বছরে বি. এস-সি!”

অবাক হয়ে গেল ঋতব্রত। ওয়ার্ক-সরকার থেকে ঘষে ঘষে এতদূর উচুতে উঠেছেন সঞ্জীব চৌধুরী?

“কি ক’রে এতটা উচুতে উঠেছি জানো? শুধু বাঙালার গৌর জোরে। তখন আমি উড়িষ্যার পোস্টেট, ওয়ার্ক-সরকারি করি। সে যুগে উড়িষ্যার অনেকটাই ছিল বেঙ্গল পি. ডাব্লু. ডি-র অধীনে। আজকালকার মতো পঞ্চাশটা ডিপার্টমেন্ট ছিল না তখন। বেঙ্গল পি. ডাব্লু. ডি-র চীফ এঞ্জিনিয়ারই ছিলেন হবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি! আমার বয়স তখন চব্বিশ পাঁচিশ। বন্ধুদের বাবাদের সামনে তো নয়ই—লুকিয়েও বার্ডসাইথে শিখি নি তখন। ঠিক মনে নেই, বোধহয় টাকা বারো চৌদ্দ মাইনে পেতাম। ছাতি মাথায় দিয়ে রাস্তার কুলি খাটাই। একদিন কাজ তদারক করছি, আগের রাতে ‘রোড-কোজ্‌ড’ লেখা সাইনবোর্ডটা সরিয়ে দিয়ে কয়েকটা লরি গিয়েছিল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। তাই এঞ্জি ভেঙে গিয়েছিল অনেকটা। সেটা মেরামত করাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা মন্ত মটরগাড়ি এসে দাঁড়াল রাস্তা বন্ধের নিশানাটার কাছে। আমি যেখানে

কাজ দেখছি সেখান থেকে ফার্ন দুই দূরে হবে। তবে রাস্তাটা লোজা খাঁকায় বেশ দেখতে পেলাম—ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সাইন-পোস্টটা সরিয়ে দিল; তারপর আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। হর্ন দিতে দিতে দিতে তীর বেগে গাড়িটা এগিয়ে আসছে। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে মিস্ত্রি মজুরেরা পথ ক'রে দিচ্ছে। আপাদমস্তক জ্বলে গেল আমার। রাস্তার পাশে শোয়ানো খালি ড্রামটা এনে রাখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে। নিজেও দাঁড়লাম তার পাশে। কুলিরাও উঠে দাঁড়াল। গাড়িটা হর্ন দিতে দিতে দিতে এসে থামল আমার ফুট তিনেক দূরে। দেখলাম দু'জন সাহেব আর একজন মেমসাহেব বসে আছে। ইংরাজী তখন বলতে পারি না। সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত বিড়ে—ঐ যে তোমরা যাকে ব'ল ক্লাস নাইন। তাই হিন্দিতে ধমক দিলাম ড্রাইভারকে। ‘—দেখতে পাওনা রাস্তা বন্ধ? অন্ধ নাকি তুমি?’ নোটবই বার ক'রে টুকে নিলাম গাড়ির নম্বর। ওকে বললাম ব্যাক ক'রে গাড়ি পেছিয়ে নিয়ে যেতে। ডাইভারসন দিয়ে যেতে হবে।

ড্রাইভারও খেঁকিয়ে উঠল, ‘দেখছ না দামী গাড়ি, নীচে নামলে কাদা লাগবে। আর তো এসেই গেছি। ড্রামটা সরেও।’

রুখে উঠলাম আমি। পাঁচকথা শুনিয়ে দিলাম। দামী গাড়ি বলে মাথা কিনেছে নাকি? বেটা বোধহয় ভেবেছে সাহেব-মেম দেখে ভিরমি খাবো আমি। আশ্মো যশোরের বাঙাল! তেড়ে ধমক দিলাম। ড্রাইভার রুখে উঠল। তাকে থামিয়ে দিয়ে পিছনের সীটের মেমসাহেব বললে, ‘এ বাবু, হমলোগকো যানে দো। বহুত জরুরী কাম হ্যায়।’

জরুরী কাম না হাতি! আপাদমস্তক জ্বলে গেল। নেহাত মেয়েছেলে—তাই শুধু বললাম, ‘তা হয় না, মাপ করবেন।’

তখন তার পাশের সাহেবটা আমাকে কাছে ডেকে হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে দুখানা নোট! ‘যানে দো হমলোগকো! গর্দামে যানে সে গাড়ি খরাব হো জারগী।’

ছুঁড়ে দিলাম নোট দুটো গুর কোলে। কী ভেবেছে বেটার। কাল আদমি মাঝেই কুড়া? হু' টুকরো রুটি ফেলে দিলেই কুঁই কুঁই করবে? কিছুতেই যেতে দেব না ওদের।

মেমসাহেবের মুখটা লাল হ'য়ে উঠেছে। বললে, ‘চলো!’

গাড়ি ঘরঘর করে স্টার্ট নিল। কিন্তু হ'লে কি হবে, রাস্তার মাঝখানে ড্রাম—বাকী রাস্তাটা আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আমি বিবেকানন্দের ভক্তিতে, বাহুবল্লীপাশ!

তখন নেমে এল ওপাশের লালমুখো বিরাটাকার সাহেবটা। এতক্ষণ একটা কথাও

বলে নি। বেটার কোমরে ঝুলছে রিডলবার। ঝোলে ঝুলুক, আমারও পিছনে আছে দুশো কুলি—তাদের হাতে ধারালো গাঁইতি। হাতির মতো গোদা পা ফেলে সাহেবটা এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠিক মুখোমুখি নয়, আমার মাথাটা তার বুকের প্রায় কাছাকাছি। বললে, ‘হু’ গুট লেট আস গো?’ বললাম, ‘নো, নেভার!’ সাহেব আমার কাঁধে সের দশেক ওজনের হাতখানা রেখে বললে, ‘ডু হু নো হ অ্যাম আই?’

বললাম, ‘নো। হমার জাননে কো কোই জরুরত নেহী।’

আমার কথায় কর্পপাত না ক’রে সাহেব বললে, ‘আই অ্যাম দি চীফ এঞ্জিনিয়ার—বেকল পি. ডাব্লু. ডি.!’

এর চেয়ে বজ্রপাত হ’লে ভালো ছিল!

চীফ এঞ্জিনিয়ারের নামটাই শুনেছি কেবল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এঞ্জিনিয়ারকেই জীবনে কখনও দেখি নি। এল্লিকিউটিভ একবার এসেছিলেন রাস্তা দেখতে। দুশো রোড কুলি সার দিয়ে সেলাম করেছিল তাঁকে। ওভারসিয়ার বাবুও তাঁর কাছে কৈচোট। অথচ এই ওভারসিয়ারকেই আমরা যমের মতো ভয় করি। ওভারসিয়ার, এস. ডি. ও., ই. ই., এস. ই.—তার ওপর নাকি থাকেন সি. ই.। ঈশ্বরকে না দেখেও আমরা যেমন তাঁর উপস্থিতিটা স্বীকার ক’রে নিই—তেমনি কলকাতার কোন একটি ঘরে সি. ই. বলে একজন আছেন এটা পুঁথিগতভাবেই জানা ছিল শুধু। সে দেবতাটি সাকার না নিরাকার জানা ছিল না। ভয়ে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।”

চৌধুরীসাহেবের ল্যাণ্ড-রোভারটা মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি, “অব তুম মেরা গাড়িপার চর, নেহী তো মায় তুমারা উপর চড়ুঙ্গা!” চমকে উঠল স্বতন্ত্রত। ব্যাপারটা কিছুই নয়। একসার গরুর গাড়ি আসছিল রাস্তার মাঝ বরাবর। একেবারে পাশ দেয় নি। পাশ কাটিয়ে রোড ক্রেস্ট থেকে নেমে অনায়াসেই যাওয়া চলত; কিন্তু সঞ্জীব চৌধুরী সে জাতীয় লোক নন। এক তিল পথ তিনি ছাড়বেন না মাঝরাস্তার। তাতে অ্যাকসিডেন্ট হয় সো ভি আচ্ছা! গরুর সিং—এ বনেটটা গিয়ে ঠেকল। ব্রেক ক’বে চূপ ক’রে বসে রইলেন তিনি। গাড়োয়ানের দোষ নেই; সে তাঁর গাড়ি আসছে দেখে নি। ফাঁকা পথ পেয়ে বেচারী ঘুমিয়ে নিচ্ছিল একটু। হঠাৎ শব্দবাস্তে উঠে ব’সে গরুগুলোর লাজ মলতে মলতে পাশে নামল। স্টার্ট দিলেন ফের চৌধুরী। গল্পেরও।

“কতদূর বলেছি? ও হ্যাঁ, চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দেখে ঘাবড়ে গেছি। কিন্তু ঐ যে

বললাম। আন্দো যশোরের বাঙাল! এক মিনিট পরে বললাম ‘আপনাকে আমি চিনতাম না স্ত্র! সেলাম! কিন্তু তাহলেও বলব আপনারও যাওয়া উচিত নয় এই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে। কারণটা তো আপনিই ভালো জানেন।’

সাহেব আমার কাঁধটা ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানি দিলেন। তারপর দুটো হাত পকেটে পুরলেন। আমার মনে হ’ল বোধহয় আমার কলার-বোনটাই খুলে নিয়ে পকেটজাত করলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে ইংরাজীতে একটা কিছু বললেন। মনে হ’ল ‘ওয়াও! ওয়াও!’

ঈশ্বর জানেন কি বলেছিল সে। তার ভাষা তো বুঝিই নি, এমনকি ওটাতে আমাকে গালাগালিই দিলে, রাগ প্রকাশ করল, না, খুশি হ’ল তাও বুঝলাম না। গোদা গোদা পা ফেলে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিলে। চীফ এঞ্জিনিয়ার শব্দটাই মালুম হয়ে থাক অথবা আমার সেলাম করাই লক্ষ্য ক’রে থাক—মেট মুন্সি ততক্ষণে ড্রামটা সরিয়ে দিয়েছে। সামনের রাস্তা খোলা।

গোদা সাহেব ড্রাইভারকে কি বললে। পিছনের সাহেবের সঙ্গে কি কথাবার্তা হ’ল। বিন্দু-বিসর্গও বুঝলাম না। শেষে গোদা সাহেব, মানে চীফ এঞ্জিনিয়ার আমার কাছে ডাকলে। তখনও আমার কাঁধটা টনটন করছে। ভাবলাম কলার-বোনটা ফেরত দেবে বোধ হয়। জিজ্ঞাসা করলে, ‘হোয়াট্‌স য়োর পোস্ট?’ বললাম। দুই সাহেবে কি কথাবার্তা হ’ল আবার। মনে হ’ল পিছনের সাহেব আমার হয়ে কিছু স্থপারিশ করছে। শেষে গোদা সাহেব রাজী হ’ল যেন। ভাবলাম আমার কাঁধের হাড়থানাই ফেরত দেবার কথা হচ্ছে বুঝি। হঠাৎ পিছনের সাহেব পকেটে হাত চালিয়ে কি একটা সাদা মতো বার ক’রে আমার হাতে ফেরত দিল, বললে, ‘মিট মি আট ক্যালকাটা!’

‘কাঁধের সাদা হাড়টা ফেরত নিলাম। গাড়ি স্টার্ট দিল—সামনে খোলা রাস্তা থাকলেও, অবাক কাণ্ড, গাড়ি ব্যাক ক’রে ড্রাইভারসন হ’য়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে সম্বন্ধ ফিরে পেয়েছি। ছুটলাম তখনই ওভারলিয়ার বাবুর কাছে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই এস. ডি. ও. সাহেবের অফিসে! সব শুনে সবাই অবাক। চীফ এঞ্জিনিয়ার যাবেন তা কেউ জানতো না। কোথায় গেলেন তিনি, কবে ফিরবেন কেউ খবর রাখে না। সাতদিন পরেও যখন তিনি ফিরলেন না তখন সবাই সন্দেহ প্রকাশ করল। আমি তখন কলার-বোনটা প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করলাম। আসলে সেটা পিছনের সাহেবের নাম লেখা একটা কার্ড। ঠিকানাও ছিল তাতে। গাড়ির নম্বরও দেখালাম। এস. ডি. ও. নম্বরটা জানতেন। সবাই আমার হঠকারিতার জন্তু বাপান্ত করতে লাগল। মুখ বুজে গাল খেলাম সবার

কাছে।”

বাধা দিয়ে ঋতব্রত বললে, “তা হ’লে লাভ কি হ’ল? চীফ এঞ্জিনিয়ারও গাল দিলে, তার ড্রাইভারও গাল দিলে— আবার সব শুনে আপনার অফিসের সবাই গাল দিলে—”

সে কথায় কর্ণপাত না ক’রে চৌধুরী সাহেব বলে চলেন, “কার্ড দেওয়া আর দেখা করার কথা যাকে বলি সেই তেড়ে মারতে আসে। ওখানে গেলে কয়েদ ক’রে রাখবে। অপমানের শোধ নেবে। দিন সাতেক ইতস্তত ক’রে একদিন ছুটি নিয়ে রওনা হলাম কলকাতামুখে। দেখিই না কি হয়! সেই আমার প্রথম পদার্পণ কলকাতায়। ঠিকানা খুঁজে গিয়ে পৌঁছলাম। বিরাট অফিস। টার প্রডাক্টস! সাহেব চিনতে পারলেন আমাকে। বলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত মাইনে পাই, কতদূর পড়েছি—বাড়িতে কে কে আছে ইত্যাদি। শেষে বললেন, ‘হমার কাছে কাজ করবে বাবু?’

রাজী হ’য়ে গেলাম। সেই থেকে এই ফার্মেই আছি আজ বক্রিশ বছর। আমার সততা আর একগুঁয়েমিতে মুগ্ধ হয়েছিল গ্রে সাহেব। ভীষণ ভালোবাসতো আমাকে। নাইট ক্লাসে সেই আমাকে ভর্তি করিয়ে দেয়। চাকরি করতে করতে পরীক্ষা দেওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে;—মাস এট্রান্স পরীক্ষার ফি-টাও দিয়েছিল। পরে অবশ্য স্কলারশিপের টাকাতেই পড়েছি আমি।

পরে জেনেছিলাম গ্রে-সাহেব চীফ এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘এই সংকর্তব্যনিষ্ঠ ছেলেটিকে তুমি পুরস্কৃত করতে পার না? কোনও ইনক্রিমেন্ট অথবা লিফট?’

চীফ বলেছিলেন, ‘এটা তোমাদের মতো প্রাইভেট ফার্ম নয় গ্রে, এখানে একটা নন-ম্যাট্রিককে তো আমি সাব-ওভারসিয়ার করতে পারি না।’

গ্রে বলেছিলেন, ‘তা হ’লে ওকে দিয়ে দাও আমাকে। আমি ওকে দিয়ে প্রকৃত কাজ আদায় ক’রে নেব। ও খাটি লোক। দেবে ওকে?’

‘উইথ নো রিগ্রেট!’—হেসেছিলেন চীফ।

“ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আজ আমি উঠে এসেছি এইখানে। গ্রে সাহেবই অবশ্য এর জন্ত প্রধানত দায়ী;—কিন্তু তবু আমার মনে হয়—আমার উন্নতির মূলে রয়েছে সেই একদিনের গৌরাত্ম্য।”

ওদের গাড়ি তখন হাওড়া ব্রীজে উঠেছে।

ঋতব্রতের ভায়েরি থেকে খানকতক পাতা তুলে দিচ্ছি।

“কাল সকালে ক্যাম্পে ফিরে আসা গেল। পরশু সারা দিনটা চষে বেড়িয়েছি সারা কলকাতা। বন্ধু-বান্ধব যার বাড়িতেই গেছি খোঁজ নিতে—সে-ই অল্পপস্থিত। এক একটা দিন এমনিই হয়। ভাগ্য যেন দিনের সবক’টি যাত্রাকে নিখল করবার উদ্দেশ্যে আগে থেকে ওদের সরিয়ে দেয়। রেখাদের বাড়িতে সকালে গিয়েছিলাম—তখন সে ছিল না। সন্ধ্যাবেলা আবার আসব বলে এসেছিলাম। অথচ দেখি সে সন্ধ্যায় সিনেমায় গেছে। রেখা যে আমাদের এড়িয়ে চলতে চায়, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান। চিঠিপত্রও লেখে না বহুদিন। সন্দেহ হচ্ছে আমার পূর্বের আশঙ্কা অমূলক নয়। আমার চিঠি পাওয়ার পরই সে মধুপুরে রওনা হয়। মধুপুরেই গিয়েছিল কিনা কে জানে? হয়তো একটা Pleasure trip দিয়ে এল কোথাও অমল ঘোষের ‘উইনসাম ম্যারো’ সেজে। হবে নাই বা কেন? অমল ঘোষ বড়লোকের ছেলে। ব্রিক্‌লেস হ’লে কি হবে উর্বরতন চতুর্দশ পুরুষই ব্যবস্থাপনা পাকা ক’রে গেছেন অধোস্তন চতুর্দশ পুরুষের অধোগমনের। স্ততরাং রেখার মনের কথা আজ বোঝা সোজা। তার সব প্রাণেলিকার অবসান হয়েছে। শ্রীমতী রেখা আজ আমার কাছে ‘সরল-রেখাই,’ যদিও নগদ পেলাম তার প্রস্থের বিস্তারটাই—জ্যামিতিক অর্থে। ভালো। খেলায় হারজিত আছেই—কিন্তু সাতখানা গোল খেলেও পরাজিত দলকে একবার খেলা সমাপ্তির টানা হুইস্‌লটা শুনিয়ে দেওয়া হয়! আমার খেলা যে ফুরোল সেটা স্পষ্ট জানিয়ে হুইস্‌লটা বাজিয়ে দেওয়ার ভঙ্গতাইটুকুও কি আমি আশা করতে পারি না?

কলকাতার চীফের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও বোকা হলাম। তিনি কাজের কথাই আলোচনা করলেন শুধু। যে জন্তে কলকাতা গেলাম সে কথা বলবার উপক্রম করতেই থমকে উঠলেন, ‘আই ডোন্ট লাইক টু হিয়ার য়োর পারসোনাল ম্যাটার্‌স্‌, বোস। অ্যাপার্ট ক্রম সার্ভিস কণ্ডাক্ট ক্লস, আই হোপ য়ু হ্যাভ য়োর ওন সেল অব মরালিটি।’

এই সময় পিয়ন এসে দাখিল করল একটা ভিজিট কার্ড।

সেটা দেখে তিনি বললেন, ‘আনে বোলো।’

তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে ও প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে গেল।

ক্যাম্পে যখন এসে পৌঁছলাম—মেজাজটা খিঁচিয়েছিল। আমার ঘরের সামনে এসে দেখি বিরাট জটলা! বারান্দার একখানা চেয়ার পেতে তফাদার সাহেব আসীন। ঘটনাটা মুখরোচক তো বটেই—নাটকীয়ও! এঁরা সমবেত হয়েছেন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে—ক্যাম্পে দুর্নীতি বন্ধ করতে। রান্নাঘরের ভিতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে কুসুম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শোনা গেল নাপিত ডেকে তার

কেশমুণ্ডন করা হয়েছে। শান্তিটা সামান্যই—এই সেদিনও ইংল্যাণ্ডে ডাইনীদেব
পুড়িয়ে মারার নজির আছে। কুসুম ছ' নম্বর আসামী। প্রধান আসামীর দেখা
পেলায় না—তাকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। রতন তো আমাকে দেখে
হাউমাউ ক'রে উঠল। তাকে থামিয়ে দিলাম। ঘটনাটা শোনা গেল তফাদারের
মুখে। অপরাধ গুরুতর। এদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি না থাকলে এই রকম দুর্নীতি বন্ধ
করা যেত না।

আগের দিন তারাপদকে বাগ থেকে নামতে দেখেছিল ক্যাম্পের কয়েকটি সমাজ-
সেবী উৎসাহী কর্মী। তারা খবর রাখে আমি কলকাতা গিয়েছি এবং আমার
অসুস্থস্থিতির সুযোগ নিয়ে রতনও গেছে গোলবাজারে যাত্রাদলের আসরে। কুসুমকে
তার নির্দিষ্ট ব্যারাকে রাত দশটার সময়েও ফিরতে না দেখে এদের সন্দেহ হয়।
অতঃপর অনুসন্ধান করা হয় আমার ঘরে। সেখানে দরমার দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে
দেখতে পাওয়া গেল কুসুম ও তারাপদকে আপত্তিজনক অবস্থায়।

দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর হঠাৎ পাওয়া নির্জন সুযোগটা ওদের হয়তো একটু বেশী
আত্মহার্য ক'রে দিয়েছিল। কারণ সমাজসেবীরা দরজার বাইরে থেকে শিকল
ভুলে দিয়ে তফাদার প্রমুখ গণ্যমান্য কয়েকজনকে নিয়ে আসবারও সময় পায়।
মধ্যরাত্রে লঠনের আলোয়, সোরগোলে মুখরিত হ'য়ে ওঠে এলাকাটা। বিনা
থরচার সার্কাস দেখবার দর্শকের অভাব হয় না কোথাও। ভাঙা যাত্রার আসর
থেকে রতনও ফিরে এসেছে সেই সময়।

কাল অত রাত্রে ব্যবস্থা করা যায় নি, তাই আজ আমারই বারান্দায় হচ্ছে কোর্ট-
মার্শাল! প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা সবাই হাজির। বিচারপতি নিজেই নাকি প্রধান
সাক্ষী। বিচারে জুরীরা অর্থাৎ তাবৎ দর্শক আসামীদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করলেন।
বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পের পেনালকোডে বলে এ অপরাধে পুরুষ অপরাধীকে
ফরিয়াদী পক্ষের লোকেরা চাঁদা ক'রে চপেটাঘাত বর্ষণ করবে এবং নারী
অপরাধিনীর গায়ে হাত দেওয়া যাবে না—শুধু তার মস্তক মুণ্ডন করা হবে।
প্রথম শাস্তিটি বিচারের পূর্বে এবং দ্বিতীয়টি বিচারের পরে সম্পন্ন করাই প্রথা।
আমি আসবার আগেই পরামানিক ছ' নম্বর আসামীর শাস্তিবিধান সমাপ্ত
করেছে। বারান্দার এক পাশে ধূলোকাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে মেথরুক্ষ একরাশ
চুল।

মনে পড়ল আর একদিনের কথা।...ছোট বোন কামিনী রোয়াকের খুঁটি ধরে
দাঁড়িয়ে দেখছিল বিফারিত চোখে। উঠান ভরে গেছে এক গাঁ লোকে। ধূলো-
কাদায় উঠানের উপর বসে আছেন মা। তাঁর কোলে মাথা গুঁজে পড়ে আছে

দিদি—একরাশ খোলা চুল লুটোচ্ছে কাদার।

সেই একই দৃশ্য ;—তফাতের মধ্যে এখানে কাদামাথা চুলগুলো গুর দেহচ্যুত, এখানে নেই মায়ের কোলে মাথা গৌজার সান্না—আর বোধহয় তফাত এই যে এখানে বিচার ক’রে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে—এবারে গুণ্ডা কর্তৃক ধর্ষিতা নয় সে !

তফাদার বললেন, “মেয়েটাকে এখুনি চলে যেতে বল ক্যাম্প ছেড়ে। রাস্তার গিয়ে বসে থাকুক। তারাপদ অবশ্য দু-চারদিন ক্যাম্পেই থাকবে এখন।”

কে একজন ছকুম তামিল করতে যাচ্ছিল ; হয়তো ধরেই আনতো কুসুমকে। বাধা দিল রতন। বললে, “বেশ তো। সাহেব তো এসে পড়েছেন। ব্যবস্থা উনিই করবেন এখন। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?” বেশ বাগিয়ে বললে কথাটা—সেই হাউমাউ ভাবখানা নেই। তার বাধা দেবার ভঙ্গিতে খতমত খেয়ে থেমে গেল লোকটা।

কর্ণাভূন যদি কখনও মঞ্চস্থ করি, কথা দিচ্ছি রতন, বিকর্ণণ রোল তোর বাধা !

থেকিয়ে উঠল মারমুখী জনতা।

নরম সুরে হেসে তফাদারকে বললাম, “কেশাকর্ষণ পর্যায়টা তো স্তম্ভস্পন্ন হয়েছে—রাজসভার মাঝে বস্ত্রহরণ পর্বটা কি না করলেই নয় ? সর্বসমক্ষে পথে আর তাকে নাই বার করলেন !”

তফাদার কথাটার জবাব দিলেন না। হয়তো বিচারকও আইনের দাস। এতটা করতে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল না। জবাব দিলেন ডেপুটি ক্যাম্পসুপার ভৈরবচন্দ্র, “দুঃশাসনরা চেষ্টা করলেই কি দোপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হয় ? কলির কেউ ঠাকুর ঠিক সময় হাজিরা দেয়ই !”

সে কথায় কর্ণপাত না ক’রে তফাদারকে বলি, “গুর মাথাটা কামিয়ে দেওয়াই বোধহয় চরম শাস্তি হয়েছে। এরা চলে যাক, আমি কুসুমের যাওয়ার জন্ত গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করছি।”

“উঃ ! কী দরদ রে !”—জনতার কণ্ঠ।

মাথা তুলে মনে হ’ল দ্বিতীয় সারি থেকে কথাটা বললে বড়খোকা।

আমি তফাদারকে বললাম, “এদের এখন যেতে বলুন।”

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বড়খোকা। “আমরা সরকারী জমি খারাইয়া আছি।”

এ উক্তি তে ক্যাম্প-সুপার তফাদার কোনও প্রতিবাদ করেন না। বুঝলাম তাঁরও অহুমোদন রয়েছে কথাটার। এবারও ধীরকণ্ঠে বললাম, “মিষ্টার তফাদার, আশা করি আপনি এদের বুঝিয়ে দেবেন যে আমার বাড়ির সামনে কাউকে আমি

এভাবে হুঁসা করতে দেব না।”

তফাদার উঠে দাঁড়ালেন, “বেশ তো মেয়েটাকে আপনিই বার ক’রে দিন না কেন?”

“না, তা আমি দেব না।”

“কেন জানতে পারি কি?” প্রশ্নটা ভৈরবচন্দ্রের।

“আমার খুশি।”

অল্পলতম একটা ইঙ্গিত ভেসে এল ভিড়ের মধ্য থেকে। জনতার মধ্যে রয়েছে টিকাদরের লোক, মিস্ত্রি, মজুর, গুয়ার্ক-সরকারেরা। রতনও আছে। এবার ধৈর্যচ্যুতি হ’ল আমার—

“ক্যাম্পটা আপনার হ’তে পারে, এ ঘরখানা আমার। আমি দুঃখিত মিস্টার তফাদার, কিন্তু আপনি যখন এই সব কথা বরদাস্ত করছেন, তখন আপনাদের এখান থেকে চলে যেতে বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।”

তফাদার তখন দাওয়া থেকে নিচে নেমেছেন। বললেন, “আমি যাচ্ছি, কিন্তু কতদিন পরে মেয়েটিকে ছেড়ে দেবেন জানতে পারি কি?”

“পারেন। যতদিন না তারাপদ আরোগ্যলাভ করে, একমাসও হ’তে পারে, বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।”

আবার একটা কি মস্তব্য শোনা গেল ভিড়ের মাঝে। এবার গর্জে উঠলেন তফাদার। ভিড় পাতলা হ’য়ে গেল। তফাদাররাও চলে গেলেন।

ঘরে এসে বসলাম। ক্যাম্প এসে সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করেছে। একজন মাত্র বন্ধু পেরেছিলাম ক্যাম্পে। খোয়ালাম আজ। মনটা আরও খারাপ হ’য়ে গেল। রতনকে বললাম, কুসুমকে বলে দিতে সে যেন বাড়ির বাইরে না যায়। তার জন্য ছুটি বেশী চাল নিতে বললাম হাঁড়িতে। রতন বললে, “আজ একাদশী।”

রান্না কুসুমই করল। সামলে নিল সে নিজেকে, অলঙ্কারেই। অনেক দুঃখের আঁগুনে পুড়ে কঠিন হয়েছে সে। অপমান তার অঙ্গের ভূষণ!

দুপুরে দেখতে গেলাম তারাপদকে। আমাকে দেখে কি বলতে গেল, পারল না। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা। হাতখানা তুলে দেখাল— ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা।

ফিরে এলাম ঘরে। কাজে গেলাম না সারাদিন। চুপ ক’রে পড়ে থাকলাম শুধু। কুসুমকে আমার বাড়িতেই রাখব, যতদিন না ভালো হয় সে। এতে যে যত বাধা দিতে আসে আশুক, শুনব না। মনে পড়ল সঞ্জীব চৌধুরীর কথাগুলো। অফিসের ভাক নিয়ে এল রতন। চিঠি, চিঠি, আর চিঠি। বিল, প্রোগ্রেস রিপোর্ট আর

প্রার্থনা। একথানা চিঠি এসেছে দেখলাম নতুন ধরনের। ক্যাম্প থেকে একটি দরখাস্তে জানানো হয়েছে এল/২২ নম্বর ব্যারাকে কমলা নারী একটি মেয়ের স্নীলতাহানি করবার চেষ্টা করেছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোন স্টাফ। নাম উল্লেখ নেই—না অভিযোগকারীর না আসামীর। গোপনীয় ছাপ মার্কা সেটা এসেছে আমার কাছে অস্বস্তিকর এবং রিপোর্ট করার নির্দেশ সমেত। এ ভালো কাজ হয়েছে আমার!

সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ভালো লাগে না। পায়ে পায়ে চললাম এল/২২ ব্যারাকের উদ্দেশ্যে। আজও দেখলাম বৃদ্ধ ব'সে বিড়ি পাকাচ্ছেন—পাগলটা কয়েকটা কাককে খাওয়াচ্ছে উচ্ছিন্ন ভাষায়। সামনের মাঠে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে আর উড়ে উড়ে কাকগুলো খাচ্ছে তাই। মাঝে মাঝে উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠছে পাগল। বড়খোকা নেই, কমলার মাকেও দেখলাম না। পার্টিশনটা গাঁথা শেষ হয়েছে দেখছি। কমলা একটা ছেঁড়া শাড়ির প্রান্ত সেলাই করছিল। আমাকে যে দেখেছে তার প্রমাণ পেলাম আমার দিকে ভুলেও একবার তাকালো না দেখে। অস্বস্তিকরটা কি করে করা যায়? কমলার মা ফেরা পর্বন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বসলাম গিয়ে বৃদ্ধের কাছে।

“আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।”

চশমাটা কপালের উপর তুলে, আমাকে দেখে বৃদ্ধ হকচকিয়ে গেলেন—
“আউহাইন, আউহাইন, বউহাইন,—আর বইবানই বা কই?” উঠে দাঁড়ালেন তিনি শশব্যস্তে!

কাঠের একটা ছোট বাস্ক টেনে ততক্ষণে আমি ব'সে পড়েছি। আলাপ হ'ল বৃদ্ধের সঙ্গে। আদি বাড়ি মৈমনসিং জিলা, থানা বাজিতপুর, গ্রাম মামুদপুর। বিড়ির বাগিল আর কুলো ভর্তি তামাকপাতা সরিয়ে রেখে বৃদ্ধ ভালো হ'য়ে বসেন গল্প করতে। বৃদ্ধের নাম রামনিধি চৌধুরী, বারেক্স ব্রাহ্মণ, আসল উপাধি লাহিড়ী। তার পৈত্রিক ব্যবসা পোরহিত্য করা। ঘরে সাতপুরুষের ৩নারায়ণ ছিলেন। ঊরই সেবা করতেন। বিংশ-পঁচিশ ঘর বর্ধিষ্ণু যজমান ছিল। পাঁচ ঘর থেকে যা পেতেন তার উপর ছিল রানীপুরের জমিদারের মাসোহারা। গল্প বলতে বলতে মেতে উঠলেন বৃদ্ধ। যেন ফিরে গেছেন তিনি জন্মভূমিতে। প্রকাণ্ড চক্কেলানো রানীপুরের জমিদারবাড়ি। সামনে বা'র মহল, এ পাশে কাছারি—তারপর একটা বিরাট অঙ্গন পার হ'য়ে অন্দরে আসতে হয়। বা'র বাড়ি আর অন্দর বাড়ির মাঝের অংশটায় গোল-পোস্ট পুঁতলে অনারাসে ফুটবল খেলা চলে। অন্দর মহলেও বিরাট ব্যবস্থা। বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবু আর ছোটবাবুর তরফ।

প্রত্যেক তরফে কাজ করবার জন্তে আলাদা চাকর, আলাদা ঝি। এপাশে সমস্ত পশ্চিম দিকটা জুড়ে রান্নাঘর। পশ্চিম দিকের দীঘির পাড়ে রানীগুরের বর্তমান জমিদারের প্রপিতামহ বরেন্দ্রকিশোর লাহিড়ী চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত “ধর্মরাজ” শিবলিঙ্গ। প্রচলিত নাম “বুড়ো রাজা”। বরেন্দ্রকিশোর এ পরিবারে দত্তক এসেছিলেন বর্মান থেকে, শিবের নামকরণ থেকেই সেটা অঙ্কমান করা যায়। সরোবরের ভিতর একটা নকল দ্বীপ, তার মাঝখানে খেত পাথরের একটা বাঁধানো চত্বর। কাঠের সেতু বেয়ে দ্বীপে যাওয়া যায়। মেজবাবুর ছিল বাগানের শখ—তাঁর লাগানো পদ্মফুলে লাল হ’য়ে থাকতো দীঘিটা।

বাধা দিয়ে বলি, “জমিদারের কথা থাক, আপনার কথা বলুন।”

হাসেন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ, “আমার কথা আর কি কইতাম বাবা? আছলাম জমিদারের পুত্র, অহন হৈছি সরকারের পুত্র!”

যেন একটা চরম রসিকতা হ’ল। প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি হা হা ক’রে। হাসির ধমকে কমলা একবার মুখ তুলে চাইল শুধু। আবার শুরু করেন তাঁর গল্প। দেশের কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হ’য়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

বর্ষায় ভেসে যায় দেশ। যে মাঠে কপাটি খেলত ছেলেরা ফাগুন-চৈত্র মাসে, সেখানে পাঁচ সাত হাত ঘোলা জলের ঘূর্ণিপাক ভেসে চলে। এপাড়া ওপাড়া যাতায়াত করতে হয় ডিঙি নৌকায়। তবুতবু বাড়ে জল। সন্ধ্যায় দেখা দৃশ্য বদলে যায় সকালে। জলের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে ধানের চারা। সেই ধান যখন পাকে, নৌকা ক’রে কাটতে যেতে হয়। তলাকার খড়গুলো অবশ্য পায় না চাষীরা। পচে যায় জলে। তা থাক, ধানই মা লক্ষ্মী—সেখানে মায়ের অক্লপণ দান! সেই জল একদিন সরে। তরতরিয়ে সরে যায় গৈরিক বসনা চঞ্চলা মেয়েটি। পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে তলা থেকে দেখা দেয় নীচেকার মাটি। আর সেই সঙ্গে আকাশে এসে জোট পাকায় পুঞ্জ পুঞ্জ তুলোপেঁজা মেঘ! নৌকা ছেড়ে পথে পা দেয় মাছ। এই মহালায়েই হয় মায়ের বোধন। সে ৬মহাপূজার আনন্দ কোথায় পাবেন?

গলা ভারি হয়ে আসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের। উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকান তিনি।

তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে মায়ের মূর্তি,—“মা যা ছিলেন!”

আমার দেরি হ’য়ে যায়। বাধা হ’য়ে বৃদ্ধকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁদের ত্যারাকে আমার কোনও কর্মচারী কখনও কোন দুর্ব্যবহার করেছে কিনা। বৃদ্ধ বিস্মিত হন, বলেন, “কই না!”

কমলার মা তখনও ফেরেন নি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আমি উঠি। বৃদ্ধ উঠে

হাত দুটি জোড় করেন। আমি কমলার দিকে এগিয়ে আসি। সেও উঠে দাঁড়ায়।
“তোমার মাকে বল তো সময়মতো আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে।”

“মার যাওয়া সম্ভবপর হবে না।”

নত নয়নেই বলল কথা ক’টা। মনে পড়লো তার মা’র সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিন
ক’টা কড়া কথা বলেছিলাম। ও! তাই উনি যেতে পারবেন না। বললাম, “খুব
পারবেন। এই তো আমি এসেছি তাঁর কাছেই। তিনি নেই তাই ফিরে যাচ্ছি।
তুমি তাঁকে বল কাল একবার আমার ওখানে যেতে।”

“তাঁর যাওয়া সম্ভব নয়—তাঁর শরীর খারাপ।”

স্পষ্টই বোঝা যায় মিথ্যা কথা বলছে কমলা—নাহ’লে তার মা বাইরে বেড়াত
না এই সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাগ হ’য়ে গেল। বললাম, “ভালো কথা। তবে কর্তব্যটা
এখনই সেটুরে যাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। আমার কোন কর্মচারী তোমার,
মানে, তোমাদের উপর কোনও দুর্ব্যবহার করেছে কি?”

“দুর্ব্যবহার?”

“হ্যাঁ, মানে কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আছে তোমার?”

“কেন বলুন তো?” চোখে চোখে চাইল কমলা স্পষ্ট ক’রে।

“তাহ’লে আমি তার প্রতিবিধান করতাম।”

একমিনিট চুপ ক’রে রইল কমলা। একটু ইতস্তত ক’রে বললে, “ক্যাম্পে এতলোক
থাকতে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে এ সন্দেহ হ’ল কেন আপনার?”

“কারণটা তো বোঝই; এবং সে সম্বন্ধে তোমাকে বেশ সচেতনই মনে হয়।”

কমলার মুখখানা লাল হ’য়ে উঠল ক্ষণিকের জন্তে—কিন্তু আঘাতটা সে ফিরিয়ে
দিলে দৃঢ়স্বরে, “সে সম্বন্ধে সচেতন না হ’য়ে উপায় কি? আপনারা পাঁচজনেই
তো আরও সচেতন ক’রে তুলেছেন আমায়!”

আশ্চর্য! নতমুখী মেয়েটাকে যতটা লাজুক, যতটা সাধারণ মনে হয়েছিল সে তো
তা নয়! ভেবেছিলাম আমাকে অগ্রসর হ’য়ে কথা বলতে দেখেই বুঝি জড়পুটুলির
মতো শঙ্কুবৃত্তি গ্রহণ করবে। তা তো নয়ই, বরং কাটা কাটা কথায় আঘাত
করতে ছাড়ে না। বললাম, “আমরা পাঁচজন? অর্থাৎ আমিও! তোমার বড়
বড় চোখ দুটোয় তো অনেক কিছুই ধরা পড়ে।” বলেই দংশন করলাম জিহ্বা!
এ কথাটা কেন বললাম! ছি ছি! মেয়েটা কি ভাবল?

কি যে ভাবল তা বোঝা গেল পরক্ষণেই। দপ্ ক’রে জলে উঠল ওর চোখ দুটি:
“নিশ্চয়ই! কেন নয়? ক্যাম্পের আর কোনও ঘরে তো পার্টিশন হ’তে দেখলাম
না?...যাই হোক আপনি অনেক উচুতে; আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার

শোভা পায় না। আপনার প্রশ্ন ছিল কম্পট্রাক্সন ডিপার্টমেন্টের কেউ আমার প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করেছে কিনা। আমার জবাবটাও শুনে যান। ই্যা হয়েছে। তবে সে অভিযোগ আমি এমন কোনও অফিসারের কাছে করতে চাই, যিনি অপরিচিতা যুবতীর চোখ বড় বড় কিনা লক্ষ্য করেন না।”

কানে কে যেন লিশা টেলে দিল। ক্যাম্পে এসে ঝগড়া করেছি অনেকের সঙ্গেই। মাথা ঊচু ক’রে প্রত্যাঘাত করেছি সকলকেই; অথচ এই এক ফোঁটা মেয়েটার কাছে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ’য়ে গেল। কোনরকমে বললাম, “তুমি আমার ক্ষমা কর। আমি সেভাবে কথাটা বলি নি। হয়তো অগ্নায়ুই হয়েছে আমার ও কথা বলা। তবু বিশ্বাস রুর, তোমাকে অপমান করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার।”

মাথা নীচু ক’রে ফিরে এলাম। বৃদ্ধ রামনিধি তখনও বসে আপন মনে বিড়ি পাকাচ্ছেন। পাগলটা বসে আছে বাইরে।

ঘরে ফিরে এলাম যখন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। ক্যাম্পের এখানে ওখানে শাঁখ বাজছে—কোথায় যেন কঁাসর ফটীও বাজছে। যেন ক্যাম্প নয়, এটা গ্রাম! দেখি ঘরের সামনে একটি গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর শুয়ে আছে তারাপদ। আমার প্রত্যাবর্তনের জগ্গেই ওরা অপেক্ষা করছিল বোধকরি। আমি আসতেই কুসুম বেরিয়ে এসে আমাকে ভূমিষ্ঠ হ’য়ে প্রণাম করল। তারপর গরুর গাড়িতে তারাপদের মাথার কাছে গিয়ে বসল। মালপত্র যে ক’টি ছিল আগেই তোলা হয়েছে গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দিল।

বুলালাম, রতনকে দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়েছে কুসুম। ডেকে ধমক দিলাম রতনকে, সে কেন জানায় নি আমাকে পূর্বাহ্নে। রতন চুপ করে গাল শুনল। বোধহয় হতভাগার ধারণায় কুসুমের চলে যাওয়াটাই তার মনিবের পক্ষে মঙ্গলকর মনে হয়েছে এবং এ-ও সে মনে করেছিল আগে জানলে আমি বাধা দিতে পারি। রাত্রে আহাঁরাদির পর রতন একটি বন্ধ খাম এনে দিল আমাকে। কুসুম এটা নাকি আমাকে দিতে বলে গেছে। খুলে দেখি তার মধ্যে রয়েছে একখানি চিঠি আর একটি ফটো। ফটোখানা ডায়েরিতে ধরে রাখা যাবে না তাই চিঠিখানাই শুধু তুলে দিলাম।

চিঠিখানা সত্যিই আমাকে বিহ্বল করেছে। এই তাই’লে কুসুমের ইতিহাস? আমার ক্যাম্প জীবনে কুসুমের নাটক এখানেই শেষ। তাই ভাবছি নাটকটা বিরোগাস্তক, না মিলনাস্তক,? মেলোড্রামা নয় তো?

‘শ্রীচরণকমলেশু,

আপনার দয়া ও দাক্ষিণ্য জীবনে ভুলিব না। আমার জীবনের অনেক কথাই রতনদা আপনাকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছে জানি,—নিজের কানেও কিছু শুনিয়াছিলাম কিন্তু একটা কথা রতনকে আমি বলি নাই, কাহাকেও বলি নাই। বলিবার উপায় ছিল না। আপনাকে আজ তাহা না বলিয়া যাইতে পারিতেছি না। কারণ সত্যটা আপনার নিকট গোপন করিয়া গেলে আপনার নিকট একজন অযথা মিথ্যাবাদী থাকিয়া যাইবেন। আমি ঘৃণ্য জীব—আমার কথা ভাবি না—কিন্তু উনি আপনাকে মিথ্য ব বলেন নাই। আমার সহিত তাহার কোনও অবৈধ সম্পর্ক নাই।

আমি জানি আমার একথা আজ বিশ্বাস করা কঠিন। তাই প্রমাণ-স্বরূপ এই ফটোখানি রাখিয়া গেলাম। এটি আমার বিবাহের পরদিন আমার দাদা তারাপদ উঠাইয়াছিলেন। আমার এপাশে মা, পিছনে হরিহর গাঙ্গুলী মহাশয়। দাদা ফটো তুলিয়াছিলেন—চিত্রে তিনি নাই।

ফটো দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ষাঁহাকে আপনি তারাপদ নামে চিনেন তিনিই আমার স্বামী। তাঁহার আসল নাম বিশ্বনাথ। আমার দাদা পথেই মারা যান। পথে শুনিয়াছিলেন আমার স্বামী মারা গিয়াছেন। অনাথা বিধবা বলিয়া পি. এল. কার্ড পাই এবং ক্যাম্পে আশ্রয় পাই। আমার স্বামী গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘদিন পরে খুঁজিতে খুঁজিতে আমার সাক্ষাৎ পান এই ক্যাম্পে। তখন তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে। ফেরান্নী আসামী বলিয়া এবং ভয়-স্বাস্থ্যের জন্ত রোজগারের কোনও ব্যবস্থাই তিনি করিতে পারেন নাই। তাই আমার বৈধব্য-বেশ ঘুচাইতে পারি নাই। আশা ছিল শীঘ্রই স্বামীপুত্র লইয়া আবার সংসার পাতিতে পারিব; কিন্তু আজ যে অবস্থায় ওনাকে লইয়া যাইতেছি—ভয় হয় এ বেশ পরিবর্তনের স্রোতঃ হয়তো আর ইহজীবনে আসিবে না।

এ জীবনে এ কলঙ্কিনী মুখ আর কখনও দেখিবেন না। বিচারে ষাঁহারা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু বলিতে পারেন কোন পাপে আজ আমরা এই অপরাধে অপরাধী?

আপনার সৌজ্ঞ্য ও মহাশুভবতার কথা জীবনে ভুলিব না।

—ইতি প্রণতা হতভাগিনী কুম্ম।

‘পু:—ফটোখানি নষ্ট করিয়া ফেলবেন।’

হুম্মের শেষ অস্থরোধ রাখে নি ঋতব্রত। তার কাছে সেই ফটোখানা দেখে-
ছিলাম। বরবধু বেশে কুসুম ও বিশ্বনাথ। ঋতব্রত বলেছিল গালের ঐ আঁচিলটা

মুখের আদলটা না থাকলে বিশ্বনাথকে চেনাই যায় না ফটো দেখে। সুন্দর
স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষের ফটো। বরকনের ছবি।

ক্যাম্পের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। মেমপাড়ার ঘরগুলো সবই সারানো
হ'য়ে গেছে। বকুলতলার সমস্ত ঘরও মেরামত শেষ হয়েছে। কাজ জোর চলেছে
এখন গলাদ' অঞ্চলে। স্টেশন রোড থেকে গোলবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলটায়
এখন কাজের চাপ বেশি। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখে ঋতব্রত। একথেকে কাজে
বিরক্তি আসে তার। বর্ষা ভালোভাবেই নেমে গেছে। তফাদারের ঘরটা এখনও
ছাওয়া হয় নি। তিনি দেন নি। বৃষ্টির মধ্যেই মালপত্র টানাটানি করেন।
হাসপাতালটা সারানো হয়েছে। লেডিজ ওয়েষ্টিং রুমটা তৈরি হয়েছে;
ডাক্তারের জন্তে একটি বাড়তি চাকরের ঘরও তোলা হয়েছে। বিশেষ আদেশ
আনিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। বেশ ঘটা ক'রে নতুন ঘরটির উদ্বোধন করলেন ডাক্তার
সাধুচরণ। এক সন্ধ্যায় নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন বন্ধুকে। তফাদার
অবশ্য সেদিন কলকাতা গিয়েছিলেন। ডাক্তারের তাতে খুব অসুবিধা হয় নি
অবশ্য। রামশরণ তার ইয়ারবন্ধু নিয়ে এসেছিল। উপস্থিত ছিলেন, ডেপুটি-সুপার
ভৈরবচন্দ্র। অনেক রাত পর্যন্ত পানাহার চলেছিল। গুজব, নিমন্ত্রণকর্তা ডাক্তারবাবু
হ'লেও সমস্ত খরচ রামশরণের।

ক্যাম্পের একটানা জীবনে বৈচিত্র্য নেই। ভিড় হয় ডোল অফিসের কাউন্টারে।
কার্ডে দাগ দিয়ে হিসাব ক'রে টাকা দেন ললিতবাবু—ডোল ক্লার্ক। মাথাপিছু
ট্রার টাকা নয় আনা ক'রে পায় প্রাপ্তবয়স্করা একপক্ষকালের জন্তে। ছোটরা পায়
তিন টাকা দুই পয়সা। প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যাটা এখানে বিচিত্র। আট বছর বয়স
হ'লেই এরা সবালাক পি. এল. ! এই আট বছর বয়স হয়েছে কি না এ নিয়ে কি
বাক-বিতণ্ডা হয় এক একদিন।

ক্যাস-ডোল অফিসের উন্টোদিকে রেশনের গুদাম। থলি ভরে রেশনও নিয়ে যায়
কার্ডে লিখিয়ে। দু' সের চাল, দু' সের আটা আর চৌদ্দ ছটাক ডাল। পনের
দিনের রসদ। আট বছরের কম বয়স হ'লে অর্ধেক রেশন। রেশনের গুদামে
ইঁদুরের গর্তটা আর কিছুতেই বন্ধ করতে পারলে না ঋতব্রত। সমস্ত মেজেটা খুঁড়ে
নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চার ইঞ্চি সিমেন্ট কংক্রিট ক'রে দিল চার : দুই : এক মসলা
দিয়ে। অথচ দুর্দমনীয় ইঁদুরের দল এই কুলিশকঠোর কংক্রিট ভেদ ক'রে উঠে
আসে। এ নিয়ে বছবার বকাবকি শুনতে হয়েছে তাকে। কিন্তু ইঁদুরগুলোও

নাছোড়বান্ধা। ছেনি নয়, হাতুড়ি নয়, শুধু নখ আর দাঁত দিয়েই ওরা অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে চলেছে। এখনও প্রতি মাসে ইদুরের খাতে একটা বিরাট অঙ্ক খরচ লেখা হয়। বড় বড় চিঠি আসছে কৈফিয়ত তলব করে—নিশ্চয়ই ঠিকমতো মঙ্গলপ দেওয়া হয় নি, না হ'লে কি ক'রে গর্ত হয় ?

মহুরগতিতে চলে ক্যাম্পের জীবন। দিন আনে, দিন খবচ করে ওরা। কোনও ভাবনা নেই, কোন চিন্তা নেই। অস্থখ হ'লে ভগবানকে ডাকে, ডাক্তার ডাকে না। সম্ভাবন হ'লে প্রথম কর্তব্য হ'ল কার্ডে লিখিয়ে নেওয়া—মরে গেলেও হাঙ্গামা নেই—খবর দিয়ে আসে ক্যাম্প-অফিসে। ওদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, চাল-চুলো-ঘর-বাড়ি কিছুই বালাই নেই। একেবারে কোপীনবস্ত্র খলু ভাগ্যবস্ত্র। কিন্তু ঋতব্রতের মনে হয় সবচেয়ে বড় 'নেই'টা হচ্ছে এদের ভবিষ্যতের চিন্তা। ওদের জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা যেন পড়ে গেছে ক্যাম্পে ঢোকায় পরেই। আর কারও কিছু করণীয় নেই—অভ্যাগমতো দিনে কয়েকবার হাছতাশ করা ছাড়া। মীরাবাঈ যেমন তহ্মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন কৃষ্ণে—এরা তেমনি সমস্ত সমর্পণ করেছে সরকারকে ! দায় ঝঙ্কি নেই কোন !

দীনতম দিনমজুর, দরিদ্রতম কৃষক, কলকাতার ফুটপাতে শায়িত ভিক্ষুককেও দেখেছে সে। তাদেরও থাকে আয়ের চিন্তা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এদের তাও নেই। এদের তুলনায় কয়েদীদের জীবনও ভালো, বরণীয় কনসেন্টে সন ক্যাম্পের জীবন। প্রথম জন স্বপ্ন দেখে মুক্তি দিনের, দ্বিতীয় জন প্রত্যাশা করে যুদ্ধাবসনের। ফাঁসীর আসামীরও থাকে একটা স্বনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিণতি।

হঠাৎ নিজের উপরই বিরক্ত হয় ঋতব্রত। সে কি অগ্রায়্য করছে না এদের প্রতি ! ঐ তো বুদ্ধ ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরী বিড়ি বানাচ্ছেন—ঐ তো নীচের রাস্তার উপ' বিছিয়ে ধান শুকোচ্ছে ওরা। গৃহসংলগ্ন একমুঠো জমিতে লাউ-কুমড়া-ঢাড়াঙ্গ গাছ লাগিয়েছে সবাই। বাঁচবার জন্তে আকাঙ্ক্ষা কি ওদের কম ? এই পরিবেশে তো পঁচিশে বৈশাখে স্মরণ করেছে কবিকে—যখন তার মনেও ছিল না লেকখা ! এদের জন্তে মাসে মাসে বছরে বছরে অপরাধী হস্তে সরকার খরচ ক'রে চলেছে এদের প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো পর্যাপ্ত নয়, তবে সরকারের তহবিলের পক্ষে তা ক্ষমতার অতিরিক্ত। যতটা খরচ হয় সবটা ওরা হাতে পায় না, তবু তো এর আঙ্গু প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু এ বাঁচার শেষ কোথায় ?

আট-দশ বছরের যে নাবালক ছেলেটি মায়ের হাত ধরে একদিন ঢুকেছিল ক্যাম্পে আজ সে হয়তো পনের-ষোল বছরের প্রাণচঞ্চল কিশোর। তবু আজও সে ডোলডুক পি. এল. ! চল্লিশ বছরের পজু স্বামীটি যখন স্ত্রীর হাত ধরে ক্যাম্পে

খাতার নাম লিখিয়েছিলেন তখনও তিনি ছিলেন পি. এল.—আজও তাই। কিন্তু এই হুঁশাত বছরে তিনি যে তিনটি রুগ্ন শিশুকে পৃথিবীর আলোকে নিয়ে এলেন, তারাত পি. এল. ! এই অনন্তপথযাত্রীদের শেষ তীর্থ কোথায় ?

“শ্রার !” রতন এসে দাঁড়িয়েছে।

“কিরে ?”

“কমলা এসেছে শ্রার। আপনার সঙ্গে দেখা করবে।”

“কমলা ? এখানে ? না তার মা ?”

“না শ্রার, কমলা নিজেই এসেছে।”

“ও আচ্ছা, ডেকে দে।”

কমলা এসে প্রবেশ করে। মলিন শাড়ি একখানি সাধারণ ক’রে পরা। গায়ে একটি ব্লাউজ। মাথার চুলগুলি রুক্ষ। বোধহয় কয়েকদিন তেল মাখে না, অথবা সাবান দিয়ে মাথা ঘষেছে। রতন ওকে পৌছে দিয়ে চলে যাচ্ছিল—ঋতব্রত ডেকে বললে ওর বিছানাটা পেতে দিতে। রতন বিছানা পাততে থাকে। নির্জন ঘরে কমলার সঙ্গে কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বোধহয়।

“বস” বললে ঋতব্রত।

কমলা বসল না। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আঁচলটা পাকাতো লাগল শুধু।

“বল, কি বলবে ?”

একটু ইতস্তত করে কমলা। আশে পাশে তাকায়। তারপর বলে, “আই ওয়াণ্ট টু স্পিক ইউ এলোন।”

ইংরাজী শুদ্ধ নয়, উচ্চারণও তথৈবচ। তবু ওর এ কথায় অবাক হল ঋতব্রত। এতটা সপ্রতিভ ভাব যেন আশা করে নি। সময় নেবার জন্তে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে ধরালো একটা। রতন বিছানা পেতে বেরিয়ে যায়।

“এবার বল। তোমার মাকে নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে ক’রে ? একা তোমার আসাটা ঠিক হয় নি। জানোই তো ক্যাম্পের ব্যাপার।

“মা আসতে পারতেন না। তিনি আঠারো দিন হাসপাতালে।”

“হাসপাতালে ? কেন, কি হয়েছে তাঁর ?”

“তা জানি না। তবে তিনি আর বোধহয় বাঁচবেন না !”

“কেন, এমন কি হয়েছে তাঁর ? রোগটা কি ?”

“দারিদ্র্য এবং দুর্ভাবনা বোধহয়। আরও উপসর্গ আছে।”

দু’জনেই চুপ ক’রে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঋতব্রতই বললে, “কই, তুমি তো

সেদিনও বল নি কিছু ?”

“আপনি তো জানতে চান নি।”

তা বটে ! মা যে অসুস্থ এবং হাসপাতালে পড়ে আছে এ খবর সম্পূর্ণ অপরিচিত যে তাকে জানাবার কি প্রয়োজন ? বললে, “যাক্, আমাকে কি বলবে ?”

ইতস্তত করে কমলা ।

“তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো। কোন সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই। সেদিন তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে। হঠাৎ আমিও বোধহয় বেফাঁস কিছুই বলে ফেলেছিলাম—কিন্তু আমি সে জাতীয় লোক নই।”

“না না, সেজ্ঞে আমি কিছু মনে করি নি সেদিন।”

“করেছিলে। না হ’লে কে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল আমাকে জানালে না কেন ?”

বড় বড় চোখ দুটি তুললে কমলা। চোখাচোখি হ’ল ঋতব্রতের সঙ্গে। সত্যিই কমলা হুন্দরী। কিন্তু না ! ঋতব্রত ওকথা ভাববে না আর !

“আপনার কর্মচারীরা কেউই আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে নি।”

“এ তুমি মিথ্যা কথা বলছ।”

“মিথ্যা কথা আমি বলি না।”

“বল। সেদিন বললে কেউ তোমাকে অপমান করেছে ;—আজ বলছ কেউই করে নি। একটা তো মিথ্যা নিশ্চয়ই।”

আবার চোখাচোখি হ’ল দু’জনের। হেসে ফেললে কমলা, “একটাও মিথ্যা কথা নয়। সেদিন রাগ ক’রে বলেছিলাম। আপনাকেই ‘মীনু’ করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি। আপনি যা কিছু করেছেন আমার ভালোর জগ্গেই করেছেন।”

“বেশ, এবার তা হ’লে বল তোমার বক্তব্য। না না, কোনও সঙ্কোচ করার দরকার নেই। তোমার বড় ভাই থাকলে যেভাবে বলতে সেইভাবেই খোলাখুলি বল তোমার বক্তব্য—”

“আপনি...আপনি...আমাকে অল্প কোথাও থাকার ব্যবস্থা ক’রে দিতে পারেন ? অল্প কোনও ব্যারাকে ? ব্যারাকে—”

“অল্প কোনও ব্যারাকে ? কেন বল তো ?”

“কারণ তো আপনি জানেনই। যে কারণে নিজের পয়সায় পার্টিশন করিয়ে দিলেন। মা আজ প্রায় তিন সপ্তাহ হাসপাতালে। ওখানে থাকা আমার পক্ষে আর এক রাজিও সম্ভব নয়। প্রথমদিকে লতিকাদি—সেই যে স্বামী-স্ত্রী পরিবার—তিনি এসে আমার দিকে শতেন। আজ চার পাঁচদিন স্ববলবাবু, মানে লতিকাদির

স্বামীর বুকের বেদনাটা বেড়েছে—জ্বরও হয়। তাই উনি আর শুতে আসছেন না। এ ক'রাত একেবারে...মানে...আপনি একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না আমার অন্ত কোনও ব্যারাকে যাওয়ার, যেখানে...মানে...মেয়েছেলেই বেশি ?”

“তা আমি কি করব ? এসব ব্যাপারে তফাদার সাহেবের কাছে যেতে হবে।”

“তফাদার সাহেব ছুটিতে আছেন। এখন ডেপুটি-সুপার ভৈরববাবু অফিসিয়েট করছেন। তফাদার সাহেব থাকলে কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু ভৈরবচন্দ্র... মানে...তিনি নিজেই একটু...ইয়ে প্রকৃতির।”

থেকিয়ে উঠল ঋতব্রত, “হোন ইয়ে প্রকৃতির। তোমাকে অন্ত ঘরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তো এমন কিছু নয় ;—এটুকুও কি তিনি করবেন না মনে কর তুমি অহুরোধ করলে ?”

কমলা প্রথমে গর গলার আওয়াজে চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই বুঝলে ধমকটা তাকে নয়—ভৈরবচন্দ্রের উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য। তাই হেসে বললে, “অহুরোধ করবারও দরকার হবে না ! আমি না বলতেই তিনি অন্ত ভালো ঘরে আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করতে উন্মুখ।”

“তবে তো মিটেই গেল সেখানে গেলেই পারো—”

“সেখানে যেতে পারলে আর আপনার কাছে আসব কেন ? এক গা গহনা আর আজীবনের ভরণপোষণ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে আপনার কাছে এ অহুরোধ নিয়ে আসার কারণ আছে কিছু নিশ্চয়ই !”

“ও ! ওটা আমি বুঝতে পারি নি !”

খানিকটা পরে বললে, “আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি কি করতে পারি। তোমাকে একটা দরখাস্ত করতে হবে ! আমি লিখে দেব তুমি সই করবে খালি। এক জাতীয় রিলিফ ক্যাম্প আছে, যেখানে শুধু মেয়েরাই থাকে—সেই রকম ক্যাম্পে চলে যাবার দরখাস্ত দিতে হবে একটা।” কমলা তবুও চলে গেল না।

“আরও কিছু বলবে আমাকে ?”

“হ্যাঁ, আর একটা কথা বলছিলাম। ইয়ে...”

“বল।”

“যতদিন কিছু ব্যবস্থা না হয় ততদিন রতনদা আমার ওখানে রাত্রে গিয়ে শুলে আপনার অসুবিধা হবে কি ?”

“রতন ? আমার পিয়ন ? ওকে তুমি কতটুকু চেন ?”

“বা চিনি তাই যথেষ্ট। রতনদা আমার সব কথাই জানে।”

“তবে তার সামনে বলছিলে না কেন ?”

“রতনদা শুধু বড়খোকার কথাই জানে ! বড় খোকা যে আসলে আরও বড় একদল লোকের আড়কাঠি তা সে জানে না।”

এটা ঋতব্রতেরও জানা ছিল না ! বড়খোকা লোকটি যে এতদূর কমতাশালী তা তারও ছিল অজানা। তাই কি ‘সেদিন তফাদার সাহেব তাকে ঘাঁটাতে সাহস করেন নি ?

“রতনদা ওখানে শুলে অস্থবিধা হবে কি আপনার ?”

“বিন্দুমাত্র না। তবে অস্থরোধটা তুমিই তাকে ক’র। তার আপত্তি না থাকলেই হ’ল।”

ঋতব্রত ভাবছিল ক্রমশ তার জ্ঞানোদয় হচ্ছে বুঝি। ক্যাম্পের অনেকের স্বপ্নপই সে বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে এখানে কি ভাবে সাবধানে চলতে হয়। তাই নিজের ঘরে কমলার সঙ্গে কথা বলার সময় রতনকেও আটকে রাখতে চেয়েছিল। অভিজ্ঞতা বাড়ে মাস্তুষের ক্রমশই।

সে ভুল তার ভাঙল পরদিনই। এল/২২ ব্যারাকে কাল রাত্রে চুরি হ’য়ে গেছে। চুরি গেছে বড়খোকার বাস্ম থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট। কোন রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে রতন পালিয়ে এসে খবর দিল ঋতব্রতকে। খবর পেয়ে ঋতব্রতও গিয়েছিল ঐ ব্যারাকে। সেখানে বড়খোকা সদলবলে উপস্থিত। শুনিয়ে দিল ওকে সবাই পাঁচকথা। যেমন মনিব তেমনি চাকর হবে তো? ...সাহেব যদি বাড়িতে বিধবা মেয়েমাস্তুষ রেখে ফুর্তি করতে পারে, তবে তার পিয়নই বা কেন একরাত ব্যারাকে ফুর্তি ক’রে যাবে না! ...তা, বেটা বিনি পয়সায় মজা নুটছিল লোট...টাকা চুরি করিল কেন?

সেখান থেকে ঋতব্রত গেল ক্যাম্প অফিসে। অফিসের ইনচার্জ এখন তফাদার নন। ভৈরবচন্দ্র। সাধুচরণের সঙ্গে বিশস্তালাভ করছিলেন তিনি। ঘাগী ও ঘুঘু! ভৈরবচন্দ্র উন্টে অভিযোগ করলেন, “তা আপনার পিয়ন ক্যাম্পে রাত কাটায় কেন? চুরি করা না করা পরের কথা!”

“পিয়ন আমাদের জানিয়ে গিয়েছিল। আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম।”

“তাই নাকি? আশা করি পুলিশ এনকোয়ারিতেও আপনি একথা বলবেন?”

“পুলিস এনকোয়ারী? সেটা কেন?”

“আমরা থানায় খবর দিয়েছি। আচ্ছা, কাল রাত্রে কি কমলা বলে মেয়েটি আপনার ঘরে এসেছিল?”

ঋতব্রত বুঝলে ব্যাপারটা গড়াবে অনেকদূর। না ভেবে-চিন্তে কিছু করা উচিত নয়। এরা রতনকে গাঁথতে চায় না, তাকেই জড়াতে চায়! না হ’লে প্রকাশ

দিবালোককে ‘রাত’ বলে উল্লেখ করবে কেন ?

কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত ফিরে এল ঘরে। একটু পরেই হয়তো দারোগা আসবে। হয়তো চালান দেবে রতনকে। তাকে অবশ্য বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাবে না। গেজেটেড অফিসার সে। তবে পাঁচজনের সামনে দুটো বাঁকা ইঙ্গিত করলেই বাঁঠেকাচ্ছে কে ? সাধুচরণ এবং ভৈরবচন্দ্র যখন এ জাতীয় কারবার চালাচ্ছেন ক্যাম্পের বৃকে বসে, তখন থানার দারোগার সঙ্গে নিশ্চয়ই সন্ডাব আছে ঐদের। প্রতি মুহূর্তেই দারোগার আবির্ভাব আশঙ্কা করছিল। যথাসময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত ও. সি. এলেন এবং সোজা এসে উঠলেন ওর ঘরেই। খবর পাঠালেন ভৈরবচন্দ্রকে। ভৈরবচন্দ্র একটু বিচলিত হলেন। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রথমত দারোগা সাহেব ভৈরবচন্দ্রের অফিসে উঠে আসামীকে তলব করে পাঠাবেন এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। তা’হলেও সপার্বদ তিনি এলেন ঋতব্রতের ব্যারাকে। সাধুচরণও সন্দান করলেন—মজা দেখতে আপত্তি কি ?

এসেই গুঁদের নজরে পড়ল ঋতব্রতের ঘরের সামনে একটা ল্যাণ্ড-রোভার দাঁড়িয়ে—তার পিছনে একখানা সাইকেল বাধা। বারান্দার খান তিনেক চেয়ার পাতা। ঋতব্রত, ও. সি. এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সেগুলি দখল করেছেন। ভৈরবচন্দ্র জানতেন এখন দীর্ঘক্ষণ ধরে জবানবন্দী, প্রশ্ন-উত্তর চলবে—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। অথচ বসবার চেয়ার আর নেই! বেশি একখানা পাতা আছে বটে, তবে তাতে বসলে অফিসিয়েটিং ক্যাম্প-সুপারের মর্যাদায় লাগে!

ভৈরবচন্দ্রের সমস্যার সমাধান হ’ল কিন্তু অচিরেই। ও. সি. গুঁকে আসতে দেখে নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বললেন, “এইসব পেটি ব্যাপারের ফয়সালা মশাই নিজেরাই করতে পারেন না? পাঁচটাকার একখানা নোট হারিয়েছে—তাই এফ. আই. আর. দিতে থানায় লোক ছুটেছে? যতসব...”

একটা ঢোক গিলে ভৈরবচন্দ্র বলেন, “তাছাড়াও একটা কেস আছে স্তার,—ঐ অনধিকার প্রবেশ করে রাত কাটানো—”

হা হা করে হেসে ওঠেন দারোগা সাহেব, কোথা থেকে এইসব খবর পান মশাই? তিলকে তাল করছে এরা, বুঝছেন না? আমি মিস্টার বোসের পিয়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। ব্যাপারটা কিছুই নয়!”

“কিন্তু এটা তো ভালো কথা নয়—”

“না, তা তো নয়ই! রতন, তুমি বাবা বোসসাহেবের ঘরেই রক্তদীপ হ’য়ে থেকো, অস্ত্র কারও ঘরে সাঁজের দীপ জালাতে যেও না আর।” বলেই হা হা করে হাসেন তিনি। ভৈরবচন্দ্র হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে

দারোগা সাহেবই বললেন, “বাই দি ওয়ে...চামেলীর কেসটার কি হ’ল? আপনারা নিজে যদি কিছু করতে না পারেন তবে আমাকে সেটা জানান—আমিই ইনভেস্টিগেট করি।”

সাবধান হ’য়ে গেলেন ভৈরবচন্দ্র। চামেলীর কেস? সেটার বাবদ তো পাণ্ডনা-গণ্ডা সব চুকিয়েই দেওয়া হয়েছে! আবার সেই পুরোনো কাস্থন্দির কথা উঠেছে কেন? বুঝলেন, ও. সি. ঋতব্রতের কাছ থেকে মোটা রকম দাঁও মেয়েছে। এ যাত্রা আর কিছু হবে না। ছেলেটা তো কম ধড়িঝাজ নয়! আগে থেকে দারোগাকে হাত করল কি ক’রে? ভৈরবচন্দ্র নিভে গেলেন একেবারে।

“আস্থন মিস্টার চৌধুরী এবার যাওয়া যাক!” উঠলেন দারোগা সাহেব। তৃতীয় ভদ্রলোকটি এতক্ষণ চোখ বুজে সিগার টানছিলেন শুধু। বললেন, “ঊ?” একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, “আমার যাবার দেরি আছে। আর আমি তো কলকাতা যাবো। আপনি যাবেন্ উণ্টোমুখে থানায়। আপনাকে ছেড়ে রেখে এসে আমাকে নিয়ে যাবে।”

সেইমতো নির্দেশ দিলেন তিনি ড্রাইভার হরদয়ালকে। বিশালবপু হরদয়াল গাড়ি ব্যাক করিয়ে নিল। দারোগা সাহেব রওনা হলেন। আসর ভেঙে গেল। সসামুচরণ ভৈরবচন্দ্রও বিদায় হলেন।

“আপনি দারোগাকে চিনলেন কি ক’রে—” ঋতব্রতের প্রশ্ন।

“আই জার্স্ট হ্যাপ্‌ন টু নো। রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে আসছি, দেখি পাংচার হ’য়ে যাওয়া সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে ও। গাড়ি থামলাম। বললে, ‘ক্যাম্পে যাবো।’ আমি বললাম, ‘চল, পৌছে দিই; ওখানে আমারও একজন পরিচিত লোক আছে, এঞ্জিনিয়ার বোস। দেখা ক’রে যাওয়া যাবে।’ বেটা বললে, ‘এঞ্জিনিয়ার বোস আপনার পরিচিত? তারই ব্যাপারে এনকোয়ারিতে যাচ্ছি।’ তখন সব শুনলাম; বললাম, ‘পাগল! ঋতব্রত আমার ছেলের ক্লাস ফ্রেন্ড। ওর পিয়নকেও চিনি আমি।’ তা লোকটা আমার কথা মেনে নিয়েছে দেখছি।”

ঋতব্রত অবাক। বলে, “শুধুমাত্র আপনার কথাতেই এতটা?”

“হবে না? ওর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ জানো? ডি. আই. জি. রায়-চৌধুরীকে নেমস্তত্র করেছিলাম আমার ওয়ার্ক-সাইটের ওপাশে বড় বিলটার গেম বার্ড্‌স্‌ শিকার করতে। রায়চৌধুরী আমার একগেলাসের বন্ধু। আনঅফিসিয়াল ডিজিট হ’লেও কোথা থেকে খবর পেয়ে ছমড়াি খেয়ে এসে পড়ল এই দারোগাটি আমার ক্যাম্প সাইটে। নিজে চোখেই তো দেখে গেছে রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা।”

খুব খুশি হ'য়ে উঠল ঋতব্রত সঞ্জীব চৌধুরীকে পেয়ে। তার মনে যেন বল ফিরে এল। বললে, “কি খাবেন বলুন। কি ভাবে আপনাকে এন্টারটেইন করতে পারি?”

“যু নো বেটার। অফার মি কফি, সিগারস, ড্রিংস, এনিথিং যু প্ৰীজ!”

“ওর তো একটাও পারব না। তবে চা খাওয়াতে পারি। বিস্কুটও বোধহয় আছে।
...আর হ্যাঁ...বৌদির দেওয়া আমসব্ব আছে। খাবেন?”

“দি আইভিয়া! চায়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমসব্বই খাবো আজ! নিরে এসে তো হে—কি নাম যেন তোমার!”

“আজ্ঞে আমার নাম রতন।” বলে সে চা বানাতে যায়।

“তারপর হোয়ার ইজ্ য়োর দ্রোপদী?”

“দ্রোপদী?”

“সেই যে—কি নাম যেন, ভালো রান্না করতো?”

“কে কুসুম? সে চলে গেছে।”

“চলে গেছে? তাহ'লে তোমার রান্না করছে কে।”

“কেউই না। নিজেই রতনকে দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি।”

“সে কি? আর কাউকে পেলেন না? স্থাল আই সেণ্ড্ যু এ কুক?”

“সে তো ভালোই হয়। কিন্তু এ কথা যাক। আপনাকে আসল কথাটাই বলি।
একটা পরামর্শ দিন!”

“দাঁড়াও। যু কাণ্ট হিয়ার ব্রতকথা উইদাউট তুলসীপত্র ইন য়োর হাণ্ড্।”

একটা চুরুট বার করলেন চৌধুরীশাহেব। সেটাকে ধরিয়ে জমিয়ে বসলেন। ঋতব্রত তাঁকে বলে গেল কমলার বৃত্তান্ত। মন দিয়ে শুনলেন চৌধুরীশাহেব। দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে ঋতব্রত বললে, “এখন বলুন কি করি?”

“উড্ যু হিয়ার মাই অ্যাডভাইস্?”

“বলুন।”

“বলুন ফলুন নয়। আমার উপদেশের একটা মর্ষাদ্য আছে। গতবারের উপদেশটাতে তো তুমি কর্ণপাতও কর নি। ফলং স্বপাক রন্ধনম্! ভুগছো তুমিই।”

“না এবার শুনব ঠিক। বলুন আপনি।”

“কিল বোথ্ বার্ড্ ইন ওয়ান ফায়ার!”

“মানে?”

“ঐ মেয়েটি, সরলা না কি যেন নাম? ওকে নিয়ে এসে তোল তোমার এখানে।
তুমি আর রতন এ ঘরে থাকছো—ও ও-ঘরে শোবে। মা ভালো হ'য়ে গেলে চলে

যাবে। বাঙালীর যেটি যখন, রাখতে জানেই। তুমিও দুটি খেয়ে বাঁচো—সেও বাঁচুক ঘুমিয়ে। অফার হার স্লীপ অ্যাণ্ড যু উড গেট গুড ফুড,—অ্যাণ্ড পারহাপস্ সাম হ্যাপি ড্রীম্ ইন্ টু দি বারগেন !”

“বলেন কি ! আপনি ঠাট্টা করছেন ?”

“নো ! আই অ্যাম নট !”

টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারেন একটা চৌধুরীসাহেব। “আই অ্যাম সিরিয়াস টু দি টিপ অফ মাই হেয়ার। তুমি যদি ওকে এখানে এনে রাখতে না পার তবে আমিই ওকে নিয়ে যাবো। অবশ্য ওর মা এখানে অন্ত্রস্থ ; ও হয়তো যেতে চাইবে না। আর তাছাড়া আড়ালে নিয়ে গেলে তো ঠিক জমবে না। ওদের নাকের ওপর এখানে এনেই রাখতে হবে তাকে। ভয় কি ?”

“না ভয় আর কি...মানে...”

“মানে, দেয়ার আর এনাফ অ্যাণ্ড টু স্পেয়ার ! ও মানে খুঁজতে গেলে চলবে না। তোমাকে পারতেই হবে এটা।”

উৎসাহের আতিশয্যে কাঁধের উপর চাপড় মারলেন ঋতব্রতের।

ঋতব্রত মিন মিন করে তবুও, “না তা নয়।...আচ্ছা তাই হবে। আমি ওকে বলে দেখি—যদি রাজী হয়...আপনি কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেবেন। মানে, একটা ভীষণ গণ্ডগোল হবে আশঙ্কা করছি।”

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সঞ্জীব চৌধুরী। এ কথায় বসে পড়লেন।

“নাঃ ! তুমি পারবে না। ও তোমার কর্ম নয়।”

“কেন ? কি হ’ল আবার ?”

“তুমি শুধু আমার ভরসায় এগুচ্ছ—নিজের জোরে নয়। এ কাজ তার পক্ষেই সম্ভব যে নিজের জোরে চলতে পারে।”

“আচ্ছা হ’ল বাপু হ’ল ! আপনি ভুলেও আমার খোঁজ নেবেন না। এবার হ’ল তো ? এখন উঠুন, আপনার গাড়ি অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে।”

ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না চৌধুরীসাহেবের, বললেন, “তুমি তো বেশ লোক হে ছোকরা ! হোস্টাট অ্যাবাউট আমসত্ব ডিপড্ ইন্ এ হোলি কপ অফ টি ?”

“ও হ্যাঁ।” লজ্জিত ঋতব্রত তাড়াতাড়ি স্টকেস খুলে আমসত্ব বের ক’রে আনে। চায়ের কাপ হাতে রতনও প্রবেশ করে।

চা পর্বের পরে আমসত্ব চুষতে গিয়ে চৌধুরীসাহেব আবার খুশি হ’য়ে ওঠেন। গ্র্যাণ্ড আমসত্ব। গাড়ি থেকে হরদয়ালকে দিয়ে বোতল মাস আনালেন। জ্বিক করতে করতে গল্প চলল আরও খানিকটা। শেষে উঠে ঋতব্রতকে বললেন, “গেট

আপ !”

“আমি কোথায় যাবো ?” ঋতব্রত অবাক ।

“কাজটা এখনই সেরে রাখা ভালো । বেটারা জেনে রাখুক সজীব চৌধুরীও আছে এর ভেতরে ।”

ঋতব্রতের কিন্তু এটা ইচ্ছা নয় । এই আধপাগলা ভদ্রলোককে নিয়ে কমলার কাছে যেতে তার মন সরে না । ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে হবে কমলাকে—এ ভদ্রলোক কি করতে কী ক’রে বসবেন হয়তো । মুখে কিন্তু বললে সে অন্য কথা, “আপনি যে এর মধ্যে আছেন সেটাই হচ্ছে আমাদের ট্রাম্প কার্ড ! আগে ভাগে সেটা দেখাবো কেন ?”

চোখ দুটি কুঞ্চিত ক’রে চৌধুরী বললেন, “হাতের তাস লুকিয়ে রাখতে হয় বলেই তাস আমি জীবনে খেলতে শিখি নি । ইন্ডোর গেম্‌সের মধ্যে আমি খেলি দাবা । যোল দু’গুণে বজ্রিণটা ঘুঁটি চোখের উপর থাকবে, তার মধ্যেই মাত করতে ভালোবাসি আমি । রাখা ঢাকা আমার পোষায় না । নাও গুঁঠ !”

যেটুকু চিনেছে ভদ্রলোককে তাতেই এরপর আর প্রতিবাদ করতে সাহস হ’ল না ঋতব্রতের । গিয়ে বসল রোভারে । গাড়ি এসে থামল এল/২২ ব্যারাকের সামনে । গাড়ি থেকে নেমে চৌধুরীসাহেব গটমট্ ক’রে ঘরে ঢুকে গেলেন—পিছন পিছন ঋতব্রতও এল । হরদয়াল স্টিয়ারিং‌বে বিশালবপু এলিয়ে দিয়ে বসে রইল গাড়িতেই । ঋতব্রতের ইজিতে চৌধুরীসাহেব এগিয়ে গেলেন কমলার দিকে । এ পাশে বৃদ্ধ খেতে বসেছেন । পাগলটা ছেলে কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ওপাশের দম্পতি বিশ্রামলাপরত । স্ববলবাবুর বোধহয় জ্বর ছেড়েছে । উঠে বসে আছেন তিনি । বড়খোকা একটা নীল লুঙ্গি পরে উবু হ’য়ে বসে আম খাচ্ছিল । কমলা মাহুর পেতে শুয়েছিল নিজের এলাকায় । ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল ।

“তোমার নামই সরলা ?”

“না, আমার নাম কমলা—সরলা আমার দিদির নাম ।”

“দেন যু আর নট্‌ দি গার্ল আই অ্যাম আফটার । সরলা কই ?”

ঋতব্রত পাশ থেকে বললে, “না, এর কথাই হয়েছে আপনার সঙ্গে ।”

“আই সী ! তুমিই সরলা তাহ’লে । আচ্ছা শোন । তোমার তো বাপু এখানে থাকা চলবে না ।”

কমলা এ জাতীয় আক্রমণের জ্ঞান মোটেই প্রস্তুত ছিল না । সকাল থেকে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতেই সে ক্লাস্ত । কদৰ্শ ইজিতে, অলীল ভজিতে সারা সকাল গালা-গালি করেছে বড়খোকা । বন্ধুদের শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, “আচ্ছা তোরাই বল,

ঐ শালা রতনার চেয়েও কি আমি কালো কুচ্ছিৎ ? আমিও তো শালা বিনে কড়িতে তেল মাখছি না। তোরাই বল।” নিজের ভাষায়, বিকৃত মুখভঙ্গি ক’রে এ জাতীয় বক্তৃতা ইচ্ছিতে বড়খোকা জিনিসটাকে গুরুজনক ক’রেই রেখেছিল। মুখ বুজে গহ্ব ক’রে গেছে কমলা। সারা সকালটাই সে আশঙ্কা করেছে থানার দারোগা কখন আসে। চৌধুরীসাহেবকে সে ভেবেছিল কোনও বিশিষ্ট অফিসার। বললে, “আপনি কে ?”

“হ ? মি ? আই অ্যাম্ দি ফাদার অফ্ হিজ্ ফ্রেণ্ড। হৃদয়ব্রতের পিতৃবন্ধু।”

চৌধুরীসাহেবের বিচিত্র বাংলা শুনে হেসে ফেলেছে ঋতব্রত।

কমলা বললে, “আমাকে কি বলছিলেন ?”

“বলছিলাম তোমার তো এখানে থাকা চলবে না।”

“তবে কোথায় থাকব আমি ?”

“অ্যাট হিজ্ প্রেস। ওর রান্না করার লোক নেই—তোমারও থাকবার জায়গা নেই। সে অফার মিউচুয়াল হেল্প ! আই মীন—”

“আই ফলো”, জবাব দিলে কমলা। অল্প কেউ নজর না করলেও কমলা লক্ষ্য করেছিল আখ-থাওয়া আম হাতে বড়খোকা উঠে এসেছে। তাই তর্জমাটা বাংলায় করতে দিল না ঠুঁকে।

“আমি একটা কথা কইয়াম !”

আম চাটতে চাটতে উঠে এল বড়খোকা। সে কথাবার্তা দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল না।

“কও !” জবাব দিলেন চৌধুরী।

“আমরার ঘর দিয়া বিষ্টি হইলে জল পড়ে।”

“ওরাগুৱফুল ডিস্কভারি ! বুষ্টি হ’লে ছাদ দিয়ে জল পড়বে না তো কি হোয়াইট হর্স ছইস্কি পড়বে ?”

“আইগ্যা জলই যদি পরে তো কি রহম্ সারাইলান আপনারা ? সরকারের অর্থ গুলাইন বোবাক্ নষ্ট করলাইন করে ?”

চৌধুরী ঘুরে ঋতব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন, “অ্যাম আই হাভি দি প্রেক্সার অফ্ টকিং উইথ্ দি ফিনানসিয়াল অ্যাডভাইসার টু দি গাভার্নমেন্ট অফ্ অরেন্ট বেঙ্গল ?”

ঋতব্রত হাসলে। বললে, “না ! ও ক্যাম্পের একজন পি. এল.—বড়খোকা।”

“আই সী। খোকা, তুমি বাইরে যেতে পারো—”

“ক্যান ? এ ঘরে আমি বসং করি। আমি ঘর ছাড়তাম করে ?”

“হরদয়াল !” হাঁক দিলেন চৌধুরী। ছ’ ফুট দীর্ঘ পাঞ্জাবী সিংজী এসে সেলাম

করল। হাতের ইঙ্গিত করলেন শুধু চৌধুরী। মুখে কিছু বললেন না। হরদয়ালও রাইট টার্ন ক'রে মুখোমুখি দাঁড়াল বড়খোকার। ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিলে শুধু ছারের দিকে। মুখে কিছু বললে না। তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্ফু-স্ফু ক'রে বেরিয়ে গেল বড়খোকা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল ঘরের সকলেই। উৎকর্ষ হ'য়ে উঠল সব। এগিয়ে এল না আর কেউ। হরদয়াল স্থান ত্যাগ করল।

“আমি তোমার বাপের বয়সী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আজ বিকেলেই তুমি ঋতব্রতের ওখানে গিয়ে উঠবে। রাঁধবে, বাড়বে, খাবে, খাওয়াবে। ছেলেটার খাওয়ার বড় কষ্ট। তুমি একটু দেখ। আর যদি কখনও প্রয়োজন হয়, আমার খবর দিও। কিপ ইট।”

একটা কার্ড বার ক'রে দিলেন কমলাকে। নামটা পড়ল সে।

“কি ? ইজ্ ইট ফাইনালি সেটল্ড ?” প্রশ্ন করেন তিনি।

কমলা তাকায় ঋতব্রতের দিকে।

“বিকলে রতনকে পাঠিয়ে দেব ?” শুধায় ঋতব্রত।

ঘাড় নেড়ে জবাব দেয় কমলা।

“গার্টন্স সেটল্ড দেন্। কম অন্। আচ্ছা চলি, বাই বাই।”

ঋতব্রত এবং চৌধুরীসাহেব এসে গাড়িতে ওঠেন।

ঘটনাটার সারা ক্যাম্পে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দেবে, সর্বত্র এটাই হবে আলোচনার বিষয়—এই রকমই আশঙ্কা ঋতব্রত করেছিল। সেটা করাই স্বাভাবিক। কুসুমের ব্যাপারটা তার গ্রন্থানের সঙ্গে সঙ্গেই চুকে গেছে। চামেলীর আলোচনায় নতুনত্বের আশ্বাস নেই। ক্যাম্পের আড্ডাগুলিতে অনেক দিন ধরে মুখরোচক বিষয়-বস্তুর অভাব ছিল—এমন সময় যদি প্রচারিত হয় এল/২৯ ব্যারাকের কমলা প্রকাশ্য দিবালোকে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাগান গিয়ে উঠেছে—এবং সেখানেই বাস করেছে—তাহ'লে সেটার ‘হবিষা কৃষ্ণবজ্র’ আড্ডার আশ্রমে আছতি দেবে না কি ?

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক তা ঘটল না। কারণ নতুন একটা ব্যাপারে সবাই জড়িয়ে পড়েছিল। ক্যাম্প অফিস থেকে প্রচার করা হয়েছিল—কয়েকটি পরিবারকে পুনর্বাসনে পাঠানো হবে শীঘ্রই। পরিবারগুলি এতে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এদের প্রতিবাদের জোর কি ? হয়তো অনায়াসেই পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পন্ন হ'ত কিন্তু এই সুযোগে কয়েকজন ছোকরা কলকাতা থেকে এসে জোট পাকালো। নিখিল বঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের শুভাশুভ নির্ধারণ করবার একটা সংস্থা নাকি আছে

কলকাতায়। এর নাম জানা যায় নি এতদিন। সেখান থেকেই ছুটি ভবনলোক এসে ক্যাম্পবাসীর একটা অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি দাখিল করলেন ভৈরব-চন্দ্রকে। প্রথমটায় আমলই দিলেন না ভৈরবচন্দ্র। ফলে যা হয়। স্টাট-কর্নার মিটিং হ'ল, প্রশংসন বার হ'ল, এবং ক্রমশ ব্যাপক মিটিংও দু'একটা হ'য়ে গেল। এসব ঝামেলার খবর ঋতব্রত রাখে না—কিন্তু জিনিসটা ব্যাপক আকার ধারণ করার শুনল সবই। কয়েকজন নাকি অনশন করবার ছমকিও দেখিয়েছে। অটল বটব্যাল নামে একজন অক্লান্ত কর্মী ক্যাম্পের প্রতিরোধ-সংগঠনে কাজ করতে এসেছে শুনল। দু'একদিন গরম গরম বক্তৃতাও দিতে শুনল তাকে।

ভৈরবচন্দ্র এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তবু অখণ্ড অবকাশ ছিল ডাক্তার সাধুচরণের। কিন্তু একক তিনিই বা কি করবেন? তাছাড়া তিনিও যেন এতটা দুঃসাহস আশা করেন নি ঋতব্রতের তরফ থেকে। একফোঁটা একটা ছেলে যে এমন ঢাক পিটিয়ে একটা মেয়েছেলেকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে নিজের বাড়িতে এটা যেন কল্পনাভীত! আজকালকার ছেলেগুলোর হ'ল কি? এসব কারবার তো অনেকেই করে, ভাবেন সাধুচরণ; তিনিও করেছেন অনেক কিছুই। কিন্তু এমন বেপরোয়া প্রকাশ্যভাবে? এতটা সাহস হয় কি ক'রে মাছুষের? কিসের জোর আছে ছোঁড়াটার? ব্যাপারটা আলোচনা করতে গেলেন ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে—কিন্তু তিনি নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।

রামশরণ কিন্তু উল্লসিত হ'য়ে উঠল এ সংবাদে। একটা স্বেচ্ছাসেবক থুঁজছিল সে। বেশ বড় রকমের একটা স্ক্যাণ্ডাল পাকাতে পারলেই বাছাধন বদলি হ'য়ে যাবেন। চতুর রামশরণ বুঝে নিয়েছে যে ঋতব্রতকে নোয়ানো যাবে না। পোষ মানবে না যে পাখি তাকে খাঁচায় ভরে রেখে লাভ কি? ভরসার মধ্যে ছোকরা বাগ না মানলেও কাজ বোঝে না কিছুই। সূচ অবস্থা গলতে দিচ্ছে না সে কাজের কোনও ছিদ্র দিয়ে—সেদিকে প্রথর দৃষ্টি এস ডি ওর। তাতে খেদ নেই রামশরণের। আপন মনেই হাসে অভিজ্ঞ ঠিকাদার “সু”ই যানে না দিবে তো কি হইল? হাঁথি হামি জরুর চালিয়ে লিবে।”

এত কম রেটে, এত কড়া সুপারভিসনে কি ক'রে যে কাজ ক'রে যাচ্ছে ঠিকাদার—সে এক বিস্ময় ঋতব্রতের কাছে। বোধহয় জেদের বশেই হাজার কয়েক টাকা লোকসান দিয়ে যাবে বেটা—ভাবে ঋতব্রত। করোগেটের টিনের ছাদে সীট বন্টুর সংখ্যা কম আছে এবং বিটুমিনাস ওয়াসার কয়েকটি লিম্পেট ওয়াসারের সঙ্গে দেখা যায় নি বলে টিনের মাপ দেয় নি সে এই বলে। শুধু এই একটা আইটেমেই হাজার ছয়েক টাকা আটকে গেল ঠিকাদারের। ঐ সামান্য অজুহাতে

গোটা আইটেমটার এক পরশ। পেমেন্ট হ'ল না এ বিলে। না পার্ট-রেটও দেবে না সে। সুরেশ সেনগুপ্ত খবর পাঠাল রামশরণকে। বস্ত্রত কণ্টাক্তিরকে কথাটা বলতেই সঙ্কোচ হচ্ছিল সুরেন সেনগুপ্তর। কিন্তু ঠিকাদার হাসিমুখেই বললে, “ও তো ঠিক হায়! হাম সীট বন্টু ওঁর বিটুমিন ওয়াগার লাগায়ে দিব। পিছাড়ি বিলমে নাপি উঠাইয়ে।” প্রত্যেকখানি টিন পরীক্ষা ক'রে চলল টিন মিস্ত্রি।

“আজকে কি কি রান্না হবে?” কমলা এসে শুধায়।

“ঊ?” ডায়েরি লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই সাড়া দেয় ঋতব্রত।

“বলছি আজকে কি রান্না হবে?”

“তার আমি কি জানি?”

“আঃ, থাকেন তো আপনি। কি থাকেন বলুন।”

“আমি তো একা থাকো না, সবাই থাকে। যা হয় খাওয়াও।

“আচ্ছা বেশ, এখন উঠুন দেখি।”

“হু!” আবার অগ্ন্যমনস্ক হ'য়ে কলম চালায় ঋতব্রত।

“কী আশ্চর্য! উঠুন!”

এবার ঋতব্রত বিরক্ত হয়। “আঃ, কী হয়েছে কি? একটু লিখছি শুয়ে শুয়ে— সকাল বেলাতেই সবাই বিরক্ত করতে শুরু করেছ।”

“হয়েছে আর কি? সকাল থেকে বিছানা কামড়ে পড়ে আছেন, ওগুলো ঝাড়তে হবে না?”

বাধ্য হ'য়েই উঠতে হয় ঋতব্রতকে। কমলা বিছানা ঝেড়ে, মশারিটা তুলে একটা নীল বেড-কভার পেতে দিল। চার দিক ভাঁজ ক'রে, হাত দিয়ে টেনে টেনে সমান ক'রে দিয়ে বললে, “নিন শুন এবার! কী এমন মহাভারত রচনা হচ্ছে শুনি?”

সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে ঋতব্রত বললে, “এ বেড-কভারটা কার?”

“আপনার। রতনকে দিয়ে আনিয়েছি স্টেশন বাজার থেকে। আপনি দৈনিক বাজার খরচের যে টাকা দিয়েছিলেন তার থেকে একুশ টাকা তের আনার বাজার করিয়েছি। টাকাটা আমাদের মিটিয়ে দেবেন।”

“একুশ টাকার বাজার একদিনে? বল কি? আমাদের তো রোজ পাঁচগিকে দেড়-টাকার মধ্যেই হ'য়ে যেত।”

“সে তো দৈনিক বাজার। এটা স্টেশনারি। এই বেড-কভার আনিয়েছি, একটা পাপোশ, চায়ের কাপ দুটে, ফুলদানি একটা আড়াই টাকা, আপনার তো দেখছি

কিছুই ছিল না। সরষের তেলই নাকি মাথায় মাখতেন সুনলাম—কিন্তু কাপড়-কাচা সাবানটা গায়ে মাখতেন কি করে ?”

“সানলাইট তো গায়ে মাখা যায়।”

“ভাগ্যি জানলাম আপনার কাছে।”

তারপর হেসে বললে, “আচ্ছা, এতটাকা জমিয়ে কি করবেন আপনি বলুন তো ?”

“আমার অনেক ধার দেনা আছে বাজারে।”

দু’জনেই চুপ করে যায়। কমলার কথাতে ঋতব্রত যেন নতুন দৃষ্টি পেল। সত্যিই, ঘরের শ্রীই যেন পালটে গেছে। উটাকার মশারিটা টান টান করে টাঙানো হয়েছে। ফুলদানিতে রক্ষিত হয়েছে রজনীগন্ধার একটি ভাঁটি। টেবিলের জিনিসপত্র আগে যা ছিল তাই আছে, কিন্তু বই ও ফাইলপত্র সারিবদ্ধ হয়ে জায়গা খালি করে দিয়েছে অনেকটা। স্লাইডরুলের খাপটা হারিয়ে গিয়েছিল বহুদিন—কোথা থেকে সেটাকে উদ্ধার করে এনে কোষবদ্ধ বস্ত্রটিকে রাখা হয়েছে টেবিলের প্রান্তে।

কমলাও হয়তো ভাবছিল এই অদ্ভুত চরিত্রের লোকটির কথাই। নিজের স্মৃতি-সুবিধা আরামের দিকে কোনও নজর নেই। এত পরিশ্রম করে সে ঘরটা সাজালো, একটা প্রশংসাবাগীও শোনা গেল না গৃহস্বামীর কাছ থেকে। হয়তো তার নজরেই পড়ে না। আজ প্রায় মাসাধিক কাল কমলা এসেছে এ বাড়িতে। প্রথম প্রথম যে সংকোচের ভাবটা ছিল ক্রমেই সেটা সরে গেছে। ধীরে ধীরে এ ছোট সংসারের যাবতীয় ঝামেলা ঝেড়ে ফেলছে ঋতব্রত কমলার স্বাক্ষে। ধোপা-বাড়ির হিসাব রাখে কমলা,—কোনটা কাচতে যাবে, কোনটা যাবে না ঠিক করে লেই। ছাড়া জামার পকেট থেকে উদ্ধার করে কখনও রেলওয়ে মানি-রিসিট ভাউচার, কখনও অসমাপ্ত কবিতা, কখনও বা দশটাকার নোট। যাবতীয় খরচের হিসাব তুলে রাখে খাতায়। গোয়ালাকে হিসাব বুঝিয়ে টাকা মেটায়। বেশ লাগছে কমলার—এই নতুন সংসারে এসে। সকালোঁ বিকালে হাসপাতালে যায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের অবস্থার কোনও উন্নতি হচ্ছে না কিন্তু।

ঋতব্রত হঠাৎ বলে, “একটা কথা যোজাই বলব বলব ভাবি, বলা হয় না।”

“বলে ফেললেই হয় সেটা।”

“মানে ইয়ে,—তোমার টাকাটা দেওয়া হয় নি।”

“আমার টাকা ?” অবাক হয় কমলা।

“কুসুমকে আমি মাসে দশটাকা করে দিতাম।”

জ্ঞান হয়ে যায় কমলা। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ঋতব্রতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভু-

ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সে রান্না করছে, ঘর পরিষ্কার রাখছে, ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে ফুল, বোতাম আঁটছে ধোপাবাড়ি থেকে ফেরত আনা প্যান্টের গায়ে—কিন্তু সে তো অত্ৰ কোনও কারণে নয়—সে যে পরিচারিকা! দয়া ক’রে তাকে দেওয়া হয়েছে এই কাজ—সে নেহাত অনাথা বলে। স্নান কর্তে কমলা বললে, “কুম্ভের ছিল অভাবের সংসার, সে অর্থের বিনিময়ে কাজ করতে এসেছিল। আমাকে আপনি খেতে দিচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন—এর বিনিময়ে আমি আপনার সেবা করি স্ত্রার। টাকার কথা তো ছিল না আপনার সঙ্গে।” একটু কুণ্ঠিত হয় ঋতব্রত, “তুমি আমাকে স্ত্রার বল কেন?”

“কি বলব তবে?”

“ঋতুদা বললেই পারো।”

“আপনার অফিসের সব কর্মচারীই তো আপনাকে স্ত্রার বলে।”

“তুমি কি আমার অফিসের কর্মচারী?”

“না, তা অবশ্য নই। আমি আপনীর পার্সোনাল মেড সার্ভেন্ট।”

“কমলা! ছিঃ! কী বলছ তুমি?”

“ঠিকই তো বলেছি! ‘ঝি’ কথাটা বলতে আজও জিবে আটকায়, তাই ইংরাজি ক’রে বললাম। তা না হ’লে টাকা দেওয়ার কথা বলে আপনি আমাকে অপমান করতেন না।”

জল ভরে আসে হঠাৎ কমলার দু’চোখে। স্তম্ভিত ঋতব্রতকে কোনও জবাব দেওয়ার অবকাশ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় কমলা।

কমলার স্থান পরিবর্তনে ক্যাম্প মহলে যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল সেটা গুঞ্জন আকারেই রয়ে গেল কিন্তু। তেমন কোন ব্যাপার, তেমন কোনও কথা গোচরে এল না ঋতব্রতের। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ায় বড়খোকা বীভৎস রকম কিছু একটা করত হয়তো—কিন্তু উদ্বাস্তদের ধর্মঘটের ব্যাপারেও সে পাণ্ডা-জাতীয় একটা কিছু হ’য়ে উঠেছিল। ভৈরবচন্দ্র আর সাধুচরণ হয়তো হকচকিয়ে গেছেন সঞ্জীব চৌধুরীর আকস্মিক আবির্ভাবে। লোকটা কে? অথবা দারোগা সাহেবের স্বরূপ পরিবর্তনে হয়তো বিচলিত হয়েছেন গুঁরা। কিংবা ধর্মঘটের ব্যাপারেই সবাই ব্যস্ত। কারণ যাই হোক, ফল হ’ল এই যে নিরুপদ্রব মেলামেশার অবকাশে গুঁরা দু’জন এল পরস্পরের কাছাকাছি। ঋতব্রত যে দীর্ঘ সময়টা নিয়োজিত করত চিঠি লেখা বাবদ, আজকাল সেটা ব্যয়িত হয় কমলার সঙ্গে গল্প করায়। মাঝে মাঝে রতনও এসে যোগ দেয়। ঋতব্রত বলে তাঁর হোস্টেল জীবনের বিচিত্র গল্প।

নিজিত সহপাঠীর মশারির চালে ভিজা গামছা রেখে কেমন মজা দেখতো তারা—
 পরস্পরের কার্টুন ছবি ঐকে টাঙিয়ে রাখতো ডাইনিং হলের নোটিস বোর্ডে।
 সুষ্মা নামে যে লোকটি পান দিয়ে যেত খাবার পরে, তার সঙ্গে ওরা মজা মারত।
 একবার একজন অধ্যাপকের মূর্গা চুরি ক'রে খেয়েছিল—রাত তিনটেয় স্নেটার
 হাউসের দ্বিতলে ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না হয়েছিল মাংস—এমনি হাজারো
 গল্পের ভাঙার তার। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে কমলা।

আবার কোনও কোনও দিন কমলা বলতে শুরু করে তার গল্প। হোস্টেল
 জীবনের হাস্যজনক গল্পের খোরাক না থাকলেও তার সতেরো বছরের জীবনেও
 ঘটেছে নানান ঘটনা। ছোট ছোট হাসির কথা দিয়েই সূচনা হ'ত বটে—তবে
 পরিশিষ্টটা করুণ পরিচ্ছেদে এসেই সমাপ্ত হ'ত। উপায় নেই। ওর সতেরো
 বছরের উচ্ছল যৌবন ঢাকা পড়ে গেছে বিষাদের এক অমোঘ কৃষ্ণ যবনিকায়।
 কমলার বাপ ছিলেন পোস্টমাস্টার। এক পোস্টঅফিস থেকে আর এক ডাকঘরে
 বদলি হয়েছেন কেবল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে পরিবার। কমলার ছোট ভাই ছিল
 একটি। শৈশবেই মারা যায়। দেশদেশান্তর অনবরত ঘুরে বেড়াতে হ'ত বলে
 মেয়েদের স্কুলে পড়ানো হ'য়ে ওঠে নি। তবু পড়াশোনা ভালোবাসতেন তিনি।
 রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে দুটিকে কোলের কাছে নিয়ে মাতুর পেতে তিনি পড়াতে
 বলতেন। ইংরাজি, বাংলা, গল্প। দেশবিদেশের ইতিহাস। কখনও বা গান গাইতে
 বলতেন। অধিকাংশই গীতাঞ্জলি অথবা নৈবেদ্যের রবীন্দ্রসংগীত। নিজেও মেয়েদের
 সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতেন কখনও বা। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র ছিল তাঁর
 প্রিয় সংগীত—আর শিবাষ্টকম্!

তারপর হঠাৎ একদিন আবার যেন বদলির অর্ডার পেলেন তিনি। রেজিস্ট্রেশন
 লেজার, সেভিস একাউন্টের মোটা মোটা ফোলিও, মনিঅর্ডারের অসমাপ্ত
 হিসাবের মতোই বিধবা স্ত্রী এবং দুটি মেয়েকে রেখে গরঠিকানার ডাকঘরের ডাকে
 গাড়া দিলেন একদিন। চোখ বুজলেন পোস্টমাস্টার মশাই!

প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা আর ইনসিওরেন্সের টাকাটা এক ক'রে বিধবা রাখলেন
 ব্যাঙ্কে। আয়ের পথ বন্ধ। এ পুঁজি ভেঙেই চলে দিন। মুখ শুকিয়ে যায় বিধবার।
 বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও শেষ হয় একদিন। তাই ছাঁটা কাপড়ের কাজ শুরু
 করলেন তিনি। বড়ি, কাঁথা, আচার,—মেলায় বেচবার ব্যবস্থা করেছিলেন। হয়তো
 সামলেও উঠতেন ঠিক,—এমন সময় এল র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ! নাবালক মেয়ে-
 দুটির হাত ধরে রওনা হলেন তিনি কলকাতামুখে। গিয়ে কোথায় উঠবেন স্থিরতা
 নেই। ভার লাঘব হ'ল পথেই। এক রাত্রে অব্যাহতি দিল সরলা! ঘরবাড়ি

ছাড়তে যত বড় আঘাত পেয়েছিলেন তার চেয়ে কঠিন আঘাত পেলেন তিনি সরলাকে ছাড়তে হ'ল ব'লে, কিন্তু তার চেয়েও বড় আঘাত পেলেন তিনি—যেদিন শুনলেন তাঁর সমস্ত গচ্ছিত ধন সমেত ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গেছে! ভয়ঙ্কর বধু হয়ে থাকবার আর উপায় রইল না তাঁর। তিনি একেবারে অনাথা! কমলার হাত ধরে এসে পৌঁছলেন আশ্রয়শিবিরে। ঘুরতে ঘুরতে এসে আজ আশ্রয় পেয়েছেন বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পে। গল্প শারা হয়। চুপ ক'রে বসে থাকে কথক আর শ্রোতা। হোস্টেলের হাসির গল্পগুলো মনে হয় চরম মিথ্যা। হঠাৎ উঠে পড়ে কমলা। বলে, “আগুন দিতে বলি রতনকে। এবেলা কি হবে ভাত না রুটি?”

“খিচুড়ি। দেখছ না কি রকম জল আসছে!”

“রোজ রোজ কী খিচুড়ি খান আপনি! না, আজ রুটি হবে।”

উঠে যায় কমলা। ডাল বের ক'রে ভিজতে দেয়। বড়া করবে। খিচুড়ির সঙ্গে ডালের বড়া ঋতব্রত খুব ভালোবাসে। খিচুড়িই করবে সে আজ।

সঞ্জীব চৌধুরী অনেকদিন আসেন না। দত্তসাহেবের ইনস্পেক্সনও হয় নি বহুদিন। বস্তুত কাজে কোন খুঁত পান না তিনি পরিদর্শনে এসে। প্রতিটি মালমসলা উৎকৃষ্ট। ওয়ার্কম্যানশীপ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত মাপ নেওয়া হয় না। তিনি আপত্তি করবেন কিসে? দিন চলে যায় একই ভাবে। মেজদার চিঠি আসে মাঝে মাঝে। কয়েকটা পর পর চিঠি লিখেও রেখা মিস্ত্রির কাছ থেকে জবাব না পাওয়ায় চিঠি লেখা বন্ধ করেছে ঋতব্রতও। মেজবোদি লিখেছেন বিয়ের সম্বন্ধ আসছে নানা জায়গা থেকে। মেজদা ব্যস্ত হয়েছেন কয়েক জায়গায় কথাবার্তাও চলছে। মেজবোদি পূর্বেই সচেতন করেছেন। তাই শুকে। বলেছেন, তার কোনও বক্তব্য থাকলে যেন সে অবিলম্বে জানায়। রেখা মিস্ত্রির ব্যাপারটা মেজবোদিরও মোটামুটি জানা ছিল। এ চিঠির জবাব সে দেয় নি। তার অল্প কয়েকদিন পরে এল মেজদার চিঠি। লীলার বিয়ে দিয়ে এবার তাঁর ইচ্ছা ভাইয়ের বিয়েটাও সেয়ে ফেলেন। পিতৃদেবের অসমাপ্ত কাজ নাকি ওটা। এ বিষয়ে ছোট ভাইয়ের মতামত জানতে চেয়েছেন।

ঋতব্রত আবার চিঠি লিখতে বসল রেখাকে। খোলাখুলি জানতে চেয়ে পত্রাঘাত করল। রেখা কি তার কাছ থেকে মুক্তি চায়? জবাব না দিলে তো সেটা স্পষ্ট হবে না। খোলাখুলি জানিয়ে দিলে দু'পক্ষই নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। বিজনেস্ লেটারের মতো চিঠিখানা খসড়া ক'রে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠাল সেখানা।

কেন এমন হয় ? ভাবে ঋতব্রত । দুদিন আগেও রেখা মিস্তিরের হাবে ভাবে মনে হ'ত ঋতব্রত বোস ছাড়া যেন তার জীবনই বুখা । বন্ধুমহলে এ নিয়ে কত হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি ! আজ ক'মাস সে চলে এসেছে দৃষ্টির আড়ালে—অমনি সেই সুযোগে তার শূণ্য সিংহাসন দখল ক'রে বসেছে আর একজন । ঋতব্রত বোস আজ রেখা মিস্তিরের জীবনে একটা বাহুল্য—বিষময় স্মৃতিমাত্র ! যেন একটা কাটা দাগ—বাখা চলে গেছে কিন্তু দাগটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই ।

“ইয়াসিন এসেছে স্ত্রার—দেখা করতে চায় ।” রতন খবর দেয় ।

“ডেকে দে ।”

ইয়াসিন এসে দাঁড়ায় । রামশরণের ড্রাইভার । লম্বা সেলাম করে । রতন চলে যায় নিজের কাজে ।

“কি খবর ইয়াসিন ?”

“আপনাকে এর বিচার করতে হবে স্ত্রার !”

“বিচার ? কিসের বিচার ?”

“আজ সতেরো মাস আমার মাইনে দেয় নি স্ত্রার । যখনই হাত পাতি দু' দশটাকা দিয়ে বলে পরে হিসাব মেটাবো । কত টাকা পাবো তাই বলে না । কাল স্ত্রার টাকা চাইতে গেছি—আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিল । হারামির বাচ্চা বলেছে আমাকে । কেন ? আমি আমার হকের টাকা চাইলেই হারামি ? আর তুই শালা চুরি জোচ্চুরি ক'রে—”

“কী আবোল তাবোল বকছ ?” ধমক দেয় ঋতব্রত ।

“না স্ত্রার, তাই বলছি ।”

“কিন্তু আমার কাছে বলে কী লাভ ? আমি তো তোমার টাকা আদায় ক'রে দিতে পারব না । আর ঠিকাদারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো জানোই । তাকে অহুরোধও আমি করতে পারব না ।”

“তাহ'লে আমি স্ত্রার আমার হকের টাকা পাব না ?”

“তুমি নিজে গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো । আমি কিছু বলব না ।”

রতন এসে আবার জানায়—কালিবাবু এসেছে । চোরের মতো সরে পড়ে ইয়াসিন । কালিবাবু, রামশরণের এজেন্ট এসে ঢোকে । সঙ্গে একজন লোক । তার হাতে দুটো রেডি-মিক্শড রঙের ড্রাম । কালিবাবু ড্রাম দুটো টেবিলে তুলে দেখাল ।

“না না—এসব রঙ চলবে না । আমি যা লিখে দিয়েছিলাম তাই আনলেন না কেন ?”

“এই তো স্ত্রার জেনসনের রঙ—এই দেখুন ৮/৩ ফিল্ড গ্রীন !”

“আপনি কি নিজেই কিছু বোঝেন না—অথবা আমাকেই বোকা বোঝাতে চান?”
“স্মার?”

“জেনসন হচ্ছে কোম্পানির নাম—৮/৩ শেডের নাম। ও কোম্পানির নানান নামের রঙ পাওয়া যায়। আমি বলেছি ‘উডকোট’ আনতে। সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা করে যার ইম্পিরিয়াল গ্যালনের দাম। বুঝলেন? এ চলবে না, নিয়ে যান।”
“সাড়ে সাঁইত্রিশ?”

“সস্তায় আনতে পারলে আমার আপত্তি নেই। সীল করা টিন দেখিয়ে গেলেই হ’ল।”

“না, আমি বলছিলাম কি লোকাল উড কাঠে অত দামী রঙ...মানে...”

“মানে টানে নেই। আইটেমে লেখা আছে ‘অ্যাপ্রভড্ কোয়ালিটি।’ উডকোট অথবা কিলমিল ছাড়া আমি আর কিছু অমুমোদন করব না।”

“কিন্তু আমাদের রেটে পোষায় কিনা তাতো দেখবেন স্মার?”

“নিশ্চয়ই নয়। রেট দেবার সময় আমার পরামর্শ নিয়েছিলেন? কে বলেছিল অত ‘লো-রেটে’ কাজ নিতে? আমি? যান।”

জ্ঞানমুখে টিন দুটো সমেত ফিরে গেলেন কালিবাবু। অক্ষুটে কি বার হ’ল তার মুখ দিয়ে। ঋতব্রত ভাবে ভাগ্যে এসব কথাগুলো শোনা যায় না। পিতৃকুল-মাতৃকুল—কোন কুল উদ্ধার করে গেলেন কালিবাবু কে জানে!

দুপুরবেলা খেতে বসে ক্ষেপে গেল ঋতব্রত। ক’দিন ধরেই রাগটা নেপথ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল। বিস্ফোরণ হ’ল হঠাৎই। সেদিন রবিবার। রবিবারে সাধারণত মাংস হয়। দু’একটা ভালোমন্দ পদ রান্না করার একটা অলিখিত আইন তৈরি হ’য়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই। আজ আলু সেক্ক ভাত দেখে চটে উঠেছিল সে।

“শুধু আলু সেক্ক দিয়ে ভাল-ভাত রোজ খাওয়া যায়? কমলা কই?”

“দিদিমণি হাসপাতালে।” কুণ্ঠিত রতনের কৈফিয়ত।

“তবে আর কি? উদ্ধার করেছেন।”

ডালটা হরিষারের গন্ধার সঙ্গে তুলনীয়। ফটিকস্বচ্ছ ধারার তলায় মুড়িগুলি দৃশ্যমান—উপরে ভাসছে তর্পণের ফুল বেলপাতার মতো দু-চারটি ফোড়ন! আঙুল দিয়ে এই ত্রিতল-ডালকে ক্লাসলেস সোসাইটি করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে ঋতব্রত ঢেলে দিল সেটা ভাতের ক্রেটারে। প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই টান মেরে ফেলে দিল সব। হরিষারের গন্ধাজলের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারের গন্ধাজলের তফাত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটা মনে হ’ল না ঋতব্রতের।

শশব্যস্তে ছুটে আসে রতন রান্নাঘর থেকে। সে আম কাটছিল।

“কি রান্না হয় আজকাল ? কাল রাত্রেও কুটিগুলো পুড়ে গিয়েছিল। আজ ভালে হুন নেই !”

অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল রতন। যেন অপরাধটা তারই।

আসলে অপরাধটা কিন্তু রতনেরই। কমলা আজ ক’দিন রান্না করছে না। ঋতব্রত হাত ধুয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রতন কয়েকটা আম কেটে নিয়ে গিয়ে অনেক সাধাসাধি করল। একটাও মুখে দিল না ঋতব্রত। রাগের চেয়েও অভিমান হয়েছিল তার বেশি ! কেন আজকাল তার খাওয়ার কাছে কমলা এসে বসে না ? কমলা আজ ক’দিন ধরেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিন ঋতব্রত ওকে ডাকল সন্ধ্যাবেলায় গল্প করতে—মাথা ধরেছে বলে পাশ কাটাল কমলা। খাবে না। কখনও সে খাবে না। আজ আসুক কমলা হাসপাতাল থেকে। সে নিজে খাবে না ফলে ওরাও কেউ খেতে পারবে না। দেখি কি করে কমলা।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ঋতব্রত। স্বপ্ন দেখছিল কমলা এসে ওকে সাধাসাধি করছে,—
“ওঠো খাবে চল, আচ্ছা, আর কোনও দিন অবাধা হব না কথার।”

“তবে আজ সন্ধ্যাবেলায় একটা গান শোনাবে বল।”

“গান ? গান শোনাব কি ক’রে ? গান তো আমি জানি না।”

“মিছে কথা ! সেদিন না তুমি বললে সন্ধ্যাবেলা বাবাকে গান শোনাতে ?”

“আচ্ছা বেশ বাপু, বেশ। শোনাব আজ। এবার খেতে চল।”

ঋতব্রত হাতখানা বাড়িয়ে দেয়, “উঠতে পারছি না আমি ;—তুমি একটু টেনে নাও !”

“স্মার !” স্মার !”

“কে ?” ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঋতব্রত, ঘুম ছুটে যায় মুহূর্তে। কি ব্যাপার ?

“হাসপাতাল থেকে লোক এসেছে স্মার আপনাকে ডাকতে।”

“হাসপাতাল থেকে ? কমলা ফেরে নি ? খায় নি ?”

“দিদিমণি তো আজ ক’দিনই খাচ্ছেন না। আমিই রান্নাবান্না করি।”

“কেন ? সে খায় কোথায় ?”

“তাঁর আবার খাওয়া ! আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। দিদিমণির মার অবস্থা ভালো নয়।”

চমকে ওঠে ঋতব্রত। তাড়াতাড়ি প্যাণ্টের মধ্যে পা ছুটো গলিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে রওনা হয়। যে কম্পাউণ্ডারটি ডাকতে এসেছিল সে আগে আগে চলে।

“ওদিকে কেন ? হাসপাতাল তো এদিকে ?”

“ওঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে।”

“আইসোলেশন ওয়ার্ড ? কেন ওঁর কি কোনও ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে ?”

“না। শেষ অবস্থায় আমরা রোগীকে জেনারেল ওয়ার্ড থেকে সম্ভব হ’লে সরিয়ে আনি। ওতে অস্ত্রাস্ত্র পেসেন্টদের মনে শক লাগে।”

“ও !”

ঋতব্রত যখন গিয়ে পৌঁছল বুজ্জার তখন শেষ অবস্থা। দীর্ঘ দিনের রোগভোগে চক্ষু কোটিরাগত। চৈতন্য কিন্তু পুরোমাত্রাতেই আছে। মাথার পাশে বসে আছে কমলা পাষণ প্রতিমার মতোই। দেখলে বোঝা যায় ক’দিন তার স্নানাহারও হয় নি। অনাহার-অত্যাচারে তাকেও মৃত্যুপথযাত্রীর মতোই দেখাচ্ছে। বাইরের বারান্দায় দুটো টুল পেতে ডাক্তার সাধুচরণ গল্প করছিলেন ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে। একটা ইনজেকশন সিরিঞ্জ ধুয়ে তুলছিল নার্স। ঋতব্রত সোজা গিয়ে দাঁড়াল রোগিনীর শিয়রে। তার হাতখানা গিয়ে মিশল মৃত্যুপথযাত্রীর রোগপাণ্ডুর হাতে। কোটিরাগত চক্ষুর কোল বেয়ে ঝরে পড়ল অশ্রু। কমলা জাঁচলে চোখ মুছল।

“কমলা রইল”—ধীরে ধীরে বললেন মৃত্যুপথযাত্রী।

কি জবাব দেবে ঋতব্রত ভেবে পেল না।

ডাক্তারবাবু সিরিঞ্জটা নিয়ে এসে বললেন, “দেখি হাতখানা।”

“আর থাক না ডাক্তারবাবু। ফোঁড়াফুড়ি তো অনেকই করলেন। এবার আমাদের শাস্তিতে যেতে দিন। ক’টা কথা বলার আছে, বলে নিই।”

ধুকিয়ে ধুকিয়ে বলেন তিনি। ডাক্তারবাবু বিরত হলেন। তিনিও বুঝেছিলেন আর খোঁচাখুঁচি বুখাই। তবে এতটা গ্লুকোস নষ্ট হবে ভেবে গা কচক্চ্ করতে লাগল তাঁর।

“কই, কমলি কই রে ?”

“এই যে মা।” ঝুঁকে পড়ে কমলা।

চোখ বুজলেন রোগিনী। বলেন, “আমি সব শুনেছি বাবা। তোমাকে যে কি বলে আশীর্বাদ করবো—। ওর মতো মেয়ে হয় না। নিজের মেয়ে বলেই বলছি না। তুমি...তুমি...” দম বন্ধ হ’য়ে আসছে তাঁর।

“কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। এখন থাক না। পরে বলবেন।”

“না। কষ্ট আর কী ? আর পরে ?” স্নান হাসলেন বিধবা।

“ওকে দেখো। তোমাকে আর কি বলব বাবা। আমরা অনাথা। দেখো যেন ছ’মুঠো খেতে পায়...ভজ্রভাবে জীবনটা যেন কাটাতে পারে। ওর বাবার বড়

আদরের মেয়ে ও। উঃ মাগো !”

“আপনি কিছু ভাববেন না। ওর ব্যবস্থা ক’রে দেবো। আপনার মেয়ের মতো মেয়ের বিয়ে হবে না? সব ব্যবস্থা হ’য়ে যাবে।”

“তুমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছ তো? আমি নিশ্চিত হ’য়ে যেতে পারি?”

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলা।

“হ্যাঁ মাসীমা। ওর সব ব্যবস্থা আমি ক’রে দেব। আপনি নিশ্চিত হোন।”

“আঃ! মাগো! কইরে কমলি মা, কোথায় গেলি?”

উদগত অশ্রু দমন ক’রে আঁচল থেকে মুখ তুলে কমলা সাড়া দেয়, “এই যে মা আমি।” সে সাড়া আর তাঁর কানে পৌঁছায় না। তাঁর বৃকের উপর উপুড় হ’য়ে পড়ে কমলা।

ওকে এখন কঁাদতে দিতে হবে কিছুক্ষণ। আশ্বে আশ্বে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঋতব্রত। ডাক্তার এবং ভৈরবচন্দ্র তখনও আলোচনা করছেন। ক্যাম্পে গুঁরা একটা প্লে করবেন সব স্টাফ মিলে। সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল বোধহয়। হঠাৎ সাধুচরণ বললেন, “অরক্ষণীয়ার ড্রামাটাইজড ভার্গান আছে নাকি মশাই?”

“কেন বলুন তো?” প্রতিপ্রশ্ন করেন ভৈরবচন্দ্র।

“জ্ঞানদা আর অতুলের পার্ট নেবার মতো ছোটো লোকের সম্মান পেয়েছিলাম।”

“তাই নাকি?”

পাশ দিয়ে ঋতব্রত অশ্রুমনস্কের মতো চলে যায়—একটা কথাও তার কানে যায় নি। সে চলেছিল আপন খেয়ালে।

দুনিয়া কারও জন্তে বসে থাকে না। মাতৃবিরোধের শোকও ভুলতে হ’ল একদিন কমলাকে। তার চারিদিকে বিপদের বহুমুখী উত্ততক্ষণ নাগিনী! চোখের জল মুছে ফেলতে হ’ল তাকে। অনাথার আবার শোক কিসের? যন্ত্রচালিতের মতো কাজ ক’রে যায়। সব কাজের হারানো খেই একে একে তুলে নেয় হাতে। দৈনন্দিন কার্ধ-তালিকা তার আবার পূর্ববৎ হ’ল। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম সকাল সন্ধ্যায় হাসপাতাল যাওয়াটা রইল বন্ধ। মাঝে মাঝে উদাস হ’য়ে বসে থাকে। ভাবে তার অতীত জীবনের কথা—অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। তার ছেলে-বেলাকার সাথীদের মনে পড়ে। বন্ধু তার ছড়ানো আছে সারা বাংলায়। যেখানে যেখানে তার বাবা বদলি হয়েছেন সেখানেই তার আলাপ হয়েছে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে।

রতন বাজার নিয়ে আসে। সাজিয়ে সাজিয়ে তুলে রাখে ডালায়। হঠাৎ কখন

ঋতব্রত এসে বলে একখানা কুমাল লাগবে। ট্রাক খুলে কুমাল বার ক'রে দেয় কমলা। আজকাল ট্রাকের চাবি কমলার কাছেই থাকে। জামাকাপড়, টাকা-পয়সা সবই থাকে কমলার হেপাজতে। শুধু স্ট্রটকসের চাবিটা থাকে ঋতব্রতের কাছে। ওর মধ্যে আছে ওর ডায়েরি, কবিতার খাতা, চিঠির বাগ্লি।

একদিন রাতে আবার হঠাৎ এল ইয়াসিন। চোখ দুটো লাল। গায়ে মদের গন্ধ। ঋতব্রতের ইচ্ছা করে না ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আলাপ শুরু ক'রেই বুঝতে পারলে কী মর্মান্তিক দুঃখে আজ মাত্রাতিরিক্ত মত্তপান করেছে ইয়াসিন।

ইয়াসিন তার মাহিনার প্রাপ্য টাকা নিতে গিয়েছিল রামশরণের কাছে। বাক-বিতণ্ডাও হয়েছে কিছু। কালিবাবু রাগের মাথায় বলে দিয়েছে ইয়াসিন নাকি নালিশ করতে এসেছিল সাহেবের কাছে। হঠাৎ ক্ষেপে গেল রামশরণ। ঋতব্রত তার নাগালের বাইরে কিন্তু ইয়াসিন তো ছিল হাতের কাছেই। পা থেকে জুতো খুলে বসিয়ে দিলে ইয়াসিনের মুখে। রুখে উঠেছিল ইয়াসিন। তখন রামশরণের আদেশে তার ভৃত্যবর্গ নির্মম প্রহার করেছে ইয়াসিনকে। ইয়াসিন পরদিন থানায় গিয়েছিল নালিশ করতে। সেখানে দারোগা তাকেই লক্-আপে রেখে দেয় সারা দিনরাত। মোটার পার্টন্স চুরির অভিযোগ ছিল পূর্বাঙ্কেই রামশরণের। ইয়াসিনের সহকারী ক্লিনার মতিয়া নাকি মোক্তারবাবুকে খবর দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে এনেছে ওকে। শুনে একেবারে ক্ষেপে গেল ঋতব্রত। এরা কি? গরীব বলে কি মানুষ বলেই গণ্য করা হবে না ইয়াসিনকে? জিজ্ঞাসা করলে, “এখন কি করবে?” “জেল হ'লে জেলে যাবো। খালাস পেলে বাড়ি চলে যাবো।”

“বাড়ি কোথায়?”

“আজ্ঞে, ছিলাম তো বরাবর শ্রীরামপুরে। পার্টিশনের পর পরিবার পাঠিয়ে দিয়েছি কুষ্টিয়ায়। সেখানেই চলে যাবো।”

“টাকা আদায়ের কি হবে?”

“টাকা আর দেবে না হারামির বাচ্চা। আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। শালা লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে আটকে রেখেছিল এতদিন।”

চুপ ক'রে রইল ঋতব্রত।

“তবে আমিও এর শোধ নেব। আমিও একবার দেখে নেব শালাকে। জেলে যেতে ইয়াসিন মিঞার ভয় নেই। জেলের বাইরেও লপ্সির চেয়ে কীই বা ভালো খাইয়ে রেখেছিল? তবে ও শালাকে যদি না জেলের ভাত খাওয়াতে পারি—”

অতি দুঃখেও হাসি আসে ঋতব্রতের, “তুমি কি করতে পারো ওর বিরুদ্ধে? টাকা দিয়ে সব ঢেকে দেবে সে। ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাতে পারবে তুমি?”

“মিথ্যা কেন সত্য? সত্যি কথাই বলব আমি। তাই তো এসেছি।” ঋতব্রত কোতুহলী হয়। কি বলতে চায় ইয়াসিন?

নিম্নকণ্ঠে ইয়াসিন নিবেদন করে তার অভিযোগ। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যায় না। একথা কি সত্যি? কিন্তু টিন তো সত্যিই কিছু খারাপ আসছে না! বললে, “সত্যি জানো তুমি?”

“হ্যাঁ স্যার! আমি জানব না? প্রতিবার তো আমিই গাড়ি চালিয়ে আনি। স্টোর থেকে সরকারী টিন ওঠে কলকাতায়। তারপর আমরা যাই লিলুয়ার। সেখানে আপনাদের সরকারী সব ভালো টিন নেমে যায়। গাড়িতে লাদ করা হয় খারাপ টিন। কালিবাবু আমাকে বুঝিয়েছে লিলুয়া থেকেও সরকারী টিনই ওঠে। ও ভাবে আমরা জানি না কিছু। আমি শালা যে জেনে শুনে চুপ মেরে আছি এটা বিশ্বাসই করে নি ওরা। ভেবেছে জানলে নিশ্চয়ই ভাগ চাইতাম কোনও দিন না কোনও দিন।”

ঋতব্রত অগ্নমনস্ক হ’য়ে পড়ে। কথাটা কেমন ক’রে বিশ্বাসযোগ্য? যে করোগেটেড টিন সাইটে এসে পৌঁছয় তাও তো বাঙালি বাঁধা ঝকঝকে নতুন টিনই! কলকাতার স্টোর থেকে লিস্ট আর রোড পার্মিট সমেত লরি ছাড়ে—এখানে ওর ওয়ার্ক-সরকার লিস্ট মিলিয়ে মাল খালাস করে। এত বাঙালি, এত ফুট। কোনও দিন তো হিসাবের গুণগোল হয়েছে এরকম রিপোর্ট পায় নি কিছু! নতুন মাল, একই বাঙালি বাঁধা ভালো মাল—একই দৈর্ঘ্যের একই মাপের টিন যদি আসে তবে বদল করার মানোটা কি?

“আপনি বিশ্বাস করছেন না স্যার?”

অগ্নমনস্কের মতো ঋতব্রত শুধু বললে, “হুঁ?”

ইয়াসিন বুঝতে পারে টিন বদলানোর ব্যাপারে বিশেষ কিছু হবে না। মুখে যতই বড়াই করুক, ভালো টিন আর খারাপ টিন শব্দ দুটি তার রচনাই। বস্তুত ব্যাপারটায় একটা গোপন করার প্রয়াস দেখেই কিছু একটা সন্দেহ করেছিল সে—আসলে রহস্তটা কিছুই বোধগম্য হয় নি তারও। তাই এবার অগ্ন অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, “আর তাছাড়া আপনি শেঠজীর হাতে যেতুখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়—সে দুটো সে খুলে পড়েছিল স্যার!”

“তুমি সত্যি কথা বলছ?”

“হ্যাঁ স্যার, মিথ্যা বলে আমার লাভ?”

“লাভ আছে বই কি। রামশরণ তোমাকে অপমান ক’রে, জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছ—রামশরণের নামে দুটো মিথ্যা বললে আমি যদি তার উপর বেশী

রেগে যাই তাহ'লেই তোমার লাভ।”

তখন কসম খেয়ে ইয়াসিন বললে সে সত্যি কথাই বলছে। কেমন ক'রে খাম খুলে চিঠিগুলো পড়ছিল শেঠজী, সে কথাও বললে সবিস্তারে।

“আচ্ছা তুমি যেতে পারো।”

সেলাম ক'রে চলে গেল ইয়াসিন।

আর কোনও দিন টাকার কথা বলে নি ঋতব্রত কমলাকে। কমলা এতে খুশিই হয়েছিল। আবার সে গৃহকর্মে ডুবে গিয়েছিল। ওদের সম্পর্কটা যে প্রভু-ভূতোর—এ কথাটা ভুলে থাকতে চায় কমলা। সে যেন ঋতব্রতের কোনও আত্মীয়া। মামাতো কি পিসতুতো বোন এসেছে ক'দিন ওর সংসারটা চালিয়ে দিতে। সম্পর্কটা এতদূর সহজ হ'য়ে উঠেছে যে, কমলা একদিন এসে ঋতব্রতকে অম্লান বদনে বললে, “আচ্ছা আপনার বাড়িতে একটি মেয়ে থাকে জানেন?”

কবিতার খাতাখানা বন্ধ করে উঠে বসে ঋতব্রত, “কেন বলতো?”

“সে শাড়ি-ব্লাউজ-সায়্য পরে তা জানেন?”

“আন্দাজ করছি—যেহেতু সে ভদ্রসমাজে মুখ দেখায়—কিন্তু কেন বলতো।”

“এখনও কেন? সেগুলো ব্যবহার করলে ছিঁড়ে যায় তা জানেন?”

এ কথার পরেও অগ্রমনস্ক কবি প্রকৃতির লোকটির নজর পড়বে না এতটা স্থূল নয় সে। ছিঁ ছিঁ—এটা তার আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। শাড়িটার বিভিন্ন জায়গায় তালি দেওয়া আর সেলাই করা। ব্লাউজটাও তথৈবচ। হাতের কাছে অনেকটা অনাবৃত। ছেঁড়াটার পাশ দিয়ে লম্বা সেলাই চিহ্ন। অর্থাৎ ব্লাউজের কাপড়টা পচে ফেঁসে গেছে—সেলাইয়ে আর বাগ মানানো যাচ্ছে না তাকে।

“এর জন্তে তুমিই দায়ী। টাকা-পয়সা তোমার কাছেই থাকে। প্যান্ট নেই বলে রতনকে দিয়ে ন'গজ থাঁকি কাপড় আনায়ে। দার্জি ডাকিয়ে মাপ নেওয়ায়ে। অথচ শাড়ি-ব্লাউজ কিনলে না কেন?”

“বা রে! আপনার টাকা না বলে নিজের জন্তে খরচ করি কি ক'রে?”

“আমার টাকা তোমার টাকা খুব জ্ঞান হয়েছে দেখছি যে!”

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে কমলা।

“বেশ ব্যবস্থা আমিই করছি। কত ইঞ্চি শাড়ি পর তুমি?”

আবার হেসে লুটিয়ে পড়ে কমলা।

“শাড়ির মাপ ইঞ্চি মেপে হয় না ধুতির মতো। হাত মেপে হয়। দশ হাত।”

“তা অত হাসির কি আছে? কিনি নি তো কখনও, তাই জানি না।” আর

ব্লাউজ ? সেটা তো হাত মেপে নয়—সেটা কত ইঞ্চি ?”

“তা আমিও জানি না। কিনি নি তো কখনও তাই জানি না।”

“তবে নমুনা দাও একটা।”

“নমুনা কোথায় পাবো ? একটাই আছে—সেটা গায়ে। সেটা খুলে দিতে পারি—
কিন্তু কথা দিন যতদিন না নতুন ব্লাউজ হয়—বাড়ি ঢুকতে পাবেন না আপনি।”

কান দুটো লাল হ’য়ে ওঠে ঋতব্রতের। এতদূর শোচনীয় অবস্থা হয়েছে কমলার ?
অথচ ঘৃণাকরেও কোনও দিন জানায় নি কিছু। অত্যন্ত রূঢ় কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠে,
“ফাজলামি রাখো। মাপটা দিও আমার। সব সময় ফাজলামি ভালো লাগে
না।”

নিজের রূঢ় স্বরে নিজেই চমকে ওঠে সে। এতটা কঠিন স্বরে ধমক দেওয়ার
প্রয়োজন ছিল কি ? প্রয়োজন ছিল। ধমকটা সে দিয়েছে নিজেকেই ! নিজের
অশ্রমনস্কতাকে, নিজের অক্ষমতাকেই। কেন সে এটা লক্ষ্য করে নি এতদিন।
তাছাড়া হঠাৎ এই মুহূর্তেই তার শিক্ষিত ভদ্র মনের অন্তরালবাসী পশুটা একটা
ভুলে যাওয়া ছবির উপর থেকে পর্দা তুলে ধরবার উপক্রম করছিল বোধহয়।
ধমকটা সে নিজেকেই দিয়েছে রূঢ়স্বরে।

কমলা কিন্তু বিন্দুমাত্রও রাগ করে না। হেসে বলে, “আর বাহাদুরি দেখাতে হবে
না মশাই। আমার শাড়ি-ব্লাউজ বাবদ কিছু টাকা স্বেচ্ছাশ্রম করুন ! আমি নিজেই
ব্যবস্থা ক’রে নেব।”

ঋতব্রত তৎক্ষণাৎ খান কয়েক দশটাকার নোট এগিয়ে দিল কমলার দিকে। বিনা-
বাক্যব্যয়ে কমলা গ্রহণ করল তা হাত পেতে। বললে, “আপনি তো কই বললেন
না, শুধু খাওয়া শোওয়ার কথাই ছিল আমার। পরতে দেওয়ার কথা তো হয়
নি।”

“আঃ ! আবার ঐ কথা ! তুমি ভারি ইয়ে—”

“কিয়ে ?” হেসে ওঠে কমলা।

“আপনাকে একটা কথা বলব ?” জিজ্ঞাসা করে ফের।

“বল।”

“আপনি একটা বিয়ে করুন। এ ভূতের বেগার আর কতদিন খাটব আমি ? একা
একা থাকতে হয় আমাকেও সারাদিন। একটা লোক হ’লে কথা বলে ঝাঁচি।”

ঋতব্রত উঠে বসে। ক’দিন ধরেই ভাবছে কমলার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করবে
কিনা। মেজলা আর বৌদি আবার তাগাদা দিয়েছেন, অথচ জবাব আসে নি রেখা
মিত্তিরকে লেখা রেজিস্ট্রি চিঠির। একটা পরামর্শের প্রয়োজন হ’য়ে পড়েছিল

ঋতব্রতের। শুধু নিজেকে থেকে প্রসঙ্গটা তুলতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল তার।
বালিশটা জুত ক'রে টেনে নিল বুকের তলায়। বাইরে অন্ধকার হ'য়ে আসছে।
কমলা দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। ঋতব্রত বললে সব কথা খুলে। মেজদা পীড়াপীড়ি
করছেন। বৌদিও। কথার তোড়ে রেখা মিস্তিরের সঙ্গে পূর্বরাগের কথাও বলল
অকপটে। অনেকদিনের নিরুদ্ভ-বাণী উজাড় ক'রে দিল নীরব শ্রোতাটির সামনে।
চুপ ক'রে শুনল বসে কমলা। দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে ঋতব্রত বললে, “এখন বল,
কী করা যায়।”

“দাঁড়ান, একটা আলো জ্বলে আনি।”

উঠে যায় কমলা। অপেক্ষা করে ঋতব্রত। খানিক পরে আলো রেখে যায় রতন।
রান্নাঘর থেকে ওঠে রুনঠান আওয়াজ। কমলা বোধহয় রান্না শুরু ক'রে দিয়েছে।
একটু অপেক্ষা ক'রে আবার লিখতে শুরু ক'রে ঋতব্রত।

কবিতাটা লিখছিল সে কমলাকে উদ্দেশ্য ক'রেই।

পরদিন কমলার সঙ্গে দেখা হ'তেই ঋতব্রত ভাবছিল অসমাপ্ত প্রসঙ্গটার সমাপ্তি
করা দরকার। ডাকতে গেল তাকে। দরকার হ'ল না। কমলা নিজেই এল ঘরে।
ছুঁড়ে দিলে একটা সেজিস ব্যাকের খাতা।

“এটা কি হ'চ্ছে?”

“কোনটা? ও! তুমি দেখে ফেলেছ দেখছি।” হাসে ঋতব্রত। তুলে নেয় খাতা-
খানা। কমলা টাকা নিতে অস্বীকার করায় পরদিন ওর নামে পোস্টাফিসে
একখানা মাইনর খাতা খোলে। তিন মাসে ত্রিশটাকা জমা পড়েছিল সেটাতে।

“আপনি কেন আমাকে না জানিয়ে খাতা খুললেন?”

“অন্তায় করেছি?”

“নিশ্চয়ই! এভাবে অপমান করার কি অধিকার আছে আপনার?”

“মান অপমানের বোধটা খুব তীক্ষ্ণ হয়েছে দেখছি।” হেসেই বললে কথাটা।

হঠাৎ চটে উঠল কমলা, বললে, “আমি গরীব হ'তে পারি, কিন্তু তাই বলে মান
অপমান বোধ থাকবে না এটাই বা আপনি আশা করেন কি ক'রে স্ত্রায়?”

‘স্ত্রায়’ কথাটার এবং কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় কমলা ভীষণ চটেছে। এর মধ্যে অন্তায়টা
কোথায় ঋতব্রত ভেবে পায় না। বলে, “কি পাগলামি করছ? মান অপমানের
কথা উঠছে কোথায়?”

“উঠছে। আপনাকে তো আমি বলেছি টাকা আমি নেব না। তা সত্ত্বেও...।”

“এ টাকা তো তোমাকে এখনও দিই নি আমি, অত চটছো কেন?” তারপর
রসিকতা ক'রে জিনিসটা সরল করবার উদ্দেশ্যে বললে, “তোমার বিয়ের সময় তো

একটা যৌতুক দিতে হবে, তাই জমাজ্জি টাকাটা। ক্রমে ক্রমে না জমালে আমিই বা পারব কি ক'রে ?”

হাত বাড়িয়ে খাতাখানা টেনে নেয় কমলা। তারপর হঠাৎ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে কেলে সেখানা। ঋতব্রত তাড়াতাড়ি এসে চেপে ধরলে ওর হাত। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল কমলা। ফিরে এল একটু পরেই।

“আমার মতো রিক্সাজি মেয়েদের যে বিয়ে হয় না, একথা আপনিও জানেন আমিও জানি। এ নিয়ে রসিকতা করার কোন দরকার নেই।”

স্তম্ভিত হয়ে গেল ঋতব্রত ! এ কি থেকে কি হ'ল ?

আঁচলের খুঁট খুলে ক'খানা দশটাকার নোট রেখে দিল কমলা টেবিলে। চাপা দিলে একটা পেপার-ওয়েটে। বললে, “এটা তুলে রাখবেন।”

“মানে ? ও টাকাটাও নেবে না তুমি ?”

“বিয়ের সময় রেখা মিস্তিরকেও তো শাড়ি কিনে দিতে হবে—ক্রমে ক্রমে না জমালে পারবেন কেন আপনি ?”

“কমলা, লক্ষ্মীটি !” উঠে আসে ঋতব্রত।

“না না—ও আমি কিছুতেই নেব না—কিছুতেই না।”

দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় কমলা।

ঋতব্রতের কাছে সমস্ত আচরণটাই রহস্যময়।

দিন কেটে যায়। কমলা যজ্ঞচালিতের মতো কাজ করে চলে। কাজ ক'রে রতন ; কাজ করে ঋতব্রত। ওর সামনেই আসে না কমলা। আসার উপায়ও নেই হয়তো—ভাবে ঋতব্রত। ব্লাউজটা আরও ছিঁড়ে গেছে। অস্বোয়াস্তিতে ছটফট করে ঋতব্রত। এ তো ভারী বিপদে পড়া গেল। কখনও যদি বা কমলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তার মুখখানা কালবৈশাখীর আকাশের মতো। কথাবার্তা প্রায় বন্ধই। সন্ধির কোনও সূত্রও খুঁজে পেল না বেচারী। হতাশ হ'য়ে পড়ে ঋতব্রত। সমস্তা সমস্তাই রয়ে গেল।

সমাধান যে আসন্ন তা বোঝা যায় নি। অভাবিত ভাবে মূর্তিমান সমাধান এসে হাজির হলেন একদিন সকালে ল্যাণ্ড-রোভারে চড়ে। এসেই হৈচৈ শুরু ক'রে দিলেন। সেটা ছিল রবিবার। কাজ ছিল না ঋতব্রতের। সঞ্জীব চৌধুরী মন্ত একটা কুইমাছ নিয়ে এসেছেন ! ডাক পড়ল কমলার।

“মাথাটা দিয়ে মুড়িকট হবে। পেটি দিয়ে কালিয়া, গাদা ভাজা। বানাও দেখি জুত ক'রে। পেয়ে গেলাম একটা হাটে। শোন সরলা, বেশ বড় জামবাটিতে

ক'রে দেবে আমাকে। চূজ্ কর মি এ ম্যাগনাম সাইজ জামবাটি! কবজিভর ডুবিয়ে খেতে পারি যেন।”

হেসে ফেললে কমলা। দীর্ঘদিন পরে হাসি দেখা গেল ওর মুখে।

“বড় বড় নৈনিতাল আলু লাগবে। আছে ঘরে? না থাকে তো ওই রসিক না কি যেন আছে পিরনটা—ওকে বাজারে পাঠাও। ও ঠিক পারবে।”

“আজ্ঞে আমার নাম রতন।” এগিয়ে আসে রতন।

“ঠিকই চিনেছি! রতনে রতন চেনে! মাছটা কেটে ফেলতো বাবা।” রতনকে নিয়ে কমলা চলে যায় রান্নাঘরে।

“চলুন আপনার গাড়ি করে আমরা ঘুরে আসি একটু!”

“রাইটও। চল। হরদয়াল!”

“হরদয়াল এখানে থাক। আপনাকে কয়েকটা কথা বলব গাড়িতে।”

“ইজ ইট?”

দু'জনে গাড়ি নিয়ে রওনা হ'য়ে পড়ে স্টেশনমুখো।

গাড়িতে সমস্ত কথা ঋতব্রত খুলে বললে চৌধুরীসাহেবকে। চৌধুরী ধৈর্য ধরে শুনলেন সব।

“কেন ক্ষেপে গেল বুঝলাম না।”

“বুঝলে না? তা বুঝবে কি ক'রে? ওর নাম সরলা বটে—কিন্তু—নামটা তোমার হওয়া উচিত ছিল।

“ওর নাম সরলা নয় কমলা—ভুল করছেন আপনি।”

“মোটাই ভুল করি নি—তাই তো বলছি আমি—ওর নাম সরলা হওয়া মোটেই উচিত নয়—তুমিই সরল। সিম্পল অ্যাজ্ এ সিম্পল্টন!”

“আপনি বুঝতে পেরেছেন কিছু?”

“সিওর!”

“কি বলুন তো।”

“এখন নয় পরে বলব।”

“তবে ফেরা যাক।”

“নো। আমাকে একবার স্টেশনবাজার ঘুরে যেতে হবে।”

“কি, নৈনিতাল আলু তো?”

“ইয়েল! বেটে তোমার ব্রহ্ম তালুতে লেপে দিতে হবে।”

ঋতব্রত চূপ ক'রে যায়। বোঝে চৌধুরী মর্মান্তিক চটেছেন।

গাড়ি স্টেশনবাজারে দাঁড়ায়। বাজার ঘুরে ঘুরে গোটা তিনেক শাড়ি কিনলেন

চৌধুরী। ছুঁখানা তাঁতের—একটা সিঁদুর। সায়। ছিটের কাপড়। একটা মাথার তেল। বড় চিরুনি একখানা। ট্যালকম পাউডার এক কোটো। মাথার কাঁটা, ফিতে, সেন্ট এক শিশি, চটি একজোড়া, ব্লাউজ।

ঋতব্রত একটা কথাও বলে নি এতক্ষণ। এবার ভয়ে ভয়ে বললে, “মাপ না জেনে ব্লাউজ কেনা যাবে?”

অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শুধু চৌধুরী, কিছু বললেন না। বেছে বেছে খান চার পাঁচ ব্লাউজ কিনলেন তিনি। ঋতব্রত আবার বললে, “ইয়ে, বলছিলাম কি, মাপটা না জেনে—”

“আমি যদি যুনিভার্সিটির ইনচার্জ হতাম তা হ’লে তোমার ডিগ্রি কেড়ে নিতাম।”

“কেন?” সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে ঋতব্রত, “আমার ডিগ্রির কি অপরাধ হ’ল?”

“একটা মেয়ের সঙ্গে তিন মাস বাস ক’রেও যে তার গায়ের মাপ এস্টিমেট করতে পারে না—সে এঞ্জিনিয়ার?”

আবার চুপ ক’রে যায় ঋতব্রত।

এক কাঁড়ি বাজার ক’রে ফিরলেন চৌধুরী। কমলাকে ডেকে বললেন, “এ চশমখোরটা তো তোমাকে পাগলি সাজিয়ে রেখেছে। তা ওর সংসারে তুমি যা ক’র আমি দেখতে আসি না। কিন্তু ছেঁড়া কাপড় পরে ভাত বেড়ে দিলে আমি কিন্তু তোমার হাতে খাবই না। এরজন্তে এক পয়সাও খরচ হয় নি এই কিপ্টেটার। অল কামস্ ফ্রম য়োর সানস্ পকেট।”

কমলা হাসিমুখেই সব উপহার গ্রহণ করল।

“না, শুধু হাত বাড়িয়ে নিলেই চলবে না। এগুলো আমার সামনে পরে আসতে হবে। আই লাইক টু সি হাউ দীজ্ হুট্‌স্ য়ু। আবার কবে আসি না আসি।”

“তবে তো কিছুতেই পরব না আজ। এটুকু দেখবার জন্তেই আপনাকে আর একদিন আসতে হবে ফের। মায়ের খোঁজই তো নেন না একেবারে।”

“না, সে হবে না। তুমি জান সেরে আমার দেওয়া কাপড় জামা পরে না এলে তোমার হাতে খাবই না আমি।”

“তা হ’লে কথা দিন আসছে রবিবারে আবার আসছেন।”

“নেক্‌ড্‌ সানডে? ইম্পসিব্‌ল! আসছে রবিবারে আমি থাকব পার্টনার। তার পরের বুধবারে আসব।”

“আচ্ছা তা হ’লেই চলবে।” খুশি হ’য়ে কমলা রান্নাঘরে ফিরে যায়।

ছুপরে টেবিলের উপর খবরের কাগজ পেতে খেতে দেওয়া হ’ল ওদের দু’জনকে। দু’জনে টেবিলে গিয়ে বসলেন। ছুঁহাতে ছুঁখানি থালা নিয়ে এল কমলা। ঋতব্রত

মুখ বিশ্বয়ে চেয়ে থাকে। সবুজ রঙের ডুরে শাড়িটা জড়িয়ে উঠেছে কমলার তরুদেহ। সত্ত্ব জ্ঞান ক'রে ভিজ়ে চুল খুলে দিয়েছে পিঠের উপর। পাউডারের প্রলেপ লেগে রয়েছে রজনীগন্ধার ডাঁটার মতো গ্রীবার পার্শ্বে। কপালের মাঝখানে একটি বড় সিঁহুরের টিপ্। প্রসাধনের একটা স্নিগ্ধ মুহু সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। ওদের মুখ দৃষ্টির সামনে চোখ নীচু করল কমলা। মুখে ফুটে উঠল অনভ্যস্ত সজ্জার সলজ্জ হাসি। টোল পড়ল গালে।

ঋতব্রতের কবি মন বললে, “গালের ঐ টোলটিই হ'ল ষোলো কলার ষোড়শ কলা।”

“এই না হলে আমার মা! ছাখ্ ছাখ্ হতভাগা! এই মাকে আমার কী ক'রে রেখেছিল তুই!”

ক্রতপায়ে কমলা চলে যায় ঘর ছেড়ে। প্রায় ছুটেই। ঋতব্রত খেতে খেতে অগ্ন-মনস্ক হ'য়ে পড়ে! মনে পড়ে তার কবিতাটা অসমাপ্ত হ'য়ে আছে। আজ রাঙেই শেষ করতে হবে সেটা।

আহারান্তে ঋতব্রতের খাটে চিত হয়ে পড়লেন চৌধুরী সাহেব। ডেকে পাঠালেন কমলাকে। কমলা এসে বসল। চৌধুরী গল্প শুরু করলেন। তাঁর ছেলেবেলার গল্প। প্রথম বিলেতযাত্রার কাহিনী। গল্প-গুজবে বিকেল গড়িয়ে আসে। বিকেলে চৌধুরী বোঁক ধরলেন বেড়াতে যেতে হবে। ভাদ্রমাস হ'লেও আকাশটা পরিষ্কার ছিল। গাড়িতে স্টোভ তোলা হ'ল। চায়ের সরঞ্জাম। পাকা রাস্তা ধরে অনেক দূর গিয়ে থামলেন তিনি। একটা বড় ‘রেনটি’ গাছের তলায় স্টোভ জ্বলে চা খাওয়া হ'ল। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলেন সবাই।

এবার বিদায় চাইলেন চৌধুরী। কমলা বললে, “এই বুধবারের পরে বুধবার আসছেন তো?”

“সিঁওর! এখানকার কাজ আমার শেষ হয়ে এল। এবার পাটনায় যেতে হবে আমাকে। তোমার রান্না খেয়ে এত লোভ হয়েছে যে ভাবছি তোমাকে পাটনায় নিয়ে গেলে কেমন হয়?”

“আর এখানে?” প্রশ্ন করে কমলা।

“এখানে কি ব্যবস্থা হবে তাতে আমাদের কি দরকার। রসিকের রান্না পছন্দ না হ'লে একটা বিয়ে করলেই পারে ও। বউ যখন ইচ্ছে যোগাড় হবে এঞ্জিনিয়ার সাহেবের—কিন্তু মা তো আমি পথে ঘাটে পাব না?”

ঋতব্রত “বা রে, সে হবে না” জাতীয় কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কমলা বললে, “সত্যি আমাকে নিয়ে যাবেন? পাটনা আমি যাই নি

কখনও। ভারি ইচ্ছে করে দেখতে। ক্যাম্পে আর ভালো লাগে না।” ঋতব্রত সামলে নিলে নিজেকে।

“সত্যিই নিয়ে যেতাম—তুমি রাজী থাকলে।”

“আমি রাজী।”

“বেশ, তবে বুধবারে তৈরি থেকো।”

গতবারের মতো ‘থ্যাটস্ স্টেপলড! বাই বাই!’ বললেন না তিনি এবার। চির উৎসাহী চৌধুরীসাহেবও যেন ঠিক উজ্জসিত হ’তে পারলেন না ব্যবস্থাটার।

চৌধুরী সাহেবকে এগিয়ে দিতে এল ঋতব্রত। বাড়ি থেকে বার হ’য়ে জিজ্ঞাসা করলে, “আপনি কি সত্যিই কমলাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে?”

“ইয়েস্।”

এমন গম্ভীরভাবে কথাটা বললেন তিনি—যেন প্রিভি কাউন্সিলের রায়! এরপর আর কোনও কথা ঋতব্রত খুঁজে পেল না। চৌধুরী গিয়ে বললেন ল্যাণ্ড-রোভারে। হঠাৎ ঋতব্রত প্রশ্ন করলে, “কেন ও আমার উপর রাগ ক’রে আছে বললেন না তো?”

“হু নিডনট্ নো। আমি তো নিয়েই যাচ্ছি ওকে।”

ঋতব্রতের কেমন যেন খটকা লাগে। হরদয়াল এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছে তখন।

“কি ব্যাপার বলুন তো?” শুধালো সে।

“ভোস্ট হু ফলো স্টিল?”

অবাক হ’য়ে চেয়ে থাকে ঋতব্রত। কি একটা গোপন রহস্যের উপর থেকে যবনিকা যেন সরে আসতে থাকে—মনে পড়ে অনেক দিনের অনেক সামান্যতম ঘটনা—অতি তুচ্ছ—অথচ অতি অমূল্য!

ফার্স্ট গিয়ার টেনেছে হরদয়াল। ঘড়ঘড়ে আওয়াজে এঞ্জিনটা কি বলতে চায়—অথচ বলতে পারে না! হঠাৎ মুখটা বাড়িয়ে চৌধুরী সাহেব বলেন, “হু আর এ রিয়েল্ সিম্পলটন! এ ফুল!”

ঋতব্রতের মাথাটা টেনে এনে কানে কানে বলেন, “ওর মনে আবার নতুন ক’রে আঘাত দিও না। সাবধানে কাটিয়ে দিও ক’টা দিন।” অবাক বিষ্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকায় ঋতব্রত! এ কথার মানে কী?

“শি লাভস্ হু—ঈভিউট!”

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে রওনা হ’য়ে গেল ল্যাণ্ড-রোভার। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ওয়!

সতর্ক হয়ে গেছে ঋতব্রত। কমলা তাকে ভালোবাসে! আশ্রয় দেবার অহিলায় নিয়ে এসে সে তার সর্বনাশই করেছে শুধু। তাই চৌধুরীসাহেব ওকে নিয়ে যেতে চান দূরে—ঋতব্রতের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে। সেখানে গিয়ে কমলা ভুলতে চেষ্টা করবে ওকে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এঞ্জিনিয়ারের বধু হবার স্বপ্ন তার মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। পাপ! সে উচ্চাশা সে কেন করে? জেনে শুনেও যদি তুমি আগুনে হাত দাও তবে আগুন তোমাকে ক্ষমা করবে না। অথচ এই কমলার উপর কবিতা লিখেছে সে! ছিঃ! যাকে বিয়ে ক’রে বধু হবার যোগ্যতা দিতে পারে না, তাকে নিয়ে কাব্য করার শখ কেন? নিজের উপরেই রাগ ধরে তার, কিন্তু তারই বা দোষ কোথায়? সে তো ইচ্ছে ক’রে কমলার সর্বনাশ করে নি? সে তো জ্ঞাতসারে কোন প্রত্নরও দেয় নি কমলাকে। কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া যে একান্ত অসম্ভব এ কথা তারা দু’জনেই জানে। তবে কেন এমন হয়? মনে পড়ে কমলার মাকে কথা দিয়েছিল ভার নেবে। ভার তো সে এখনও নিতে রাজী। দায়িত্ব নেওয়া মানে তো নিজে বিয়ে করা নয়। সে অর্থে প্রতিশ্রুতি দেয় নি ঋতব্রত। না কখনই না। মৃত্যু-পথযাত্রীও নিশ্চয় সে কল্পনা পোষণ করেন নি অন্তরের নিভৃততম কোণেও। আচ্ছা, কমলার বিয়ের খরচ বাবদ যদি কিছু দেয় সে চৌধুরীসাহেবকে। হাসি আসে মনে মনে। টাকা দেবে চৌধুরীসাহেবকে? গুর আউট-স্টেশন অ্যালাউন্সটাই হয়তো ঋতব্রতের মাহিনার চেয়ে বেশি। যাক, কমলা তো জলে পড়ছে না। যাক সে চলে।

আবার তখনই খচখচ করে মনের মধ্যে! কমলাবিহীন ক্যাম্পের জীবনটার কথা ভাবাই যায় না আজ। মনে মনে ভাবল—ধরা যাক কমলা চলে গেছে। সে নেই। ও আছে একা এই বাড়িটার রতনকে নিয়ে। যেমন ছিল এতদিন। আজ যেন তা ভাবাই যায় না। কেন যায় না?

স্মৃটকসের তলা থেকে কমলার উদ্দেশ্যে লেখা অসমাপ্ত কবিতাটা বার ক’রে আবার পড়ে একবার। এ কি লিখেছে সে? এ কবিতা তো শুধুমাত্র সৌন্দর্যের উপাসনা নয়। এর প্রতি ছত্রে ছত্রে যে সে ধরা পড়ে গেছে। কবিতাটা তারস্বরে বলছে, “তুমিও ওকে ভালোবাসে ফেলেছ ঋতব্রত। তুমিও ওকে ভুলতে পারবে না।” ছিঃ! এসব কি ভাবছে সে? কমলা কে? একটা সাধারণ রিফ্রাজি মেয়ে। সাত-ঘাটের জল খেয়ে এসে ঠেকেছে ক্যাম্পে। সে নিজে সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। ক্যাম্প থেকে একটা উদ্ভাস্ত ঘরের মেয়ে নিয়ে সে কোন লজ্জায় গিয়ে দাঁড়াবে বাড়িতে—বোস বাড়ির ছোট বউ এনেছি বলে? কি আশ্চর্য? বিয়ে করার কথা উঠছে কোথায়? মানে মানে এই কটা দিন কাটিয়ে দিলেই হ’ল।

এড়িয়ে চলতে লাগল সে কমলাকে। কমলাও এড়িয়ে চলে গকে। দু'জনের কেউই ধরা দিল না অপরের কাছে—অথচ দু'জনেই বুঝলে ধরা তারা পড়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ঋতব্রত এই সব কথাই। দশ দিনের মেয়াদ ওদের। একে একে দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। প্রতিমুহূর্তই এগিয়ে নিয়ে আসছে বিচ্ছেদের দিনটিকে। ঋতব্রত ভাবছে তার ক্যাম্প-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। মনে পড়ে প্রথম আসার দিনটার কথা। ইয়াসিন তাকে নিয়ে এল জীপে ক'রে। ইয়াসিন। হোকটার শেষ পর্যন্ত কি হ'ল কে জানে? ও বেচারীও উদ্ভাস্ত—ও পড়ে আছে এপারে, পরিবার আছে ওপারে। ইয়াসিনের কথায় একটা সম্ভাবনার কথা হঠাৎ মনে পড়ল তার। বিদ্যাপুষ্টির মতো উঠে বসল ঋতব্রত। উঃ! কী বোকা সে! এই সোজা কথাটা বুঝতে পারে নি এতদিন। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে ডরম্যান লন্ডের মোটা বইখানা নিয়ে কি দেখল। স্লাইডরুলটা টেনে নিয়ে বার কয়েক এপাশ ওপাশ টানাটানি ক'রে কি হিসাব করল যেন। উঃ! একটা আইটেমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা লাভ করবে রামশরণ! উদ্বেজনার পায়চারি করতে শুরু করল সে। এক বাণ্ডিল টিন ওজন করলে হয়। কিন্তু তা হ'লেই ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে যাবে। নাঃ। সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে একটা কন্ফিডেন্সিয়াল চিঠি দিক দত্তসাহেবকে। কপি দেওয়া যাক চীফকে। কিন্তু ব্যাপারটা যাচাই না ক'রেই লেখাটা উচিত হবে কি? মুখে বলাই ভালো প্রথমে।

উঠে তাড়াতাড়ি স্ট্রিকেসটা গুছাতে বসল। রতন এসে জিজ্ঞাসা করে কোথাও যাবে কি না। বললে, “কলকাতা যাবো।” কমলা এসে দাঁড়ায়। এগিয়ে দেয়—তোয়ালে, টুথব্রাস, পেস্ট, শেভি-সেট, জামা-কাপড়। একবারও জিজ্ঞাসা করলে না কেন যাচ্ছে—কবে ফিরবে।

রওনা হ'য়ে পড়ল ঋতব্রত।

ও বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই এক ভদ্রলোক এসে খোঁজ করলেন ঋতব্রত বহুর। রতন তাঁকে বললে, “সাহেব তো কলকাতা গেছেন আজ।”

“ও, কলকাতা গেছে—আচ্ছা ঠিক আছে।”

ভদ্রলোক ফিরে যাবার জন্তে ঘুরলেন।

ঘরের ভিতর থেকে দেখতে পেয়েছিল কমলা। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে ঋতব্রতের। তার সন্দেহ হ'ল। রতনকে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করালো।

“কে, আমি? আমি ঋতব্রতের মেজদা। কলকাতা থেকে আসছি।” ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কমলা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। মেজদার অকুণ্ঠিত

হ'ল। বললেন, “আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।”

“আমি আপনার ভাইয়ের বাড়িতে রান্নার কাজ করি। আমার নাম কমলা। আমাকে তুমিই বলবেন।”

“ও, আচ্ছা। ঋতু কি আজই কলকাতা গেছে?”

“হ্যাঁ, ঘণ্টা দুয়েক হ'ল।”

“কবে ফিরবে?”

“তা তো বলে যান নি।”

“আচ্ছা ঠিক আছে।” মেজদা উঠে পড়েন।

“সেকি? আপনি বসুন। এখন তো ট্রেন নেই। ছপুরে ট্রেন—একেবারে খেয়ে-দেয়ে যাবেন।”

“না, আমাকে এখন যেতে হবে। কমলাকে আর কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই স্টকেসটা হাতে নিয়ে রওনা হলেন তিনি। রতন স্টকেসটাকে নিতে যাচ্ছিল। বিরক্তভাবে বাধা দিলেন ভদ্রলোক।

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল কমলার। হয়তো ভদ্রলোকের সতিাই তাড়া ছিল। তাছাড়া ঋতব্রত নেই—সুতরাং এখানে থাকার কোন মানে হয়তো খুঁজে পান নি তিনি।

আশ্চর্য! এই দিনই ছপুরের ডাকে এল ঋতব্রতের নামে একটা ভারী প্যাকেট রেজিস্ট্রি ডাকে। চিঠিখানা কোথা থেকে আসছে বুঝতে একবিন্দু দেরি হ'ল না কমলার। মুক্তোর মতো পোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঋতব্রতের নাম। খামের পেছনে প্রেরকের নাম-ঠিকানাও রয়েছে। সেই ক'রে খামখানা নেওয়ার পর থেকে সারাদিনই নাড়াচাড়া করেছে সেখান। মুখটা আঁঠা দিয়ে আঁটা, সীল করা নয়। খুলে পড়া যায় অবশ্য চেষ্টা করলে। বুঝতেও পারবে না ঋতব্রত। কিন্তু ছিঃ! পরের চিঠি। আবার ভাবলে চলেই তো যাচ্ছে সে ঋতব্রতকে ছেড়ে আজীবনের মতো। জেনে গেলে ক্ষতি কি তার প্রিয়তম মাহুঘটির ভাগ্যে কি হ'ল শেষ পর্বস্ত। খামখেয়ালী, আপনভোলা এই মাহুঘটিকে সে হয়তো জীবনে ভুলতে পারবে না—কিন্তু ও লোকটার জীবনে তো সে কিছু নয়। এই তো তার প্রিয়জনের ডাক এসেছে। দুর্নিবার কোতুহলের বেগ দমন করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ল কমলার। তাছাড়া চিঠি এত ভারী প্যাকেটে আসবে কেন? কি আছে এর ভিতরে? কত পাতা লিখেছে রেখা মিস্ত্রি? না, প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়ায় পাপ নেই—মনকে সে বোঝাল। এটা শুধুই কোতুক, নিছক কোতুহল।

সাবধানে খামটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একগাদা পুরানো

চিঠি। সব ঋতব্রতের লেখা। ওর মাঝে একখানি ছোট চিঠি রয়েছে মুক্তোর মতো বকবকে হস্তাক্ষরে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেল কমলা।

কয়েক লাইন পড়তেই কমলার নিঃশ্বাস ঘনঘন পড়তে নাগল। থরথর করে কাঁপতে লাগল হাতখানা। অঙ্ককার হ'য়ে এল চারিদিক। মুক্তোর মতো অক্ষর-গুণ্ডো ইতস্তত নড়ে বেড়াতে লাগল। চিঠিখানা বন্ধ ক'রে অনেকক্ষণ বসে রইল সে। রতনের পদশব্দে চৈতন্য ফিরে এল তার। বাজারের পয়সা নিতে এসেছে সে। আঁচল খুলে পয়সা দিল কমলা।

রতন জিজ্ঞাসা করে, “কি কি আনব?”

“যা হয়।”

রতনও হয়তো আন্দাজ করেছে কিছু। হঠাৎ সাহেব চলে গেলেন কলকাতায়। দিদিমণি বসে আছেন মাথায় হাত দিয়ে। সে কিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা নিয়ে চলে গেল।

আস্তে আস্তে ওঠে কমলা। আঠার শিশিটা নিয়ে বন্ধ করলে ফের খামখানা। রেখে দিল ডাকের অগ্ন্যস্ত্র চিঠিপত্রের সঙ্গে ঋতব্রতের টেবিলে।

ঋতব্রত ফিরে এল। রতন তাকে জানাল ডাকে চিঠি এসেছে, বললে মেজদা এসে ফিরে গেছেন। সে সব কথা খেয়ালই হ'ল না ওর। সে তখন অগ্ন্য নেশায় মেতে আছে। একটা ‘গেজ-টেস্টার’ নিয়ে এসেছে সে কলকাতা থেকে। তখনই সে বেরিয়ে পড়ল আবার। রামশরণ নেই। তার কর্মচারীকে বলে গুদামটা খোলালে। মেপে মেপে দেখল অনেকগুলো টিন। সমস্ত ছাব্বিশ গেজের! তার আশঙ্কা অমূলক নয়! ঠিকই ধরেছে সে। ওখান থেকে সে নিজেই গেল পোস্টাফিসে। দু'খানা টেলিগ্রাম করল। একখানা দত্তসাহেবকে, অপরখানা চাঁফ এঞ্জিনিয়ারকে। দু'জনকেই বলে এসেছিল তার সন্দেহের কথা। ইয়াসিনের কথা। পূর্বসংকেত মতো সে শুধু লিখলে টেলিগ্রামে—“অ্যাজাম্পসনস্ কারেক্ট—অমুমান সত্য।”

বাস! এবার ফাঁদে পড়েছেন রামশরণ। মনে পড়ল ওয়ার্ক-সরকারকে দিয়ে রামশরণ বলে পাঠিয়েছিল, “বলবেন আপনার সাহেবকে—নাফা হামি জরুর করবে। স্ব'ই না চলবে তো কি হইল—ইখি হামি জরুর চালিয়ে লিবে।”

হাতি এবার কাদায় পড়েছেন। ইয়াসিন এ শুভ মুহূর্তে কোথায় তুমি? এসে দেখে যাও তোমার সম্বন্ধরোপিত বিষয়কে কী ফল ধরেছে!

পরদিনই টেলিগ্রামে জবাব এল চাঁফ এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে।

“তোমার তার পেলাম। এক্সিকিউটিভ মফঃস্বলে। নিজেই পরিদর্শনে আসছি কাল বেলা তিনটায়।”

টেলিগ্রাম এল পরিদর্শনের দিনই সকালে। নিজে হাতে হু'খানা চিঠিতে খবরটা জানিয়ে তৎক্ষণাৎ পিয়ন-বইতে লিখে রতনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল ক্যাম্প অফিসে আর ঠিকাদারকে। রামশরণ কাল রাত্রে এসেছে। খবর পাওয়া গেছে।

একটু পরেই রামশরণ এল ওর কাছে। তখনও দশটা বাজে নি। আর কেউ আসে নি অফিসে। দীর্ঘ তিন-চার মাস পরে আজ রামশরণের পদধূলি পড়ল অফিস ঘরে। সেই অপমানিত হয়ে ফিরে যাবার পর আর আসে নি। ঋতব্রত বসন্তে বলল তাকে। সিংজী বিনীত নমস্কার ক'রে আসন গ্রহণ করল।

“সি. ই. কখন আসবেন স্ত্রার?”

“সে তো চিঠিতে লিখেছি। বেলা তিনটে।”

“আর কোন আসছেন স্ত্রার?”

“তা জানি না। জানান নি তিনি।”

“আপনি কখন চিঠি পাইলেন? হামি তো কাল ভরদিন অফিসে ছিলাম। কিছু শুনলম না।”

“এইমাত্র টেলিগ্রাম এসেছে।”

“ও! তবে কি কি ইস্তাজাম করতে হোবে বোলেন?”

“কিছুই না—যেমন কাজ হচ্ছে হবে।”

“না, হামি বলছিলাম কি, শুধু ‘টি’ হোবে, না ‘টি-ডিনার’ দুইই হোবে। কখনো লোটে যাবেন লিখেন নাই?”

“না। তাছাড়া চা-খাবার খেতে তো আসছেন না। সে সব কিছু করতে হবে না আপনাকে। হয়তো উনি খাবেন না কিছু!”

“হোবে স্ত্রার হোবে। জরুর করতে হোবে। খাবেন উনি। হামি এতো কষ্ট ক'রে বনাবো শুঁর উনি খাবেন নাই? আপনি ভি হমার উখানে খাবেন।”

“না, মাপ করবেন। গুঁদের জন্তে কিছু করবেন কিনা তা আমি কিছু বলব না। তবে আমি ওখানে যাব না।”

“স্ত্রার, যা হইয়ে গেল উ তো হইয়ে গেল। আপনি হামার উপর গৌসা করেন—মাক্‌ন হমাকে ছুঁ যা। লেकिन বহারওয়ালা বড়াসাহেবকে পাস কেন হমরা ঘরের ঝগড়া জানাব?”

“ঝগড়া কিসের? আপনার সঙ্গে আমার তো কোন ঝগড়া নেই? আপনি আমাকে শত্রু ভাবতে পারেন—আমি আপনাকে শত্রু ভাবি না।”

“কি বলেন আপনি। রাম রাম!”

হঠাৎ দু'প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট নিয়ে এসে রতন রেখে যায় টেবিলের

উপর। ঋতব্রত কিনতে দিয়েছিল। একটা প্যাকেট খোলে ঋতব্রত। নিজে নেয় একটা, সিংজীকে অফার করে একটা। সিংজী গ্রহণ করে। ভাব জমাবার গরজ আছে তার। দু'জনেই ধরালো দুটো। অপর প্যাকেটটা সিংজীর দিকে এগিয়ে দিয়ে ঋতব্রত বললে, “এটা আপনার, নিন ধরুন।”

“হমার? কৈসে?”

বিস্মিত সিংজীর প্রসারিত করে প্যাকেটটা দিয়ে ঋতব্রত বলে, “এর আগে আপনি শেষ যেদিন এঘরে এসেছিলেন সেদিন আপনি এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দিয়েছিলেন রতনকে। মনে আছে? রতন প্যাকেটটা যখন নিয়ে আসে তখন আপনি চলে গেছেন। সে সময় রাগের মাথায় প্যাকেটটা আমি ফেলে দিই। ওটা অত্নায় হয়েছিল আমার। পরস্য সেবার আপনিই দিয়েছিলেন। ঘুণার আবেগে সেটা ফেলে দেওয়া উচিত হয় নি আমার। তাই আজ শোধ দিলাম। আচ্ছা, রাম রাম।” উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সে। অর্থাৎ, ভদ্রভাষায় এখন তুমি যেতে পারো। রামশরণ ওঠে। কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। ঘরের বাইরে পা দিয়েই ফেলে দিলে ছুঁড়ে সিগারেটের প্যাকেট আর জলন্ত সিগারেটটা। স্পষ্টই দেখা গেল ঘর থেকে। হাসলে ঋতব্রত। আচ্ছা দেখা যাবে ও বেলা এ তেজ থাকে কোথায়!

বাস, এখন আর হাতে কোনও কাজ নেই। হ্যাঁ, ডাকের চিঠিগুলো দেখতে হবে। একি, রেখা মিস্তিরের চিঠি এসে পড়ে আছে? ক্ষিপ্ত হাতে খামখানা খুলে পড়তে শুরু করে। ক্রমে তার মুখেও ফুটে উঠল কুঞ্জনরেখা, প্রথম পাঠিকার বেলায় যা হয়েছিল। হাতখানা তারও হয়ে উঠল কম্পমান, মুখখানি রক্তলেশশূন্য!

ঋতব্রত জানতেও পারে না তার মুখের প্রতিটি রেখার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করছিল একজন দর্শক—আড়ালে, তার থেকে অনতিদূরেই। খামখানা বন্ধ ক’রে স্টুটকেসে তুলে রাখে;—অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করে ঘরময়। এসে বসে আবার টেবিলে। নাঃ, ও কথা আর সে ভাববে না। এবার অফিসের ডাক দেখতে হবে। একে একে খামগুলি খুলে যায়। কোয়ার্টালি ইন্সপেক্টর প্রিমিয়ামের তাগাদা এসেছে। অফিসিয়াল চিঠি। মামুলী কেরেসপন্ডেন্স। একখানা আবার পার্সোনাল। মেজদার হাতের লেখা বোধহয়। ঋতব্রত খাম খুলে চিঠিখানা বার করে। আখখানা পড়তে পড়তে ঋতব্রত উঠে পড়ে। এ কি? কে এই সর্বনাশ করছে তার? একই অভিযোগ আসছে দু’ জায়গা থেকে! তার ক্যাম্প-জীবনের এত খুটিনাটি খবর কে পৌঁছে দিচ্ছে কলকাতায়? তাই সেবার মেজদা মুখভার ক’রে রইলেন। গম্ভীর হ’য়ে রইলেন বৌদি। তাই কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন

বৌদি, “ওখানে যে মেয়েটি তোমাকে রান্না ক’রে দেয় তার নাম কি?”

পদচারণা শুরু করে ঋতব্রত উত্তেজিত হ’য়ে। এই জন্তেই মেজদা হয়তো নিজে চোখে দেখতে এসেছিলেন ব্যাপারখানা। কিন্তু তিনি কি দেখে গেলেন—যার জন্তে বিশ্বাস করলেন এমন স্থগিত অভিযোগ! কমলা যুবতী, কমলা সুল্লরী,—মানা গেল সেকথা। কিন্তু এই কি যথেষ্ট প্রমাণ? ঋতব্রত যে কি ধাতুতে তৈরি তা অস্তুত তাঁদের জানা থাকা উচিত। রাগে অভিমানে কান্না আসতে চায় ঋতব্রত। ছি ছি—কি ক’রে বিশ্বাস করেন একথা মেজদারা? রেখা মিস্তির বিশ্বাস করতে পারে। সেটা স্বাভাবিক। তার যথেষ্ট কারণ আছে। সে একটা ছুতোই খুঁজছিল এতদিন। কিন্তু মেজদা, মেজবৌদি? তাঁরা কেমন ক’রে স্থিরসিদ্ধান্ত হলেন? কিন্তু এক হিসাবে তো মিথ্যা কথা লেখেননি তিনি—“আমার ভাই যে একটি রিফিউজি ক্যাম্পের অনুচা যুবতী মেয়ের জীবন লইয়া এ ভাবে ছিনিমিনি খেলিতে পারে—এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পর—” সত্যিই কি সে ছিনিমিনি খেলে নি কমলাকে নিয়ে? সত্যিই কি তার জীবন বিষময় ক’রে তোলে নি? আজ যদি সেই বিষের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হ’য়ে আসে—

‘বিষের ধোঁয়া?’ শরদিন্দুহাবুর বিখ্যাত উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে নিজেকে তুলনা ক’রে ঋতব্রত আত্মপ্রসাদ লাভ করে হয়তো। বিষের ধোঁয়ার নায়ক বেপরোয়া ভাবে অস্বীকার করেছিল সমাজকে—অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তার জয় হয়েছিল! কিন্তু,—হ্যাঁ, একটা মন্ত কিন্তু আছে! বিষের ধোঁয়ার আত্মভোলা অধ্যাপকটি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল সমাজব্যবস্থা বিষয়ে। সে জানতো না অবিবাহিত যুবকের পক্ষে অনাখ্যায়ী সুল্লরী যুবতী নারীর একত্র বসবাস সমাজ সহ্য করে না! কিন্তু ঋতব্রত তো সে কথা জানতো! সে তো শুধু বাহ্যুহুরি দেখাতেই, সঞ্জীববাবুর উৎসাহে ভৈরবচন্দ্রের উপর টেক্সা দেবার উদ্দেশ্যেই কমলাকে এনে তুলেছিল নিজ আবাসে। তাছাড়া বিষের ধোঁয়ার নায়ক ছিল তার আদর্শে অটল—তার সহবাসিনী যুবতী মেয়েটির প্রতি কোনও দুর্বলতা ছিল না তার। আর ঋতব্রত? সে জো মনে মনে—, না হলে কবিতা লেখার অহুপ্রেরণা সে কোথায় পায়? প্রত্যক্ষ কমলাকে কোনও প্রেমনিবেদন না করলেও কবিতার মাধ্যমে সে তো উন্মুক্ত ক’রে দিয়েছে তার হৃদয়ের দ্বার!

আঃ! আজ যদি সঞ্জীব চৌধুরী থাকতেন! উঠে পড়ে ঋতব্রত। অফিসিয়াল ডাক আর দেখা হয় না। হঠাৎ মুখোমুখি হ’য়ে যায় কমলার সঙ্গে। কমলা! কমলা কী হ’য়ে গেছে! তপস্চারিণী অপর্ণার মতোই গোপন সাধনারতা শীর্ণা নারীমূর্তি! বৈরাগিণী মূর্তি তার!

“কোথায় বের হচ্ছেন ?”

“কে, আমি ? এই একটু কাজে ।”

“আপনি নিজেও কিছু খাবেন না—আমাদেরও উপোস করিয়ে রাখবেন ?”

“কেন, কেন ?”

“কাল রাত্রে কিছু খেলেন না । সকালে খাবার করেছি না খেয়েই বেরুচ্ছেন ।”

“না না, তা কেন ? নিয়ে এসো । খাবো না কেন ?”

একথালি লুচি আর তরকারি নিয়ে আসে কমলা । পাশের ঘরে গিয়ে ঋতব্রত আহারে বসে । ধীরে ধীরে সে সব কিছুই খেয়ে নেয় । ক্ষুধাও যে পেয়েছিল সেটা বোঝা গেল একক্ষণে ।

“আপনার কি হয়েছে বলুন তো ?”

“আমার ? কই না, কিছু হয় নি তো ।”

“তবে এমন ক’রে কলকাতায় গেলেন । এসেও স্থির হচ্ছেন না ।”

“ও, সে একটা অফিসিয়াল ব্যাপার । হ্যাঁ, ভালো কথা । আজ বিকেলে সি. ই. আসছেন । তাঁকে কিছু চা খাওয়াতে চাই । কি করা যায় বলত ?”

“সি. ই. মানে ?”

“সি. ই. মানে চীফ এঞ্জিনিয়ার ।”

“ও ! তা কি খাওয়াতে চান বলুন ।”

“সেইটেই তো পরামর্শ চাইছি ।

ক্রমে বৈকালিক চায়ের আয়োজনে মেতে ওঠে দু’জন । রেখা মিস্ত্রিরের চিঠি পড়ে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে কমলা প্রথমে মুহূর্তমান হ’য়ে পড়েছিল । কিন্তু পরে যেন কেমন একটা মুক্তির আশ্বাস পেল ।

ফোঁড়া ফেটে গেলে যেমন আরাম লাগে—সেই রকম একটা আরাম বোধ করল কমলা । তার বুকের ধন তাহ’লে এখনও কেউ কেড়ে নেয় নি । সে নিজে অবশ্য কোনও দিন গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না ঋতব্রতের পাশে । সেকথা স্বপ্নেও ভাবে নি সে । কিন্তু তবু কেমন যেন একটা আরাম পাওয়া গেল রেখার চিঠিখানায় । তাই সে সহজ হ’তে পারল আজ বহুদিন পরে ।

সহজ হওয়াটা আবার সংক্রামক । দীর্ঘদিনের পর সেই পুরানো দিনের মতো কমলা যখন একটা প্লেটে ক’রে মাংসের একটু পুর নিয়ে এসে বললে, “দেখুন তো চেখে চপের পুরটা ঠিক হ’ল কিনা ।” তখন ঋতব্রতও সেটা মুখে দিয়ে অনায়াসে বলতে পারে, “এ রাম ! হুনে পুড়ে গেছে ! দু’বার হুন দিলে নাকি ?”

“ঐ্যা !” হতভম্ব হয়ে যায় কমলা ।

হঠাৎ হোহো করে হেসে ওঠে ঋতব্রত। ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে কমলা হেসে ফেলে
—“যান ! ভারি ইয়ে আপনি !”

অনেকদিন পরে প্রাণখোলা সহজ হাসি হাসলো দু’জনে।

স্মরেন সেনগুপ্ত আর জীবেন কর আজ সারাদিন বায়ে বায়ে আসছে। এটার কি হবে—ওটার কি করা যায়। ঋতব্রত ব্যবস্থা করে যায়। খান কয়েক হাতলঙা চেয়ার আনতে পারলে হ’ত। একটা টেবিল-ক্লথও নেই—কি পেতে দেবে ? কিছু ভয় নেই—বিছানার একটা ধোপদুরন্ত চাদর আছে—সেটাই দু’ভাঁজ করে পেতে দেবে কমলা।

“আপনি বরং দেখুন ফুলের একটা তোড়া বানাতে পারেন কিনা।”

“ফুলের তোড়া কি হবে ?”

“ফুলদানিতে রাখব—ঘরটা সুন্দর দেখাবে।”

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিনটায় এসে পৌঁছল চীফ এঞ্জিনিয়ারের কালো বড় গ্লিমাউথখানা। শুরু হ’ল ইনস্পেকশন। ঘুরে ঘুরে কাজ দেখালেন তিনি। কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। রামশরণ উজ্জসিত হয়ে উঠল। ইনস্পেকশন শেষ হ’লে রামশরণ বললে, “এবার শ্রার এদিকে একটু আসতে হোবে মেহেরবানী করে ?”

“কোনদিকে ?”

“একটু চায়ের ইস্তাজাম করেছিলম শ্রার।”

“তাই নাকি ? আচ্ছা সে তো ভালো কথাই। তবে একেবারে সব সেরে এসে বসা যাবে।”

“সব তো সারা হইয়ে গেল শ্রার।”

“না, সব সারা হয়েছে কই ? আপনার স্টোর দেখব, এস. ডি. ও-র অফিস দেখব।” আবার হুঁরা এগিয়ে চলেন। রামশরণের গুয়ার্ক-শেডের সামনে একটা শামিয়ানা খাটানো। টেবিলে অয়েলক্লথ পেতে সাজিয়ে রেখেছে নানান ডিশ। দূর থেকে বোঝা গেল না কি রকম ব্যবস্থা করতে পেরেছে সে মাত্র একটি বেলার মধ্যে।

স্টোরে এসে পৌঁছলেন সকলে। শুদামে গাদা দেওয়া আছে অননুমোদিত মাল—শালবল্লা, মুলিবাঁশের দেওয়াল, দরমার বাঁপ। রামশরণ চীফের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলে। ঋতব্রত জানালে, হ্যাঁ—প্রত্যেকটিই কোন না কোন কারণে রিজেকটেড হয়েছে। আগার স্পেসিফিকেশন।

“আই সী !”—বললেন সি. ই.।

“পাঁচ ইঞ্চি বল্লার মাপে কোয়াটার ইঞ্চি ঘেরে ছোট হ’লে মাল রিজেক্ট হ’য়ে যাবে স্ত্রার?”

“সিওর! পেমেন্টের সময় পাঁচ ইঞ্চি মাপের চেকে সইটার উপর কোয়াটার ইঞ্চি কালি লেপে দিলে নেবেন আপনি?...অচ্ছা, ওই করোগেটেড টিনগুলো কি ‘গেজ’? চক্কিশ না ছাক্কিশ?”

ঋতব্রত জবাব দিল না, রামশরণও নীরব। সেনগুপ্ত বললে, “চক্কিশ স্ত্রার?”

“চক্কিশ? ইম্পসিবল্! টোয়েন্টিফোর বি. ডাবলু. জি. টিন দেওয়ার কথা? প্রস্তুত ঋতব্রতকে। সে জানালে, “হ্যাঁ।”

“তবে ছাক্কিশ গেজি টিন স্ট্যাক দেওয়া আছে কেন? ওগুলোও কি তাই রিজেক্টেড হ’য়ে পড়ে আছে?”

“হ্যাঁ স্ত্রার!” অকূলে কূল পায় রামশরণ।

“না স্ত্রার! ও টিন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল। ওগুলো ঠিকাদার আনে নি। আমরাই দিয়েছি। ওটা রিজেক্টেড নয়।” বলে ঋতব্রত।

“না স্ত্রার!” প্রতিবাদ করে রামশরণ, “ওগুলো হমার আছে। ইসব টিন ছাক্কিশ গেজি আছে। হমার ওয়ার্কশেড কে লিয়ে আনিয়েছি হাম্।”

লাল হয়ে উঠেছে রামশরণের মুখখানা উত্তেজনায়।

“কি বলছেন যা তা! এসব সরকারী টিন নয়? আপনার টিন এখানে আসবে কি করে?”

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা ফাঁস হয়ে যায়। অনর্গল মিথ্যা বলেও একটি মাত্র সত্যকে ঢেকে রাখতে পারল না রামশরণ ঠিকাদার।

“তবে সরকারী টিন কোথায়?”

“সরকারী টিন এখন স্টোরে নাই স্ত্রার। সব চালে লাগিয়ে দিলম।”

“চালের টিন মাপব তবে।” বেরিয়ে এলেন চীফ।

পাগড়িটা খুলে ফেললে রামশরণ। ক্রমাল দিয়ে টাকটা একবার মুছে নেয়।

“এখানে গেজ-টেস্টার আছে?” চীফ প্রশ্ন করেন।

“ইখানে উ জিনিস কুথা পাবেন স্ত্রার?”

“আমার কাছে আছে; আনিয়ে দিচ্ছি।” ঋতব্রত বলে।

তৎক্ষণাৎ সে সাইকেলে ক’রে লোক পাঠিয়ে দিল অফিসে। রামশরণের ইচ্ছা করছিল টেনে এক চড় মারে এস. ডি. ও-কে। পরতান! কোথা থেকে আসে গেজ-টেস্টার? হতভাগা ছোড়া কি বোঝে না এতে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করছিল তুই? হুঁ হুঁটো বিলে পেমেন্ট হ’য়ে গেছে। এখন যদি গলদ

বের হয়, তা হ'লে এস. ডি. ও ডি বাঁচবে খোড়াই।

চালে উঠে লোক টিন মাপলো। সব ছাব্বিশ গেজি। অর্থাৎ যে মাল কলকাতা স্টোর থেকে দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে পাতলা ধরনের টিন! সব কাগজপত্র সীজ করলেন সি. ই। এম. বি., সাইট অর্ডার বুক, সাইট অ্যাকাউন্ট লেজার ফাইল, হাণ্ড রিসিটের অফিস কপি, এমন কি ওয়ার্ক-সরকারের নোট বই—যাতে লেখা আছে প্রতি ট্রিপের সময় তারিখ, মালের বিবরণ, লরির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম। সব নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধল সি. ই-র অর্ডালি পিয়ন। কন্ট্রাক্টরের গুলামে পড়ল সরকারী তালা। চট দিয়ে মুড়ে তালা শীল-মোহর করা হ'ল। সব কাজ বন্ধ রাখবার আদেশ দিলেন সি. ই.। অল ওয়ার্ক সাসপেন্ডেড আনটিল ফার্দার অর্ডার্স! শুধু অসমাপ্ত ঘরের চালগুলো মাস্টার রোল কুলি দিয়ে শেষ ক'রে নেবে ঋতব্রত। চোখে অন্ধকার দেখে রামশরণ। তার ত্রিশ বৎসরের ঠিকাদারী জীবনে এমন ঘটনা সে কখনও হ'তে দেখে নি। একবার আমতা আমতা ক'রে বললে, “দিনা বদল গেল কেমন ক'রে ছজুর?”

“সাঁট আপ স্কাউণ্ডেল—চিট!” ধমকে উঠেন সি. ই.।—সেকথা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললেই চলবে!”

গলা কাঠ হ'য়ে যায় রামশরণের।

ওরা দল বেঁধে চলল ঋতব্রতের বাড়ির দিকে। ঋতব্রতের হাতে তখনও রয়েছে গেজ-স্টেস্টারটা।

“ওটা আমার হাতে দিন স্তার।” পাশ থেকে কে যেন বললে।

অগ্নমনস্কভাবে তার হাতে যন্ত্রটা দিতে গিয়ে ঋতব্রতের নজর হ'ল লোকটা আর কেউ নয়—ইয়াসিন!

একগাল হেসে ইয়াসিন সেলাম করে এস. ডি. ও-কে।

সি. ই. একটু এগিয়ে গেছেন তখন। ঋতব্রত ইয়াসিনের দিকে ঘুরে বললে, “তুইও আয়—চা খেয়ে যাবি আমার ওখানে।”

ইয়াসিন মাথা নাড়ে, “আমাকে চা খাওয়াতে হবে না স্তার। বরং লপ্সি খাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা করুন ঐ হারামির! আমার কেস এখনও ঝুলছে,—এবার ম্যাজিস্ট্রটকে বলব ‘আমি কবুল খাচ্ছি স্তার—জেল দিন। শুধু জেলারকে বলে দেবেন স্তার ঐ হারামির সঙ্গে যেন একখানিতে জুতে দেয় আমাকে।”

কথা কটা উৎসাহের আতিশয্যে জোরে জোরেই বলে ইয়াসিন। পাশে পাশেই চলেছে রামশরণ। মাথা নীচু ক'রে চলেছে। সে বুঝেছে এতক্ষণে যড়যন্ত্রটা কেমন ক'রে পাকিয়েছে!

ঋতব্রত ঘুরে বললে, “হাঁথি কিন্তু গল্গল না সিংজী !”

সিংজী একবার আশেপাশে তাকালো, তারপর বললে, “হামি ত মরলাম, লেकिन আপনি ভি বাঁচবেন খোড়াই !”

তড়িৎশিখার মতো একটা চিন্তা খেলে গেল ঋতব্রতের মনে। ওর নামে কলঙ্কটা কি রামশরণই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? একমাত্র রামশরণই চেনে মেজদার বাড়ি। ধূর্ত সন্ধানী হয়তো কোনও সূত্রে ষোঁগাড় করেছে রেখা মিস্ত্রির ঠিকানাটাও।

ঋতব্রতের ঘরের সামনে রতন টেবিল চেয়ার পেতে রেখেছে। খান তিনেক চেয়ার পাতা আছে। সি. ই. একটাতে গিয়ে বসলেন। টেবিলের মাঝখানে একটা ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। সন্ধ্যা হব হব। ঘরের মধ্যে মশা হবার ভয়ে কমলা ব্যবস্থাটা বাইরেই করেছে। মন্দ নয়। গাছতলায় বসে চা খাওয়ার একটা আলাদা চার্ম আছে। সি. ই.-কে খাবার টেবিলে বসতে দেখে একে একে সুরেন সেনগুপ্ত, জীবন কর প্রভৃতি দূরে গিয়ে জটলা পাকাতে শুরু করল। রতন একটা প্লেটে খাবার আর চা নিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে আসতে গেল। গাড়ি কাঁচা রাস্তায় নামে নি কাদার মধ্যে।

সি. ই.-বললেন, “অবশ্য তোমার বিরুদ্ধেও ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকসন নিতে হবে আমাকে। তবে তোমার হয়েছিল জেজুইন মিস্টেক। অভিজ্ঞতার অভাব। তাছাড়া তুমি নিজেই পয়েন্ট আউট করেছ ভুলটা। সুতরাং হয়তো ওয়ার্নিংয়ে শেষ হবে তোমার পালা, কিন্তু তোমার ঠিকাদার ডুবলো অগাধ জলে।”

ঋতব্রতের হঠাৎ মনে পড়ে যে রতন খাবার নিয়ে গেছে ড্রাইভারকে দিতে। ঘরে কমলা একলা। হয়তো চা খাবার তৈরি হ’য়ে গেছে। আনবার লোক নেই বলে ঠাণ্ডা হচ্ছে সব। খবরটা নিতে সে ভিতরে আসে। ভিতরটা বেশ অন্ধকার। একটা কুপি জ্বলছিল রান্নাঘরে। ঋতব্রতের পদশব্দে হঠাৎ নিভে গেল সেটা। এগিয়ে এল ঋতব্রত। ডাকলে কমলার নাম ধরে। কেউ কোথাও সাড়া দিল না। ব্যাপার কি? পকেট থেকে একটা দেশলাই বার ক’রে কাঠি জ্বাললে একটা। স্বল্পালোকিত রান্নাঘরের একপ্রান্তে দেখা গেল একটা মোড়ার উপর বসে আছে কমলা—হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। ঋতব্রত যেন স্থানকালপাত্র ভুলে যায়। এগিয়ে এসে কমলার হাতখানি ধরে আকর্ষণ করে, “কি হয়েছে কমলা?”

কমলার কোন জবাব নেই। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে তার শরীরটা দুলে দুলে উঠেছে।

“কি হয়েছে বলো! কে তোমাকে কি বলেছে?”

জোর ক'রে ওর অশ্লীল মুখটা তুলে ধরে সে। হঠাৎ ঋতব্রতের হাতে ঠেকে এক টুকরো কাগজ। কমলার মুঠায় ধরা। জোর ক'রে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। কমলা দেয় না। ফলে আধখানা কাগজ ছিঁড়ে আসে। আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বালে ঋতব্রত।

কাগজখানা আর কিছুই নয়। ওর অসমাপ্ত কবিতার একটি ভগ্নাংশ। কমলাকে উদ্দেশ্য ক'রে যা সে লিখেছিল।

“না না ওটা আমার! আমাকে দিয়ে দাও।”

ঝাপিয়ে পড়ে কমলা। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হয়তো পড়ে যেত সে। ঋতব্রত ধরে ফেলে। ওর বুকের উপর ভেঙে পড়ে অশ্লীলবোধে কমলার কমল আনন।

হঠাৎ একটি তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হল যেন দৈববাণী : “এককিউস মি বোস। দিস্ ওয়াজ অল্‌সো এ পার্ট অফ্‌ মাই ইনভেস্টিগেশন্স। আই হ্যাড ইকোয়াল গ্রীডিয়াস্ চার্জেস্ এগেন্‌স্ট যু—ফ্রম আদার কোয়ার্টার্স!” সি. ই.র কণ্ঠস্বর।

ঋতব্রত বুঝতে পারে তার কর্তৃত্ব তত্ক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর মতোই লুটিয়ে পড়েছে। সংজ্ঞা হারিয়েছে কমলা। ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল কমলাকে। ক্ষিপ্ত হাতে কুপিতা জেলে ফেলে। দেখা যায় রান্নাঘরে সাজানো আছে দু খালা খাবার; টি-পটে লিকার ঢালা আছে! মগে করে জল নিয়ে ঝাপটা মারে বার দুই কমলার মুখে। ধীরে ধীরে উঠে বসে কমলা।

“আসছি আমি।” বলে বেরিয়ে গেল ঋতব্রত বাইরে। বাহির তখন জনশূন্য। রতন ছুটে এসে খবর দেয়, “সি.ই. চলে গেলেন স্ত্রীর।”

নিশ্চিন্ত ভাব রাতি নাই। সে রাত্রিও পোহালো। খবরটা জানাজানি হতে বাকি থাকবার কথা নয়। সি.ই. যে খাবার টেবিলে বসেও না খেয়ে চলে গেলেন—দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখল সবাই। জীবন কর, স্বপ্নের সেনগুপ্ত, ওয়ার্ক-সরকারেরা। ব্যাপারটা কি না বুঝলেও জল্পনা-কল্পনার বিরাম রইল না। কারণ তারপরই আবির্ভাব ঘটল অকুস্থলে ডাক্তার সাধুচরণের। পরীক্ষা ক'রে ঔষধ দিয়ে গেলেন তিনি কমলাকে। নারীস শক্ লেগেছে নাকি তার।

সারারাত বিছানায় ছটফট করেছে ঋতব্রত। এক ফোঁটা ঘুম নেই চোখে। এ কি হ'ল? কেন ঘটল এ দুর্ঘটনা! অবিশ্বাস্য ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল—সে চরিত্র-হীন! একটা বাস্তবহারী অসহায় মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাম চরিতার্থ করছে

সে, আর বাইরে অপেক্ষা করছেন মহামান্ত অতিথি ! এরপর বন্ধু মহলে সে মুখ দেখাবে কি ক'রে ? মেজদা ! মেজবোদি ! উঃ ! আর সে পারে না !

পাশের ঘরেও বিনিম্র রজনী যাপন করেছে নিশ্চয়ই আর এক হতভাগিনী । ভারি মায়া হ'ল ঋতব্রতের ওর উপর ! তার দোষ কি ! অথচ কি জানি কতদূর গড়াবে ব্যাপারটা ! মনে পড়ল সংজ্ঞাহীন কমলার দেহটি কেমন ক'রে দু'হাতে তুলে শুইয়ে দিয়েছিল সে । কি হালকা কমলা ! ভারি ইচ্ছে হ'ল পাশের ঘরে গিয়ে কমলার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয় । সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েইছে ।

ধীরে ধীরে পার্টিশন দরজার কাছে এগিয়ে যায় । দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ । ঝাঁপের দরজায় কান পাতে । ওপাশ থেকে ভেসে আসছে একটা চাঁপা কান্নার আওয়াজ । তোলপাড় ক'রে ওঠে ঋতব্রতের বকের মধ্যে ! না পারবে না,—কমলাকে ছেড়ে যেতে পারবে না সে । এতবড় গভীর ভালোবাসাকে উপেক্ষা ক'রে যাওয়া অজ্ঞান, পাপ ! ঋতব্রত সমাজ মানে না, পারিবারিক কোলিত্তের বুটো অভিগম সে লাগতে দেবে না তাদের এই অপাপবিন্দু অন্নান ভালোবাসার গায়ে । অহুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতো ডাকে সে, “কমলা ! কমলা !”

সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে ওপাশ থেকে,—“না না না, আমাকে ডেকে না ।”

ঋতব্রত কি বলতে যায়,—হয়তো কোন গাঙ্গনার কথা, অথবা দ্বার খুলে দেবার অহুরোধ—কিংবা ভালোবাসার কথা ; কিন্তু কথাটা তার বলা হয় না । ওপাশের বারান্দা থেকে রতন উঠে আসে ।

“—ডাকছিলেন স্মার ?”

একটা টোক গিলে ঋতব্রত বলে,—“হ্যাঁ, আমার দেশলাইটা জানিস ?”

“বালিশের পাশে নেই ?”

—“ও, হ্যাঁ রয়েছে ।”

সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল । কাল সকালে যা হয় করা যাবে । কমলাকে খোলাখুলি সব কথা জানাবে সে । হ্যাঁ, কমলাকে সে ভালোবাসে । কবিতায় যে কথা বলেছে—সেটা বাগাড়ম্বর নয়—তার মনের কথাই । কমলাকে সে বিবাহ করবে । সামাজিক মর্যাদা দেবে সে এ ভালোবাসার । এ সিদ্ধান্তে এসে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় ঋতব্রত । তন্দ্রার আবেশে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই । একবার মনে হ'ল ঘুমের মধ্যে লোমণ্ডরালা একটি কুকুর ওর পায়ে হুড়হুড়ি দিচ্ছে । অস্বোপান্তিতে পাটা টেনে নেয় । তারপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে । ঘুম ভাঙল রতনের গোলমালে । তখন পূর্বের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝের তির্ধকভাবে ।

“স্তার !”

“কি রে ?”

“দিদিমণি কোথায় ?”

“সে কি ?”

এঘর শুঘর কোথাও নেই। বাথকম, ল্যাটিন ? না কোথাও নয়। এই ভোরবেলা কোথায় গেল সে ? একি, তার বালিশের পাশে ট্রান্সের চাবি এল কি ক’রে ? সেটা তো কমলার আঁচলে ? চাবিটা নিতে গিয়েই বালিশটা সরে গেল। তলা থেকে বের হ’ল একখণ্ড চিঠি—

“শ্রীচরণেশ্ব—

তোমার জীবন তো ব্যর্থ ক’রে দিয়ে গেলাম। খেতে পরতে দেবে বলে এনেছিলে অনাথা মেয়েকে, তার দাবি দেখা দিল আকাশস্পর্শী স্পর্ধায়। তোমার আর দোষ কি ? আমার জন্ত তোমার নির্মল চরিত্রও আজ কলঙ্কলিপ্ত ! ঘরে বাইরে তোমার এ লাক্ষনা আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। রেখা মিত্রের চিঠিখানা আমি পড়েছি। তাকে ব’ল, তোমার মতো ছেলের ভালোবাসা পাওয়ার মতো পুণ্য করে নি হতভাগী কমলা। এ চিঠিখানাই তার প্রমাণ।

সেই কলঙ্কই তোমার হ’ল অথচ আমাকেও দিতে পারলে না এমন কোনও পাথের—যা সম্বল ক’রে কাটাতে পারতাম বাকি জীবনের ব্যর্থ দিনগুলি।

অনেক পাপ করেছি। মার্জনা চাইব না। সারাজীবনই তো পড়ে রইল তার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে।

চৌধুরীসাহেবকে ব’ল তাঁর স্নেহ ভালোবাসা আমি জীবনে ভুলব না। আমি হতভাগী ;—যার কাছে গিয়েছি তাকেই জালিয়েছি। তাঁর সদাহাস্তময় মুখের হাসিটুকু মুছে দিতে—তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে পড়তে আর সাহস হয় না।

যাওয়ার আগে একটা প্রণাম করতে গেলাম। তাও তো নিলে না ভূমি। চির-বিদায় রইল।

হতভাগিনী তোমার কমলা।

পরিশিষ্ট

বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী শেষ হয়ে গেল। শেষ হল ঋতুভ্রমের চাকরি-জীবনের প্রথম অধ্যায়। এই ঘটনার দিনই সে ক্যাম্প ত্যাগ করে; আর ফিরে যায় নি সে সেখানে কোনও দিন। বদলি হয়ে যায় অন্তর।

আজও অবসর সময়ে ইজিচেয়ারে ক্লাস্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে স্বতির বাঁপি খুলে বসে ঋতুভ্রত। ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায় লোকগুলি। উদ্ভাস্তদের প্রতি প্রকৃত দরদী তফাদার, অসাধু সাধুচরণ ও কুচক্রী ভৈরবচন্দ্র! স্বরেন সেনগুপ্ত, জীবন কর, শিশির, সত্যীশ ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। আর স্বতির পথে সার দিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই উদ্ভাস্তর দল। দেখতে পায় শুভকেশ বৃদ্ধ কুলপুরোহিত বিড়ি পাকাতে পাকাতে গুন্‌গুন্‌ ক'রে পড়ছেন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ। স্ববলচন্দ্রের বুকে গরম তেল মাশিষ ক'রে দেন স্ত্রী লতিকা। পাগলা বসে বসে আপন মনে বিড়িবিড়ি করে।

বিড়ি পাকাতে পাকাতে পাকা জুটুটো তুলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামনিধি চৌধুরী পাগলকে প্রশ্ন করেন, “হেইদিন কি কইলা তুমি—ল্যাডিন কথাডার অর্থ কি?” পাগল মিটি মিটি হাসে। চোখ দুটো পিটপিট করে খুশীতে।

বলে :—“If an angel out of heaven

Gives you something else to drink,

Thank him for his kind intentions;

Go and pour them down the sink !”

অর্থ গ্রহণ হয় না রামনিধির, বলেন, “কি কইলা?”

পাগল কথা বলে না। মিটি মিটি হাসতেই থাকে। রামনিধি কিন্তু এতে রাগ করেন না, বলেন, “বাই কও, বুস সাহেব লোক ভালোই আছিল, তার কথাই কইংছিলাম। শুন্‌ছি ঘুস খাইত না। ক্যান্‌ যে অমন দুর্মতি হইল ছেরাডার।”

পাগলা ফিক্‌ফিক্‌ করে হাসে। গুঁর ডালা থেকে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে ধরায়। একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে মুখ দিয়ে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। শালের খুটিতে ঠেস দিয়ে পা নাচাতে নাচাতে চোখ বুজে দার্শনিকের মতো বলে—

“Beauty provoketh thieves

Sooner than gold !”

মনে পড়ে কুসুমের কথা। জোর ক'রে তার মাথা নেড়া ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিবাদ করে নি। একবারও বলে নি—সে সত্যী—সে নিরপরাধিনী! কল্প পছন্দ স্বামীর হাত ধরে নীরবে ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল কুসুম। মনে পড়ে বিশ্বনাথের কথা। না, বিশ্বনাথকে সে চেনে না। যে উদ্ধত যুবকটি বলেছিল, “সমাজের চোখে তোমার বাবার ঠাকুর বিকলাঙ্গ পতিত। সমাজের চোখে আমিও ব্রাত্য—জেলফেরত আসামী। আমিও পতিত—তুমিও আমার কলঙ্কিনী রাই।” সেই সব বৃষস্কন্ধ কপাটবন্ধ বিশ্বনাথের দলকে চেনে না ঋতব্রত। সে দেখেছে শুধু বন্দারোগাক্রান্ত পাজর-সর্বস্ব তারাপদ নামধারী প্রেতাঙ্গাগুলিকেই! ওই যে কমলা;—পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি ছাড়া ওর কি অল্প কোনও সংজ্ঞা হতে পারত ক্যাম্পের ভিতর? বড়খোকাদের কাছ থেকে শালীনতা ও সত্যীত্ব রক্ষা করতেই যাবৎযৌবন বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হ’ত ওকে।

বড়খোকা! কে জানে সেই বা কেন নেমে এল এত নীচে। তার গোটা ইতিহাসটা জানা হয় নি। ঋতব্রতের মনে হয়—কি জানি তারও জীবনে হয়তো আছে এমন অধ্যায় যার জন্তে তার আজকের অধঃপতনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে! ঋতব্রতের সঙ্কল্পেও তো সি. ই.-র ভ্রাস্ত্র ধারণা হয়েছিল সন্দেহাতীতরূপে—সে নিজেও পোষণ করত ভ্রাস্ত্র ধারণা কুসুমের প্রতি! আর তাছাড়া—ভাবে ঋতব্রত—এই যে হাজার হাজার বৃন্তচ্যুত উদ্ভাস্তর দল—এরাই কি কেবল দ্বারী এদের আপাত অধঃপতনের জন্তে? এরা তো এমন ছিল না! এদের জানানো হয়েছে—এরা স্থায়ী পোস্ত্র—পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি।

প্রতাপশালী দুর্ধর্ষ জমিদার যখন বৃদ্ধ বয়সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, তখন এমনিভাবেই দিন গোনেন তিনি। ওরা সবাই শেষজীবনের সম্রাট শাহজাঁহা। ওদের আছে গৌরবময় অতীত—নিজ পরিবার-সাম্রাজ্যে ছিল তারা সার্বভৌম সম্রাট! আজ পড়ে আছে শুধু পরমুখাপেক্ষী পক্ষাঘাতগ্রস্ত শেষের দিনগুলি। ওরা জানে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়েও ওদের ভাগ্যের চূড়ান্ত মীমাংসা করা চলতো—তা করা হয় নি। কিন্তু দারাগিকোর চেয়ে শাহজাঁহার শেষজীবনই কি সুখের? র্যাডক্লিফের টানা যমুনার ওপারে সাতপুরুষের তাজমহলের দিকে তাকিয়ে যুত্কার দিন গুনছে হাজার হাজার শাহজাঁহা। সে তাজমহল হয়তো মাটির, হয়তো খড়ের ভাঙা চালা একখানি!

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে এদের পিছনে সরকারী তহবিল থেকে—যতদিন না মহাকালের হস্তক্ষেপ হয়। মানবিকতার মালগুদামে ওরা আন-সার্ভিসেব্ল্ মার্কা পেয়েছে। সার্ভে রিপোর্টেড হিউম্যানিটি! মহত্মাকৃতি জীব-গুলিকে তাই স্ট্যাক দিয়ে রাখা হয়েছে বকুলতলা ক্যাম্পে! নিলাম নোটিশ

জারি ক'রে লাভ নেই—কোনও “জ্যাপডালু”ই নেই এদের ! প্রতীক্ষা করা হচ্ছে উপর থেকে কবে আসে মহাকালের নোটস—“রাইট অফ্ !”

লেজার থেকে নাম-খারিজের আদেশনামা !

কানে বাজে দরদী তফাদারের কণ্ঠস্বর, “দে আর এ ক্লাস অফ পার্টিচুয়াল প্রফেসনাল লিগালাইজড বেগার্স ।”

আইন-সম্মত চিরস্থায়ী একশ্রেণীর ভিক্ষুকজীব !

বকুলতলা ক্যাম্পের কাহিনী শেষ হ'ল । ঋতব্রতের গল্প কিন্তু শেষ হয় নি এখনও—কারণ সে বকুলতলা ক্যাম্পের লোক নয় । তার গল্পের উপসংহার শুনতে গিয়েছিলাম তাই । পরিচয় হয়ে গেল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে । ঋতব্রতই পরিচয় করিয়ে দিলে । অবশ্য একমাথা ব্যাকব্রাশ করা প্র্যাটিনামরঙ চুল—পাইপমুখে মানুষটির পরিচয় না দিলেও চিনতে অসুবিধা হ'ত না । সম্ভাব্য চৌধুরী । ঋতব্রত আমার নামটা জানাল তাঁকে । পরিচয় দিলে সাহিত্যিক বলে, কবি বলে ।

“ও অলমাইটি, যু আর এ পোয়েট ? ছাটস্ ফানি অ্যাণ্ড ছাটস্ গ্রেট !”

আমি বলি, “ঋতব্রতের ক্যাম্পের গল্প শুনেছি তার মুখে । শেষ অধ্যায়টা আপনি বলুন ।”

“কতদূর শুনেছেন আপনি ?”

বললাম তা ।

“তারপর আর বাকি নেই কিছু । হঠাৎ পাটনায় একখানা টেলিগ্রাম পেলাম । আপনার বন্ধু অবিলম্বে আমাকে দেখা করতে বলেছে কলকাতার একটা হোটেলের ঠিকানায় । অ্যাণ্ড আই হাভ টু ক্লাই ব্যাক দেন অ্যাণ্ড দেয়ার । সব কথা খুলে বললে ওরা হু'জন ।”

“হু'জন ?”

“হ্যাঁ, সরলাও ছিল সে হোটেলে । ক্যাম্প স্টেশনে অপেক্ষমাণ সরলাকে ধরে নিয়ে এসেছিল আপনার বন্ধু । আমার কাছে পরামর্শ চাইল—কি করা যায় । হু'জনেই কনফেস্ করলে আমার কাছে । বুঝলাম—হু'জনেই অপরাধী—শান্তি হওয়া উচিত । বোথ্ শুড বি পানিশ্ড্ । একসঙ্গে হু'জনের হাতে ছাণ্ডকাফ পরিয়ে চালান দিলাম ।”

“কোথায় ?” প্রশ্ন করি আমি ।

“যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ! আপনি কবি মানুষ—তাই কাব্য ক'রে বলছি—ছাণ্ডকাফ ওয়াজ ফুলের মালা, প্রিজন্ হাউস ওয়াজ ম্যারেড লাইফ, জেলর ওয়াজ প্রজাপতি হিমসেল্ফ—অ্যাণ্ড জাজ দিস্ পুরার ফেলা ! রেজিস্ট্রি-ম্যারেজে সাক্ষী

ছিলাম আমি। কেমন ভালো করি নি সরলা মা ?”

সলজ্জ হেসে ম্যাডাম বস্তু বললে, “মোটাই না ! ওর তো মজাই হয়েছে ; মাইনেও দেয় না আজকাল, ব্যাঙ্কে টাকাও জমা দেয় না। আমারই হয়েছে জালা।”

সঞ্জীব চৌধুরী হঠাৎ ঋতব্রতকে প্রশ্ন করেন, “বাই দি ওয়ে—তোমার সেরে কবিতাটা শেষ হয়েছিল ? আমি তো শুনি নি ?”

ঋতব্রত হেসে বললে, “সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। আপনি যে কতবড় কাব্যরসিক বিবাহিত জীবনের উপর উপমা শুনেই তা বুঝেছি আমরা।”

নিরুপায়ভাবে শ্রাগ করেন চৌধুরী সাহেব। হতাশাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি তাঁর। কাব্যা করাটা মাঠে মারা যাওয়ায় নিরাশ হয়েছেন তিনি।

মনে পড়ল ঋতব্রতের বোভাতে ওদের চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দেখেছিলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পঙ্ক্তি ভোজনেই বসেছিলেন তিনি। বোভাতে নববধূ সকলের পাতে এক চামচ ক’রে ভাত দেয়—এটাই প্রথা। নববধূ সামাজিক স্বীকৃতি। তিন আইনে বিয়ে হলেও এ প্রথাটা মেনেছিলেন মেজবোদি। চীফের পাতে মিসেস বস্তু যখন ভাত দিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, “খাবারগুলো অনেকদিনের বাসি মনে হচ্ছে।”

“সে কি, সে কি !” ছুটে আসেন বাড়ির সবাই। মেজদা খাবারের থালাটা পালটে দিতে নিজেই ছুটে আসেন। সকলেই স্তম্ভিত !

বাধা দিলেন চীফ নিজেই, বললেন, “একদিন বোস আমার নিমন্ত্রণ করেছিল। তাড়াতাড়ি থাকায় আমি খেয়ে আসতে পারি নি। তাই ভাবলাম সেই খাবার-গুলোই বুঝি বোমার হাতে পাঠিয়েছে আজ !”

সি. ই.-র রহস্যপ্রবণতার কথা জানা ছিল সকলের। ঋতব্রতের কঙ্কুস স্বভাবের প্রতি এটি একটি বক্রোক্তি বলেই সকলে মেনে নিল ! তখন বুঝি নি, আজ বুঝি, একথায় কেন লাল হয়ে উঠেছিল ঋতব্রতের মুখ। মিসেস বোসের মুখ দেখতে পাই নি—সেটা ছিল ঘোমটার আড়ালে।

ঋতব্রত চৌধুরীসাহেবকে জানায়, “চৌধুরীসাহেব ! আমার বন্ধু আমার ক্যাম্প-জীবনের কাহিনী নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখেছে।”

“ইজ্ ইট ?” উৎসাহিত হলেন সঞ্জীব চৌধুরী।

“কি নাম দিয়েছেন বইয়ের ?”

“ছিন্নমূল !”

“অফুল ! রিনেম ইট—নাম দিন ‘বৃক্ষচ্যুত’ !”

“ওতো এক কথা !”

“না এক কথা নয় ! ছিন্নমূল মানে যে গাছের মূল ছিঁড়ে গেছে। নতুন মাটিতে পুঁতে দিলে আর সে বাঁচে না। অথচ বৃক্ষচ্যুত ফুলের আরও সম্ভাবনা আছে— সে ফুলে পূজার থালা থেকে বরণের মালা সবই সাজানো যায় !”

“কিন্তু বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিলে আর কি ফুল বাঁচে?” ঋতব্রত তখনও তর্ক করে।

“যু আর নাইদার এ পোয়েট নব্বু এ বোটা নিস্ট ! তাই বোকার মতো তর্ক করছ ! ফুল কি তোমার মতো ফুল ? ফলের সম্ভাবনাকে পিছনে রেখেই সে বৃক্ষচ্যুত হয়।”

এবারে আমি প্রশ্ন করি, “আপনি কি মনে করেন তেমনি সম্ভাবনা আজও আছে এই সব পার্মানেন্ট লায়্যাবিলিটি উদ্ভাস্তর ? সুযোগ পেলে ওরা আবার সামাজিক মায়ায় হয়ে উঠবে?”

“দি আনসার ইজ সিম্পল !”

“উত্তরটা সরল ?”

“সরল নয় সরলা !”

আমরা চুপ ক’রে যাই। চৌধুরীসাহেবই বলে ওঠেন, “সে যাই হোক, ক্যাম্পের কাহিনী যখন লিখেছেন তখন আমার কথাও থাকবে নিশ্চয়ই কিছু ? দেন আই মাস্ট হ্যাভ এ সাইড পার্ট অ্যাজ ওয়েল ?”

“সাইড পার্ট কোথায় ? আপনাকেই তো হিরো ক’রে একেছে ও।” বললে ঋতব্রত।

“তাই নাকি ? কই দেখি দেখি।”

অগত্যা পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনালাম। যেখানটায় তাঁর কথাগুলি আছে বিশেষ ক’রে।

হা হা ক’রে হাসলেন চৌধুরীসাহেব।

বললেন, “লোকের নাম অবশ্য মাঝে মাঝে আমার গুলিয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে সব সময় গুলোয় না। অ্যাটলিস্ট সরলা মায়ের নামটা আমার ভুল হয় না কখনও। এটা আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন নরেন বাবু।”

হাত দিয়ে কমলাকে কোলের কাছে টেনে নেন তিনি। মিসেস বোগও তাঁর ফেনস্ত্র কেশের মাঝে আঙুল বুলাতে থাকেন।

বললাম, “সব সময়ই হয়—আপনি অবশ্য সব সময় টের পান না, এই যা ভরসা। প্রথমত ম্যাডামের নাম সরলা নয়, কমলা—আর দ্বিতীয়ত আমার পৈত্রিক নামটাও নরেন নয়।”

“ইজ ইট ? দি সেম ওল্ড ফানি মিস্টেক্ এগেন ? দেন আই অ্যাম্ রিয়ালি ভেরি সারি।”

হা হা ক’রে হেসে ওঠেন সঞ্জীব চৌধুরী !

‘পদ্মা-যমুনা-মেঘনা-আড়িয়েল-থা বিদ্যোত নদীমাতৃক দেশের মাহুশ ওরা !

কোন অতীত ইতিহাসে ওদের উর্বরতন পূর্বপুরুষ এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে। সঙ্গে এনেছিল অশ্ব, গৃহপালিত পশু ;—এনেছিল দৃষ্ট সাহস আর উন্নত রক্তের অভিমান। ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল অঙ্গ-বঙ্গ-কলিক্দের কিনারে কিনারে। অল্পমত অনার্যদের সঙ্গে, মঙ্গোলীয় রক্তের সঙ্গে, আরও হাজার জাতি-উপজাতির শোণিতে ওদের সে অভিমান হয়েছিল দ্রব। তাদেরই একটা শাখা মেনে নিয়েছিল ঐ নদী মেঘনা শ্রামল ভূখণ্ডকে মাতৃভূমি ব’লে। পৃথিবী সে অধিকার স্বীকার ক’রে নেয়। কেটে যায় সহস্রাব্দী।

তারপর কোথা দিয়ে কি যেন হ’য়ে গেল। আজও ভাবলে অবাক লাগে হরিপদ মাস্টার মশায়ের—হঠাৎ একদিন নাকি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ’য়ে গেল আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা তাঁর সাতপুরুষের ভিটেখানায় তিনি পরবাসী। জিনিসটা ভালো ক’রে বুঝবারও সময় পাওয়া গেল না। মাস্টারি ক’রে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তাঁর। ভূগোল-ইতিহাস গিলিয়ে গিলিয়ে গাধা পিটিয়ে মাহুশ করতে হয়েছে ঝাঁকে—সেই হরিপদ মাস্টারকেই স্বীকার ক’রে নিতে হ’ল ইতিহাস-ভূগোল-বহির্ভূত এই সিদ্ধান্তটাকে।

হরিপদ চক্রবর্তীকে হঠাৎ একদিন বলা হ’ল যে মতিগঞ্জ তিনি প্রবাসী। মতিগঞ্জ তাঁর দেশ নয়। এখানে তাঁর স্থান নেই !

হরিপদ সামনের কলমের ফজলি গাছটার দিকে চাইলেন ; ওটা লাগিয়ে ছিলেন তাঁর কর্তামা। গোয়ালঘরখানির দিকে তাকালেন। দেখলেন গৃহসংলগ্ন দেবায়তনের দিকে,—সেটা তাঁর কর্তাদাদার প্রতিষ্ঠিত। অসহায় উদাস দৃষ্টিতে অনেক কিছুই ধরা পড়ল। পাশাপাশি টিনের চালার ভিড়, ছায়া-ধম্‌ধম্‌ নারকেল গাছের পাতায় পাতায় কোলাকুলি, মবাইয়ের গায়ে তেল-সিঁ‌হুরের রাঙা রেখা, নদীর হাঁ‌সুলি-বাঁ‌কের জল-চিক্‌চিক্‌ পাড়ে কলমি আর কচুর মিতালি, ধান সিঁ‌ড়ির ধাপে ধাপে বীজ-ধানের ঘন সবুজাভ। ফুলে ফুলে আপাদমস্তক মূড়ি দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা, গরুর গাড়ির চাকা মেরামত হচ্ছে কলিমুদ্‌দিনি মিস্ত্রির ছাপরায়—ভেসে আসছে তার ঠকাঠক ! ও পাশের দাওয়ায় পুত্রবধু কামিনীর আঁচল ধরে ঝুলে পড়েছে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বাবলু। রোজ় বল্‌মল মতিগঞ্জ গ্রামের আপাদমস্তক একনজরে দেখে নিয়ে হরিপদ মাস্টার চশমাটা খুলে নিয়ে মুছলেন। তারপর

আবার চোখে দিলেন সেটা। জীবনে এই প্রথম ভুল জেনেও অঙ্কটাকে সংশোধন করা হ'য়ে উঠল না। কোন্ নির্বোধ ছাত্র যে এতবড় ভুল অঙ্কটা কবলো তা জানতেও পারলেন না তিনি। অন্তত তাকে নাগালের মধ্যে পেলেন না। পেলে কি করতেন জানি না,—কিন্তু ভুল অঙ্কের অঙ্ক ফলাফলটাকেই স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। বার হ'য়ে পড়তে হ'ল স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে।

ওদের মতো অনেকেই চলে এল এ-পারে দলে দলে। সারি সারি মাহুঘ। কোলে শিশু, বগলে প্যাটার, মাথায় মোট আর বুকে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। শেষবারের মতো স্টিমারটা ডেকে উঠল মতিগঞ্জের স্টিমারঘাটে। সিটি তো নয়—সে এক আর্জানাদ! রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন গুঁরা। হরিপদ মাস্টার আর তাঁরই মতো সহস্র হতভাগ্য। নদীর জলে পড়েছে লক্ষ লক্ষ সূর্যকণা;—চেউয়ের মাথায় রয়েছে সঙ্কট—ফিরে যাওয়ার আহ্বান। কোটি কোটি হাতছানি দিয়ে মতিগঞ্জের স্টিমার ঘাটে নদী ওদের ফিরে ডাকছে। স্টিমারের সিটি শুনে দূরে স'রে যাচ্ছে ইলিশ ধরার নোকাগুলো। ওদের গলুইয়ে রানীকৃত রূপালী ইলিশ। মাছরাঙাটা স্থির হ'য়ে বসে আছে আধ-ডোবা কঞ্চিটার ডালে। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' নরনারী—তাদের মুখে আতঙ্ক, চোখে জল। আসবে, ওরাও আসবে, দুদিন আগে আর দুদিন পরে—এই যা!

এইবার খুলে দেবে স্টিমারের সিঁড়িটা। মতিগঞ্জের সঙ্গে যে সামান্ততম যোগসূত্রটি অবশিষ্ট রয়েছে—মুহুর্তে ঘুচে যাবে তা। সম্ভান ভেসে পড়বে নিজের ভাগ্যা-স্বেষণে—মায়ের জঠরের নিশ্চিত নিদ্রার অবকাশ আর ফিরে আসবে না জীবনে। হঠাৎ পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে পড়ে জোবেদালি।

“আমাগো ছাইড্যা চলান ছাবতা? আমরায় কি দোষ করলাম?”

না! দোষ জোবেদালি করে নি। কোনও দোষ নাই তার। ওর বাপ, ওর ঠাকুরদা ছিল চক্রবর্তী বাড়ির কৃষাণ। চক্রবর্তী পরিবারের ব্রহ্মোত্তর ভূখণ্ডটুকুতে ওরাই ফলাতো সোনা। ঘরে বয়ে দিয়ে যেত মালিকের প্রাপ্য ধান। আহ্বানমাত্র বেগার দিয়ে গেছে। বেজার হয় নি কখনও। সত্যনানারায়ণের প্রসাদ নিয়ে অন্নান বদনে কপালে ছুঁইয়ে খেয়েছে। ঈদের দিনে নিয়ে গেছে বকশিশ—বিজয়ার দিনে মিষ্টান্ন। দাওয়ার উঠে বসবার অধিকার ছিল না ব'লে ক্ষুব্ধ হন নি কখনও—এ কারণে যে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত—এটা যে মানবিকতারই অপমান সে বোধই ছিল না ওদের। না, জোবেদালির প্রতি কোন অভিযোগ নেই চক্রবর্তীর। তিনি ওর হাত ছুটি ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটি কথাও বলতে পারলেন না। ধরা গলায় জোবেদালি বলে, “আমাগো কি আইব? ছুঁথের দিনে

কার কাছে গিয়া দাঁড়াইবাম ?”

হরিপদ চক্রবর্তীর মনে হ’ল এই জোবেদালির সঙ্গে তাঁর আত্মার আত্মীয়তা আছে। সুখ দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হ’য়ে গেছে শতাব্দী অথবা সহস্রাব্দীর নির্দেশে ! র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে সম্পর্ক ছিন্ন হ’তে পারে না। দুঃখের স্বাদে জোবেদালির কোনও নিরাপত্তা নেই চক্রবর্তী বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছাড়া। চক্রবর্তী বাড়ির কোন উৎসবও সম্পন্ন হ’তে পারে না পরিবার-ভুক্ত জোবেদালির উপস্থিতি ভিন্ন। হরিপদ চক্রবর্তী বলেন, “মন খারাপ করিস না আলি। তুই আমার পরিবারের লোক—আমার আত্মীয়। তোকেও আমি নিয়ে যাব কলকাতায়।” ফ্যালফ্যাল ক’রে তাকিয়ে থাকে জোবেদালি। যেন বুঝতে পারে না মাস্টার মশাইয়ের কথা।

“কি ভাবছিস রে বোকা ? ভয় নেই—তোর বউকেও নিয়ে যাবো—ফতিমাকেও ; ওখানে আবার আমি জমি কিনবো। তোকেই বন্দোবস্ত দেবো। তুই ভাবিস না। আমাকে ছেড়ে তোরাও চলবে না—তোকে ছেড়ে আমারও চলবে না রে।”

দ্বিতীয়বার সিটি দেয় স্টিমারে। ওরা সিঁড়িটাকে সরাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সচকিত হ’য়ে ওঠে জোবেদালি। ছুটে চলে যায় সিঁড়ির দিকে। ওর স্বদেশের সঙ্গে যোগসূত্রও বুঝি এখনই ছিন্ন হ’য়ে যাবে। যাবার সময় তার ভীত আঁত ধরে কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় ক’টি শব্দ : “না কর্তা, কইলকাতায় যাইলে উয়ারা আমারে মাইয়া ফালাইবে !”

চকিতে স্বরণ হয় হরিপদ মাস্টারের। মতিগঞ্জ যেমন হরিপদের বিমাতৃভূমি—খাস কলকাতাও তেমনি জোবেদালির কাছে বিদেশ। ভুল অঙ্কটার কথা মনে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ !

ওদিকে স্টিমারটা বার কতক পাক খেয়ে তখন ঘুলিয়ে দিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ’য়ে পড়লেন যেন চক্রবর্তী। স্টিমারের সারেও কোনপথে চলেছে—জ্ঞান নেই তাঁর। তবু নির্বিবাদে ছেড়ে দিয়েছেন তার উপর এ যাত্রার দায়িত্ব। যেমন ছেড়ে দিয়েছেন জীবনতরীর হালখানি ভাগ্যদেবীকে।

দর্শনা থেকে বানপুর। দলে দলে চলেছে মানুষ। মানুষ, আর মানুষ। অতীত ইতিহাসের যুগে যেমন ক’রে এসেছিল সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে এদের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ,—খাইবার ‘পাস’ দিয়ে—আধাবর্তে ! নয়নারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃতবৎসা-নারী সম্মানক্রোড়ে সত্তা জননী ! সঙ্গে ক’রে নিয়ে চলেছে খাঁচায়-পোষা পাখি, গলায় চেন কুকুর। ক্যানেক্তার, পৌটলা, বাস্ক, বিহানা। কাঁঠিওঠা মাদুর আর কালিওঠা লঠন। কাঁকালে শিশু, চোখে আতঙ্ক আর হৃদয়ে

সম্মান। ওদের পূর্বপুরুষ আধাবর্ষে এসেছিল নতুন রাজ্য জয় করতে ; অনাধীদের উদ্ধাস্ত করতে। ওরা এল নিজের দেশ ছেড়ে—উদ্ধাস্ত হ'য়ে।

এইটুকু হাঁটাপথে আসতে হবে। দুই রাজ্যের মধ্যে সরাসরি রেলপথ আছে—নেই রেলপথে গমনাগমন। এইটুকু পথ আসতে রেললাইনের পাথরে ঠোঁকর খেয়ে চোখ থেকে পড়ে চশমাটা ভেঙে গেল হরিপদ মাস্টারের। ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ তিনি বরাবরই। চোখে অন্ধকার দেখলেন। স্ত্রী বিন্দুবাসিনী হাত ধরে ঠুঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন রেললাইনের ধারের এক বিরলছায়া বাবলা গাছতলায়। বড়মেয়ে নমিতা দুর্বাধাস ছিঁড়ে এনে একটুকরা ছাকড়া দিয়ে বেঁধে দেয় পায়ের বুড়ো আঙুলটা। থর মধ্যাহ্নের দৃপ্ত তেজে ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। সেই দু'ঘণ্টা ধরে তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চোখের সামনে দিয়ে—বৈশাখী মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে বয়ে গিয়েছিল এক জনপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। মানুষ চলছে গায়ে গায়ে লেগে, প্রশস্ত রেলপথের উপর চাপ ভিড়। ঠেলা-ঠেলি, ছড়াছড়ি—দীর্ঘ ক'মাইল বিস্তৃত যেন জীবন্ত মানুষের একটা চলন্ত অঙ্গুর! বিনা চশমায় একটা মানুষের থেকে আর একটা মানুষকে তফাত ক'রে দেখতে পারছিলেন তিনি। যেন প্রতিটি মানুষের কোন পৃথক সত্তা নেই। ওরা যেন সম্মানিত পলায়নপর একটি অভীষ্মার উপাদান। অঙ্গুরটা চলছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই। 'ওর লেজটা দেখা যায় না—কিন্তু কে বুঝি সন্ধিন দিয়ে খোঁচা দিয়েছে সেই লেজে। ভয়ত্রস্ত সরীসৃপটা ছুটে চলেছে দর্শনা থেকে বানপুর! আজও কলোনীর বিরলস্থান কুটিরের মাত্র বিছিয়ে যখন শুয়ে থাকেন—চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায় সেই বিচিত্র মিছিল। গায়ে গায়ে লাগা মানুষের প্রবাহ।

এ-পারে এসে কে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে। স্টিমারে, ট্রেনে, কতো লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নতুন ক'রে জীবিকা অন্বেষণের যৌথ প্রচেষ্টা করবেন ব'লে কয়েকজনের নাম পরিচয়ও লিখে রেখেছিলেন নোট বইতে। কে জানে কোথায় গেল লোকগুলো। আছে হয়তো কোনও পি. এল. ক্যাম্পে পড়ে অথবা পেয়েছে পুনর্বাসিত তাঁরই মতো। না হয় হাকামা চুকেই গেছে একেবারে। সাত আট বছর কেটে গেছে এরপর। কত বড় বঙ্গা ব'য়ে গেছে এদের উপর দিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। ট্রান্সিট ক্যাম্প, পি. এল. ক্যাম্প, পুনর্বাসিত, যাও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বেরার—ফিরে এসো হাওড়া অথবা শেয়ারলদ' স্টেশনে। পুলিশ ভান, কোর্ট, হাজত—ঠিক ছায়! ছায়াটার নেই বাটপাড়ের ভয় ; কি করবি কর। আবার পুনর্বাসিত ? বেশ আবার চেষ্টা ক'রে দেখব। তোমাদের যদি দৈর্ঘ্য থাকে তবে আমাদেরও থাকবে।

“কেন থাকবে না?”—বলেন গোকুল দাস। জমিদারের গোমস্তা ছিলেন তিনি। বলেন, “ও ব্যাটাগো স্বেচ্ছা করা কি সহজ মশয়? মাইর খাইয়া খাইয়া ব্যাটাগো পিঠে কড়া পইড়া গেছে। আরও মারবা? মারো। তোমারই জুতো ছিঁড়বো।” হরিপদ মাস্টার বলেন, “ওরা ওরা বলছেন কেন? আমি আপনিও তো ঐ দলেই। আমরাও তো উদ্ধাস্ত!”

“আমরা আর অরা?”—বিস্মিত হন গোকুল দাস। জমিদারের দুর্ধ্ব গোমস্তা। বলেন, “আমরা হইলাম গিয়া ভদ্রলুক, মানে মিডলক্লাস। আর অরা? অগো কোনও দিন চা’ল আছিল না চুলা আছিল? ঘর ভাইক্যা দিছি বার বার। উই-পুকার মতো গড়ছে আবার!”

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আড়িয়েলখা বিধৌত নদীমাতৃক ভূখণ্ডের মানুষগুলো সে গৌরব দাবি করতে পারে। এক হাতে রুখেছে প্রকৃতিকে—অন্য হাতে প্রতিহত করেছে প্রবলতর শোষণবিলাসী মানুষকে। দু’হাতে সংগ্রাম ক’রে চলেছে আজীবন। তবু দুর্ভাগ্যকে জয় করতে পারে নি। শ্রাবণ-ভাদ্রের ভরা নদীতে শোনা গিয়েছে স্তম্ভোখিত অজগরের গর্জন—নিভৃত রাত্রে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখেছে হয়তো একশ’ দেড়শ’ হাত এগিয়ে এসেছে নদী! কাল সন্ধ্যায় যে বিরাট অশ্বখ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখে গিয়েছিলে গৈরিকবাসনা মেয়েটির উদ্দাম উচ্ছ্বাস—আজ সে মহীরুহের চিহ্নমাত্র নেই। রাতারাতি নদীতীর ছেড়ে মানুষ চলে গিয়েছে অভ্যস্তর ভাগে। সেখানে নতুন বন্দোবস্ত দেয় না জমিদার। নদী যদি জমি খেয়ে নেয় তবে কে কি করতে পারে? অসহায় স্ত্রীপুত্র গরু-ছাগল নিয়ে মানুষগুলো ঘুরে মরে, বানের মুখে কুটোর মতো। তারপর সংবাদ আসে নদীর ওপারে জেগেছে চর। উর্বর পলিমাটির চাদর মুড়ি দিয়ে দলদলে কাদামাটি হাতছানি দেয় ওদের। চরের জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলে ওরা। মানুষ-থেকে কুমীরে তাড়া ক’রে ধরে নিয়ে যায় বিরলবলতি চরের শিশুকে—বিষাক্ত সাপের করাল দংশনে নীল হ’য়ে যায় প্রিয়জন। তবু ওরা হার মানে না। চালায় লাঙ্গল, বোনে শস্ত, বসায় কলমের গাছ। ধীরে ধীরে মাথা তুলে জেগে ওঠে গ্রাম। প্রকৃতিকে জয় ক’রে ওরা হাসে!

অমনি দেখা দেন আর একজন। এতদিন যিনি খোঁজই রাখেন নি মানুষগুলো কি করেছে চরে। তিনি জমিদারের লোক। হুকুম জারি হয়—নতুন বন্দোবস্ত নিতে হবে। কে অহুমতি দিলে ওদের এখানে ঘর করতে?

অহুমতি? অহুমতি আবার কিসের? অহুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে প্রকৃতি—পৌকুষের দৃষ্ট নির্দেশে। কিন্তু সেকথা শোনে না জমিদারের পেয়াদা। এ যুক্তি

গুরা মানে না।...

...দূরের গ্রাম থেকে সকলে মধ্যরাত্রে বেরিয়ে এসে দেখে নদীর বুকে জলে উঠেছে বাড়বানল। বিস্তীর্ণ নদীর এ পাড়ে এসে পৌঁছায় না তার পোড়া ছাই, অথবা হতভাগ্য গৃহদগ্ধ মানুষের অস্তিম আর্তনাদ!

“চরইস্‌মাইলপুরে আগুন লাগছে মনে হাতিছে?”

“লাগবো না! হালার জমিদার।”

এ যেন চিরন্তন একটি ব্যবস্থা! প্রতিবাদের প্রয়োজন নেই। গ্রীষ্মকালের খররোজ, বর্ষার ধারাপাত, জীতের তীব্রতা যদি মুখ বুজে সহ্য করতে পার তবে এটাই বা পারবে না কেন?

তবু উইপোকাকার মতোই মানুষগুলো আবার লেগে যায় ঘর বাঁধতে!

সেই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দেশের মানুষগুলি এসে ঘর বেঁধেছে কলোনীতে।

কলোনী!

উদয়নগর উদ্বাস্ত কলোনী।

বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে জেগে উঠেছে নতুন বসতি। এলোমেলো অগোছালো গ্রাম নয়। দস্তরমতো প্রাণ করা গ্রামনগরী। প্রাণের ব্লুপ্রিন্ট দেখলে মনে হ’তে পারে ত্রিশ-চল্লিশ-ছোট চণ্ডা সমান্তরাল সড়কগুলোর হুঁধারে বাড়িগুলি বুঝি সাজানো। বাস্তবে কিন্তু বিসর্পিত রেখার অপ্রশস্ত গলির কাদা ভেঙে বাড়িগুলোর কাছে পৌঁছানোই কষ্টকর। ঈশ্বর জানেন ক্রটি কার। যে সরকারি ওভারসিয়ার প্রাণ দেখে রাস্তা লে-আউট দিয়েছিল তারই যোগ্যতার অভাব—অথবা সরকারি সড়ক গ্রাসে উৎসাহী কলোনীবাসীর যোগ্যতার পরিচয়! পাশাপাশি বাড়ি। তার ছাঁদ আলাদা। কোনটা পাকা, কোনটা কাদার। দরমা, মুলিবাঁশও আছে। পলস্তারা করা পাকা ইটের দেওয়ালের উপর কংক্রীটের ছাদ থেকে শুরু করে পাট-কাঠির দেওয়ালের উপর তাল পাতার ছাউনিও আছে। সরকারি খাতা অমুদ্রায়ী এদের মূল্যমান হওয়া উচিত অভিন্ন। প্রত্যেকটি বাড়ি করার খরচ বাবদ সরকারি খাতায় ঋণের পরিমাণ সাড়ে বাইশ শ’ টাকা। একচুল এদিক ওদিক নেই।

এদের মাঝে মাঝে আবার আছে অসমাপ্ত ঘর। কোনটা প্লিন্স পর্যন্ত গাঁথ-কোনটার লিণ্টেল ঢালাই হ’য়ে থেমে আছে। মাঝে মাঝে উর্ধ্বমুখ পিলার-অহল্যা পাপঞ্চলনের প্রতীকায় দাঁড়িয়ে আছে। এদের বারা মালিক তারা নিরুদ্ধেশ। জমি আছে—অসমাপ্ত বাড়ি আছে—নেই মালিক। কলোনীর পরিভাষায় ডেসার্টার! ছুট লোকে বলে গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা আত্মসাৎ করে এরা নাকি

অপর জায়গায় গিয়ে ব্যবস্থা করেছে নতুন ঋণলাভের। উর্মমুখ পিলারগুলো বোধহয় সেকথা বিশ্বাস করে না। শবরীর প্রতীক্ষায় ওরা দিন গোনে।

এ ছেন একটি ডেসার্টারের বাড়ির মাথায় থান কয়েক করগেট চাপিয়ে বর্তমানে বাস করছেন হরিপদ মাস্টারমশাই। সাতবছর আগে ট্রেনে-সিমায়ে খাঁরা হরিপদ মাস্টারের নাম লিখে নিয়েছিলেন তাঁরা আজ তাঁকে দেখলে চিনতে পারবেন না। সাত বছরেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে যেন বিশ বছর। ডান চোখে একেবারেই দেখতে পান না তিনি। বাঁ চোখটায় তীব্র আলোর সামনে বুঝতে পারেন লোক-জনের আনাগোনা। মাহুস চিহ্নিত করার মতোও দৃষ্টিশক্তি নেই তাঁর। উমাশলী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত এপারে এসে বহু স্কুলেই দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু নতুন চাকরি জোটে নি তাঁর। লেখাপড়ার চর্চা ছিল তাঁদের পরিবারে। বড় ছেলে অনিমেসকে ওকালতি পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। হ'ল না। নমিতাও মেথাবী ছাত্রী। প্রাইভেটে পড়েই ম্যাট্রিক পাস করেছিল সে। পড়ালে এতদিনে বি. এ. এম. এ. পাস করত হয়তো। কিন্তু কিছুই করা হ'ল না।

গৃহনির্মাণ ঋণের টাকা দিয়ে একটা বাড়ি করতে শুরু করেছিলেন। প্রায় শেষও হ'য়ে এসেছিল। তারপর অর্থাভাবে তিলে তিলে খুলে বিক্রি করেছেন জানালা-দরজা-টিন-ইট! নিজের উপার্জন নেই। অনিমেস একটা রিকশা চালায়। তাতেই চলে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন। আজ দু'মাস সেও রোগশয্যায়। বর্তমানে এই ডেসার্টার্স কোয়ার্টারে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সপরিবারে। জীবনের সব আশা আকাজ্জকই ঘুচে গেছে। এখন বৃদ্ধের একমাত্র বাসনা ছোট ছেলেটিকে মাহুস ক'রে তোলা। ওকে দিয়েই ফিরিয়ে আনতে হবে এ সংসারের লক্ষ্মীত্রী।

ঘর একখানিই। তার মাঝামাঝি একটা শাড়ি টাঙিয়ে এপাশে রাত্রি যাপন করেন হরিপদ মাস্টার আর স্ত্রী বিন্দুবাগিনী। নমিতা আর লতু সে দিকেরই ভাগীদার। শাড়ির অপরাংশে, গোরবে পাশের ঘরে, অনিমেস আর কামিনী নিম্নস্বরে দাম্পত্য আলাপ করে। গোরা শোয় ওদের কাছেই। অন্ধের কনিষ্ঠ সন্তান এগারো বছরের বাবলু যে কোথায় শোয় তা বোধহয় সে নিজেই জানে না।

ক'দিন ধরে অনিমেসের জরটা একেবারেই ছাড়ছে না। অবশু জরতাপ মাপবার মাপকাঠি এক্ষেত্রে হরিপদ মাস্টারের হস্তস্পর্শই। কিন্তু উষ্ম বাপের কল্পিত হস্তে কি ভুল নির্দেশ দিতে পারে না? অনিমেস মাথা তুলে উঠে বসবার চেষ্টা করে। আজ তার শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালোই বোধ হচ্ছে।

“আবার উঠে বসলে কেন?” প্রশ্ন করে কামিনী।

“জরটা ছাড়লো মনে হচ্ছে।”

কামিনীর ডান হাতটা ঐটে। গোরাকে খাওয়াতে খাওয়াতে উঠে এসেছে। বা হাত দিয়ে স্বামীর ললাট স্পর্শ করে। জ্বর বেশ আছে বলেই মনে হয়—সেকথা জানাতে মন সরে না ওর। চুপ ক’রে থাকে।

“বউমা, র্যাশানের থলেটা দাও।”

পর্দার ওপাশ থেকে হরিপদ শাড়া দেন। ত্রুপদে কামিনী বেরিয়ে আসে। স্বস্তরের হাতে তুলে দেয় চটের থলিটা। আজ ডোল-ডে। স্বস্তর গিয়ে চাল আনবেন তবে জালা হবে উনান। অঙ্ক মাছুষ। ঠেলাঠেলি ছড়াছড়িতে সহজেই কাবু হ’য়ে পড়েন। চাল নিয়ে হয়তো ফিরবেন পড়ন্ত বেলায়। তখন রান্না চড়বে। র্যাশান-মেয়াদের শেষ কটি দিন কামিনীর প্রায় অভুজ্জই কাটে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে সে তখন গিয়ে বসে কাঠের উনানের সামনে। ভিজা কাঠের উনানে ফুঁ দিতে চোখে জল আসে। তাতে দুখ নেই কামিনীর। কান্দবার এ একটা ভালো অছিলা।

বাপমায়ের আদরের মেয়ে ছিল কামিনী। একমাত্র সন্তান—তাই অভিমানী ছিল সে বড়। অনেক খোঁজ ক’রে বাবা-মা তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন হরিপদ পণ্ডিতের বড় ছেলের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষিত মহোপাধ্যায় বংশ। অনিমেষ ছেলেও ভালো। তখন পড়ত কলেজে। আম-জামের বাগান ঘেরা ওদের বসত বাড়িটা দেখে কল্যাণদায়ক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—অভিমানী মেয়েটার অন্তত খাওয়া-পরার কষ্ট থাকবে না।

কিন্তু কোথা থেকে কি যে হ’য়ে গেল!

টিপি টিপি বৃষ্টি নামলো। মাথায় একটা গামছা চাপিয়ে হরিপদ মাস্টার র্যাশান আনতে বেরিয়ে গেলেন।

“বাবলু কোথায়?” কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করে অনিমেষ। ওর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে কামিনী। বলে, “কি জানি সে তো বেরিয়ে যায়, সেই কাকডাকা ভোরে।”

“আর ফেরে বুঝি সেই প্যাঁচা-ডাকা মাঝরাত্রে?”

কামিনী জবাব দেয় না। আপন মনেই বকতে থাকে অনিমেষ : “ছেলেমাছুষ তো আর নয়। দশ-এগারো বছর বয়স হ’ল। সংসারের অবস্থাটা তারও বোকা উচিত। অঙ্ক বাপ বৃষ্টি মাথায় ক’রে র্যাশান আনতে যায়—আর নবাবপুত্র কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন।”

এত দুখেও কামিনীর হাসি আসে। বলে, “গাল দিচ্ছ কাকে?”

“নবাব খাজা খাঁর বেটা তোমার আদরের দেওরটিকে। আদর দিয়ে দিয়ে যার

মাথা খেয়েছ তাকে।”

অনিমেষের কণ্ঠস্বরে একবিন্দু কোমলতা নেই। বাবলু যে তার বৌদির আদরেই উৎসর্গে যেতে বসেছে এটুকু অনিমেষ বর্ণে বর্ণে বোঝে। তাই খোঁচা দিয়েই বক্তব্যটা শেষ করে।

কামিনী রাগ করে না। দেওরের প্রতি তার স্নেহের আতিশয্যাটা যে বাড়িমুখ সকলে মাথা খাওয়ার পর্যায়ে ফেলে এটুকু তার জানা কথা। তাই হাসিমুখেই সে জবাব দেয়, “তা যেন বুঝলাম, কিন্তু জর গায়ে ভাইকে গাল দিতে বসে আসলে কাকে গাল দিচ্ছ তা কি ভেবে দেখেছ?”

“কাকে?”—প্রশ্নটা বোধগম্য হয় না অনিমেষের রোগভূবল মস্তিস্কে।

“তোর বাপকে রে অল্প, তোর বাপকে। ঐ যে তুই গরীব ইস্কুল মাস্টারকে নবাব খাজা খা বললি না, তাই বৌমার মুখে হাসি আর ধরছে না। আসল নবাবের ঘরের মেয়ে কিনা তাই শ্বশুরের খোয়ারে আনন্দের আর পরিসীমে নেই!”

কামিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার আঁচল তুলে দেয়। বিন্দুবাসিনী। কঠোর সত্যটা অকস্মাৎ মুখব্যাদান ক’রে দাঁড়িয়েছে। একই ঘরে বাস করে ওরা। শ্বশুর-শাশুড়ী, পুত্র-পুত্রবধূ! মাঝের টাঙানো বস্ত্রখণ্ডটি গোরা যে কখন টেনে নামিয়েছে তা খেলাই হয় নি কারও। দৃশ্যাস্তরের অসময়ে মঞ্চাধিপের অনবধানতার ড্রপসীন উঠে গেলে—যেমন ক’রে ছুটে পালায় সীন সিফ্টারেরা, তেমনি দ্রুতপদেই নিজস্ব হ’তে চায় কামিনী ঘর থেকে। বাধা পায় সেদিক থেকে নমিতা প্রবেশ করায়। নমিতার হাতে এক বাটি বার্লি। অনিমেষের তক্তাপোশে সেটা নামিয়ে রেখে মায়ের দিকে ফিরে বলে, “তুমি আবার ওদের কথার মধ্যে কথা বলতে এসেছ মা? একখানা ঘর—ওরা কি স্বামী-স্ত্রীতে কোন কথাও বলতে পারবে না তোমার জ্বালায়?”

“অন্তায় হ’য়ে গেছে মা, মাপ চাইছি। তবে চোখ-কানের সামনেই এসব হ’তে দেখলে সব সময় স্থির থাকতে পারি না। কি করব! কপাল আমার!”

আপন মনে গজগজ করতে করতে তিনি চলে যান। নমিতা এবার কামিনীকে বলে, “আর তোমাকেও বলি বৌদি। জানো তো একখানি মাত্র ঘর। ওসব কথাগুলো কি চেষ্টিয়ে না বললেই নয়?”

কামিনী বলে, “কপাল আমারও ঠাকুরঝি। শাশুড়ী নন্দ যে সব সময় আড়িপেতে আছেন এটা মনে থাকে না আমারও।”

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় নমিতা। যেন কিছু বলবে সে। তারপর রোগজীর্ণ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে সামলে নেয় নিজে। চলে যায় ধীর পদে।

কামিনীও অল্পসরণ করে।

অনিমেঘ চূপ ক'রে শুয়ে থাকে। আজ ছ'মাস সে শয্যাগত। তার আগে সেও বেরিয়ে যেত সেই কাকডাকা ভোরে—আর ক্ষিপ্ত সাড়ে দশটার শেষ লোকালের প্যাসেঞ্জার দেখে পৌঁচাডাকা মাঝরাত্রেই! অনিমেঘ ভাবে তাড়াতাড়ি সব বদল হ'য়ে যাচ্ছে। শুধু তাদের আর্থিক সচ্ছলতাই নয়, মাহুষগুলো পর্যন্ত। উমাশঙ্কী গার্লস স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তী তো আমূল পরিবর্তিত হ'য়ে গেছেন। শুধু দেহে নয় মনেও। সত্যাত্মী আদর্শবাদী হরিপদ পণ্ডিতের প্রেতাত্মা আজ উদয়নগর কলোনীর ডোলভুক্ ডিকাজীবী তাকে চেনা যায় না। বদলে গেছেন বিন্দুবাসিনীও। উচ্ছল সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন তিনি। গোয়ালঘরে গোমাতার সেবা থেকে আহারান্তে পণ্ডিতের হাতে খড়কে কাটিটি এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজটুকু তিনি নিজে হাতে করতে চাইতেন। নববধূ কামিনীকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন এ বাড়ির কুলাচার। নির্বিবাদী মাহুষ ছিলেন তিনি। কটুকথা কেউ কখনও শুনতো না তাঁর মুখ থেকে। পুত্রবধূর সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করা তো স্বপ্নকথা! বদলেছে নমিতাও। কামিনীর সঙ্গে ওর বয়সের তফাত নেই। দুই অন্তরঙ্গ সখীর মতোই ছিল ওরা ওপারে। আজ তাদের সামান্যতম জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। দোষ অনিমেঘ দেবে কাকে? একটু আগে বকছিল বাবলুকে। কিন্তু বাবলুই কি এ রকম ছিল চিরকাল? ছেলেবেলার বাবলুকে মনে পড়ে। এক মাথা কৌঁকড়া কৌঁকড়া চুল। নিটোল স্বাস্থ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। ডাগর চোখ দুটির অন্তরালে যেন কোন অতলম্পর্শ গভীরতা আছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দুঃখ কষ্টই পেয়েছে এতদিন। ওপারের জীবনটা তার কাছে গল্পকথা। নিজের বাল্যকালের সঙ্গে ভাইয়ের শৈশব তুলনা ক'রে এতদিন শুধু কষ্টই পেয়েছে। উমাশঙ্কী গার্লস স্কুলের হেড পণ্ডিতের বেতন যাই হোক সংসারে প্রাচুর্য ছিল যথেষ্টই। অপরিপুষ্ট মাছ, অটেল আম-জাম-কলা। খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে—খিদে পেলে অল্পভূতিটা কেমন হয় অনিমেঘ জানতে পারে নি এপারে পা দেবার আগে। বাড়ির সামনে ছিল একটা কালোজামের গাছ। নীল হ'য়ে থাকত গাছের তলাটা পাকা ফলের প্রাচুর্যে। পেড়ে কুড়িয়ে নিঃশেষিত করা যেত না তার অক্লপণ দান। মাহুষের পদদলনে নীলাভ হ'য়ে থাকতো পাকা জামের রসে পথ চলতি সড়ক। আর আজ জাম বিক্রি হয় পরসার চারটে। বড় বড় ডাগর চোখে লোলুপতা ফুটে ওঠে বাবলুর। দাদা বলে, “জাম খাবি বাবলু? যা এক পরসার কিনে আন।”

“ভারি তো জাম—” ঠোট উন্টে জবাব দিত বাবলু।

এত বুঝমান ছিল সে। খিদেয় শুকিয়ে গেছে মুখটা—তবু খেতে চায়নি। অতটুকু ছেলেমানুষ বুঝে নিয়েছিল এ সংসারের অসহায়তা। শুধু বড় খিদে পেয়ে বৌদির কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে সলজ্জে জিজ্ঞেস করেছে : “আজ ফ্যান রাখ নি বৌদি?” জবাব দিতে পারে না হয়তো কামিনী। সে কি ক’রে বোঝাবে অতটুকু ছেলেকে—যে ফ্যানটা আলাদা ক’রে রাখলে ভাতের পরিমাণ যায় কমে। সহজে হজম হ’য়ে অল্প সময়েই খিদে পায়। তাই ভাত থেকে ফ্যানটাকে বিমুক্ত করা আর সম্ভব হচ্ছে না এ সংসারে। বৌদির মুখ দেখেই বুঝে নেয় বাবলু। তাড়াতাড়ি শুকনো ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলে, “বাঁচিয়েছ বৌদি; ও ফ্যান সত্যিই গিলতে পারি না আমি। মাগো! মানুষে খায় নাকি শুধু ফ্যান খুন দিয়ে!” ওর হাসি দেখে চোখে জল আসে হয়তো কামিনীর!

সেই বাবলু!

অনিমেঘ উত্তপ্ত মস্তিষ্কে বসে বসে তাই ভাবে। সেই বাবলুর এতবড় পরিবর্তন হয় কি ক’রে? শত চেষ্টাতেও ওকে বই নিয়ে বসানো যায় না। ব’লে, ব’কে, মেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন হরিপদ মাস্টার। নমিতাও বোধহয় আশা ত্যাগ করেছে। ‘ও গাধাটার কিছু হবে না’ বলেছেন পণ্ডিত। অনেক গাধাকে যিনি পিটিয়ে মানুষ করেছেন—এবং বাবলুর মেধা আর অধ্যবসায় নিয়ে যার গর্বের অন্ত ছিল না, এক সপ্তাহে তার অক্ষর পরিচয় শেষ হয়েছিল বলে যে পণ্ডিতের প্রশংসার ভাষা যোগায় নি—তিনিই শেষ পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী ক’রে বসলেন একদিন। সংসারের কোনও কাজ করবে ন। আজকাল কারও সঙ্গে ভালো ক’রে কথাই বলে না। কোন ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় কেউ টেরই পায় না। দুপুরে ফিরে কোনও দিন খায় কিনা তা ওর বৌদিই জানে। সারাদিন ওর দেখা নেই। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ও গুটিগুটি এসে শুয়ে পড়ে ওর নির্দিষ্ট মাহুরে। হয়তো ঘুম ভেঙে যায় নমিতার অথবা বিন্দুবাসিনীর। কিন্তু মধ্যরাত্রে আর কে ছেলে শাসন করতে বসে। স্ততরাং লালয়েং, তাড়য়েং কোনটাই হ’য়ে ওঠে না। এগারো বছরের এক ফোঁটা বাবলু সংসারের শাসন শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক’রে চলেছে।

অনিমেঘ কি করতে পারে? বাবলু তো ছেলে, অল্প বয়স। লতুটাকেই কি শাসন করতে পারে? ঐ বোধহয় একমাত্র মেয়ে যার কোনও পরিবর্তন হয় নি। এপারে আসার সময় কতই বা বয়স ছিল ওর। বছর সাত আটের একটা চঞ্চল ফুটফুটে মেয়ে ছিল। আজ ওর বয়স পনেরর কোঠায়। গড়নটা বাড়ন্ত নয় বলে আজও ক্রক পরে। কিন্তু বয়স তো ছেলেমানুষের নয়। লতু বোধহয় দেহে মনে আজও

সেই লতুই আছে। সেই কিশোরী বালিকা। শুধু কিছু বাজে নভেল প'ড়ে অকালপক হয়েছে ইতিমধ্যে। লেখাপড়ার ধার সেও ধারল না! লতুর জন্তে ভেবে আর কি হবে? সব গুণের অধিকারিণী হওয়া সম্বন্ধেও নমিতারই যখন কোনও ব্যবস্থা করা গেল না—তখন লতুর আর কি হ'তে পারত? কিন্তু বাবলুটার উপর বড় ভরসা ছিল যে! অনিমেষ অবাক হ'য়ে ভাবে—সংসারের সব কাজে কামিনীর এত বুদ্ধি, এত বিচক্ষণতা, আর এই সোজা কথাটা কেন সে বোঝে না? কামিনী কেন বোঝে না যে ঐ একফোঁটা ছেলেটার দিকে চেয়েই দিন গুণছে এতগুলো লোক। সে মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে, চাকরি-বাকরি ক'রে এই ভেঙে পড়া সংসারটাকে আবার খাড়া ক'রে তুলবে! মহোপাধ্যায় বংশের শেষ সম্মানটুকু হয়তো ওই পারতো উদ্ধার করতে; অন্ধ হরিপদপণ্ডিতকে এই উদ্ধৃতি থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারতো অমৃত শেষের কটা দিনের জন্ত।

“ওমা, বার্লিটুকু এখনও খাও নি? জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে?” কামিনী এসে দাঁড়ায়।

“মা কোথায়?”—অনিমেষ প্রতিপ্রশ্ন করে।

“মা জল আনতে গেছেন।”

রাস্তার ধারে নলকূপ। এতদিন কামিনী অথবা নমিতাই জল নিয়ে আসতো। সম্প্রতি এ দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী অথবা নমিতা প্রতিবাদ করে নি। করবার উপায়ও ছিল না। নতুন একখানা শাড়ি না কেনা পর্যন্ত তাদের দু'জনের কারও পক্ষে সম্ভব নয় রাস্তার কল থেকে জল তুলে আনা। বাইরে বের হবার অর্থাৎ জল আনতে যাবার একটি মাত্র এজমালি শাড়ি ছিল—কোনদিন কামিনী কোনদিন নমিতা সেখানি পরেই জল নিয়ে আসতো। সেটিও জীর্ণ হ'য়ে এসেছে। তাছাড়া টিউব-ওয়েলের ঠিক সামনেই জয়হিন্দ কেবিন। চায়ের দোকান। ডি-ব্লকের সেক্রেটারি বিষ্টুপদ মজুমদারের রেস্তোরাঁ। যত রাজ্যের বেকার বকাটে ছোঁড়ার আড্ডা সেটা। স্বয়ং বিষ্টুপদও কম না। এটা অল্পভব করেছেন বলেই বিন্দুবাসিনী স্বেচ্ছায় এ দায়িত্বটা নিয়েছেন। লতু অবশ্য এ কাজটা ক'রে দিতে পারতো সংসারের। করেও মাঝে মাঝে কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ভুলেও যায়। এই ‘মাঝে মাঝে’ ব্যাপারটা এত ঘন ঘন ঘটতে লাগলো যে শেষ পর্যন্ত বিন্দুবাসিনী আর ওর উপর ভরসা করতে রাজী নন। পানীয় জলটা মাঝে মাঝে ভুলে গেলে সংসারটাও মাঝে মাঝে অচল হ'য়ে ওঠে! এতকথা অনিমেষ জানে না। বলে, “মা জল আনতে গেছেন? কেন? জলটুকুও ভুলে আনতে পার না ভূমি? নমু পারে না, লতু পারে না?”

একটু ইতস্তত করে কামিনী। তারপর বলে, “লতুর কথা জানি না। কিন্তু ঠাকুরঝি বা আমার লজ্জা করে—এ শাড়িটা—”

“ও! তা ইয়ে, বাবলুকেও তো বলতে পার সংসারের এটুকু কাজ ক’রে দিতে। ষাট বছরের বুড়িটাকে সেও তো একটু সাহায্য করতে পারে। আমরা তার নাগাল না পেলোও তুমি তো তার দেখা পাও।”

“আচ্ছা বলব অখন! কিন্তু বার্লিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি!”

“না খাব না। আগে আমার কথার জবাব দাও। সত্যি তুমি কি ভেবেছ মনে? এ ভাবে বাউণ্ডুলে হ’য়ে যাবে ছেলেটা? লেখাপড়া শিখবে না? মানুষ হবে না?”

কামিনী কি যেন ভাবে একটু। তারপর বসে পড়ে ওর চৌকির একপ্রান্তে। ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, “কথাটা তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম। দেখলে তো, ওর লেখাপড়া হবে না। বাবা আর ঠাকুরঝি যতই কেন না বকাঝকা করুন ও বই নিয়ে কিছুতেই বসবে না। ও চাইলে বিষ্টুর দোকানে কাজ করতে। এক বেলার খোঁরাকি আর মাসে পাঁচটাকা নগদ! অথচ তোমরা রাজী হ’লে না। তোমরা মত দাও ওকে আমি ঐ চাকরিই নিতে বলি। যা হোক সংসারের আয় তো হবে!”

নমিতা বসেছিল ঘরের প্রায় চৌকাঠের কাছে। উঠে আসে সে। আর সহ্য হয় না তার। বলে, “বাবা আর ঠাকুরঝির বকাঝকায় কেন কাজ হয় না তা তো তোমার অজানা নেই বৌদি। বাড়িতে একজন যদি অনবরত আশকারা দিয়ে যায় তবে তাকে শাসন করে কে? বাবলু হবে চায়ের দোকানের বয়? ওর লেখাপড়া হবে না। কেন হবে না? জানো, বাবা বলতেন ঠুর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বাবলুর মতো মেধাবী ছেলে একটিও দেখেন নি। পড়লে ও নিশ্চয়ই বৃত্তি পাবে পরীক্ষায়।”

“সে কি আমিই জানি না ঠাকুরঝি? পড়াতে পারলে তুমিও এতদিনে বি. এ পাস ক’রে চাকরি করতে—তোমার দাদাও হয়তো ওকালতি করতে পারতো। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। ইচ্ছা থাকতেও তোমরা পড়াশুনা চালাতে পারলে না—আর ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা পণ্ডিত ক’রে তুলবে?”

নমিতা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কামিনী তার যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে: “তাছাড়া সংসারটা তো চালাতে হবে? তোমার দাদা আজ দু’মাস বিছানায় পড়ে। মানুষ তো কমগুলি নই আমরা সংসারে?”

নমিতা জবাব দিতে পারে না। অনিমেঘও কোন উত্তর খুঁজে পায় না। এতদিন

সংসারটা চলছে কি ক’রে সেই বিষয়। অবস্থা অবশ্য চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে—তবু অচল হ’য়ে তো পড়ে নি। চলছে খুড়িয়ে খুড়িয়ে অভাগীদের এ সংসারটাও। “তোমরা বুঝিয়ে বল বাবাকে। ঠাকুরপোকে বিষ্টুর দোকানেই ঢুকতে দাও!” “না!” হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে অনিমেঘ : “জীবনে অনেক নিচে নেমেছি; কিন্তু আর নামতে পারব না।”

কামিনী জবাব দেয় না। সে জানে আসল অভিমানটা কোথায়! সামাজিক মর্যাদার অভিমান। জাতের অভিমান। মতিগঞ্জ স্কুলের হেডপণ্ডিত হরিপদ চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র মহোপাধ্যায় ৬কৃষ্ণচন্দ্র ভিষগুরুত্বের পোত্র—চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতের ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করবে—নিষিদ্ধ মাংসের উচ্ছিষ্ট প্লেট ধুয়ে মুছে তুলবে—এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না তাঁরা। অবস্থার ফেরে পণ্ডিতগির্গি আজ রাস্তার নলকূপে জল আনতে যান—পণ্ডিতমশাই গিয়ে দাঁড়ান ভিক্ষার ঝুলি হাতে ডোল অফিসে—পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—যাকে ওকালতি পড়াবার বাসনা ছিল পণ্ডিতদম্পতির সে আজ রিকশা চালায়; কিন্তু ব্যাস! ওর নিচে আর নামা যায় না।

“বার্লিটা খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি!”

অনিমেঘ আর আপত্তি করে না। চটা-ওঠা কলাই করা বাটিটা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে।

জলভরা ঘড়াটা শশকে উঠানে নামিয়ে হাঁপাতে থাকেন বিন্দুবাসিনী। বয়স হয়েছে, অতবড় ঘড়াটা বয়ে আনতে তাঁর সতিহই কষ্ট হয়।

বাইরে কে যেন ডাকে : “পণ্ডিতমশায় রইছেন নাকি ঘরে?”

“কে? ভিতরে আসুন।” সাড়া দেয় অনিমেঘ।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে বিষ্টুপদ। ডি-ব্রকের সেক্রেটারি তথা জয়হিন্দ-কেবিনের মালিক স্বনামধন্য বিষ্টুপদ মজুমদার। কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার স্বেচ্ছা পায় না। দরজার কাছেই বিষ্টুপদ দাঁড়িয়ে আছে। কামিনী মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃত হ’য়ে পড়ে পিঠের আধখানা—ছিন্ন কাপড়ের ফাঁকে। সেটা অশুভব করে সে। তাড়াতাড়ি সেটুকু ঢাকতে গিয়ে ঘোমটাটা নামিয়ে দিতে হয়। বিষ্টুপদের সঙ্গে চোখোচোখি হয় ফলে। অস্বস্তিকর অবস্থা।

বিষ্টুপদ হাসে : “আরে আমাকে দেইখ্যা ফির লজ্জা পাও ক্যারে? আমি তো ঘরের লুক।”

“আসুন, এখানে এসে বসুন।”—অনিমেঘ আহ্বান করে ঠুঁকে চৌকিতে এসে বসতে। বিষ্টুপদ কিন্তু এগিয়ে আসে না, দ্বার ছেড়ে। সেখান থেকেই বলে,

“বৌমাঝে একখান শাড়ি কিনা দাও সে অনিমেঘ ! ঘরের লক্ষ্মীকে এক্ষেত্রে উদামগা কইর্যা রাখছ, মা লক্ষ্মী তো বেবাক্ অথুণী অইবই !”

আপাদমস্তক জ্বালা ক’রে ওঠে অনিমেঘের। দাঁতে দাঁতে চেপে বলে, “ওকে যেতে দিন। দরজা ছেড়ে বসুন এখানে এসে !”

এবার বিষ্টপদকে এগিয়ে আসতে হয়। কামিনী দ্রুতপদে নিজস্ব হয় ঘর থেকে। যেন কৌরবসভা ত্যাগ করলেন যাজ্ঞসেনী।

“মাস্টার মশয় কই ? বাবলুরে দেখি না ?”

“বাবা রাশন আনতে গেছেন। বাবলু বাড়ি নেই। কি বলছিলেন বলুন।”

“কইং ছিলাম কি বাবা অন্ধ বুড়টারে ক্যান পাঠাও ডোল অফিসে ? বউডারে না পাঠাও বুইন দুডার একটারেও তো পাঠাইতে পার ?”

“কেন পারি না তা তো আপনার জানা উচিত মজুমদারবাবু। দু দুবার ডি-ব্লকে শাড়ি বিলি হ’ল অথচ আমাদের বাড়ি বাদ পড়ল। আপনি সেক্রেটারি, আপনার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয় ?”

“কি করুম কও ! পাচখান শাড়ি তো পঞ্চাশ জন পরিবার। কারে দিয়া কারে রাখুম কও ?”

“যাক্ যা বলতে এসেছেন বলুন।”

“বাবলুরে আমরাই দাও। দুকানে একডা ভালো ছুকা খুঁজতাম। চাইর হারামজাদরে রাখছি—চারডারেই তাড়াইছি। হালারা সব চোর ! বুঝল না বাবা, পিছন ফিরছি কি মুখে ঢুকাইছে খাওন।”

বলতে বলতে পানের ডিবা থেকে একখিলি পান নিয়ে নিজেও মুখে দেন তিনি। তারপর শুরু করেন : “বাবলুডা হাজার হউক চোর অইব না, পুণ্ডিতের পোলা, আর যা শিখুক চুরি বিছাটা শিখে নাই—না কি কও ?...আরে ক্যা ও নমু ? নমুদিদি ! আমরা টুক্ চুন দাও সে নমুদিদি !”

“আপনাকে তো আগেই বলেছি মজুমদার মশাই। ওকে আমরা লেখাপড়া শেখাব। চাকরি করতে দেব না।”

“আরে দাহ্ কও তো ভালোই—কিন্তু পারতেছটা কই ? কোনও কাজ কামের মধ্যে ঢুকায়ে দাও। বদমাইসিডা কমব। তাছাড়া দু’ পয়সা রুজগার হইব সংসারে। পাচডাটা মাস মাস তাই বা আয়ে কুথিক্যা ? ঘরের হালতো ঠাখতেছ ? বুইনগুলার বিয়া ঝাওন লাগবো। নমুর দিকে তো চক্ষু তুল্যা চাওন যায় না।... আরে এ্যাই যে চুন আনছ দেখি !”

নমিতা চুনের পাত্রটা হাতে প্রবেশ করেছে একটু আগেই। বিষ্টপদ সেটি গ্রহণ

করে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। শুকনো ঠোঁটটা জিব দিয়ে একবার চেটে নেয়। নমিতা চুনের পাত্রটা নামিয়ে রেখে চলে যায়।

“ই্যা কি জান্ কইছিলাম? নাকি চাওন যায় না! তারপর ধর গিয়া কুজগারের পথ দেখাইলেও যুদি না লও তোমরা, তখন ত ফ্রি র্যাশন মিলব না! টারভেশন তো সবার জুগ্গি নয়!”

হাসে অনিমেঘ—পাণ্ডুর হাসি। বিষ্টুপদ পাঁচ কষছে। কলোনীতে যারা বেকার—কোন রোজগারের ব্যবস্থাই যারা ক’রে উঠতে পারে নি, সেই সব দুঃস্থ পরিবারকে স্টারভেশন ডোল দেবার ব্যবস্থা আছে। র্যাশন কার্ড বিলি করেন ‘আর. ও’-সাহেব। তিনি সরকারি কর্মচারী। তবে কে কার্ড পাবে কে পাবে না এটা স্থির করেন তিনি ব্লক-সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। ব্লক-সেক্রেটারিরা কলোনীরই লোক। কিছুটা স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হয়েছে আর কি। তাই ব্লক-সেক্রেটারি দয়াক্ষণ্য নিয়ে তদন্ত ক’রে রিপোর্ট দেন। সেই রিপোর্ট অস্থায়ী বিচার করা হয় কোন পরিবার ফ্রি র্যাশন পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী কিনা। বিষ্টুপদ ইচ্ছা করলে এদের ফ্রি র্যাশন পাবার অধিকারটুকু কেড়ে নিতে পারে। সেই ইঙ্গিতই যে সে করছে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না অনিমেঘের। বিরুদ্ধ আক্রোশে সে ফুলতে থাকে। সে বুঝে নিয়েছে বিষ্টুপদের কারসাজি। অল্প মাহিনায় বিশ্বস্ত একটি ছোকরা চাকর পাওয়ার লোভে এই পাঁচ কষছে।

বিষ্টুপদের উদ্দেশ্য কিন্তু আরও গভীর। সে চায় এই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ’তে। তার স্বাপদ চক্ষুর দৃষ্টি ফিরছিল ওপাশের ছোঁচা বেড়ার ঘরখানির আশে পাশে। অসংবৃত বসনে যেখানে ঘরকন্নার কাজ করছে কামিনী। ডি-ব্লকের টিউব-ওয়েলটা জয়হিন্দ কেবিনের ঠিক উল্টো দিকেই। চায়ের দোকানে বসেই বিষ্টুপদ লক্ষ্য করে পাড়ার মেয়েদের জল নেওয়া। কামিনীর সঙ্গে কয়েকবার তার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। মেয়েটার যে বয়স হয়েছে তা যেন বোঝাই যায় না। বছর চব্বিশ পাঁচশের কম হবে না। এক ছেলের মা। কিন্তু হ’লে কি হবে, মেয়েটার একটা অভূত আকর্ষণী শক্তি আছে। পাড়ার অনুঢ়া ষোড়শী অষ্টাদশীদের কাউকে দেখতে তো বাকি নেই তার। ডলি, শেফালী, সরমা, নমিতা,—সবাইকেই তো দেখে ওখানে বসে, কিন্তু এক ছেলের মা এই মেয়েটার পাশে দাঁড়াতে পারে কেউ? রঙটা শ্রামবর্ণ নয়, কালোই। তা হোক, স্বাস্থ্য কিন্তু তার অটুট। আজ মাসখানেক মেয়েটা জল নিতে আসছে না কল থেকে। বাবলুটাকে দোকানে ঢোকাতে পারলে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। গরজটা বিষ্টুপদর তাই রড় বালাই হয়ে পড়েছে। বাংলা উপভ্রাস যথেষ্ট পড়া আছে বিষ্টুপদর। কণ্ঠস্থ আছে

বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ রসস্থ অহুচ্ছেদ। পরকীয়া প্রেম অসিদ্ধ—হিঁদুঘরের কেউ এ অনাচার সহ্য করবে না ! অন্তত বিটুপদর তাই ধারণা।

অনিমেঘ ধীরে ধীরে বলে, “ও কথাটা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বিটুবাবু। এ বাড়িতে কেউ উপার্জনক্ষম নেই ব’লে আমরা স্টারভেশন ভোল পাই। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের ওটা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন তা আমার মনে আছে।”

“আরে কি কও ! সব কথারই তুমি বাঁকা অর্থ লও দেহি। তোমাগো ভালোবাসি তাই না স্টারভেশন ব্যবস্থা কর্যা দিছি।...আরে এ ছিছি, চুন বেশী লইয়া লিছি দেহি। মুখ এক্ষেত্রে পুড়্যা গেছে। আরে অ নম্ ! কই গেল এয়ারা ? বোমা, অ বোমা !”

অসহায় অনিমেঘ বজ্র দৃষ্টি মেখে শুয়ে থাকে। ঘরে এসে ঢোকে লতু। বছর পনের বয়স। বাড়ন্ত চেহারা নয়—আজও ফ্রক পরে। চোখে মুখে কথা ফোটে তার। সংসারের কোন কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। এসেই বলে, “কি হয়েছে দাত্তর ? চুনে মুখ পুড়েছে বুঝি !”

“হ !”

লতু খিলখিল ক’রে হেসে ওঠে !

“চুনে কি আপনার মুখ পুড়েছে ? পুড়েছে অণ্ড কিছুতে ?”

“কি কও ?”

“কই কি যে চুনেও মুখ পোড়ে না—কালিতেও মুখ পোড়ে না এমন কি চুন কালি একসঙ্গে মুখে পড়লেও অনেক নির্লজ্জের মুখ কিছুতেই পুড়তে চায় না কিনা !”

অনিমেঘ ধমক দিয়ে ওঠে : “কি হচ্ছে—এই লতু !”

“তা তুমি রাগ করলে কি হবে। দাত্ত আমাদের রসিকতা ঠিকই বোঝে—না দাত্ত ? তা জল দেবো ? মুখটা ধুয়ে ফেলবে ? এখন জলই চাও—চুন-কালি যা চাও সব ষোগাড় দেব আমি ! দিদিও আসবে না—বৌদিও না !”

“তুই যা বলছি—যা এখান থেকে !” ধমকে ওঠে অনিমেঘ। হাস্তে হাস্তে লতু চলে যায়।

মুখখানা কালি ক’রে ব’সে থাকে বিটুপদ। তারপর হঠাৎ হেসে সে লঘু করে ব্যাপারটা : “আরে লতুর কথা ধর ক্যান্। এ্যাক্ষেত্রে পোলাপান ! তা যাউক ! কাল থিকা বাবলুরে দুকানে পাঠাইবা তো ?”

হরিপদ পণ্ডিত ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলেন। সমস্ত শরীরটা তাঁর ভিজ়ে গেছে। বৃষ্টির জলে না ঘামে তা তিনিই জানেন। উত্তেজনায় পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। বিটুপদর প্রস্তাবটা কানে গিয়েছিল তাঁর। তাই উঠান থেকেই বললেন :

“না!”

“না? না—ক্যান?”

“কারণ ব্রাহ্মণের ছেলে কোন জন্মে শূদ্রের দোকানে চাকরের কাজ করে না তাই।”

“অ;—বুঝছি। তা বামুন ঠাকুরের ভিকার অন্ন তো মিষ্ট লাগবই। বামুনের ব্যবসাই যে ভিকার। এখন আমার টাহাভা দিয়া ছান আমি চইল্যা যাই।”

“টাকা? কিসের টাকা?”

বিষ্টুপদ পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বার ক’রে মেলে ধরে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। এগারো বছরের বাবলুর আঁকা বাঁকা অঙ্করে লেখা, “দশটাকা ধার হিসাবে বুঝিয়া পাইলাম। বাবলু।”

প্রথমটা বাক্যক্ষুণ্ণ হয় না কারও। অনিমেষ সামলে নেয় নিজেকে। বলে, “আপনি ছেলেমানুষ নন বিষ্টু বাবু। এগারো বছরের ছেলের যে হাতচিঠি দিয়ে টাকা ধার করার অধিকার নেই—আর নিলেও যে তার জন্ম তার বাবা দাদা দায়ী হয় না—এ সহজ কথাটা আপনার জানা উচিত।”

“আপনারা টাহা দিবান না?”

“না! একবার নয়—একশ’বার না!” অনিমেষ উত্তেজিত। হরিপদ নীরব।

“বেশ এখন আর আমারে দুসবাম না। আমি আদায় করবাম।”

“আদায় করতে পারেন করবেন। গায়ের জামাকাপড় খুলে নিতে পারেন। ধার সে শোধ দেবে কেমন করে?”

হাহা করে হাসে বিষ্টুপদ।

“টাহা আদায়ের ফন্দিও জানা আছে দাছ! উত্তলের কথা না ভাইব্যা টাহা দি নাই! আচ্ছা চলি!”

ভিজা ছাতাটা তুলে নিয়ে বিষ্টুপদ রওনা দেয়। দৃঢ় পদক্ষেপ তার। সে পদক্ষেপে টাকা আদায় সম্বন্ধে কোনও সংশয় আছে ব’লে মনে হয় না। অনিমেষ বিস্মিত হয়। হরিপদের বোধহয় বিস্মিত হবার মতোও মানসিক অবস্থা নেই। বিন্দুবাগিনী বলেন; “বাবলু টাকা ধার করেছে? এক-আধ নয় দশটাকা? আজ আশ্চর্য ছেলে ঘরে।”

কেউ সে কথার জবাব দেয় না।

বিষ্টুপদ ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়বার আগেই কে তাকে ডাকে পিছন থেকে: “শুভুন!”

অনতিদূরে কামিনী! আশ্চর্য! যে মেয়েটা তাকে দেখলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, ভুলেও

মুখ তুলে তাকায় না—সেই আজ তাকে পিছন থেকে ডাকছে ! বিষ্টুপদ ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ায় । একটু পিছিয়ে দাঁড়ায় কামিনী ।

“বাবলুকে কিছু বলবেন না—সে আপনার টাকা ফেরত দেবে ।”

“কি কও ! আজ দেড় মাস হয়্যা গেছে এক পয়সা দেয় নাই—এ্যারে আর বিশ্বাস কি ?”

“আমি কথা দিচ্ছি । আমি আপনার টাকা শোধ দেব ।”

“তুমি ? তুমি কই পাইবা ?”

“সে কথা যাক । আপনি কথা দিন বাবলুকে মারধর করবেন না ।” হঠাৎ খুশীতে হাসি উথলে ওঠে বিষ্টুপদর সর্পচ্ছতে । এ ব্যাপার তো আশা করা যায় নি । এ যে গাছে না উঠতেই এককাদি ! ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে বিষ্টুপদ : “এডা কি কও, তুমি দিবা টাহা আর তাই আমি হাত পাইত্যা নিবাম ?”

কামিনী সতর্ক হ'য়ে স'রে দাঁড়ায় ।

“তুমি ভরসা দিলি আর আমার ভয়ডা কি ?”

কামিনী এবারও নিরুত্তর ।

“জল আনবার যাওনা দেহি—ক্যারে ?” বিষ্টুপদ একেবারে বিগলিত । কামিনী একটি কঠিন জবাব দেবার আগেই পিছন থেকে ডাক শোনে : “বৌমা !”

তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ায় বিষ্টুপদ । বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন । ক্ষতপদে বিষ্টুপদ গলিটা পার হয়ে যায় । একবারও পিছন ফিরে তাকায় না ।

“অনেক সহ্য করেছি বৌমা—অনেক নিচে নেমে গেছি আমরা ! শেষ আঘাতটা বোধহয় তোমার হাতেই পাওনা ছিল ! ছিঃ !”

কামিনী শিউরে ওঠে ! এ কী কথা—আত্মকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যায় : “এ কি বলছেন আপনি ! মা, আমি আমি—” কথাটা শেষ করতে পারে না ।

“ঠিকই বলছি বৌমা । বলবারও আর কিছু নেই তোমার—বুঝবারও বাকি নেই কিছু আমার । কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথা নয় । দ্বিতীয়বার যেন এ দৃশ্য আমাকে না দেখতে হয় ।” ক্ষতপদে বিন্দুবাসিনী ফিরে যান বাড়ির দিকে ।

স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে কামিনী । মৃগয়ী মূর্তি । কিসের থেকে কি হ'য়ে গেল—যেন বুঝতেই পারে না ।

কথা হচ্ছিল নিতাই কবিরাজের ডাক্তারখানায় ।

যোগেন নারেক বললে, “যে যাই বলুক ঠাকুর্দা, আমার মত আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখা ।”

ঠাকুর্দা অর্থাৎ বৃদ্ধ নিতাই কবিরাজ জবাব দেন না। হাঁটু'পর্বন্ত কাপড় তুলে টুলের উপর উবু হ'য়ে বসে নিম্নলিখিত লোচনে বিড়ি টেনে চলেন। জবাব দেয় প্রমোদ পাল। বলে, “কি ভাবে চেষ্টা করতে চাও ভূমি?”

“সেই সনাতন পদ্ধতিতে। চল সবাই মিলে গিয়ে দরবার করি ডি. এম্. এর সাথে। হয় কাজ দাও, নয় ডোল দাও—নয় ফার্মারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে শেষ ক'রে দাও আমাদের। তোমরাও বাঁচ, আমরাও বাঁচি।”

ভূষণ বলে, “এ গান তো গাওয়া হ'য়ে গেছে বাবা। বার বার একটি কেক্তন কি ভালো লাগবে ঠুঁদের?”

“তা ছাড়া আর কি করা যায় বল? আমরা কি শখ ক'রে এককথা বার বার বলি? সেবার বলেছিলাম, গুঁরা কায়দা ক'রে ফিরিয়ে দিলেন আমাদের। মনে ভাবলাম—বুঝি ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। তাই আবার একই সুরে গাওয়া শুরু করতে চাইছি।”

বিড়িটাতে একটা অস্তিম টান দিয়ে সেটা বাইরে ফেলে দেন ঠাকুর্দা। গুছিয়ে বসে বলেন, “ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ যোগেন। সেবার আমরা সবাই এক রা কেটে-ছিলাম। বুড়ো বাচ্চা মায় ঘরের বউ পর্বন্ত গলা মিলিয়ে হৈকে ছিল কাজ দাও বলে। এবার আমাদের দল ভেঙে গেছে। সেবার যারা আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবার তারাই দাঁড়িয়েছে আমাদের বাধা হ'য়ে। কলোনীরই লোক তারা এবং বেশ ক্ষমতাশালীই। তারা আমাদের বিপক্ষে যাবে।”

প্রমোদ বলে, “ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল! সত্যিই এবার আমরা কিছুতেই এক হ'তে পারব না।”

ঠাকুর্দা বলেন, “আর তাছাড়া মনে ক'রে দেখ সেবারকার কষ্টটা। এবার অনেকেই যা হোক ক'রে খাচ্ছে। তারা কেন সে কষ্ট সহ্য করতে যাবে? কষ্টটাও তো কম নয়? বলি সেবারকার কথা ভুলে গেলে নাকি সব? কি হে যোগেন মনে পড়ে? ভূষণ?”

লোকগুলি জবাব দেয় না। দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। সেদিনের স্বতি কি ভুলবার? না কি মুখে স্বীকার না করলেই মুছে যাবে সেদিনের স্বতি মন থেকে। বছর পাঁচেক আগেকার কথা।

কলোনীতে তখন নতুন এসে বসেছে উদ্বাস্তরা। পার্মানেন্ট ল্যাবরেটরি ক্যাম্পের নরকবাস যখন অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল তখন এই লোকগুলো স্বপ্ন দেখতো পুনর্বাসনের। পার্মানেন্ট ল্যাবরেটরি ক্যাম্পে এদের ছিল না কোন মানবিক সংজ্ঞা। সেখানে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মিলিটারীদের তৈরি বড় বড় গুল্ম ঘরে। সেখানে

থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল এরা। সেখানে ওদের না ছিল কোন সামাজিক বন্ধন, না মানবিক মর্যাদা। শেরালদ' হাওড়া স্টেশনের জনপ্রবাহের মধ্যে মাতুরটিকে উচু ক'রে ধরে ছেলে কোলে ব'সে থাকতো ওরা। কখনও রাত কাটতো গাছের তলায়, কখনও দেড় হাত উচু তাঁবুর মধ্যে। লরী বোঝাই ক'রে হয়তো নিয়ে গিয়ে তুলতো কোনও পি. এল. ক্যাম্পে। গোলাকৃতি লোহার শেডের অন্ধকূপে আশ্রয় পেত নতুন ক'রে। সেখানে ওদের প্রাণহাঁপিয়ে উঠতো। মাথার উপর একখানা নিজস্ব চালার জুতা লোকগুলো উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। 'যাবৎ জীবৎ ভোল ভবেৎ' এই অপূর্ব ব্যবস্থাটা সকলে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে নি। যারা ওটা মেনে নিতে পারলো তারা মানবজীবনের চরম মোক্ষলাভ করলো সন্দেহ নেই। তারা হ'য়ে উঠলো দুঃখে অস্থিরমন, সুখে বিগতস্মৃৎ। যাকে ব'লে একেবারে স্থিতপ্রজ্ঞ। রোজগারের ধান্দা নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, সপ্তাহান্তে ডোলাটি নিয়ে এসে বাকি সময় ভগবান অথবা সরকারকে গাল পাড়া। দীর্ঘ পাঁচ সাত বছর যারা এ স্বর্গে বাস করেছে তাদের ইহকাল তো বটেই পরকালটিও বোধকরি বরবারে হ'য়ে গেল।

কিন্তু ব্যবস্থাটা সকলে মেনে নিতে পারে না। অনেকে বিদ্রোহ করে। তারা চায় পুনর্বাসন। মাছুষের মতো বাঁচতে। তারা যখন শুনলো যে সরকার পাঁচ কাঠা ক'রে জমি দেবে, বাড়ি করবার জুতা ঋণ দেবে—তখন যেন ওরা হাতে স্বর্গ পেল। মনে হ'ল জীবনের এই একমাত্র কাম্য। পায়ের নীচে একমুঠো নিজস্ব জমি,—যেখানে লাউ কুমড়ো-শাক-আলু-বিলাতি বেগুন লাগাতে পারবে। মাথার উপর একটা নিজস্ব ছাদ—যেটাকে 'আমার বাড়ি' ব'লে পরিচয় দেওয়া যাবে। লোকগুলো ছুটে এল পুনর্বাসতির লোভে। বাড়ি তৈরি করার প্রথম ইন্সটলমেন্ট-ঋণ এল। কিছুটা খরচ হ'ল অবুঝ পোড়া পেটের চাহিদা মেটাতে—কিছু সতিহি বাড়ি তৈরি করতে। এমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে ওদের প্রায় সকলেই মাথা গোঁজার একটা ক'রে আশ্রয় খাড়া করল। এতদিনে সতিহি তাহ'লে বাড়ি হ'ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা।

এবার দেখা দিল আসল সমস্যা! দশ-পনের-হাজার লোক এসে বসেছে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে। মাঠ হয়েছে জনপদ—উদয়নগর উদ্বাস্ত কলোনী! কিন্তু রোজগার কই? খাবো কি? বাজারে দোকান দিল কেউ—কিন্তু কিনবে কে? ক্রেতা কই? জুসনের মহাজনের কাছ থেকে ভাড়া খাটবে বলে শাইকেল রিক্শা নিয়ে এল কেউ—কিন্তু চড়বে কে? সকলেই বলে কাজ দাও; কাজ দাও বলবার মতো উদ্ভূত পরিস্থিতি নেই কারও হাতে।

ব'সে খেলে কুবেরেরও ধন ফুরায়। গৃহ-নির্মাণ ঋণের উদ্ভব অর্থ আর কতটুকু ? প্রথমে আবেদন নিবেদন। কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে লাগলেন। পরিকল্পনা করতে সময় লাগবে। 'পরিসংখ্যান' সংগ্রহ করতেই বছর ঘুরে যায় ! কিন্তু অভাব, অসুখ আর মৃত্যু তো সময়ের জন্ত বসে থাকবে না। মৃত্যু প্রবেশ করল কলোনীতে।

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। খাবো কি ? রোজগার কই ? ধীরে ধীরে গড়া-বাড়ি খুলে ফেললে—তিলে তিলে বিক্রয় হয়ে গেল সব। জানালা দরজা-করোগেটটিন-সিমেটেরবোরা-ইট। কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে কতক ফিরে গেল পি. এল. ক্যাম্পের ভূস্বর্গে। যারা রইল তারা মুখোমুখী দাঁড়ালো অনশন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। প্রথমে অসুখ। এ-বাড়ি ও-বাড়ি লোকে জরে পড়লো। যুবলে কিছুদিন কেউ বা—তারপর সরে গেল ছুনিয়া থেকে। কাঁদলে পরিজনবর্গ, অল্পের একজন ভাগীদার কমে যাওয়ার সৌভাগ্য সন্দেহ ! কর্তৃপক্ষ বিচলিত হলেন। এত অসুখ বিস্ময় হচ্ছে কেন ? দ্রুতগতিতে এসে পৌঁছালো এক মোবাইল মেডিক্যাল যুনিট।

ওষুধ দেবে কি ? এদের একমাত্র অসুখ অনাহার। পথ্য চাই। ডাক্তার ছিলেন একটু ছিটগ্রস্ত মানুষ। সিভিল সার্জেন জানতে চাইলেন কি কি ওষুধ চাই তার ফর্দ। ডাক্তার জবাব দিলে—সপ্তাহে এক ওয়াগন চাল !

বদলি হয়ে গেল পাগলা ডাক্তার !

সরকারি পরিকল্পনার আগেই মহাকালের স্কীম রূপায়িত হ'ল একের পর এক। এল অভাব, অসুখ, মৃত্যু, মহামারী ! গ্রহণের পূর্বে ধূসর বর্ণের ছায়াপাতে যেমন ক'রে স্নান হ'য়ে যায় চন্দ্রহাস তেমনি ক'রেই লোকগুলোর নতুন-বসতি-পাওয়া আনন্দ-পূর্ণিমার উপর প্রথমেই হ'ল অনাহার মৃত্যুর করাল ছায়াপাত। আকাশের বৃক থেকে তীক্ষ্ণ চিংকারে নেমে আসে শব্দের দল। হাতি পৌতার বিল কলোনীর দিকে হাত বাড়ায়। কলোনীর কাছে-পিঠে নদী নেই। ওটাই শ্মশান !

যে ভগবানের কথা মনে হ'ত দেশে থাকতে দাঁকার সময় মধ্যরাত্রে অদূর আকাশ রক্তাভ হয়ে উঠতে দেখলে—যে ভগবানের কথা মনে পড়েছিল পার্টিশানের পর দেশ ছেড়ে রওনা দেবার সময়, যে ভগবানের নাম মনে পড়েছিল শেরালদ' স্টেশনে অনাহার মৃত্যুকে মুখোমুখী দেখে—তার কথাই উঠে পড়ে আবার !

“ভগমান ! আর কত দূরে তুমি ?”

“নাই, নাই ! ভগমান নাই ! থাহকলেও তুমি কান—তুমি বোবা !”

“ছিঃ ! ও কথা কওন নাই বাবা। ভগমান দীনের দয়াল !”

“কওন নাই ? ক্যান কওন নাই ? হাজারবার কইবাম। বারো বিঘা নাবি ধানের জমি আছিল। দু জোড়া গাই ! আমার খাণ্ডনের অভাব। তোমাগো দীনের

দয়াল কান আমার এ দশা করল কও ? কি অপরাধ করছিলাম আমি ?”
ও পক্ষ নির্বাক । সেই শাস্ত চক্রাবর্তন । সুখের দিনে মনে পড়ে না তাঁকে, মনে
পড়ে দুঃখরাত্রে । আর দুর্দশা যখন চরম সীমায় এসে মর্মের মাঝখানে বসিয়ে দেয়
তীক্ষ্ণলাকা তখন জেগে ওঠে মনের কালাপাহাড় ! ‘ধাহক্লেও তুমি কানা, তুমি
বোবা’ !

অসহায় মানুষগুলো জোট বাঁধলো । কাজ চাই । অন্ন চাই ! সার বেঁধে ওরা
চলল সদরে । যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কিশোর-কিশোরী । সম্মানবন্ধা সত্বজননী—
মৃতবংসা নারী ? জেলা সমাহর্তার বাড়ি ঘেরাও করল ওরা ।

“কি চাই ?”

“কি চাই ! চাই অন্ন-বস্ত্র-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সংসার-আনন্দ । চাই মানুষের মতো
বাঁচতে । আপাতত চাই কাজ । শ্রমের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন ।”

একসঙ্গে সবাই চিংকার করলে কাজ হয় না । দলপতিহীন জনতা তাড়াতাড়ি
বেছে নিয়ে পাঠালো পাঁচজনকে ওদের প্রতিনিধি ক’রে । যারা বেশ চালাক-
চতুর—হুঁ কথা শুছিয়ে বলতে জানে । গোকুল দাস, বিষ্টুপদ, নবীন পতিতুণ্ডি—
আরও দু’জনকে । দীর্ঘ আলোচনা হ’ল । দু’দিন, তিন দিন । জনতা বাইরের
বাগানে পথের পাশে অপেক্ষা করতে থাকে । শহরের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে
কেউ দিলে দুখ, কেউ জল । স্থল কলেজের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মুষ্টিভিক্ষা
তুলে এনে দিলে । তিন দিন ওরা পড়ে রইল জেলা শাসকের বাড়ির আশে পাশে ।
সেখানেই একজনের মৃত্যু হ’ল । সে মৃত্যু মহান । একই কারণে কলোনীতে যারা
মরেছে তাদের সঙ্গে সে মৃত্যু যন্ত্রণার বোধকরি কোনও তফাত ছিল না ; কিন্তু
মৃত্যু দৃশ্যের তফাত ছিল । স্থান মাহাত্ম্যে মৃত ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেল । জেলা
শাসকের ফটকের কাছেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল ভাগ্যবানটি । কেউ বললে
অনাহার-জনিত মৃত্যু—কেউ বললে উদরাময় । খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা
এসে ফটো তুলে নিয়ে গেল । কাগজে বার হ’ল বিস্তারিত বিবরণ । বিভিন্ন রাজ-
নৈতিক দলের নেতা এই মৃত্যু সংবাদে ছুটে এলেন । যেন এটি হচ্ছিল না ব’লেই
এতক্ষণ আসরে নামতে পারছিলেন না তাঁরা । ধর্মঘট পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা
স্বৈচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইলেন । এসে পৌঁছালো কয়েকটি পতাকা আর মাইক ।
ওরা বলে, “এ্যাঙ্কিন আছিলেন কই ? র’ণ মণর র’ণ । আমাগো বিচার আন্নরাই
কন্নম্ ।”

এঁরা বললেন, “তবে মর বেটোরা ।”

অভিসম্পাত সবেও কিন্তু মরল না আর কেউ ।

তিনদিন পরে পঞ্চায়েত জানালেন ওদের দাবি সরকার মেনে নিয়েছেন। অবিলম্বে শুরু হবে টেস্ট-রিলিফের কাজ। যারা অশক্ত পক্ষ তাদের ফ্রি স্টারডেশন ডোল দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

ওরা বলে, “রও রও, ব্যাপারটা বুঝা লই।”

এরা বলে, “আরে ব্যাপার তো সবই বুঝাইবাম। এখন খাওনের বন্দোবস্ত হৈছে খায়্যা লও!”

এরপর আর কথা চলে না। লপ্‌সি প্রস্তুত। চাল ডাল মিশ্রিত খিচুড়ী। সারি সারি ওরা বসে যায়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ। ধর্মঘট প্রতাহারের শর্তগুলির আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকে। অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালগুলোর অনেকেই পরিমাণের অতিরিক্ত আহার ক’রে অস্থস্থ হ’য়ে পড়ে। ওরা ফিরে আসে।

শুরু হয় টেস্ট-রিলিফের কাজ। মাটি কাটার কাজ। পাঁচটি ব্লকে বিভক্ত করা হ’ল কলোনীকে এ, বি, সি, ডি, ই। পাঁচজন সেক্রেটারি তার। ওরাই যাদের মনোনয়ন ক’রে পাঠিয়েছিল তারাই। সেই গোকুল, বিষ্টু, নবীন!

ব্লক সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত কর—তিনি রেকমেণ্ড করলে পেতেও পার স্টারডেশন ডোল। ট্রাকে ক’রে বড় বড় ড্রাম এসে পৌছালো—গুঁড়ো দুধ ভর্তি তাতে। পীলবোর্ডের গোলাকৃতি আধার। তার গায়ে লেখা আমেরিকার দেশ-বাসীরা এগুলি উপহার দিচ্ছে ভারতবাসীকে। সে উপহারও কিঞ্চিৎ লাভ করতে পার যদি ব্লক সেক্রেটারিরা অস্থগ্রহ করেন। র্যাশানের চাল, ধুতি শাড়ি বিতরণ করা হয় এই সেক্রেটারিদের মাধ্যমেই। কিছু লোক কাজ পায়; কিছু পায় ডোল ফ্রি র্যাশান। গোকুল দাস পায় কয়লার ডিপো খোলার অস্থমতি—বিষ্টুর জয়হিন্দ কেবিন মাথা তোলে—নবীন পতিতুণ্ডি মহাজনী ব্যবসা শুরু করেন। এরা মূলধন কোথায় পেলেন সে প্রশ্নটা করবার সাহস হ’ল না কারও!

সেদিনের স্মৃতি কি ভুলবার? নাকি মুখে স্বীকার না করলেই সেদিনের স্মৃতি মুছে যাবে মন থেকে? লোকগুলো নীরবে বসে থাকে।

নিতাই কবিরাজ তাই আবার বলেন, “তাই বলছিলাম প্রমোদ, দল বেঁধে যদি দরবার করতে যেতে চাও তবে কী তোমাদের দাবি তা স্পষ্ট ক’রে জানাতে হবে।”

“দাবি আর কি? দাবি কাজ। টেস্ট-রিলিফের কাজ তো আজ দু’ বছর বন্ধ। তা ছাড়া আমরা চাই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। আমরা চেষ্টামেচি করব আর ওরা দু’এক মাসের টেস্ট-রিলিফ করবেন তা চলবে না!”

“বুঝলাম। তা স্থায়ী ব্যবস্থাটা কি রকম হবে?”

“সেটা আমরা কেন বলব? সরকার বলবে। আমাদের এখানে একটা কারখানা হ’তে পারে। কাপড়ের মিল, চিনির কল, কাগজের কারখানা। কি সম্ভবপর তা সরকারি বিশেষজ্ঞেরা বলুক। তাতেই তিন চার হাজার লোক কাজ পেতে পারে। তাছাড়া ধরুন ঠাকুর্দা, আমাদের মধ্যে ছুতোর আছে—কামার আছে—তাঁতি আছে; তাদের দিয়ে একটা কো-অপারেটিভ হ’তে পারে। আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিক—মজুরী দিক।”

ঠাকুর্দা হাসেন: “কিছু মনে করিস না ভূষণ, কিন্তু কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি করবি কাকে? টাকাটা কাকে নাড়াচাড়া করতে দিবি?”

“আপনিই বিবেচনা ক’রে বলুন। যাকে সবাই মিলে বিশ্বাস ক’রে দেবে তাকেই। আপনি ভার নিতে চান আপনাকেই দেব। তবে তহবিল তছরূপ হ’লে আমরা খানা পুলিশ করতে পারব না। স্রেফ মাথা ফাটিয়ে হাতি পোঁতায় পুঁতে দিয়ে আসব।”

হাতি পোঁতা কলোনীর অদূরবর্তী জলাটা? সেইটাই কলোনীর শ্মশান।

“কিন্তু তাদের হ’য়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে কে?” সবাই একবাক্যে বলে, “তুমি ঠাকুর্দা, তুমি।”

নিতাই কবিরাজ আর একটা বিড়ি ধরান: “কোন অধিকারে? আমি তো কলোনী পঞ্চায়তের কেউ নই?”

ওরা আবার বলে, “আমরা তোমাকে নির্বাচিত করলাম কলোনীর পক্ষ থেকে। পঞ্চায়তকে আমরা মানি না।”

ঠাকুর্দা আবার একই প্রশ্ন করেন, “কোন অধিকারে?”

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ঠাকুর্দা বুঝিয়ে বলেন; “বাপুহে, গোটা কলোনীর দশ-পনের হাজার লোকের পক্ষ থেকে আমাকে নির্বাচন করার অধিকারটা তোমরা পেলে কোথা থেকে?”

ভূষণ রায় অত ঘোরপাঁচ ভালোবাসে না। বলে, ওসব বুঝি না ঠাকুর্দা। তাহ’লে তুমি বল কি করতে হবে?”

“আমি বলি এরকম হঠাৎ কিছু করাটা ঠিক নয়। কথাবার্তা যে বলতে যাবে সে একজন সর্ববাদিসম্মত নেতা হওয়া চাই। সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে পাঁচজনকে নিয়ে পঞ্চায়ত গড়া হয়েছে তাদের উপর আমাদের আস্থা নেই।”

“আমরাও তো তাই বলছি—তুমি গিয়ে বুঝিয়ে বল।”

“না! আমাকে যদি সবাই পাঠায় তবেই আমি যাবো। তোমাদের কথায় নয়। তোমরা বরং প্রত্যেক ব্লকে গিয়ে ব’লে এস। একটা নির্দিষ্ট দিনে সবাই জমায়েত

হোক। সেখানে ওদের পাঁচজনকেও নিমন্ত্রণ করব আমরা। আমাদের অভাব-অভিযোগ আমরা পেশ করব। ওরা পাঁচজন ইচ্ছা করলে জবাবদিহি করতে পারে। সে স্বেচ্ছা দেব আমরা। তারপর সেই সভাতেই আমরা তিনজনকে মনোনীত করব। তারা তিনজন কর্তৃপক্ষকে গিয়ে জানাবে আমাদের অভাব-অভিযোগ। তা'হলে আর কারও আপত্তি হ'তে পারে না।”

ভূষণ উৎসাহে ঠাকুরদার পায়ের ধুলোই নিয়ে ফেলে, বলে, “তবে শুভস্র শীঘ্র ঠাকুরদা। আজ বিকালেই সভা হোক।”

“না আজ বিয়ুদ্বার, তায় অমাবস্তা। আজ নয়। রবিবারে, রবিবার বিকাল পাঁচটার—খেলার মাঠে।”

ওরা তাতেই রাজি।

মনে মনে হাসে ভূষণ। ই-রকের ভূষণ রায়। ঠাকুরদাকে ওরা সবাই মেনে চলে। আর ঠাকুরদা মেনে চলেন পাঁজির আদেশ, হাঁচি টিকটিকির নির্দেশ! বিশশতাব্দীর জননেতা হবার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঠাকুরদা রয়ে গেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোবৃত্তি নিয়ে। ছেলেবেলা থেকেই জেলে জেলে কেটেছে। গঠনমূলক কাজে ছিলেন চিরকালই। মহাত্মাজীর একান্ত ভক্ত ছিলেন তিনি। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, একমাথা রুম্ম চুল—গায়ে একটা এণ্ডির চাদর, চোখে নিকেলের চশমা। স্কুলে পড়বার স্বেচ্ছা পান নি। তবে দীর্ঘদিন রাজবন্দী থাকা অবস্থায় সহবন্দীদের সাহচর্যে পড়াশুনাটা করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি-সমাজনীতি সম্বন্ধে পড়াশুনা করলে কি হবে—পৈত্রিক কবিরাজীতেই তাঁর বিশ্বাস বেশী—অ্যালোপ্যাথির চেয়ে। দশহাজার লোকের নেতৃত্ব দেবার আহ্বান এসে পৌঁছেছে ধীর কাছে তিনি বিচার করতে বসেছেন তিথি আর বার! তবু ভূষণ ঠেকেই নেতা বলে মনে নেয়। মনে নেয় প্রমোদ, কানাই, যোগেন। ওরা জানে,—পারলে এই হাঁচি টিকটিকি-অগ্নেবা-মন্ডা বিজড়িত ঠাকুরদাই পারবে এই দশ পনের হাজার লোককে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। লোকটাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। আর যাই হোক মাহুঘটা খাঁটি। একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি। রাজনীতির মধ্যে এমন খাঁটি মাহুঘ দিয়ে কারবার চালানো মুশকিল। পাকা লোনা দিয়ে যেমন গহনা গড়ানো চলে না—একটু খাদ মেশাতেই হয়—আচ্ছত্ত খাঁটি মাহুঘ দিয়েও তেমনি রাজনীতি চলে না। একটু শঠতার খাদ না মেশালে প্রতিপক্ষকে বাগে আনা যায় না—ভূষণ এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই দশ পনের হাজার লোকের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ক্ষমতাসালী একচ্ছত্র নেতাই বা কোথায় পাওয়া যায়? ভূষণ, কানাই, যোগেন প্রভৃতি নব্যপন্থীরা তাই ঠাকুরদার হাতেই তুলে দিতে চায়—সে শুষ্ক দায়িত্ব।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠছে। অন্ধকারের মধ্যে ভালো ক’রে কিছু দেখা যায় না। অনিমেঘ ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে গোরাও। স্তম্ভপর্শে ঘর খুলে বার হ’য়ে আসে কামিনী। পূব আকাশটা একটু একটু ক’রে ফর্সা হ’য়ে আসছে। হিম হিম একটা শিরশিরে হাওয়া বইছে। বারান্দার একটা কোনার কোঁচার খুঁটে আপাদ-মস্তক ঢেকে মাদুরের উপর ঘুমাচ্ছে বাবলু। কামিনী লগ্ননটা জ্বালে। চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। ত্রালা খুলে ভিতরে ঢোকে। কুলুঙ্গির উপর থেকে একটা টিনের কোঁটা বার করে। সেটি বার করার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় কোন গোপন জিনিস। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। আবার কি মনে ক’রে ফিরে যায়। একটা মুখ ঢাকা হাঁড়ির ভিতর থেকে বার করে গোটা চারেক মোয়া। আঁচলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শিকল তুলে দেয় রান্নাঘরে। তারপর ঠেলে তোলে বাবলুকে।

ঘুমের চোখে খড়মড়িয়ে উঠে বসে বাবলু : “দিদিয়া উঠেছে ?”

“না কেউ ওঠে নি। এই নে—” টিনের বাস্কাটা দেয় গর হাতে। বাবলু উঠে বসে। “এগুলোও নিয়ে যা—” মোয়াগুলো দেয় গর চাদরে ঢেলে। বলে, “একটা সতেরোর লোকাল চলে গেলে খিড়কির দোরে আসিস্।”

বাবলু হাসে। চুরি করার আনন্দে ছুটু ছেলেরা যেভাবে হাসে ! এ যেন একটা ভারি মজার খেলা ! দু’জনে যায় দরজার কাছ পর্যন্ত। খিড়কি খুলে বাবলু বেরিয়ে যায়। কামিনী ডাকে, “শোন ! চলতি ট্রেনে ওঠানামা করবি না কখনও। আমার মাথার দিব্যি দেওয়া আছে—মনে থাকে যেন। আর শোন, ফেরার পথে বিটু দোকানীকে গোটা দুই টাকা দিয়ে আসিস্।”

বাবলু ঘাড় নেড়ে সাহা দেয়। রাস্তার টিউব-ওয়েলে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নেয়। কামিনী গর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে, “বৌদি !”

“কে ?” পিছন ফিরে কামিনী দেখে নমিতা উঠে এসেছে।

“কথা বলছিলে কার সঙ্গে ?”

বাবলুর মুখ ধোওয়া শেষ হয় না। একছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। কামিনী বলে, “কই, না তো ?”

“কই না তো ! এই যে গোটা দুই টাকার কথা কি বলছিলে কাকে !” কামিনী ইতস্তত ক’রে বলে ; “তোমরা সবাই দেখি কান শুনতে ধান শোন !”

“তা কানই হোক আর ধানই হোক, কথা বলছিলে তো ? কার সঙ্গে ?” কামিনী গর কোতুহল দেখে কোতুক বোধ করে। বলে, “ভূতের সঙ্গে !”

গম্ভীর হয়ে যায় নমিতা।

অচল সংসারটিকে কোন রকমে চালিয়ে নেওয়ার জগ্গই এই প্রচেষ্টা কামিনীর। সংসারের প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে গম্ভীর রাত্রে সে চিড়ে ভাজে। চীনা-বাদাম মটরভাজা মিশিয়ে পাতলা টিসু-পেপারে মুড়ে রেখে দেয়। সকালবেলা বাবলু সেগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকাল ট্রেনের কামরার কামরায় ফেরি করে : উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাণ্ড সাড়ে-চার-ভাজা। টক্-বাল-মিষ্টি-মিষ্টি। এক প্যাকেট এক আনা, তিনটে দু আনা।

কথাটা গোপন থাকে দেবর-বৌদির মধ্যেই। ওরা জানে এটা বাড়ির কেউই অহুমোদন করবে না। কি ক'রে করবে? বাবলু করবে চানাচুর ফেরি? ওর লেখাপড়া হবে না? অসম্ভব। সকালবেলা বাবলু রওনা হ'য়ে যায়। কামিনী সংসারের কাজে ডুবে যায়। ওর মনটা পিষতে থাকে লোকাল ট্রেনের চাকার। কর্মব্যস্ত ঘণ্টাগুলোর মধ্যে অবসর পেলেই মনে মনে বলে : 'ঠাকুর! তুমি ওকে দেখ! এঁটুকু ছেলে! বিপদ আপদে তুমিই রক্ষা ক'র ঠাকুর।' বেলা বাড়তে থাকে।

বাবলু ওদিকে পৌছে যায় তার কর্মস্থলে। ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভর্তি লোকাল ট্রেনের কামরা। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে টিসু-পেপারে মোড়া কয়েকটি প্যাকেট হাতে নিয়ে আর অন্য হাতে জানালার গরাদ ধরে ধরে বাবলু চলন্ত কামরার বাইরে দিয়ে ওঘর ওঘর করে।

উদয়নগরের স্পেশাল-ব্র্যাণ্ড সাড়ে-চার-ভাজা। টক্-বাল-মিষ্টি-মিষ্টি। বাবলুর এ ব্যবসাও নিরকুশ নয়। দ্রুত প্রতিযোগিতা চলে এ ব্যবসায়। আরও চার পাঁচ জন হকার ফেরি করে। রোজই তারা বিক্রি করে এই ট্রেনগুলিতে। ওরা বরদাস্ত করতে চায় না এই নবাগত নাবালকটিকে। এরা জানে ডেলি প্যাসেঞ্জারের একটা ক্ষুদ্রতম অংশই কেনে খুচরা পয়সার সওদা চলন্ত ট্রেনের কামরায়। তার জন্তে নতুন ভাগিদার ওরা কিছুতেই মেনে নেবে না।

লোকগুলো কি নির্বিকার! বাড়া আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেও ওদের মনটা দ্রব হয় না। নেড়াদা বকতে থাকে :

“আপনার মাথা বিম্বিম্ব করছে। মনে হচ্ছে কে যেন রগের দুটো পাশ চেপে ধরে আছে। অথবা পেটের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। কিংবা শরীরের কোন অংশে এমন বেদনা হচ্ছে যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগছে আপনার মনে—এ অবস্থায় আপনি একটি বড়ি জল দিয়ে খেয়ে ফেলুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব শাস্ত হ'য়ে যাবে।”

লোকগুলো নির্বিকারভাবে বসে থাকে। নেড়া থামতেই বাবলু শুরু করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর মাথায় এক প্রচণ্ড চাঁটি মেরে বসে আর একজন হকার। মর্টনের লজ্জা ফিরি করছিল সে। হেঁকে ওঠে : “বিখ্যাত মর্টন কোম্পানীর আনারসের লজ্জা!”

বাবলু মার খেয়ে হুজম করতে চায় না। প্রতিবাদ করে। সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে ওঠে ওপাশ থেকে আরও দু’জন হকার। মসলামুড়ি আর হাতকাটা তেল। বাবলু জানে ওরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে। তাই যে কামরায় সে ওঠে সেখানেই ভিড় ক’রে ওঠে ওরা ক’জন। প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভাড়াবার মতলব। কত মতলবই আছে ওদের! বাবলুর তো জানতে বাকি নেই কিছু। দুই হকারে মিথ্যা বগড়া করে। নিলামের ডাকের মতো ডাকাডাকি ক’রে কমিয়ে দেয় জিনিসের দর। যেন ঝোঁকের মাথায় ভুলে খুব কম দর হেঁকে বসেছে। দু’টাকার জিনিস ছয় আনায় বিক্রি হতে দেখলে গ্রাম্য প্যাসেঞ্জার লোভে পড়ে কিনে ফেলে সে মাল। বাবলু নেমে যায় পরের স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরাটায়। হাতকাটা-তেল কি একটা ইজিত করে মসলা-মুড়িকে। মসলা-মুড়িরও বয়স অল্প। বাবলুর চেয়ে বছর চারেক বড় হবে। কলোনীরই ছেলে। ওরা হাসে দু’জনে। তারাও নামে সেই স্টেশনে। ওঠে গিয়ে পাশের কামরায়। বাবলু সেখানে সবে হাঁকতে শুরু করেছিল। থামিয়ে দেয় মর্টন লজ্জা।

বাবলু বলে, “বারে! আমি যে কামরায় যাবো—তোমরাও সেখানে উঠবে।”

“চুপ্ বে! বেশী চেঞ্জালে দেবো ঠেলে লাইনের তলায়।”

সত্যিই ছোটখাট একটা ধাক্কা দেয় সে। বাবলুর হাত থেকে পড়ে যায় মোয়া কটা।

একজন বৃদ্ধ যাত্রী বাবলুকে সমর্থন ক’রে বলেন, “তা বাপু তোমরা ওকে এরকম কেন কর বলত? আমি তো রোজই এই লোকালে কলকাতা যাই, আর পাঁচটা পঞ্চাশে ফিরি—রোজই দেখি ছেলেটিকে তোমরা উদ্ভাস্ত কর।

মর্টন লজ্জা বলে, “ওর লাইসেন্স নেই স্মার। টিকিটও নেই। ঐ দেখুন রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছে বিনা টিকিটে ভ্রমণ বন্ধ করুন।”

বৃদ্ধ ডেলি প্যাসেঞ্জার বলেন, “তোমার লাইসেন্স আছে?”

“আলবৎ!”

“কই দেখি?”

“এই দেখুন স্মার! এ আবার কি রসিকতা। বললাম লাইসেন্স আছে; তা নয়, কই দেখি! এরকম তো নিয়ম নয় স্মার। আপনি তো রোজই ট্রেনে শ্রালদ’ যান আর পাঁচটা পঞ্চাশে ফেরেন। গেটে রোজই দেখি বুক পকেটে হাত চেপে ধরে

বলেন মাহুলি। গেট-কীপার কোনদিন বলে কি—কই দেখি?”

ভদ্রলোক পাশের সহযাত্রীকে বলেন, “কথায় এদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবেন না মশাই!”

বাবলু বিষণ্ণ মুখে নেমে যায়।

গাড়ি থেমেছে পরের স্টেশনে।

এদিকেও বেলা বাড়তে থাকে। নমিতা রান্নাঘরের কাজ ক’রে চলে। মুখ তার গম্ভীর। কামিনী গোরাকে তেল মাখাচ্ছে। নাচতে নাচতে ঢুকলো লতু। হাতে তার একখানা চিঠি। নমিতা ডাকে : “লতু এদিকে আয়। কোথায় বেরিয়েছিলি সাত সকালে?”

“বা রে! আমি তো এখানেই ছিলাম!”

“এখানেই ছিলি! তখন থেকে যে ডাকছি—মসলাটা বেটে দিতে।”

“ও লক্ষ্য বাপু আমি বাটতে পারি না। বড় হাত জালা করে।”

কামিনী বলে, “আমি দিচ্ছি ঠাকুরঝি।”

“না থাক। আমিই ক’রে নিচ্ছি।”

নমিতা সরিয়ে দেয় কামিনীকে। ওকে যেন সহ্য করতে পারছে না সে। কামিনী মুহূ আঁপত্তি জানায় : “থাক কেন ঠাকুরঝি? দিচ্ছি বেটে আমি—”

“আয় জালিও না বোদি। ছেলেকে তোয়াজ করছ তাই কর। আমারই হয়েছে যত খোয়াড়। সকাল থেকে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করলাম—তো বলে এখানেই ছিলাম। সবই ভুতুড়ে কাণ্ড। সবাই ভুতের সঙ্গে কথা বলে এ বাড়িতে।”

কামিনী আর কিছু বলে না।

লতু কাছে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে : “দিদি?”

নমিতা বিরক্ত হ’য়ে বলে, “আঃ কি হচ্ছে?”

“তুই কাকে চিঠি লিখেছিলি রে?”

“কী?”

“কাকে তুই চিঠি লিখেছিলি রে দিদি?”

“চিঠি লিখেছিলাম? কাকে? কই না তো?”

“কই না তো? আমি যে দেখলাম—চোখে চশমা, দোহার চোখা, মাথায় কৌকড়ানো চুল—তুই তাকে চিঠি লিখছিলি?”

নমিতা রেগে ওঠে : “কি বকছিল পাগলের মতো? নভেল পড়ে পড়ে কি ভোর

মাথা একেবারে খাওয়া হ'য়ে গেছে ? শুধু পাড়ায় পাড়ায় বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে—”

“বেশ কাউকে লিখিস নি তো ? এটা তবে কি ? কে জবাব দিল ?” লতু একখানা বন্ধ খাম বার ক'রে দেখায়। পড়ে : “শ্রীমিতা চক্রবর্তী, C/o, শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, প্লট ১১০৭, ডি-ব্লক, উদয়নগর !”

নমিতা উঠে আসে বিস্মিত হ'য়ে। লতু লুকিয়ে ফেলে চিঠিখানা।

“তুমি ডুবে ডুবে জল খাও ব'লে—মনে ভাবো আমরা কিছুই বুঝি না ?”

নমিতা এক ধমক দিয়ে চিঠিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। কামিনীও কৌতূহলী হ'য়ে ঘনিষে আসে। নমিতা সকলের সামনেই খোলে চিঠিখানা। ইংরেজি টাইপ করা চিঠি। মনে পড়ে যায়। মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে ওর।

কামিনী প্রশ্ন না ক'রে পারে না : “কার চিঠি ঠাকুরঝি ?”

নমিতা চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ ঘুরে বলে, “ভূতের চিঠি নয় বৌদি !”

কামিনী ছারের চোকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। নমিতা এসে পৌছায় অনিমেঘের কাছে। রোগজীর্ণ অনিমেঘের মাথার কাছে বসে বুদ্ধ হরিপদ ওর জরতপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

নমিতা বলে, “বাবা, স্থূল অথরিটি আমাকেই সিলেক্ট করেছে। অবিলম্বে জয়েন করতে বলেছে !”

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে অন্ধের মুখ। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করেন তিনি।

রাত দশটা বেজে গেছে। কেরোসিন সাশ্রয়ের জন্তু সবাই সন্ধ্যারাজেই খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিয়ে দোর খিল দেয়। কলোনী ঘুমাচ্ছে। দূরে দূরে এক আধটা বাতি জ্বলছে এখানে ওখানে। সন্ধ্যা থেকে বর্ষা নেমেছে। চারিদিকেই জমেছে কাদা। টেস্ট-রিলিফের কাজে রাস্তাগুলোয় শুধু মাটি ফেলাই হয়েছিল ; জল-নিকাশের কোনও ব্যবস্থা হয় নি। এক এক জায়গায় এক হাঁটু কাদা জমে যায় বর্ষাকালে। টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে ইল্‌শেণ্ড'ডি বৃষ্টি পড়ছেই। ব্যাও ডেকে চলেছে এক-টানা। সভ্য জগতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক শুধু রেলগাড়ির যাতায়াত। স্টেশন কলোনী থেকে দূরে নয়। বসন্ত কলোনীর একান্ত দিয়ে রেল লাইনটা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। নিয়মিত গাড়ি এসে দাঁড়ায়—স্টেশনের কল-কোলাহল ভেসে আসে কলোনীতে। ওরা টের পায় সভ্য-জগতের সঙ্গে ওদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। ওদের দিনগুলো ঘটার হিসাবে ভাগ করা নয়। ট্রেন-টাইমিংএ ভাগ করা। লৌহ-শকটগুলোই ওদের ঘড়ি। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কটা বেজেছে ?

বলে, একটা সতেরো চলে গেছে ?

ছাচা বেড়ার রান্নাঘরে বসে কামিনী একরাশ চিড়ে ভাজছিল। বাড়িস্বত্ব সবাই ঘুমাচ্ছে। বাড়ির একটা ছেলে যে এখনও ফেরে নি সে বিষয়ে যেন কারও কোনও দুশ্চিন্তা নেই। থাকবে কেন ? নিয়মিত যে ছেলে সন্ধ্যা হ'তেই বাড়ি ফেরে—রাত হ'লে তার জন্মই ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক ; আর যে ছেলের গৃহ প্রত্যাগমনের নিয়মিত সময়ই হচ্ছে মধ্যরাত্র তার জন্ম ভেবে লাভে কি ? হোক সে বালক ! কামিনী কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। দায়িত্বটা তারই। সে ওকে পাঠায় এ দুরূহ কাজে। তাছাড়া এই সময়েই ও চানচুর ভেজে রাখে।

ঘরে কয়েকটা মাটির পাত্র। খুঁজলে এক আধখানা কলাইয়ের অথবা অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসও মিলতে পারে। উনানের ও পাশে কাঠগুলো গাদা দিয়ে সাজানো। উনানের আগুনে যতটা শুকিয়ে যায়। কামিনীর মুখের একপাশ উনানের উত্তাপে রক্তাভ। ফেলে আসা জীবনের কথাই বুঝি ভাবছে বসে ও। বধু হয়ে যখন সে প্রথম আসে চক্রবর্তীর উচ্ছল সংসারে তখন নববধূটির কী সমাদর ! কি আনন্দের ছিল সেই দিনগুলো। লতু তখন ছেলেমানুষ। নমিতা কিন্তু ওর সমবয়সী। নববিবাহিতের গোপন-জীবন সম্বন্ধে তার কত কৌতূহল। নমিতার বিবাহও স্থির হয়েছিল। অনিমেষের বিয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের তারিখের কিছুদিন আগে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই অনিমেষের বিয়েটাই হ'ল সেবার। তারপর কিন্তু নমিতার বিয়ে দেওয়া ঘটে উঠল না। কত পাত্রপক্ষ এসে দেখে গেল। কতদূর অগ্রসর হয়েও ভেঙে গেছে সম্বন্ধ। কামিনীর ভারি দুঃখ হ'ত। কেন হয় না নমিতার বিয়ে ? লেখাপড়া জানা স্নানরী, সঙ্কশজাত কুমারী কত্তা। কেন তার বিয়ে হচ্ছে না ? তারপরেই হ'ল বন্ধ-বিভাগ।

চলে এল ওরা এপারে। পি. এল. ক্যাম্পে থাকার সময় একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন হরিপদ মাস্টার। তখন দৃষ্টিহীন হয়েছেন তিনি। ক্যাম্পেরই একটা ছেলে রাজি হয় নমিতাকে দেখে। ছেলেটির না ছিল রূপ না গুণ। বাড়ির দোকান ছিল তার একটা। গলায় একটা সিন্ধের রুমাল বেঁধে কোথা-থেকে-যোগাড়-করা মাডগার্ডহীন উণ্টো-হাতল একটা রেসিং সাইকেল চড়ে চক্রর দিয়ে বেড়াতো সারা ক্যাম্পটা। গান গাইত—আধুনিক হিন্দি সিনেমা-সংগীত। ব্রাহ্মণের ছেলে বলে মনেই হ'ত না। হরিপদ চুপ ক'রে রইলেন। অনিমেষ নিয়ে এল পাত্রকে। নমিতাকে যাচাই ক'রে নিল সে দেখতে এসে। পছন্দ হ'য়ে গেল তার। নগদ পাঁচশ' টাকা বরপণ পেলে সে রাজি আছে পণ্ডিতকে কন্ডাদায় থেকে মুক্ত করতে। হরিপদ অর্থনৈতিক অভ্যুহাত তুলে আপত্তি জানানলেন। অনিমেষ কিন্তু উঠে পড়ে

লেগেছিল বোনের বিবাহ ব্যাপারে। অনেক ধরাধরি ক'রে সে যোগাড় করলে একটা ম্যারেজ গ্রান্ট। অন্যথা উদ্ভাস্ত মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্ত সরকার অর্থ সাহায্য করেন ক্ষেত্র বিশেষে। পাত্র বরপণের টাকাটা আগাম চাইলে। রাজি হ'ল না অনিমেঘ। মাত্র দু'শ টাকা সে দিল আগাম খরচ বাবদ। ঐ টাকাটা নিয়েই সে পালাল। বিড়ির দোকান সে আগেই বিক্রি করেছিল।

তারপর থেকে হরিপদ আর চেষ্টা করেন নি। অনিমেঘ চেষ্টা করছিল জানতে পেরে নমিতা এসে প্রতিবাদ করে। বিয়ে সে করবে না। অন্ধ বাপের সেবার সে কাটিয়ে দেবে জীবন। হরিপদ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—বৃদ্ধের জীবনের চেয়ে নমিতার জীবনের বিস্তারটা বড়। বৃদ্ধের অবর্তমানেও নমিতাকে দুনিয়াদারী করতে হবে। নমিতা কিন্তু অটল। বয়স হয়েছে তার। তার কথারও দাম দিতে হয়। সে দৃঢ় আপত্তি জানালো যখন তখন চূপ ক'রে যেতে হ'ল অনিমেঘকেও। মনকে সে বোঝালে বোনের বিবাহ তো সে ব্যবস্থা করতে পারতই শুধু—নমিতা রাজি নয় যে।

তাই নমিতার প্রতি একটা গোপন মমতা ছিল কামিনীর। আহা বেচারী জানতেই পারল না কি মধুময় এ জীবন! নমিতা রুঢ় কথা বললেও সহ্য ক'রে যেত কামিনী, যতটা পারে। পুরানো দিনের কথাতেই একেবারে বিভোর হ'য়ে যায় সে।

খুট ক'রে শব্দ হয় বাইরে। চমকে ওঠে কামিনী।

“বৌদি আমি!”

কামিনী তাড়াতাড়ি ঝাঁপটা সরিয়ে দেয়। ঘরে ঢোকে বাবলু। জলে ভিজ়ে হি হি ক'রে কাঁপছে সে শীতে। কামিনী ওকে জড়িয়ে ধরে। ঝাঁপটা টেনে বাবলুকে এনে বসাল উনারের পাড়ে। সযত্নে মুছে দেয় ওর ঝাঁকড়া চুলগুলো আঁচল দিয়ে।

“এত রাত করে? ইস একেবারে ভিজ়ে গেছিস যে! ছি ছি; না বাপু আর তোকে পাঠাব না এ কাজে।”

“আরে দূর। এটুকু ভিজ়লে কি হয়? কিন্তু বৌদি, প্যাকেটগুলো বোধ হয় সব নষ্ট হ'ল।”

উজনের উত্তাপে বাবলু এটুকু সামলে নিয়েছে। হাতের ব্যাগটা উপুড় ক'রে ঢালে মেঝেতে। কামিনী গুণে গুণে তুলতে থাকে। হাফপ্যান্টের পকেট থেকে খুচরা পয়সা বার ক'রে দেয় বাবলু। কামিনী প্রশ্ন করে: “আজ দুপুরে খেতে এলিনে যে বড়?”

“সে অনেক কথা।”

কামিনীর গোনা শেষ হয়। খুচরা পয়সার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বলে; “মাত্র পাঁচ

প্যাকেট চানাচুর খেয়ে আছিল সারাদিন ? পাঁচ প্যাকেটের দাম কম দেখছি ?”
“আরে দূর, আমি চানাচুর খাব কোন দুঃখে ? ময়রাতে কি সন্দেশ খায় ? বন্ধুদের
খাইয়েছি। আজ ওদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল যে।”

“কাদের সঙ্গে ?”

“আর যারা ফেরি করে। মটন দা, হাতকাটা তেল দা, মসলামুড়ি আর মিঠা-
বাংলা দা।”

“মিঠাবাংলা কি রে ? তোর বন্ধুর নাম ?”

“দূর, নাম হবে কেন ? আমরা ঐ বলে ডাকি ? ওরা আমাকে ডাকে সাড়ে-চার-
ভাজা বলে।”

“তা ভালো ; কিন্তু তুই যে বড় খেতে এলি না ? এমনি করলে কিন্তু কাল থেকে
যেতে দেব না।”

বাবলু প্রতিবাদ করে : “বারে, তুমি যে মোয়া দিলে সঙ্গে ?”

“তা হোক, রোজ দুপুরে খেতে আসতে হবে।”

“তা আসব না হয়, এখন খেতে দাঁও দিকি। পেটের মধ্যে শুভ্র নিশ্চেষ্টের যুদ্ধ শুরু
হয়ে গেছে।”

“দিচ্ছি, দাঁড়া আগে তোর প্যান্টটা ছাড়াই।”

কামিনী উঠে যায় ওঘর থেকে বাবলুর একটা প্যান্ট আনতে। বাবলু উনানের
ধারে বসে হাত পা-গুলো সঁকে নেয়। আজ তার মনে স্মৃতির জোয়ার এসেছে।
ব্যবসার বাজারে যারা ছিল তার প্রতিযোগী তাদের সঙ্গে সন্ধি হ’য়ে গেল।
ব্যবসায়ী হিসাবে বাবলুর কাছে আজকের দিনটা স্মরণীয়। একটু পরে কামিনী
ফিরে আসে তার একখানা সাদা হাতে ক’রে ; বলে ; তোর প্যান্ট এখনও শুকায়
নি। এখানাই পর।”

“দূর !” প্রতিবাদ করে বাবলু : “ও কি পুরুষ মানুষে পরে নাকি ? আমার লজ্জা
করে না বুঝি।”

কামিনী হাসি লুকিয়ে বলে, “নে, আর পাগলামি করিস না। এটাই প’রে খেয়ে
নে। বাহাদুরী দেখাতে হবে না।”

কাঁকড়া মাথা নেড়ে বাবলু দৃঢ় স্বরে বলে ; “না, ও আমি কিছুতেই পরব না।”

“বাবলু !!”

কামিনীর ঐ একটি আহ্বানে নিখাদে নেমে আসে বাবলুর কণ্ঠস্বর : “বা—রে
তোমার সব তাতেই ধমক। আজকে কেমন মজা হ’ল তা শুনবে না—সারাদিন
পর বাড়ি ফিরলাম,—তা কেবল ধমকই দিচ্ছ।”

বলে বটে, তবে হাতটাও বাড়ায়। বৌদির দিকে পিছন ফিরে ভিজ়ে প্যান্টটা ছেড়ে সান্নাটা পরে। তারপর পিঁড়িতে এসে বসে। কামিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে কামিনী। ভাতের খালাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে ; “এই তো লক্ষ্মী মেয়ে,—থুড়ি ছেলে!”

লাফ্ দিয়ে উঠে পড়ে বাবলু। কামিনী চট্ ক'রে ধরে ফেলে তাকে : “কি হ'ল ?”
“দূর, শুধু এই পরে থাকা যায় নাকি !”

“কেন ? লজ্জা করে ?”

“করে না ?”

“শুধু এইটা পরে লজ্জা করছে তা বললেই হয় বাপু। তা দিচ্ছি এনে...”

“কী ?”

“আর বাকি সবগুলো, যা চাইছ। শাড়ি, ব্লাউজ, বডিস...”

এবার বাবলুকে ধরে রাখা সতিই শক্ত হয় কামিনীর পক্ষে। কিন্তু হাতটা সে ছাড়ে না। জোর ক'রে কাছে টেনে নেয়। ওর ডান হাতটা এঁটো, বাঁ হাতে আঁচল দিয়ে ভিজ়ে মাথাটা আর একবার মুছে নিয়ে মিষ্টি ক'রে বলে ; “আমার কাছে আবার লজ্জা কিরে ? তোকে যে এইটুকু বেলা থেকে মাহুষ করলাম। গোরা কি আমার কাছে লজ্জা পায় ? লক্ষ্মী ভাইটি আমার, রাগ করিস না। আচ্ছা আর, তোকে খাইয়ে দেই।”

বাবলু বোধ হয় একটু নরম হয়। আর প্রতিবাদ করে না। খেতে বসে। ভাতের গরাস পাকিয়ে বাবলুর মুখে তুলে দিয়ে কামিনী ডাকে : “বাবলু।”

“ঐ ?”

“আমি ভাবছিলাম, এবার তোর ব্যবসার কথা বাবাকে বলি,—কেমন ?”

“ওরে বাস্‌রে, অমন কাজও ক'র না বৌদি। তাহ'লেই আমাদের ব্যবসার গনেশ উর্টোবে। বাবা কিছুতেই আমাকে বিক্রি করতে দেবে না। তা কি হয়। বাবলু হবে চানচুরওয়াল ! ওর লেখা পড়া হবে না ? ও পণ্ডিত হবে না ?”

কামিনী ওর নকল করা কণ্ঠস্বরে হেসে ফেলে। তবু বলে ; “কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। ইয়ারে, সতিই লেখাপড়া শেখা হবে না তোর ?”

“ছেলেমানুষের মতো কথা ব'ল না বৌদি। লেখাপড়া শিখে মাহুষ হ'তে কি আমারই অসাধ ? কিন্তু কি করবে বল ? সংসারটা তো চালাতে হবে ? এতগুলো লোককে তুমি কি খেতে দেবে যদি আমরা ব্যবসাটা বন্ধ ক'রে দেই ?”

“বন্ধ করতে তো বলছি না আমি। কিন্তু সকলকে লুকিয়ে এ কাজটা করা কি ঠিক হচ্ছে ?”

“কেন নয় ? ওরা সবাই সমান । দাদা-দিদি-মা সব । জানতে পারলে এখন সবাই উপদেশ দিতে ছুটে আসবে । বাবলু শুধু লেখাপড়া করবে, আর কিছু নয় !”

কথাটা কামিনীরও অজানা নয় । এই জন্তই এতদিন সাহস করে বলতে পারে নি কাউকে । বাবলুর আশঙ্কা মিথ্যা নয় ; কিন্তু তবু সকলকে না জানিয়ে এই যৌথ ব্যবসাটা চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সে একা নিতেও চায় না আর । একটু ইতস্তত ক’রে তাই বলে ; “কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না বাবলু !”

“কেন তোমার আবার কি হ’ল ?”

“তুই এই সংসারের জন্তে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছিস্ ঠাৱা মনে করেন—তুই বুঝি আড্ডা মেয়ে বেড়াস্ সারাদিন । সব সময় সবাই তোকে গালাগালি দেয় । শুনলে আমার কষ্ট হয় না ?”

ভাতের দলাটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে বাবলু হেসে ওঠে : “আরে দূর । ওদের ওসব ছেলেমানুষী কথায় কান দিতে গেলে চলে ?”

হাসে কামিনীও, বলে ; “তোর ধারণা, তুই ছাড়া এ বাড়িতে সবাই ছেলেমানুষ, না রে ?”

বাবলু কি জবাব দেবে ভেবে পায় না । কামিনী প্রসঙ্গটা বদলে নেয় । বলে ; তা হাঁারে, আজ তোদের রেলের কামরায় কি হয়েছে বলবি বলছিলি যে তখন । কি হয়েছে আজ ?”

আজ কি হয়েছে ? আজ যা হয়েছে তাতে বাবলু হাতে স্বর্গ পেয়েছে । আর সেই কথাটাই বিস্তারিত ক’রে বলবার জন্ত ওর অন্তরাব্রা ছটফট করছিল এতক্ষণ । সবার দৃষ্টির আড়ালে দেবর-বৌদির এই যে যৌথ ব্যবসা এর বিকক্ষে বাধা আছে অনেক । বাবলুর মতে বাধা তিনটি, প্রথমত মূলধন, দ্বিতীয়ত ব্যাপারটার গোপনীয়তা । কিন্তু এ ছাড়াও ব্যবসাটার আর একটা বড় বাধা ছিল । সেটা উৎপাদন ক্ষেত্র নয়—বিক্রয়-ক্ষেত্রে । সেটা হচ্ছে সমব্যবসায়ীদের প্রতিকূলতা । এই স্বদর্শন বালকটিকে স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ওরা কোতুলী হ’য়ে এগিয়ে এসেছিল প্রথম দিন । মসলামুড়ি, মটন আর হাতকাটা তেল । কাকের বাসায় কোকিল শাবককে দেখে যেমন ক’রে এগিয়ে আসে বায়লকুল । তারপর বেই বোঝা গেল আগন্তুক ছেলেটিও ফেরি করতে চায় তখন উপমাটার পুরা তাৎপর্য অমুখাবনয়োগ্য হ’য়ে ওঠে । বায়লচকুর তাড়নায় জর্জরিত বাবলু এ করদিন শুধু এ কামরা ও কামরায় ক’রেছে । আজ দুপুরেও তার অবস্থা কাহিল হ’য়ে উঠেছিল । ভাবলেও বুকেটা টিপটিপ করে এখনও ।

তখনও মেঘলা করে নি । প্রাচণ্ড রৌদ্রে স্টেশন প্লাটফর্মটা যেন পুড়ে যাচ্ছে ।

মাঠের মধ্যে থেকে কঁপে কঁপে উঠছে উত্তাপ। বিম্বিম্ব করছে সারা স্টেশন।
 ওভার ব্রিজের নীচে লোহার কাঠামোর একটা টি আররনের উপর বসে ছিল বাবলু
 বিষণ্ণ হ'য়ে। সারা সকালে মাত্র এক প্যাকেট বিক্রি হয়েছে তার। করবে কি
 ক'রে? যখন যেখানে সে গিয়ে দাঁড়ায় তার উদয়নগরের স্পেশাল ব্রাণ্ড চানাচুরের
 বাঙুল নিয়ে, সেখানেই দেখা দেয় ওরা। বাধা দেয় নানাভাবে। উত্ত্যক্ত করে।
 বাবলু লক্ষ্য করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে মসলামুড়ি, হাতকাটা তেল, তানসেন-
 গুলি আর মটল।

মটল বলে, “কি বে? হকারি করার শখ মটল?”

বাবলু চুপ ক'রে থাকে। জানে, কথা বললেই ওরা আরও পিছনে লাগবে। হাত-
 কাটা তেল বলে, “আর কেন বাওয়া! এ লাইনটা ছাড় না চাঁহু!”

তানসেনগুলি ওর খুতনিটা নেড়ে দিয়ে ফোড়ন কাটে : “যা বে বাড়ি যা। মায়ের
 আঁচলের তলায় বসে লালাটুকটুক রাজকন্তের গল্প শোন গে!”

হোহো ক'রে হেসে ওঠে সবাই।

আর সছ হয় না বাবলুর। উঠে দাঁড়ায়, বলে, “কেন তোমরা এমন করছ বলত?
 আমি কি করেছি তোমাদের?”

“কি করেছ? পাকাধানে মই দিতে এসেছ দাছ। শোন্ বে, এ লাইনে আর
 আমরা হকার বাড়াতে দেব না। এমনিতেই প্লা যত মক্ষিচুষ ডেলি-প্যাসেঞ্জারের
 লাইন।”

সগর্জনে সবুজ রঙের পাকিস্তান মেল প্রবেশ করে প্র্যাটফর্ম।

মটল বলে, “চল চল।” বাবলুর দিকে ঘুরে বলে, “কি বে খোকাবাবু? তুইও
 আসবি নাকি? দেবো ঠেলে ফেলে ঐ লাইনের তলায়।”

ওরা এগিয়ে যায়। বাবলু সাহস পায় না। ধীরে ধীরে সে চলে যায় ইঞ্জিনের
 দিকে। ইঞ্জিন! ঐ যন্ত্রটা চিরদিনই আকর্ষণ করে বাবলুকে। কী আছে ওর লোহ-
 কন্দরে? কেমন ক'রে টেনে নিয়ে চলে এতবড় লোক বোঝাই এই বিরাট
 রেলগাড়ীটাকে? ঝকঝক করে তামার পাইপগুলো। নীল পোষাক পরা একটা
 লোক কালো রঙের একটা তেল লাগায়। তারপর একটা হাতুড়ি দিয়ে অহেতুক-
 ভাবে প্রত্যেক গাড়ির চাকায় একবার ক'রে পিটিয়ে চলে যায়। অবাক বিন্ময়ে
 বাবলু ইঞ্জিনের কলকজাগুলি দেখতে থাকে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার ওকে ডাকে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে বাবলু।
 ড্রাইভার ওর থলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, “কেংনা করকে?” বাবলু ইংরাজি
 ক'রে জবাব দেয় : ওয়ান অ্যানা স্তার!

“টু পাইস ?”

“নো স্তার !”

কপট ধমক লাগায় ড্রাইভার ! বাবলু চমকে পিছিয়ে যায়। ড্রাইভার কৌতুক বোধ করে। বয়লারের ডালাটা খুলে বলে—“হু পয়সার না দিলে ফেলে দেবে ওর ভিতর।”

বাবলু তিন লাফে সরে পড়ে !

হা হা ক’রে হাসে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার।

এগিয়ে আসে মসলামুড়ি।

ড্রাইভার তাকেও ডাকে : “হাউমাচ্ এ প্যাকেট ?”

“এক আনা স্তার !”

“টু পাইস ?”

“টু পাইস ফাদার মাদার স্তার, কিন্তু বাপ মা ছাড়াও ছুনিয়ার মাহুষ আছে স্তার ! তাই অ্যানাদার টু পাইস ফর মাই স্মিট হাট !”

হা হা ক’রে হাসে সাহেব। বয়লারের প্রচণ্ড উত্তাপ আর বাইরের রক্ষ প্রকৃতির দাবদাহের মধ্যে এমন রসযন রসিকতায় প্রাণটা সরস হ’য়ে ওঠে ওর। এক প্যাকেট মসলামুড়ি নিয়ে ফেলে দেয় একটা দোয়ানি : “ওয়ান আনা ফর ইয়োর প্যাকেট অ্যাণ্ড অ্যানাদার ফর ইয়োর জোকস্ !”

মসলামুড়ি সেলাম করে সাহেবকে। দোয়ানিটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর বাবলুকে অহেতুক একটা জেচি কেটে চলে যায় ফেরি করতে। বাবলু চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে থাকে ! এপারো বছরের বালকটির সঙ্গে যেন সবাই শত্রুতা করছে।

ছইসিল দিয়ে ট্রেনটা ছাড়লো একটু পরেই। বাবলু তখনও ইঞ্জিনের কাছে প্ল্যাটফর্মের সীমান্তে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে মর্টনদা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আর অপস্রমমান গাড়িটার জানালা থেকে মুখ বার করা পাকিস্তানযাত্রী একজনকে বলছে—

“আর দু’আনা, আর দু’আনা !”

লোকটা দু’হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচিয়ে ভেঙচি কাটলে মর্টনদাকে। গাড়ির গতিবুদ্ধি পাওয়ার যাত্রীটি দেশান্তর যাত্রার আগে শেষ ফাঁকি দেবার স্বযোগ পেয়েছে এপারের মাহুষকে। মর্টন ছুটে গেল লোকটার দিকে। ফাঁকি বাজি ! যাত্রীটির কাছে গিয়ে পৌঁছেতেই সে দিলে এক ধাক্কা। মর্টন পড়ে গেল প্ল্যাটফর্মের উপর ! অল্পের জন্ত চাকার নিচে পড়ল না ! লজ্জেলের শিশিটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে চুরমার হ’য়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল সবুজ রঙের লজ্জেল সারা প্ল্যাটফর্মে ! হা হা

ক'রে হেসে উঠল লোকটা! অপমান, আঘাতে আর লোকসানে চোখ ফেটে
জল বেরিয়ে এল মর্টনের। হাঁটুর কাছটা ছড়ে গেছে তার।

বাবলুর মুখেও ফুটে উঠল একটা অসহায়তার হাহাকার! মুহূর্তে সে মুখে ফিরে
এল একটা প্রতিহিংসার কাঠিষ্ঠ। লোকটার পৈশাচিক উল্লাসদীপ্ত অট্টহাস্য আর
ভুলুষ্ঠিত মর্টনদার অসহায় মূর্তি যেন আশুপ্ত ধরিয়ে দিল এগার বছরের বালকটির
মাথায়। পর মুহূর্তেই জানালা থেকে বার করা অট্টহাস্যরত মুখখানা এসে গেল
বাবলুর নাগালের মধ্যে। প্রাণপণ শক্তিতে বাবলু মেয়ে বসল ওর দাড়ি-ওয়ালা
গালে একটা প্রচণ্ড চড়!

দুই বিপরীত গতির বেগে সেও ঘুরে পড়ল প্যাটফর্মে। হাতটা তার কিম্বিকিম্ব
করছে। হেসে উঠল প্যাটফর্মস্বত্ব লোক। অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল।
তারা খুশী হ'ল। বেশ করেছে ছোকরা। বাহাদুর! মর্টন ভাঙা শিশির দুঃখ ভুলে
ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। চোঁচিয়ে ওঠে : “এই মেঠাইওয়ালা! লাও শিগ্গির
আধসের রসগোল্লা। জ্ঞা সারাদিন উপোস ক'রে আছে! হাতকাটা-তেল চট
ক'রে বাবলুর পাশে বসে টেনে নেয় ওর হাতখানা। বাবলুর হাতটা লাল হ'য়ে
উঠেছে। রক্ত জমে গেছে! নিজের ব্যাগ থেকে একটা ওষুধ বার ক'রে মালিশ
করতে লেগে যায়। বলে, “বাবলুর যখন এতটা বেজেছে ও জ্ঞা বোধহয় বাপের
নাম ভুলে গেছে মাইরি!”

অতি দুঃখেও বন্ধুরা হোহো ক'রে হেসে ওঠে! প্রাণখোলা হাসি। বাবলুও!

এই গল্পটাই বিস্তারিত ক'রে বলতে যাচ্ছিল বাবলু। কিন্তু বাধা পড়ল তাতে।

ও-ঘর থেকে বিন্দুবাসিনী সাড়া দেন : “বোমা, কথা বলছ কার সঙ্গে রান্নাঘরে?”

বাবলু একেবারে চুপ। ছড়ানো চানাচুরের প্যাকেটগুলো কামিনী কুড়িয়ে নেয়।
রাখে তুলে একটা মাটির হাঁড়িতে।

“কি হ'ল বোমা? সাড়া দিচ্ছে না কেন?”

ও-ঘর থেকেই তাঁকে থামিয়ে দেয় নমিতা : “তোমার বৌ আজকাল ভুতের সঙ্গে
কথা বলে মা! ওতে কান দিতে নেই!”

বিন্দুবাসিনী এগিয়ে আসেন দ্বারপ্রান্তে : “ও! দেওরটি ফিরে এসেছেন বুঝি?”

জবাব দেয় না কেউ!

“তুই বেঁটামুন্দির কাছে দশ টাকা ধর করেছিল?”

বাবলুর খাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। চুপ ক'রে থাকে। কামিনী বলে, “এখন কেন
মা? আগে ওর খাওয়াটা মিটে যাক। সারাদিন না খেয়ে আছে ছেলেটা!”

“তুমি চুপ কর বোমা। সারাদিন না খেয়ে থাকবারই ছেলে বটে ও! বাপ-মা না

খেয়ে মরছে আর ও বাজারে ধার করছে ! এক আধ পরসান নয়—দশ টাকা ! বল হতভাগা !”

এগিয়ে আসেন উনি দ্বার ছেড়ে বাবলুর দিকে। বাবলু কি ভাবলে সেই জানে। হঠাৎ পিঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। বিন্দুবাসিনী ওকে ধরবার জন্ত বাড়িয়ে দেন একটা হাত। যাবার সময় বাধ্য হয়ে বাবলুকে একটা ধাক্কা মেরে যেতে হ’ল। পড়তে পড়তে সামলে নেন বিন্দুবাসিনী। কামিনী এগিয়ে আসে। বিন্দুবাসিনী থামিয়ে দেন : “থাক ! দুধকলা দিয়ে কী সাপই পুবেছি ! দুধের ছেলেটাকে পর্যন্ত মত্ত পড়ে বস করেছে ডাইনী !”

ক্ষুধার্ত বাবলুর অর্ধভুক্ত থালাখানার দিকে চেয়ে কামিনী বলে, “দুধের ছেলেকে বশ করতে হ’লে মজের দরকার হয় না মা। ও একটু স্নেহের কাঙাল। আমার কাছে সেটুকু পায় বলেই ছুটে আসে আমার কাছে !”

নমিতাও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারপ্রান্তে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, “তা তো বুঝলাম, কিন্তু মার চেয়ে যে ভালোবাসে—তাকে কি বলে জান বোঠান ?”

“জানি ঠাকুরবি, বলে জান ! কিন্তু সারাদিন উপোস ক’রে যে মাকে দেখে বাড়ি ভাত ফেলে ছেলে ছুটে পালাল তাকে—”

“কী ! কী বললে তুমি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! ছোটলোকের ঘর থেকে এসেছ বাঁলে মনে কর তোমার সব ইতরামোই সহ্য করবো আমরা ! তোমার আশকারাতেই না ও সাহস পেয়েছে বেষ্টামুন্দির কাছে টাকা ধার করতে ? আমি ঠিক জানি—ঐ ডাইনীর পরামর্শেই দুধের বাছা টাকা ধার করেছে ! কী ? অস্বীকার করতে পার একথা ?”

“অস্বীকার করব কেন মা ? টাকা এনে ও আমাকেই দিয়েছে !”

নমিতা বলে ওঠে, “বাঃ ! কী গৌরবের কথা ! স্বস্তির জানলো না—স্বামী জানলো না আর বাড়ির বোঁ টাকা ধার করলেন বাইরের লোকের কাছে। ধার তো করলে বৌদি, শোধ দেবে কে ?”

“আমিই শোধ দেব ঠাকুরবি। তোমার মাইনের টাকায় হাত দেব না !”

বিন্দুবাসিনী বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠেন, “তা তো দেবেই বাছা ! শোধ যে কি ক’রে দেবে তা তো কাল সকালেই দেখেছি ! গলির মধ্যে তাই এত ঢলাঢলি !”

নমিতা যোগ দেয় : “আর শেষরাতে খিড়কিতে দাঁড়িয়ে ভূতের সঙ্গে হাসাহাসি !” কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে যায় ! চিৎকার করে ওঠে : “ঠাকুরবি ! কী বলছ ? এত ইতর মন তোমাদের ? তুমি না শিক্ষিত !”

নমিতা স্নেহের সঙ্গে বলে, “আমরাই ইতর নয় ? আর শিক্ষার কথা ভুলছ বৌদি ?

মুন্দির সঙ্গে পীরিত ক'রে সংসার চালাবার শিক্ষা তো ছুলে শেখায় না ! ওটা বুঝি তোমার মায়ের কাছে শিখেছ বৌঠান ?”

“কি বললে ?”

“তুমি বেষ্টামুন্দির সঙ্গে পীরিত ক'রে রোজগার করবে আর সেই অন্ন আমরা খাব মনে করেছ ?”

কামিনীর সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরে যায়। বাপ-মায়ের আত্মরে মেয়ে ছিল সে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। যাদের জন্তে সে এত করেছে তারাই স্বধন তাকে আঘাত করলে, নারীজের চরম অবমাননাকর-ইঙ্গিত ক'রে। তাকে ধূলার সাথে মিশিয়ে দিলে—এমনকি তার স্বর্গগতা মায়ের নামেও লেপন করলে চরম কলঙ্কের কালিমা, তখন কামিনীর হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল ! বললে, “তাই তো দেখতে পাই ঠাকুরঝি ! কি ক'রে সংসারটা চলছে তা দেখছি তোমরা সকলেই জেনে ফেলেছ ! কই অন্নজল তো কারও মুখে আটকাচ্ছে না ! খেতে দিলে না এক ফোঁটা ছেলেটাকেই !”

ডুগরে কৈদে উঠলেন বিন্দুবাসিনী।

“বোমা !”

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন হরিপদ পণ্ডিত—অন্ধ পদক্ষেপে। তাঁর ঐ কণ্ঠস্বর, কৌচাচর খুঁট গায়ে জড়িয়ে ঐ উঠে আসার ভক্তিতায় সস্থির ফিরে পায় কামিনী ! মনে পড়ে এতক্ষণ কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। কি নিয়ে ঝগড়া করছিল ! সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কঁপে ওঠে ওর।

“তোমার শান্তুড়ী আর নন্দ সব জে ৯ই অন্ন গ্রহণ করেছেন—বলছিলে তুমি। বিশ্বাস কর বোমা—আমি এ কথা জানতাম না। জানলে, তোমার এভাবে রোজগার করা অন্ন হরিপদ পণ্ডিতের গলা দিয়ে নামতো না ! কিন্তু যে কথা তুমি নিজমুখে স্বীকার করলে আর তাই নিয়ে বড়াই করলে—সে কথা জানার পরেও যদি তোমার রোজগার করা অন্নে ভাগ বসাই তবে সে অন্ন আমার কাছে গোমাংস ! কিন্তু রাত অনেক হয়েছে—এভাবে—”

কথাটা শেষ হ'ল না। হরিপদ পণ্ডিতের কথা শেষ হবার আগেই অনশনক্লিষ্ট কামিনীর সংজ্ঞাহারা দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেজের উপর।

বাবলুর অভুক্ত অন্নপাত্রটা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অন্নলক্ষ্মী ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরময়।

ও-ঘর থেকে রোগজীর্ণ অনিমেঘ শুধু প্রশ্ন করে : “কী হ'ল ?”

কেউ সাড়া দিল না সে ডাকে।

দিন আর কাটে না কামিনীর। কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গেল। এ করুণা বছর আঘাত সে কম পায় নি। গোছানো সংসার, ঘর বাড়ি সব ছেড়ে এসেছে। অভাব অনটনের তীব্র কষাঘাতে সংসার যখন জর্জরিত হ'য়ে পড়েছে তখন দক্ষ নাবিকের মতোই সে চালিয়ে এসেছে সংসার তরীটিকে। শান্তি ছিলা, তাঁর গায়ে অভাব অনটনের উত্তাপ লাগতে দেয় নি। নন্দ ছিল কিন্তু অবিবাহিত মেয়েকে সীমস্তিনী মাত্রেই ভাবে নাবালিকা ব'লে। তাই কামিনীই নিজে থেকে নিয়েছিল গোটা সংসারটাকে চালিয়ে নেওয়ার ভার। জরাগ্রস্ত স্বশ্র, রোগাক্রান্ত স্বামী, নাবালক দেবর, এদের নিয়ে সে যে কি ক'রে চালিয়ে এসেছে এতদিন কেউ তা জানে না। বোধকরি যিনি সব জানতে পারেন একমাত্র তিনিই খবর রাখতেন এই নিরলস বধূটির অতস্ত্র সাধনার। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা সাধ-আহ্লাদের কথা মনেও পড়ে নি এতদিন। দিনের শেষে দুটি শাকার রেঁধে দিতে পেরেছে প্রিয়জনকে এইটুকুই ছিল ওর পরম সান্নিধ্য। সেই ছিল ওর একমাত্র সুখ! সে সুখেও বৃষ্টি বর্ষিত করলেন ওকে ভগবান।

হরিপদ মাস্টার সস্ত্রীক সপ্তাহ পৃথক হ'য়ে গেলেন।

হরিণ মিত্রের প্লটের অলমাস্ত্র বাড়িটার উঠে গেছেন ঠরা। হরিণ মিত্রও ডেসার্টার। ঠরা ভিন্ন কার্ড করাবার দরখাস্ত করেছেন।

অনিমেঘ জ্ঞানতে চেয়েছিল একবার কারুণ্য।

হরিপদ বলেছিলেন, “তোমার রোজগার নেই—কি ক'রে টানবে আমাদের সবাইকে। তাছাড়া এখানে থাকলে তোমার স্নেহের আতিশয্যে বাবলুকে মাহুয করতে পারব না আমরা। ওই তো এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।”

অনিমেঘের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে, বলে, “রোজগার তো আমাদের কারও নেই বাবা। যদি না খেয়েই মরতে হয় তবে সবাই মিলে একসঙ্গে মরি না কেন?”

“না। উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অনিমেঘ। পুত্র উপযুক্ত হ'লে তাকে পৃথক সংসার করতে দিতে হয়। সংসারের এই নিয়ম। তুমি দুঃখ ক'র না।”

অনিমেঘ চুপ ক'রে থাকে।

“আর তাছাড়া কারও কোনও উপার্জন নেই এ কথাও তো সত্য নয়। নমিতা স্কুল-মাস্টারির চাকরিটা পেয়েছে। সেও তোমাদের সংসারে মাসিক কিছু ক'রে পাঠাবে।”

অনিমেঘ বলে, “আমরা কি কোন অপরাধ করলাম? তাই কি আমাদের ভাগ ক'রে যাচ্ছেন?”

ওর মাথায় একখানা হাত রেখে হরিপদ পণ্ডিত বলেন, “তোকে এই অসুস্থ শরীরে

ফেলে যেতে হচ্ছে—এ কি আমারই কম দুঃখ ? তুই ভালো হ'য়ে ওঠ !”

হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন বিন্দুবাসিনী ।

বাইরের উঠানে কয়েকটি বাস্ক বিছানা বাঁধা । একথানা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে । মালপত্র উঠছে তাতে । লতু আর নমিতা দেখে শুনে মালপত্র ওঠাচ্ছে । বাবলু অস্থপস্থিত । দ্বারের কাছে পাষাণ প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে কামিনী । একটা কথাও বলতে পারে নি । সমস্ত জিনিসটা যেন তার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না । অভিমানের বসে রাগের মাথায় সে যদি একটা কথা বলেই ফেলে—তাই ঐ সব সত্য হ'য়ে উঠবে ? আর সে যে ছেঁচাবেড়ার রান্নাঘরের চতুঃসীমায় তিলে তিলে বছরের পর বছর আত্মদান ক'রে এল ;—জীবনের সব সুখ সব আহ্লাদ বলি দিয়ে এই সংসারটিকে ভারবাহী বলদের মতো নীরবে চালিয়ে নিয়ে এল তার কোনও মর্যাদা এরা দেবে না ? বিন্দুবাসিনীর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, নমিতা না হয় নতুন চাকরির মোহে ধরাকে সরাসরি জান করছে, কিন্তু ওর স্বপ্ন ? হরিপদ পণ্ডিতমশাই ? তিনি কি ক'রে বিশ্বাস করলেন এতবড় ঘৃণিত মিথ্যা অভিযোগ । মা, আর মালস্বামী ছাড়া ডাকেন নি কোনদিন—আর আজ এক মুহূর্তে উনি ধরে নিলেন যে পুত্রবধূর অন্তর্নিহিত উপার্জনের অঙ্গে চলছে তাঁর সংসার ! দুঃস্থ অভিমানে কামিনীর অন্তঃকরণ ক্ষুণ্ণনোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো থরথর ক'রে কাঁপছিল ।

হরিপদ বলেন, “উঠে এসো বড় বউ । আমাদের যাবার সময় হ'ল ।”

বিন্দুবাসিনী অশ্রুসিক্ত মুখটা মুছে উঠে বসেন । বলেন, ওকে ওই সর্বনাশীর হাতে ছেড়ে যেতে হবে—ভাবলেও আমার হাত পা হিম হ'য়ে যাচ্ছে ।”

অনিমেয় উর্ধ্ব চেষ্টে থাকে । কামিনী নীরব ।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই কামিনী প্রণাম করে ।

হরিপদ যন্ত্রচালিতের মতো বলেন, “কল্যাণমস্ত ।”

কামিনী আর স্থির থাকতে পারে না, বলে, “কেন, কেন আপনি আমাদের ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন ? আমি দেব না যেতে । সমস্ত মিথ্যা কথা ।”

“মিথ্যাই হোক বোমা ! আমি আশীর্বাদ করছি তোমার স্মৃতি হোক ।”

“স্মৃতি হোক !”

কান্নায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে অভিমানিনী মেয়েটির কণ্ঠ ! স্মৃতি হোক ? অর্থাৎ কাল রাত্রে তার স্বপ্নর যা বলেছেন তা তাঁর মুখের কথা নয়, মনের কথা । রাগের মাথায় কথাগুলি বলে ফেলেন নি তিনি—এ তাঁর অন্তরের বিশ্বাস । তিনিও ধরে নিয়েছেন অসৎ উপায়ে উপার্জন করছে কামিনী ! তবু একবার সে শেষ চেষ্টা

করে : “আমার সমস্ত কথা শুনবেন না আপনি ?”

নমিতা বলে ওঠে : “যাবার সময় আবার কেন ওসব কথা তুলছ বৌদি। আমাদের যেতে দাও।”

স্নান হাসে কামিনী। দুরন্ত অভিমানে তার অন্তঃকরণ ছাই হ’য়ে যাচ্ছিল। বলে, “বুঝেছি ঠাকুরঝি। এস তোমরা। যাওয়াটা তোমাদের প্রয়োজন—যুক্তিতে তো তোমরা এখন কান দেবে না ?”

নমিতা বলে, “মানে ?”

“মানে আমরাই এখন তোমাদের বোঝা। তুমিই এখন একমাত্র উপার্জনকর এ বাড়িতে। তাই আলাদা হওয়াটা তোমার প্রয়োজন।”

নমিতা বলে, “তুমি বলেই একথা ভাবতে পারলে আর মুখে বলতেও আটকালো না ; কিন্তু উপার্জন তো তোমারও আছে বৌদি !”

“নমিতা !!”—গর্জন ক’রে ওঠেন হরিপদ পণ্ডিত।

চমকে ওঠে নমিতা, কামিনীও। এ কণ্ঠস্বর ওরা চেনে। ওরা বোঝে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করতে দেবেন না অঙ্ক বৃদ্ধ। যাবেন তিনি নিশ্চয়ই—তবে নীরবেই যেতে চান। কামিনীর দিকে অঙ্ক হস্তক্ষেপে তিনি শাস্ত সমাহিত কণ্ঠে বলেন, “সত্যীশ্বের জোরে সাবিত্রী ফিরিয়ে এনেছিলেন সত্যবানকে, লক্ষ্মীন্দরকে বেহুলা। তুমি অনিমেষকে সারিয়ে তোল এই অশীর্বাদই ক’রে গেলাম।”

ওঁরা চলে যান !

কামিনী চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সমস্ত দিন অনিমেষ একটা কথাও বলে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শূন্তের দিকে। দিন কারও বসে থাকে না। সংসারের নানান দাবি আছে। আছে শিশুপুত্রের আহ্বার—আছে রোগীর পথ্য। কামিনী মনকে শক্ত করে। উদান জ্বালে। দুটি ভাত ফুটিয়ে আর একটা বেগুন সেদ্ধ ক’রে ছেলেকে খাওয়ায়। গোরাও বোধহয় বুঝেছে—কী একটা হয়েছে আজ। অগ্ন্যগ্ন দিনের মতো কোনও ছুটামি করে না। মায়ের কাছে দুটি খেয়ে নিয়ে চূপ ক’রে শুয়ে পড়ে বাপের পাশটিতে। কামিনী একবাটি বার্ণি গরম ক’রে নিয়ে আসে অনিমেষের কাছে। ওকে খেতে বলে। অনিমেষ পাত্রটা নেয় না। হাত নেড়ে জানায় যে সে খাবে না।

যে স্বামীর কাছে কামিনীর অদেয় কিছুই নেই—যে স্বামী তার হৃদয়ের সমস্ত কথার খবর রাখে—যার কাছে দেহমনের গোপনতম সংবাদ উজাড় ক’রে চলে দিয়েছে কামিনী নিঃসঙ্কোচে—সেই স্বামীর কাছেই আজ সে গিয়ে দাঁড়াতে

পারছে না। কি জানি ও কি বুঝেছে। কী ভেবেছে! কতটুকু বিশ্বাস করেছে তাই বা কে বলতে পারে। তরঙ্গমুখর নদীবক্ষে নিমজ্জমান লোক যখন সবলে ঝাঁকড়ে ধরে ভেসে যাওয়া কাঠ—তখন চোখ খুলে সে দেখতে চায় না—ওটা ভাসাকাঠ না কুমীর! কামিনীও তার শেষ অবলম্বনটাকে যাচাই ক’রে উঠতে সাহস পায় না। অন্তরের সখী নমিতা বিশ্বাস করেছে, মাতৃসমা শাঁওড়ী বিশ্বাস করেছেন, হরিপদ পণ্ডিতের মতো দেবতুল্য লোক পর্যন্ত অবিশ্বাস করেন নি, এরপর কোন্ সাহসে কামিনী যাচাই করতে যাবে তার শেষ আশ্রয়স্থলকে! বার্লির বাটিটা নামিয়ে রেখে সে চলে আসে রান্নাঘরে। উনানে জল ঢেলে দিয়ে চুপ ক’রে বসে থাকে।

অনিমেষ ওকে ডাকে : “শোন।”

যন্ত্রচালিতের মতো কামিনী এসে দাঁড়ায় ওর শয্যাপার্শ্বে।

“কি হয়েছে বলতো? কি মিথ্যা অভিযোগের কথা বলছিলে তুমি! কালরাত্রে হ’লই বা কি?”

আর স্থির রাখতে পারে না কামিনী নিজেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অনিমেষ বুঝেছে ওকে এখন খানিকটা কাঁদতে দিতে হবে। তাই চুপ ক’রে থাকে। অনেকটা কৈদে কামিনী একটু হাল্কা বোধ করে। অনিমেষ আবার বলে, “কি হয়েছে বলো। কেন বাবা আমাদের ছেড়ে গেলেন। ওঠ, মুখ তোল।”

কামিনী ওর বুকের মধোই মুখ লুকিয়ে বলে, গুঁরা বিশ্বাস করেছেন যে আমি অসৎ উপায়ে উপার্জন ক’রে তোমাদের এ সংসারটা চালাচ্ছিলাম এতদিন—”

“অসৎ উপায়? চুরি ক’রে?”

“ওগো না, না! আমি আমি—”

“বুঝছি থাক।”

কান্নার প্রাবনে বুঝি ভেসে যাবে কামিনী। -

অনিমেষ শাস্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে, “ওঠো বউ, আমি বিশ্বাস করি নি। গুঁরা না চিনলেও আমি তো তোমাকে চিনি। ওঠো, আমার বার্লি নিয়ে এস। আমাকে বাঁচতে হবে। আমার রোগ মুক্তিতেই একমাত্র—, আমি মরব না, আমি মরতে পারি না!”

কামিনী ওকে নিবিড় ক’রে জড়িয়ে ধরে। একটা কথাও বলে না!

নিজেকে কামিনী সামলে নেয়। তার সবকিছু তাহ’লে ফুরিয়ে যায় নি। তার স্বামী, তার জীবনমরণের সাথী তাকে অবিশ্বাস করে নি। অনিমেষ বেঁচে উঠতে

চার। অনিমেঘ বেঁচে উঠবে। ব্রত-উপবাস নয়—সেবা দিয়ে, পরিচর্যা ক’রে, শুষ্কতা ক’রে, সে মৃতকল্প স্বামী সারিয়ে তুলবে। যতবড় সত্যাত্মীই হোন হরিপদ পণ্ডিত, যত শ্রদ্ধাস্পদ-পূজ্য ব্যক্তিই হোন তিনি—সে সত্যীত্বের মহিমময় মৰ্যাদার সামনে তাঁকেও এসে স্বীকার করতে হবে ক্রটি। এই ভাঙা সংসার জোড়া দেওয়ানি হবে কামিনীর জীবনের ব্রত।

দ্বিগুণ উৎসাহে জলে ওঠে কামিনী। তাকে লড়াই ক’রে প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু লড়বে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে—সেই দারিদ্র্য যে অসীম শক্তিশালী। অনিমেঘের অস্থখটা কি তাই জানা যায় নি আজও। একমাগের উপর সে শয্যাশায়ী। কোনও চিকিৎসক এসে দেখেন নি তাকে। মোবাইল ফুনিটের ডাক্তারখানায় হরিপদ পণ্ডিত গিয়ে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করতেন আর মনকে-প্রবোধ-দেওয়া লাল-নীল জল নিয়ে আসতেন। তাই খাওয়ানো হ’ত অনিমেঘকে। মায়ের চরণা-মৃত ছিল এ ছাড়াও।

কামিনী স্থির করল যেমন ক’রে হোক ডাক্তার দিয়ে অনিমেঘকে দেখাতে হবে। কলোনীর বড় ডাক্তার লালুবারু। তাঁর দর্শনী বেশী। চৌধুরী ডাক্তারও বাড়িতে এসে দেখলে দু’টাকা নেন। এক আছেন নিতাই ঠাকুর্দা। অনেক ক্ষেত্রে বিনা দর্শনীতেই রোগী দেখেন তিনি,—কামিনী শুনেছে একথা। কিন্তু নিতাই কবিরাজ থাকেন কলোনীর একেবারে অপর প্রান্তে—ই-ব্লকে। কে ডেকে আনবে তাঁকে? তাছাড়া কামিনীর সংসারে চাল ভাল সবই বাড়ন্ত। বিষ্টপদর কাছে যে দশটা টাকা ধার করা আছে তাও শোধ করা হয় নি। অস্তুত একখানা শাড়ি তাকে কিনতে হবে এ মাসেই। এখানা ব্যবহারের অযোগ্য হ’য়ে পড়েছে।

কামিনী অবাক হ’য়ে ভাবে কি ক’রে এ ব্যবস্থা অহুমোদন করলেন হরিপদ মাস্টার? ধরে নেওয়া যাক তাঁর অহুমান সত্য, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর পুত্রবধু চক্রবর্তী পরিবারের সমস্ত সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিপথেই পা বাড়িয়েছিল। বেশ কথা। কিন্তু কেন সে গিয়েছিল ও পথে? তাঁদের সংসারের মুখ চেয়েই তো? সে উপার্জনে কি ঠঁর পুত্রবধু গহনা গড়েছে? তবে? তাহ’লে কেন তিনি তিরস্কার ক’রে ওকে সম্পথে আনবার চেষ্টা করলেন না? স্কুলের কোনও ছেলে দুষ্টুমি করলে কি তিনি তাকে শোধরাবার চেষ্টা করতেন না? বিপথেই যদি যাত্রা শুরু ক’রে থাকে সে, তবে তাকে এভাবে একলা রেখে যাওয়াটা কি সেই পাপ পথে যাত্রার ব্যবস্থাটাই সুগম ক’রে দেওয়া নয়? এ কথা কি হরিপদ পণ্ডিত বোঝেন না? আর তা ছাড়া কামিনী যদি বিপথে যায় তাহ’লে কি অনিমেঘকে ত্যাগ করতে হবে? অনিমেঘের অপরাধটা কি? তিনি বিশ্বাস করেন অনিমেঘের অহুমোদন আছে কামিনীর এ

ব্যবস্থায়? রোগজীর্ণ পাণ্ডুর ঐ মানুষটার সম্বন্ধে একথা ভাবতে পারলেন তিনি? তাছাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চরম পরিচয় কি রেখে গেলেন না ঠুঁরা। একজন অসুস্থ মানুষ—একটি শিশু আর একজন যুবতী নারীর পক্ষে বিনা রোজগারে কি ক'রে চলবে সংসার? কে জলটা তুলে আনবে? চালটা হুনটা কিনে আনবে? অন্তত লতুকে কিংবা বাবলুকে এ পরিবারে দিয়ে যাওয়া কি উচিত ছিল না ঠুঁদের? অভি-
 মানে মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে কামিনীর। আর বাবলুটাই বা কি? ভুলেও একবার আসে না বৌদির কাছে! একবার মনেও পড়ে না দাদা বৌদির কথা! মনে পড়বে কেন? এখন যে দিদি রোজগার করছে! বৌদির ফ্যানভাতের কথা আর মনে পড়বে কেন। উঃ! কি নেমকহারাম ছেলেটা! ছুনিয়ার উপর শ্রদ্ধা হারায় কামিনী। শুধু স্বার্থ! আর কিছু চায় না কেউ! মানুষে মানুষে এত যে মধুর সম্বন্ধ—যা নিয়ে গড়ে উঠেছে এত সাহিত্য এত কাব্য—তা শুধু স্বার্থের খাতিরেই। প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার হবে অন্তরের সমস্ত কোমলবৃত্তিগুলির!

ঠুঁরা যেদিন চলে যান সেদিন রাত্রেই একবার এসেছিল বাবলু। তারপর থেকে ভুলেও এ পথ মাড়ায় নি। সেদিন সকালেই ঠুঁরা চলে গেছেন। রাত্রে অনিমেষ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর একথানা হাত গোরার গায়ের উপর। গোরাও ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে ওর বাপকে। ওদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার ছবিখানি বসে বসে দেখছিল কামিনী। হঠাৎ বাইরে কে ডাকল: “বৌদি!”

জানালা দিয়ে উকি মারে বাবলু।

পরক্ষণেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বৌদিকে।

কাদামাথা খালি পা, ছেঁড়া শার্ট আর হাফপ্যান্ট। হাতে জড়ানো কামিনীর শায়াটা। কয়লার গুঁড়োতে বাবলুর মাথাটা ভর্তি। সেগুলি ঝাড়তে ঝাড়তে কামিনী বলে, “তুই কোথেকে রে?”

বাবলু প্রতিপ্রসন্ন করে; “বাবা মা নাকি চলে গেছেন? কোথায় গেছেন?”

“সে কি রে? তুই জানিস না? হরিণ মিত্রের প্লটে। তুই যাস নি সেখানে?”

ঝাঁকড়া মাথাটা নেড়ে বাবলু জানায়—না।

“তবে জামা কাপড় পেলি কোথায়? কাল তো পালিয়ে গেলি আমার শায়া পরে।”

“এগুলো মসলামুড়ির। আমার সব কথা শুনে একদিনের জন্তে ধার দিয়েছে ও।

বৌদি, আমি এখানে থাকব—ও বাড়ি যাব না কিন্তু।”

ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কামিনী বলে, “ছি বাবলু, ওকথা বলতে নেই।

ঠুঁরা বাপ মা, ঠুঁরা গুরুজন। ঠুঁদের কাছেই থাকতে হবে তোমাকে।”

“তুমিও তো গুরুজন—দাদাও তো গুরুজন।”

“সে তো ঠিক কথাই। তবে বাবা বলেছেন, আমাদের ডিউটি ভাগ হ’য়ে গেছে। তুই বাবা মাকে দেখবি, আমি দেখব তোর দাদা আর গোরাকে। তোর দাদা ভালো হ’য়ে গেলেই আবার আমরা সব এক হব।”

বাবলু বড় বড় চোখে মাতৃসমা বৌদির কথাটা প্রশ্রয়ান করার প্রয়াস পায়।

“কি রে পারবি না?”

“কিন্তু দিদিরাই তো দেখতে পারে বাবা মাকে। তাছাড়া সবাই এক সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি হ’ত।”

“ক্ষতি হ’ত। সব কথা তো তুই বুঝবি না ভাই। কি রে পারবি না বাবা মাকে মাছুষ করতে?”

বাবলু গভীর ভাবে মাথা নাড়ে। এগারো বছরের বাবলু বাপ-মাকে মাছুষ করার দায়িত্ব নেয়। পকেট থেকে কিছু খুচরা পয়সা বার ক’রে বলে, “এটা নাও। আর নতুন কত প্যাকেট বানিয়েছ দাও।”

কামিনী পয়সাটা নিতে পারে না। বলে, “ও পয়সা তোর কাছেই থাক বাবলু। তোদের সংসারে খরচ করিস। মাকে সব কথা খুলে বলিস। তাঁকেই পয়সাটা দিস।”

“মাকে বললে মা আমাকে চানাচুর বিক্রি করতে দেবে না।”

“তবে দিদিকে দিস। আর বলিস সমস্ত কথা খুলে। বুঝেছিস?”

“ওরা সবাই সমান। জানতে পারলে রক্ষা রাখবে না কি?”

“না রে! কথাটা এখন বলে দেওয়াই দরকার। আমিই বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু বলা হয় নি। তুই বললে হয়তো সব মিটে যাবে। বলবি তো?”

“আচ্ছা বলব এখন। তাহ’লে নতুন প্যাকেটগুলো দাও!”

“আর ভাজি নি আমি।”

“তবে কালকের সেই ফেরত দেওয়া প্যাকেটগুলোই দাও।”

কামিনী চুপ ক’রে থাকে। বাবলু রান্নঘরের ও কোনা থেকে মাটির হাঁড়ি উপুড় ক’রে বার করে প্যাকেটগুলো।

কামিনীর মনে পড়ে যায়—‘তোমার রোজগার করা অল্পে যদি আমি ভাগ বসাই তবে সে অল্প আমার কাছে গোমাংস!’

“ওগুলো নিস্নে বাবলু।”

“বারে! তুমি নতুনও ভাজবে না—পুরানোগুলোও দেবে না। তবে আমার বিক্রি বন্ধ থাক কালকে!”

কামিনী চুপ ক’রে থাকে। কি বলতে পারে সে? কি করেই বা বোঝাবে তাকে—কেন সে আজ আর সাহায্য করতে পারে না এই খুদে ব্যবসায়ীকে।

“কাল তাহ’লে এসে নতুন প্যাকেট নিয়ে যাবো। বেশী ক’রে ভেজে রেখ কিন্তু।”

কামিনী ধীরে ধীরে বলে, “আমি আর চিড়ে ভাজব না বাবলু!”

বাবলুর মুখের ভাব বদলে যায়। অক্ষুটে বলে, “ভাজবে না? ও ভাজবে না! তারপর হঠাৎ কঁদে ফেলে: “তবে আমার ব্যবসা উঠে যাক। আমরা না খেয়ে মরি! তাড়িয়ে দিলে বাড়ি থেকে—কিছু বললাম না। টাকা নিলে না তাও কিছু বললাম না—ভাজা প্যাকেটগুলো চাইলাম তাও দিলে না! এখন বলছ চিড়ে ভেজে দেবে না। আমি কি নিজে ভাজতে পারি? তুমি কি চাও আমরা সবাই না খেয়ে মরি!”

কামিনী ওকে বুকে টেনে নেয়। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হ হ ক’রে কঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ভারী গলায় ওকে বলে, “আজ তুই অনেক কথাই বুঝবি না বাবলু। বড় হ’লে যখন এসব কথা মনে পড়বে তখন অন্তত এটুকু বিশ্বাস করিস তোর বৌদি কখনও কোন মন্দ কাজ করে নি। আমাকে আর কঁাদাসনে বাবলু। বাড়ি যা। ঠাকুরঝিকে বলিস চি’ড়ে ভেজে দিতে।”

বাবলুর রাগ একতিলও কমে না একথায়। দুরন্ত অভিমানে চানাচুরের প্যাকেট-গুলো মেজের ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঝড়ের মতো।

সেই শেষ।

আর আসে নি বাবলু।

কামিনী অবাক হ’য়ে যায়। বাবলু নিশ্চয়ই অহরোধ করেছে নমিতাকে চি’ড়ে ভেজে দিতে। কথা প্রসঙ্গে সবই জানাজানি হ’য়ে যাওয়া উচিত। আজ সাত দিন হ’য়ে গেছে। এতদিনে ওঁরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন কি ভাবে রোজগার করত ওরা দেবর-বৌদি। তবু এল না নমিতা অথবা লতু বৌদির কাছে ক্ষমা চাইতে। একবার বাবলুকেও পাঠালো না জানতে অনিমেষ কেমন আছে! কারও যেন কোনও দায়িত্ব নেই। এই ছুতো ক’রে বেকার পুত্রকে ফেলে পালিয়েছেন ওঁরা ধার্মিক সেজে! কামিনী গলায় দড়ি দেবে তবু গিয়ে দাঁড়াবে না সেখানে ভিখারীর বেশে! কখনই না!

কলোনীর প্রায় কেজ্জুহলে একটা লম্বা টিনের ঘর। দেওয়াল, জানালা, দরজা, ছাদ সমস্ত টিনের। এটি মেয়েদের স্কুল। দারুণ গ্রীষ্মে যখন টিনের নিচু-চালার তলায়, ছাত্রীদের ব্লাউস-ব্রক ভিজে ওঠে তখনও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলাতে থাকে অধ্যয়ন-অধ্যাপন। আবার যখন টিনের চালে পড়ে চড়বড় করে বৃষ্টি তখনও ছাত্রীরা মুখস্থ করতে থাকে—“আজিকার উত্তরে সাহারা মরুভূমি...পৃথিবীর

বৃহত্তম মরুভূমি !’ ছাত্রীদের অধ্যয়নই যখন তপস্চর্চা তখন কঠিন তপস্শ্রমই করছে তারা বলতে হবে। অগ্নিকুণ্ডের উপর উপবেশন ক’রে যদি গাজনের সন্ন্যাসী মোক্ষপথের পাসপোর্ট পায় তবে এই টিনের চালার দাবদাহে অধঃসিক্ত কোমলাঙ্গী মেয়েগুলি নিশ্চয়ই আশা করতে পারে, মা সরস্বতী খুলীমনেই ওদের অন্তত পাস মার্কটা পাইয়ে দেবেন। দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যবস্থাটায় খুলী হ’তে পারেন নি স্বরেখা।
ঘোষ—মেয়েস্কুলের নবনিযুক্ত হেডমিস্ট্রেস।

এই নিয়েই কথা হচ্ছিল টিচারস্ ক্রমে। হেডমিস্ট্রেস স্বরেখা দেবীর বয়স অল্প ; কিন্তু রাশভারী মহিলা তিনি। শোনা যায় যে বড় ঘরের মেয়ে শখ ক’রে চাকরি করতে এসেছেন। তিনিই বলছিলেন, “আপনারা কি বলেন ? আমি আজ ছ’মাস হ’ল এসে চার্জ নিয়েছি, কিন্তু স্কুলের হালচাল দেখে বুকেছি এর উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য। এক একটা পায়রার খোপের মতো ঘরে গাদাগাদি ক’রে বসে ছাত্রীরা। একটা ম্যাপ নেই, লাইব্রেরী রেফারেন্স নেই, টিচারদের বসবার চেয়ারের পায় ভাঙা, নিচু ক্লাসে বেঞ্চি পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এই টিনের চালার উত্তাপে মেয়েদের পক্ষে পড়ায় মন দেওয়াও কষ্টকর। আমি ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বহুবার বলেছি ; কিন্তু কোনই ব্যবস্থা হয় নি। এ ক্ষেত্রে কি করণীয় ? আপনারা কি পরামর্শ দেন ?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এ ব্লকের শোভনাদিই ব্যয়োজ্যেষ্ঠ। তিনিই উঠে দাঁড়ান : “কথা তো নতুন নয়। আমাদের স্কুলের আজ পাঁচ বছর এই হাল। কর্তৃপক্ষ যখন শুনতাহেন না তখন আর কি করন ? এমনই চলুক।”

“এটা তো সহজ যুক্তি। কিন্তু যেটা চলা উচিত নয়—সেটা এতদিন চলেছে বলেই তো তাকে চিরদিন মেনে নেব না আমরা।”

“তবু কি ইস্কুল বন্ধ কর্যা দিবার কথা কন না কি ?”

“দরকার হ’লে তাও করতে হবে।”

অল্প আলোচনার পরেই কিন্তু বোঝা গেল প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে অগ্ৰাণ্ড সকলে একমত নন। এই টিনের ঘরখানি আছে বলে মাস গেলে গ্রাসাচ্ছাদনের যা হোক একটা ব্যবস্থা হয় এদের। মেয়েগুলো তবু কিছু লেখাপড়া শেখে, গৌণ হ’লেও, সেটাও তো ধরতে হবে। স্কুলকে যদি উনি উন্নত করতে পারেন তো করুন—কিন্তু উন্নত করতে গিয়ে যদি স্কুলটা বন্ধই ক’রে দিতে হয় তা’হলে আর উন্নতি কি হ’ল ? হেডমিস্ট্রেস্ স্পষ্টই বিরক্ত হলেন। আলোচনা সেখানেই বন্ধ রেখে রওনা হলেন বাড়ির দিকে। শোভনাদি মৈত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন : “ঘর বাইত না ?”

“স্বাইতাম না ? এইখানে বইয়া করবামটা কি ?”

একে একে সকলেই রঙনা হ’য়ে পড়ে। ডি. ব্রকের নমিতা চক্রবর্তী নতুন চাকরি পেয়েছে। প্রথম মাসের মাইনেটাই আগাম নিতে হয়েছে। আজকের আলোচনায় বেচারী দমে গেল। অনেক আশা ভরসা নিয়ে এসেছে সে চাকরি করতে। এই চাকরিটি দিয়েই সে রক্ষা করবে একটা গোটা পরিবারকে। অঙ্ক বাপ, বৃদ্ধা মা, ছোট্ট ভাইবোনদের। তাছাড়া মাসিক কিছু সাহায্য করতে হবে দাদাকে, যতদিন না স্বস্থ হ’য়ে ওঠে সে। নিজের জ্ঞাত দুঃখ নেই তার। একলা মাছুষ হ’লে কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু সমস্ত পরিবারটার কথা ভেবে মনটা ভারি হ’য়ে উঠল। নিজে সে বিবাহ করবে না—অঙ্ক বাপের পরিচর্যায় বিকিয়ে দেবে জীবনটা; কিন্তু লতু ? কে বলবে পনের বছরের মেয়ে। না বেড়েছে দেহে, না মনে। এখনও কিশোরী বালিকার মতো পাড়ায় পাড়ায় ছুটোছুটি ক’রে বেড়ায়।

পায়ে পায়ে সে বাড়ির দিকে চলে আসে। হঠাৎ ভীষণ রাগ হ’য়ে গেল হেড মিস্ট্রেসের উপর। কি দরকার বাপু একটা গড়া জিনিস ভেঙে দেওয়ার ? শখের চাকরি করতে এসেছেন, ভালো না লাগে তাহ’লে রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে গেলেই পারেন। কিন্তু লতুটাকে এবার শাসনে আনতে হবে। এমন পাগলীর মতো পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতে দেওয়া উচিত নয়। বাবা মাকে সে কোনও দিনই মানো না—দিদিকেই বরং ভয় করে তবু একটু। লতুর আদর আবদারও সহ্য করতে হয়েছে অনেক নমিতাকে। সব জিনিসেরই কিন্তু সীমা থাকা উচিত। লতুরও বোঝা উচিত সে আর ছেলেমাছুষ নেই। এভাবে ছেড়ে দিলে বিপদ হ’তেই বা কতক্ষণ ? অবশ্য লতু খুব চালাক মেয়ে। বাংলা উপন্যাস পড়ে পড়ে অনেক কিছুই বুঝে ফেলেছে সে। তবু সাবধানের মার নেই।

“কে, লতু বুঝি ?”

“না বাবা, আমি।”

“ও নমু। লতু কোথায় রে ? দুপুরবেলা সেই যে বেরিয়েছে এখনও এল না তো ?” নমিতা চুপ ক’রে থাকে। স্নান ঘরে গিয়ে দেখে জলটাও তুলে রেখে যায় নি লতু। এক ফোটা জল নেই বালুতিতে।

বিন্দুবাসিনী বলেন, “ওমা একটুও জল নেই ? আমি দেখছি।”

“ধাক্ আমিই নিয়ে আসছি, দাও।”

মায়ের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নমিতা বেরিয়ে যায়। টিউব ওয়েল অনেকটা দূরে। ভীষণ রাগ হয় লতুটার উপর। কচি খুকি তো নয়। সারাদিন স্কুলে গরমে

সেজ্জ হ'য়ে দিদি ফিরবে—অথচ ঘরের একটি কাজও ক'রে রেখে যায় নি। হয় মা-
নয় দিদি কেউ করুক! সকালবেলা যে ছেঁড়া কাপড়খানা কেচে জলচৌকির উপর
রেখে গিয়েছিল সেখানাও মেলে দেওয়া হয় নি। ফলে স্কুলের ফর্সা কাপড়টা ছেঁড়ে
রাখবার উপায়ও নেই। আর কেউ না জাম্বুক মা তো জানে ওর বাইরে বেরুবার
জন্তু এই একখানা শাড়ি। এটি কিনতে বাধ্য হয়েছে সে চাকরি পাওয়ার পর।
মায়ের নাকছাবিটা হারাতে হয়েছে এজন্তেই। অথচ কেউ সংসারের কথা একটুও
ভাবে না! অল্পদিন স্কুল থেকে ফিরে সে এখানা খুলে রাখে। সন্তর্পণে ভাঁজ ক'রে
রেখে দেয়। পরে ছেঁড়া শাড়িটা। আজ বাধ্য হ'য়ে এটাই পরে থাকতে হ'ল।

ডি/১১৪১ নম্বর বাড়িখানায় সম্প্রতি উঠে এসেছেন হরিপদ পণ্ডিত। বাড়িটার
লিটেল লেভেল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছিল। অর্থাৎ দরজা জানালার মাথা পর্যন্ত।
তু'খানি ঘর। 'ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের' অল্পগ্রহে এর মাথায় খানকয়েক
করোগেটেড টিন চাপাতে পেরেছেন পণ্ডিত। ঘরের ভিতর ঢুকে তাই ভালো
ক'রে মাথা খাড়া ক'রে উঠে দাঁড়ানো যায় না। হরিশবাবু ডেসার্টার, বাড়িটা
তিনি শেষ করেন নি বটে কিন্তু কয়েকটি গাদা ফুলের চারা গাছ লাগিয়ে গেছেন।
শুকিয়ে রয়েছে সেগুলো। লাগিয়েছিলেন কয়েকটা রজনীগন্ধাও। ফুল ধরে নি
তাতে। সবুজ সতেজ ভাঁটা বেরিয়ে এসেছে তার ভিতর থেকে। তার মাথায়
ঈষৎ লালচে-সবুজ কলির গুচ্ছ। আষাঢ় মাস পড়ে গেছে—তবু ফুল ধরে নি
অমত্বের গাছে। সব গাছে যখন ফুল বরাবার সময় হ'য়ে এল তখন ফুল ফোটাতে
বোধহয় লজ্জাই পাচ্ছে ওর চারাগাছ। ভাবে নমিতা—নিজের দিকে চেয়েই।

হাত মুখ ধুয়ে এসে বসে বাপের কাছে।

প্রশ্ন করে : “খেয়েছ কিছু?”

“এখন আবার খাই না কি আমি?”

তু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। শেষে বুদ্ধ বলেন, “বাগানে যাবি না? চল ভাটা
গাছগুলোর তলায় আগাছাগুলো তুলে দিই গে।”

হরিশ মিজ্জই লাগিয়েছিলেন ভাঁটা গাছগুলো।

নমিতা হেসে বলে, “সে আমিই তুলব এখন রবিবারে। তুমি যেন তুলতে ব'স
না। তাহ'লে আগাছা বলে ভাঁটা গাছগুলোই তুলে ফেলবে শেষে।”

বুদ্ধ হাসেন। তারপর আবার বলেন, “তুই একটু বুঝিয়ে বলিস লতুকে। কি
খিজির মতো সারাদিন খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ভালো লাগে না একটু। আমার
কথা শোনে না—তোয় মায়ের কথা তো কানেই তোলে না—কলোনীর ছেলেদের
তো জানিস! অতবড় মেয়ে—বদনাম রটাতে কতক্ষণ!”

নমিতা প্রশ্ন করে : “বাবলু এসেছিল আজ ?”

“ওই আর এক ছেলে ! হতভাগা কোথাকার ! আজ দশদিন হ’য়ে গেল—এল না একবার এ বাড়ি ! লতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায় । লতুকে বলছে—সে স্নেহেই আছে—আসবে না এ বাড়ি ।”

“এটা বৌদির ভারি অগ্নায় । এভাবে বাবলুকে আটকে রাখা !”

“কিন্তু সেই বা কি করে ? অহু তো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না । বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী কে আছে যে জলটা তুলে আনে—বাজারটা ক’রে দেয় । থাক বাবলু ওখানেই ।”

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : “কিন্তু ওখানে থাকলে তো ও মাহুষ হবে না । তুমিই তো আসবার সময় অহুকে বললে বাবলুকে মাহুষ করবার জন্ত আলাদা হচ্ছি আমরা !”

বুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, “অহু মাহুষটাকে সত্য কথা ব’লে এলেই কি খুশী হ’তে তোমরা ?”

নমিতা বলে, “কিন্তু তাই বলে বাবলুকে কি একবার খোঁজ নিতেও পাঠাতে পারত না এ দশ দিনে ?”

বুদ্ধ চুপ ক’রে থাকেন । তারপর আবার প্রশ্ন করেন : “টাকাটা পাঠিয়েছিল ?”

“হ্যাঁ বাবা ।”

“কবে ?”

“আজই ।”

“অহু কেমন আছে ?”

“তা তো জানি না ।”

“তা তো জানি না ! কে নিয়ে গিয়েছিল টাকাটা । তুই না লতু ?”

“আমি মনি-অর্ডার করেছি ।”

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন বুদ্ধ : “কাজটা ভালো করিস নি নমু । লতুকে পাঠালেই তো পারতিস । অহুটা কেমন আছে জেনে আসত ।”

“সেও তো একটা খবর পাঠাতে পারত ? তারও তো উচিত ছিল বাবলুকে এ বাড়ি পাঠিয়ে তোমাকে একটা খবর দেওয়া !”

নীরব থাকেন চক্রবর্তী ।

বিন্দুবাসিনী যোগ দেন : “তার নিজেরই আশা উচিত ছিল বাবলুর হাত ধরে । অভাবের তাড়নায় অগ্নায় যদি ক’রেই থাকে কিছু—তার কি উচিত ছিল না তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ?”

নমিতাও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, চুপ করে গেল। একজন অপরিচিত যুবক এগিয়ে আসছে ওদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করে। নমিতাও প্রতিনমস্কার করে। যুবকটির দেহাবয়ব সুগঠিত। চুলগুলি অযত্নবিশিষ্ট। জামাটার হাতা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। চোখে চশমা—খালি পা। নমিতা একটা মোড়া এগিয়ে দেয়। বিন্দুবাসিনী উঠে যান ভিতরে। যুবকটি বলে, “নমিতা চক্রবর্তী কার নাম?”

উত্তর দেন বৃদ্ধ : “কে?”

প্রতি প্রশ্ন করে ভূষণ : “আপনিই হরিপদ চক্রবর্তী মশাই?”

“হ্যাঁ, বন্ধুন। আপনি?”

বলেই ছিল যুবকটি। বলে, “আমার নাম ভূষণ, ভূষণ রায়। এ ব্লকে ৭২৪নং প্রটে থাকি আমি। তা আপনার ঠিকানা শুনেছিলাম ১১০৭।

“হ্যাঁ, আমরা সস্ত্রিতি উঠে এসেছি।”

“ও। দেখুন আমি এসেছিলাম আপনার মেয়ের কাছে। নমিতা দেবীর কাছে। আপনিই আশা করি।”

নমিতা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে।

“কলকাতায় গোলদীঘির ধারে হকার্স কর্নারে আমার একটা দোকান আছে। রেডিমেড-ফ্রক, ব্লাউস, ইজেরের দোকান। আপনাদের মতো মেয়েদের দিয়ে আমরা জামা কাপড় বানিয়ে নিই। বিক্রি করি সেই দোকানে। অনেক মেয়ে আমাদের সরবরাহ দেয়। যারা সেলাই করতে জানে, সময়ও আছে যথেষ্ট, অথচ নেই মূলধন অথবা বিক্রি করার ব্যবস্থা, তারা এভাবে আমাদের সাহায্য করে। বিনিময়ে আমরাও মজুরি দিয়ে সাহায্য করি তাদের। আমার আছে কাপড়, আছে দোকান—আপনার আছে সেলাই শিক্ষা, আছে অধ্যবসায়; আমি—”

ওকে থামিয়ে দিয়ে নমিতা বলে, “প্রথমত আমি সেলাই করতে জানি একথা জানলেন কার কাছে? আর দ্বিতীয়ত আমার অর্থও অবসর আছে এটাই বা ধরে নিলেন কি করে?”

লোকটি একটুও অপ্রতিভ হয় না, বলে, “এবার কঠিন প্রশ্ন করেছেন। আপনার এক নম্বর প্রশ্নের জবাব আমরা জম্মরী—ঠিক চিনে নিতে পারি। ক’দিন আগে সি. ডি. পি. এক্সিবিসনে আপনার কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা দেখি। সেখানেই আপনার ঠিকানা পাই। আর দ্বিতীয় অবসর না থাকার কোনও কারণ নেই। সংসারের কাজ ছাড়া দুপুরটা সব গৃহস্থ মেয়ের কাছেই অর্থও অবসর।”

বৃদ্ধ হরিপদ যোগ দেন : “নমিতা স্থলে পড়ায়।”

“নমিতা স্কুলে পড়ায় ! টিচার ! সর্বনাশ ! মাপ করবেন—আমি জানতাম না । আচ্ছা আলি আমি ।”

সত্যিই উঠে দাঁড়ায় ভদ্রলোক । নমিতা ওর ভাবগতিক দেখে হেসে ফেলে । বলে, “তা বলে পালাবার কি আছে ?”

“আছে নমিতা দেবী, আছে ! কিছু মনে করবেন না আপনি—ঐ স্কুলমাস্টার জীবটিকে আমি শৃঙ্গী, দস্তী প্রভৃতির পর্যায়ে ফেলি এবং চাণক্য বাক্য স্মরণ ক’রে শত হস্ত দূর দিয়ে চলি—”

স্কুলমাস্টার হরিপদ পণ্ডিত কথাটা বোধহয় সহ্য করতে পারেন না । সংশোধন করে দেন : “চাণক্য পণ্ডিত কিন্তু মাস্টার মশাইদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে সরে যেতে বলেন নি—”

“কারণ তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন । আমি মুর্থ মানুষ ; মাস্টার মশাইদের ভয় করি ! ছেলেবেলায় বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—”

“তাই বুঝি আজও টিচার দেখলে দাঁড়িয়ে ওঠেন ?”—বলে নমিতা ।

বসে পড়ে ভূষণ : “নাঃ ! আপনি আমাকে আবার বসিয়ে দিলেন দেখছি ।”

“বসিয়েছি বটে, তবে পথে বসাই নি । যদিও স্কুলে আমার অনেকটা সময় কাটে, তবু রাত্রে আপনার কাজ ক’রে দিতে পারব । সংসারের অবস্থাটা তো বুঝতে পারেন—যেটুকু আয় বাড়ানো যায় ।”

ভূষণ ঘনিয়ে বসে । নিজের পরিচয় দেয় । ভূষণের আদি নিবাস কুষ্টিয়া । কলোনীতে এসেছে একেবারে আদি পর্বেই । হাউস-বিল্ডিং লোন দিয়ে গড়ে তুলেছে একখানা বাড়ি । স্মল-ট্রেড লোনের অর্থে শুরু করেছে এই জামা-কাপড়ের ব্যবসা । বাড়িতে আছেন বৃদ্ধা পিসী আর মা-হারা ছ’বছরের মিঠুয়া । একটা হাতকল ছিল । মিঠুয়ার মা স্খালা একা হাতেই ভূষণের দোকানের জগ্ন প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল সরবরাহ করত । অক্লান্ত পরিশ্রম করত স্খালা । সে মাত্রা যাবার পর পিসীই চালায় কলটা ; কিন্তু আজকাল বৃদ্ধার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না এতটা পরিশ্রম । মা-হারা নাতনীটাকে মানুষ করাই কঠিন হ’য়ে পড়েছে তাঁর পক্ষে । তাছাড়া চোখে ছানিও পড়েছে । এদিকে ফ্যাসানও পালটাচ্ছে অনবরত । নতুন নমুনা এনে দিলে তার সেলাই খুলে ‘কাট’ বুঝে নিয়ে নতুন জামা কাটার মতো শিক্ষা নেই পিসীর । অথচ মামুলি জামার চাহিদা গেছে কমে । ফলে ভূষণ বিপদে পড়েছে । দিন কয়েক আগে উদয়নগরের অনতিদূরে সি. ডি. পি. টাউনশিপে একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল ভূষণ । সেখানে ওর নজরে পড়ে কয়েকটি সেলাইয়ের নমুনা । উদয়নগর কলোনীর নমিতা চক্রবর্তীর হাতের কাজ । খোঁজ নিতে নিতে

ঠিক এসে পৌঁছেছে সন্ধানী ভূষণ ।

নমিতা প্রশ্ন করে : “স্বালা দেবী কতদিন মারা গেছেন ?”

“বছর দুই ।”

“সে কি, এই যে বললেন মিঠুয়ার বয়সও দু’বছর ।”

“হ্যাঁ, মিঠুয়া হবার সময় মারা যায় সে ।”

“তাহ’লে আবার বিয়ে করেন নি কেন এতদিনে ?”

ভূষণ অবাক হ’য়ে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে । প্রশ্নটার জবাব দিতে পারে না ।

নমিতাই বরং লজ্জিত হয় । এত অল্প পরিচয়ে এ রকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করাটা নিশ্চয়ই অশোভন হয়েছে তার তরফে । তাই শুধরে নেবার জন্ত বলে, “মানে, মেয়েটাকে তো মাহুষ করতে হবে আপনাকে ।”

কৈফিয়তটা নিজের কাছেও খুব জোরদার মনে হয় না । হরিপদ পণ্ডিতও বোধকরি কথাবার্তার ধরনটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলেন না, উনি বলে বসেন : “সে কথা যাক্, এখন সেলাইয়ের কথা কি হচ্ছিল যেন...”

নমিতা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আলোচনাটা ভিন্ন পথে মোড় ঘোরায় । তাড়া-তাড়ি কাজের কথা পাড়ে । কি জাতীয় জামা চাই । আগে তার নমুনা দেখাতে হবে । মজুরি কত পাওয়া যাবে সে কথাও নিঃসঙ্কোচে জেনে নেয় । ব্যবসাই যদি করতে হয় তবে সমস্ত জেনে বুঝে কাজে হাত দেওয়া ভালো । বৃদ্ধ আবার যোগ দেন আলোচনায় : “রান্নাবান্না, ঘরের কাজ, তার উপর স্থূল । এর পরেও কি পারবি ও কাজ ।”

নমিতা ভূষণকেই প্রশ্ন করে : “কি পরিমাণ মাল সরবরাহ চাই আপনার ?”

“ধরুন সপ্তাহে আধ ডজন ব্রুক, ছটা ব্লাউস আর ডজন খানেক ইজের বা সান্না ।

“মাত্র ? এতেই চলবে আপনার দোকান ? এ থেকেই সব খরচ মিটিয়ে চলবে আপনার আমার সংসার ?”

“ভুল করছেন নমিতা দেবী । আমার দোকানে অন্তত শ’ চারেক টাকার মাল জমে আছে । সেটা তো খাপাতে হবে । আপনাকে দিয়ে কিছু চটকদার মাল বানিয়ে নেব যাতে তাই দেখে লোক দোকানে ভেড়ে । তারপর যখন দাম শুনে পিছপাও হবে তখন বার করব আমার ঐ মাল । তাছাড়া আপনার মতো অনেক মেয়েই জামা সরবরাহ করে আমাকে ।

আবার শুরু হয় গভীর আলোচনা । সেলাই কলটা পৌঁছে দিয়ে যাবে ভূষণ কালকেই—সেই সঙ্গে দিয়ে যাবে কিছু নতুন নমুনাও—আর ছিটের কাপড় ।

আলোচনার মাঝখানেই এল লভু । প্রায় নাচতে নাচতেই এল । তৃতীয় ব্যক্তির

উপস্থিতিটা লক্ষ্য হয় নি তার। সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। এসেই বললে, “এই দিদি, তোকে একটা লোক খুঁজছিল। ঠিক যেমন বলেছিলাম আমি। চোখে চশমা, কঁোকড়া চুল।”

হঠাৎ ভূত দেখার মতোই ভূষণকে দেখে একহাত জিব কাটে!

ভূষণ বলে, “আপনার বোন বুঝি? দেখি দেখি খুকি—এদিকে এসো তো! এ জামাটা বুঝি আপনারই করা?” প্রশ্নটা নমিতাকে।

খুকি।

লতু একটা বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক’রে চলে যায় ভিতরে।

“কি হ’ল?”—বিশ্ময় ফুটে ওঠে ভূষণের চোখে।

“আপনি ওকে খুকি বলেছেন, তাই। উনি হচ্ছেন শ্রীমতী লতিকা দেবী!”

“ও হোহো! বড় ভুল হ’য়ে গেছে তো! এই দেখুন—লেখাপড়া তো শিখি নি—তাই বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের উপদেশটা মনে থাকে না ‘কানাকে কানা বলিও না, খুকিকে খুকি বলিও না’।”

হরিপদ চক্রবর্তী জাত মাস্টার। ভুল উদ্ধৃতিটা আবার সংশোধন ক’রে দেন তিনি: “না না, বিজ্ঞানাগর মহাশয় ঠিক ও কথা বলেন নি।”

ভূষণও মেনে নেয়, বলে, “আজ্ঞে না, তিনি পণ্ডিত মানুষ, কানাকে কানা বলবেন কেন? তিনি কানাকে বলতেন পদ্মপলাশলোচন, খোঁড়াকে বলতেন তেনজি নোরকে আর খুকিদের বলতেন শ্রীযুক্তেশ্বরী ঠান্দিদি মহাশয়া।”

সশব্দে হেসে ওঠেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। নমিতাও মুখ নিচু করে হাসি গোপন করতে। আর পাশের ঘরে ফুলতে থাকে লতু। আচ্ছা এর শোধ সে নেবে।

নমিতার যেন নতুন জীবন শুরু হয়েছে। উদয়াস্ত পরিশ্রম। সকালে, বিকালে, রাত্রে খচখচ খচখচ ক’রে কল চালায়। স্ববালার কলটা পৌঁছে দিয়ে গেছে ভূষণ নমিতাদের বাড়ি। প্রথম সপ্তাহের শেষে ভূষণ এসে জামা-কাপড়গুলো হাতে নিয়ে কি খুসী। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নমিতার শিল্পকে। বলে, “এ রকম জিনিস দিতে পারলে যত দেবেন ততই নেব আমি। আর কাটতি বাড়লে আমারও লাভ আপনারও লাভ।”

“নিশ্চয়ই। পরস্পরের সাহায্যের জগতই তো এ ব্যবস্থা।”

নমিতা একটু ইতস্তত করে। মজুরিটা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার, কিন্তু এ পার্থিব প্রশ্নটা করতে কেমন যেন মন সরছে না। বিমুগ্ধ ভূষণ একটির পর একটি জামা পাট ভেঙে দেখল আর সত্যিকারের শিল্প সমালোচকের

মতোই প্রশংসা করল—ঠিক তার পরেই মজুরির কথাটা তোলা কেমন যেন বেমানান লাগে।

বিন্দুবাসিনী এসে দাঁড়ান দ্বারপ্রান্তে।

নমিতা বলে, “আমার মা।”

ভূষণ পায়ে ধুলো নিয়ে বলে, “আজ আসি তবে?”

বিন্দুবাসিনী বলেন, “এখনি যাবে? তাড়া আছে কোন?”

“না তাড়া আর কিসের?”

“তবে একটু ব’সে যাও না বাবা। উনি এখনি এসে পড়বেন। আমি চায়ের জলটাও বসিয়ে দিই।”

ভূষণ বলে, “আপনার মেয়ের সেলাইয়ের হাত ভারি সুন্দর। আমার দোকান তো ডুবতে বসেছিল। এ যাত্রা বোধহয় উনিই রক্ষা করলেন।”

নমিতা প্রতিবাদ করে: “সে কি কথা ভূষণবাবু? আপনি মজুরি দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। ছুখীর সংসারে আপনিই বরং সাহায্য করছেন। আপনিই বাঁচালেন আমাদের।”

লতু দরজার ওপাশ থেকে বলে, “তবে বোধহয় দুটি প্রাণই ছু’জনের জন্তু বেঁচে আছে!”

ওরা চমকে ওঠে। ভূষণ বলে, “কে ঠান্ডি না?”

নমিতা জবাব দিতে পারে না। সেলাইয়ের কাপড়গুলো নিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। দেখে লতু বালিশে মুখ গুঁজে হাসছে। নমিতা বলে, “একেবারে গোপলায় গেছিল তুই। কাকে কি বলতে হয় তাও জানিস না!”

জবাব দেবার মতো অবস্থা নয় লতুর। সে ডুগরে ডুগরে হাসছে খালি। সেলাই-গুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নমিতা বলে, “নে, এগুলো বেঁধে দে। আমি চায়ের জলটা বসিয়ে দিই।”

লতু বলে, “দায় পড়েছে আমার!”

নমিতা চলে যায়। লতু কি ভাবে এক মিনিট। তারপর কাগজ কলম টেনে নিয়ে চট ক’রে কি যেন লেখে। কাগজটা ভাঁজ ক’রে রেখে দেয় একটা ব্লাউজের ভিতর। তারপর সবগুলো পাট ক’রে বেঁধে দেয়।

ভূষণ একাই বসে ছিল বাইরে। বিন্দুবাসিনী সন্ধ্যা জ্বালতে উঠে গেছেন। হরিপদ এখনও ফেরেন নি। এককাপ চা আর দু’টো নারকেলের নাড়ু একটা প্লেটে নিয়ে প্রবেশ করে নমিতা। প্যাকেটটাও এগিয়ে দেয়।

ভূষণ বলে, “একটা কথা। ঐ হলুদ রঙের বেবি ফ্রকটার কিন্তু মজুরি পাবেন না।”

“কেন ? আমার অপরাধ ?”

“ওটা মিঠুকে দেবে তার মাসিমা ।”

“ও, তা বেশ তো । তাহ’লে কিন্তু একটা শর্ত আছে । মিঠুকে নিয়ে আসতে হবে । তার মাসিমাই নিজে হাতে দেবে জামাটা ।”

ভূষণ রাজি হয় । পরের দিন মিঠুকে আনবে বলে কথা দেয় । তারপর ভূষণ বলতে থাকে তার সংসারে কথা । সুখ দুঃখের ইতিহাস । ক্রমে ওঠে কলোনীর সামগ্রিক ভালোমন্দের কথা ।

রবিবারে মিটিং করা হচ্ছে । সকলকে বোলো আনার ডাকে আসবার জন্ত আহ্বান করা হয়েছে । সেখানে ইচ্ছা করলে নমিতাও যেতে পারে ।

নমিতা বলে, “আমি কেন ? আপনারাই ও সব করুন ।”

ভূষণ মাথা নাড়ে । বাগাড়ম্বর ক’রে বোঝাতে চায়—মেয়েরাও এগিয়ে না এলে কিছুতেই কিছু হবে না ।

ক্রমে হরিপদও এসে যোগ দেন আলোচনায় ।

লতু কিন্তু আসে না ।

ভূষণ চলে গেলে নমিতা বলে, “তুই যে লুকিয়ে বসে থাকলি ?”

“তবে কি নাচব তোমার ঐ ভূষণীকাকের সামনে গিয়ে ?”

নমিতা হেসে ফেলে : “তাতেই বা দোষ কি ? তুই তো ওর কাছে এখনও থুকি !”

“ভালো হচ্ছে না কিন্তু দিদি ! ওঃ, কী আমার আপন জনরে ! মিঠুর জন্তে জামা ক’রে দেবে তার মাসি ! কেন, মাসি কেন ? পিসী হ’তে কি দোষ ?”

খিলখিল ক’রে হেসে ওঠে নমিতা : “ও, তা বুঝি জানিস না ? ঐ ভূষণীকাক যে বলে গেছে মিঠুকে শিখিয়ে দেবে তোকে ‘মা’ ডাকতে । তোকে মা ডাকলে তো আমাকে মাসিই ডাকতে হয় ।”

দুম ক’রে একটা কিল মারে লতু দিদির পিঠে ।

খেলার মাঠের ধারে রবিবার বিরাট জনসমাবেশ হ’ল ।

ভূষণ অথবা যোগেনের আশার সীমারেখা ছাড়ালো জনসংখ্যা । প্রায়শ্চিন্ত নিয়ে আলোচনা হ’ত যথেষ্টই । চার্লের দোকানে, বাজারে, স্টেশনে অপেক্ষমাণ জনতার মুখে মুখে রোজই ফেরে নানান অভিযোগের কাহিনী । একপক্ষঃ অভিযোগ করে, অপর পক্ষ ধৈর্য ধরে সবটা শোনে না—তার আগেই সে পেণ ক’রে বসে তার অভিযোগ । শেষ পর্যন্ত সকলে মিলিত হ’য়ে গাল পাড়ে তৃতীয়পক্ষকে । সে তৃতীয়পক্ষ কখনও কলোনী পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তির, কখনও সরকার, কখনও বা

স্বয়ং ভগবান। তৃতীয় অভিযোক্তার কথা জানি না তবে বাকি ক'জন সে গালকে গ্রাহ্যও করে না। আজ সভা ক'রে গালপাড়া হবে শুনে ওরা উৎসাহভরে সবাই জমায়েত হ'ল।

প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোক্তা তৃতীয় অভিযোক্তার মতোই রইলেন অল্পপস্থিত। সভায় বক্তারা একে একে অভিযোগ শেষ করতে লাগলেন। কি কি চাই—তার একটা লম্বা ফিরিস্তি করা হ'ল। স্থলের পাকাঘর, পাকা-রাস্তা, নতুন টিউবওয়েল, পুরানো নলকুপগুলির সংস্কার।

আর চাই কাজ! কর্মের বিনিময়ে গ্রাসাচ্ছাদন। অশক্তদের ক্রি ডোল। মতিবিড়ি ফ্যাক্টোরির জীবন চাকি বলে, “সবার আগে বাইক্যা দিতি অইব অগোর পঞ্চাইৎ।”

“বাংতে অইব কি কও? অগো তো বাইক্যা দিছিই! ও পঞ্চাইৎরে আমরায় মানি না।”

একটা বন্দোবস্ত বোধহয় আগের থেকেই করা ছিল; পিছন থেকে কে চিংকার ক'রে ওঠে ‘কলোনী পঞ্চায়েৎ—’

অনেকগুলি কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—‘ধ্বংস হোক!’

বার বার তিনবার। ক্রমশ কণ্ঠস্বর বাড়ে।

“পঞ্চায়েতের বিধান—”

“মানব না, মানব না!”

যোগেন নায়ক উঠে দাঁড়ায়। বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে, “ভাইসব! আপনারা সকলে একবাক্যে জানিয়েছেন যে বর্তমান পঞ্চায়েতকে আপনারা মানেন না। কেন মানেন না তা বিস্তারিত বলার দরকার নেই। এ পঞ্চায়েতের পক্ষপাতিত্বের কথা, আত্মীয় পোষণের প্রচেষ্টা, ঘুষ খাওয়ার কেছা সবাই জানেন, আমরা আশা করেছিলাম—তাদের কেউ কেউ এ সভায় আসবেন। এলে আমরা আমাদের অভিযোগ পেশ করতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা এখানে অল্পপস্থিত।”

সভায় একটা গুণ্ডগোল হয়। কেউ বলে, “আইব কুইখ্যাক্যা? আইলে হালাগো কৈক্ষিত দিতি হইব না?”

“ঘরের মধ্যই অগো যতো বিক্রম—সভায় আইবার মুখ আছে নাকি?”

ভূষণ প্রভৃতি ‘চুপ করুন’ ‘চুপ করুন,’ ক'রে থামিয়ে দেয় গুণ্ডগোল। যোগেন শুরু করে : “স্বতরাং সে সব গুন্ডারজনক আলোচনা থেকে আমরা বিব্রত রইলাম। আমরা মেনে নিচ্ছি এ সভার সকলেই বর্তমান পঞ্চায়েতের উপর আস্থা হারিয়েছি।

আমরা এ পক্ষায়ত ভেঙে দিতে চাই।”

সভায় সমর্থনসূচক সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

প্রমোদের পলিটিক্স করার অভ্যাস আছে, চট্ ক’রে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, “এ সভায় এমন কেউ কি আছেন যিনি বর্তমান পক্ষায়তকেই বহাল রাখতে চান? যদি থাকেন তো হাত তুলুন।”

কোন হাত ওঠে না।

যোগেন বলে, “সভাপতি মশাই তা হ’লে লিখে নিন—এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ’ল।”

নিতাই কবিরাজ পূর্বেই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি কি যেন নোট করেন।

যোগেন পুনরায় শুরু করে : “তাহ’লে আমরা আমাদের এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাব এবং দাবি করব বর্তমান পক্ষায়তকে অবিলম্বে পদচ্যুত করতে। তাহ’লেই প্রস্ন দাঁড়াবে নতুন কমিটি গঠনের। কলোনীর অন্তত সাত-আট শো লোক এখানে উপস্থিত আছেন। আপনারাই নির্বাচন ক’রে দিন।”

মতিবিড়ি ফ্যাক্টোরির জীবেন চাকি বলে, “অখন তিনজনের একটা কমিটি করেন। পরে ভোট নিয়া পাক্কা কমিটি করবেন।”

কানাই পাল বলে, “আমারও তাই মত। আপাতত অ্যাডহক্ কমিটিই করা চলতে পারে।”

ভূষণ বলে, “তিনজনের কমিটি, তার একজন হবেন মুখপাত্র বা চেয়ারম্যান। আমি প্রস্তাব করছি বর্তমান সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিতাই কবিরাজ মশাই চেয়ারম্যান হ’ন—এবং তিনিই বাকি দু’জনের নাম বলুন।”

সভা একবাক্যে সমর্থন করে।

পিছন থেকে কে একজন চিংকার ক’রে ওঠে “নিতাই ঠাকুরদা—”

সমবেত কণ্ঠ : “জিন্দাবাদ !”

এটাও পূর্বপরিকল্পিত বোধহয়।

সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ওদের থামতে বলেন। ‘চুপ চুপ’ একটা সাড়া পড়ে যায়। নিতাই কবিরাজ বলেন, “আপনারা সবাই যদি চান তাহ’লে যতদিন না নির্বাচন করা জনকল্যাণ কমিটি গঠিত হচ্ছে ততদিন অ্যাডহক্ কমিটি পরিচালন করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি। কিন্তু ভূষণ ভায়ার দ্বিতীয় প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত নই। বাকি দু’জনকে আমি নমিনেশন দিয়ে স্থির করব না। তাহ’লে বস্তুত সেটা একজনের কমিটিই হ’য়ে যাবে। আপনারাই স্থির ক’রে বলুন বাকি দু’জনের নাম।”

কে একজন বললে, “তাহ’লে একজন আমাদের জীবন না। মতিবিড়ি ফ্যাক্টারির জীবন চাকি।”

জীবন তৎক্ষণাৎ উঠে আপত্তি দেয়। তার কারখানার বামেলা ছেড়ে সে এ দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

“তাহ’লে ভূষণ রায়। ‘এ’ ব্লকের ভূষণবাবু।”

সকলেই সমর্থন করে।

আর একজন ?

জীবন প্রস্তাব করে যোগেনের নাম।

সভাপতি বলেন, “যোগেন আর ভূষণ দু’জনেই ‘এ’ ব্লকের লোক। এটা ঠিক হবে না। তাছাড়া সম্ভব হ’লে একজন মহিলাকে আমরা কমিটিতে নিতে চাই। মেয়েদের অনেক অভাব অভিযোগ তিনি জানতে ও জানাতে পারবেন।”

হারাণ দে-র ভাইপো পরাণ দে বলে, “আমি প্রস্তাব করতে আছি যে আমাগো মাইয়া ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে কমিটিতে লওয়া হউক।”

বিশ্বয়ের কথা ! সভার সম্মুখে মেয়ে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বসেছিলেন। আর কোনও সরকারী পদস্থ কর্মচারিই অবশ্য আসেন নি সভাতে। ক্যাসডোল ক্লার্ক মুণাল আর ‘আর ও’ সাহেবের ডেসপ্যাচার ক্লার্ক মিহির ছাড়া। হেডমিস্ট্রেস যে সভাতে উপস্থিত আছেন সেটা ভিড়ের অনেকেই এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি।

স্বরেখা দেবী উঠে দাঁড়ান। জনতাকে মুখোমুখি করা তাঁর অভ্যাস আছে। কলেজে অনেক সোসায়েলে ডিবেটিং সোসাইটিতে বক্তৃতা করতে হয়েছে। পরিষ্কার কণ্ঠে বলেন, “আপনাদের একজন আমাদের যে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আমি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পক্ষে দুটি কারণে তা সম্ভবপর নয়। যদিও কর্মোপলক্ষ্যে আমি এখানকার বাসিন্দা—তবু আমি কলোনীর রেজিস্ট্রিভুক্ত লোক নই। দ্বিতীয়ত আমি সরকারী কাজ করি। আপনাদের এ সংগ্রামে আমার সহায়ভূতি থাকলেও প্রত্যক্ষ যোগ রাখা সম্ভব নয়। তবে নিতাইবাবুর প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কমিটিতে একজন মহিলা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই আমি প্রস্তাব করি আমাদের স্কুলের শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্তীকে আপনারা কমিটিভুক্ত করতে পারেন। তিনি এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।”

নমিতা উপস্থিত ছিল সভায়। এ প্রস্তাবে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠল। তবু এটুকু সে বুঝেছে যে এখনই প্রতিবাদ না করতে পারলে আর ভবিষ্যতে পরিজ্ঞান পাবে না। উঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাই সে বলতে চায়, কিন্তু এতগুলি

লোকের দৃষ্টির সম্মুখে কোন কথাই বলতে পারে না। হেডমিস্ট্রেসের দিকে চেয়ে যে কটি অসংলগ্ন কথা সে বলে তার কোনও অর্থ হয় না। হেডমিস্ট্রেস জনতার দিকে ফিরে বলেন, “নমিতা সম্মত হয়েছে। তাকে এই গৌরবজনক পদ দেওয়ায় সে আমাকে বলছে আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে।”

সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

নমিতা বলে পড়ে।

সভার শেষে ভূষণ এসে উচ্চারণ করে নমিতাকে : “আপনাকে আর আমাকে যে এরা এভাবে যুক্ত ক’রে দেবে তা ভাবি নি।”

নমিতা জবাব দিতে পারে না।

ভূষণ আবার বলে, “কী এত ভাবছেন বলুন তো?”

“ভাবছি আমারও তো চাকরি আছে স্থুলে। আমাকে কমিটিতে নেওয়া কি ঠিক হ’ল?”

“সে দায়িত্ব হেডমিস্ট্রেসের। তিনিই আপনার নাম প্রস্তাব করেছেন। সভার বিবরণীতে সেটা লিপিবদ্ধ হয়েছে।”

“তাছাড়া—”

“কি করবেন বলুন ; প্রজাপতির নির্বন্ধ!”

নমিতা লাল হয়ে ওঠে।

ভূষণ তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে নেয়। নিতাই ঠাকুরদার কর্মপন্থাটি ওকে বোঝাতে থাকে। পায়ে পায়ে হু’জনে বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। জনতা মিটিং ভেঙে চলেছে যে যার বাড়ি। কয়েকজন আঙুল দেখিয়ে ওদের দিকে দেখালো! কি যেন বলাবলি করছে সবাই। নমিতা অস্বোয়াস্তি বোধ করে। ওর পাশাপাশি হেঁটে চলতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। মনে পড়ে যায় কেমন অবলীলাক্রমে ভূষণ বললে ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’! লোকটা অসভ্য কিন্তু।

ভূষণ কিন্তু দ্রক্ষেপ করে না জনতাকে। সে এক নাগাড়ে বকতেই থাকে। এতগুলো লোকের ভালোমন্দ এখন নির্ভর করছে তাদের উপর। এরা বাড়িঘর ফেলে এসেছে পিছনে। ছিল পি. এল. ক্যাম্পে, সেখান থেকে গিয়েছিল পুনর্বাসনে স্বদূর মধ্যপ্রদেশে—আবার ফিরে এসে উঠেছিল শেয়ালদ’ হাওড়া স্টেশনে। তারপর এসে উঠেছে বর্তমানে উদয়নগর কলোনীতে। উইপোকার মতো বার বার গড়ে তুলছে ঘরবাড়ি। ভেঙে যাচ্ছে বার বার। তবু খেদ নেই এদের। আবার গড়তে চায় এরা নূতন বন্দীক! প্ল্যানকরা কলোনীতে সারি সারি উইটিপি গড়ে তুলছে এরা। হার মানবে না কিছুতেই!

অনিমেঘের জ্বরটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বুকের বেদনাটাও। স্বস্থ সবল জোয়ান মানুষটা ক্রমশই মিশে যাচ্ছে চৌকির সঙ্গে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হ'য়ে উঠেছে। চোখটা গিয়েছে বসে। সারা মুখে বেরিয়েছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সারাদিনই গোড়ায় যতক্ষণ জেগে থাকে। তার উপর ক'দিন ধরে জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছে না। কাল রাত্রি থেকে আবার ভুল বকতে শুরু করেছে। কোটরগত চোখ দুটোর ফুটে উঠছে একটা ঘোলাটে তমসাচ্ছন্নতা। মাঝে মাঝে কামিনীকেও চিনতে পারছে না। কামিনীর রীতিমতো ভয় হয়েছে। সে বুঝতে পারছে কোনও একটা অনিবার্য পরিণতির দিকেই ছুটে চলেছে রোগী। বুকে তার পাষণ্ডভার চেপে আছে, কিন্তু কান্দবার উপায় নেই।

রাত্রি প্রভাত হ'লে অনিমেঘের গায়ে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল : “ওগো খিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?”

অনিমেঘ মাথা নেড়ে জানায়—না।

খেতে চাইলে দেবার মতো অবশ্য কিছু ছিল না ঘরে।

“খুব কষ্ট হচ্ছে কি?”

অনিমেঘ জবাব দেয় না। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। হঠাৎ কামিনীর উদ্বেগ-নমিত মুখখানা ঠেলে দিয়ে বলে, “দূর হ'! কেন ডাকছি! আমাকে? আমি যাবো না!”

কামিনী চুপ ক'রে বসে থাকে।

বাবলু সেই প্রথম দিনের পর আর আসে নি। বাবা-মা-দিদিদের নিয়ে আনন্দেই আছে সে—বৌদির কথা বোধহয় মনেই পড়ে না। লতু অথবা নমিতা যে খবর নিতে আসবে না এটা জানা কথা। বাবলুই যখন এল না। নিজেই যাবে কিনা ভাবতে থাকে। কয়েক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়।

সেদিন অনিমেঘের শরীরটা একটু ভালো ছিল—জ্বরটা কমে গিয়েছিল। অনিমেঘ জিজ্ঞাসা করেছিল : “মাঝে ক'দিন আমার হুঁস ছিল না, নয়? আচ্ছা লতু কি বাবলু আসে নি ইতিমধ্যে?”

কামিনী মাথা নেড়ে জানায়—না!

“আশ্চর্য!”

হুঁজনেই চুপ ক'রে থাকে।

অনিমেঘ আবার বলে, “দেখ, কাল থেকে মনে হচ্ছে—এযাত্রা বোধহয় আর বাঁচব না। তোমার কি হবে?”

কামিনীর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বয়ে পড়ে অনিমেঘের জ্বরতপ্ত কপোলে।

অভূত সংঘমে সে ধীরে ধীরে বলে, “বাবাকে খবর দেব ?”

“কখনও নয় ! আমার দিবি থাকল বউ—আমার প্রাণ থাকতে তুমি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে না ! যেদিন যাবে শাঁখা ভেঙে যাবে !”

স্বামীর বৃক মুখ লুকিয়ে কামিনী বলেছিল, “ওগো তুমি চূপ কর ।” অনিমেষও যে নিরুদ্ধ অভিমানে এমনি ক’রে ফুলছিল—এভাবে যে তার বহিঃপ্রকাশ হ’তে পারে—কামিনীর তা ধারণা ছিল না ।

সেই কথাগুলিই মনে পড়ল তার ।

সন্ধ্যার দিকে অনিমেষকে ডাকলে সে আর সাড়া দিল না ।

কামিনী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল !

গোরা'কে বসিয়ে রেখে বাইরে এল । এখনই কিছু একটা করতে হবে । গলিটা পার হ’য়েই পথচারীদের লুৰ্হ-দৃষ্টিতে সচেতনতা ফিরে আসে তার । এ কাপড়খানা পরে—আর যাই হোক পথে বার হওয়া যায় না । আবার ফিরে আসে । ভিজ্জে গামছাখানা জড়িয়ে নেয় গায়ে । দ্বিতীয়বার পথে বার হ’তেই দেখা হয় বিষ্টু-পদর সঙ্গে । পথ আগলে দাঁড়িয়েছে সে ।

“কই যাও ?”

পথ না পেয়ে কামিনী থেমে যায় । জবাব দেয় না ।

“অনিমেষডা ক্যামন আছে ?”

কামিনী সমস্ত সন্কোচ ত্যাগ ক’রে বলে ; “ভালো নাই—দেখুন না এসে ।”

বিষ্টুপদ উদ্বিগ্ন হবার ভাব দেখায় । ছুঁজনে ফিরে আসে বাড়িতে । বিষ্টুপদ অনিমেষের পাশে গিয়ে বসে । শান্ নেই তার । বিষ্টু নিজে'কেই দিক্কার দেয় । কী অপদার্থ সে ! এমন একটি পূর্ণযৌবনা বধু বাস করছে তার বাড়ির একশ’ হাতের মধ্যে—একেবারে অসহায় অবস্থায়—যার স্বামী ডাকলে সাড়া দেয় না—আর বিষ্টুপদ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি ?

রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বলে, “জ্বর যান্ বাড়তেছে লাগে বউ ! এমন হৈছে আমারে একডা খবর দাও নাই ক্যান ? কোন ডাক্তার চাখতেছে ?”

“ডাক্তার ? ডাক্তার ডাকব কি ক’রে ?”

“কও কি ? আরে ছি ছি ! করছ কি ! আমারে কও নাই ক্যান ?”

কামিনী গায়ের গামছার একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে, “আপনার সেই দশ টাকার এক পরসাও শোধ দিতে পারি নি, আপনাকে ডাকব কোন মুখে ।”

বিষ্টুপদ হেসে ওঠে, তারপর হঠাৎ ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বলে, “আমারে ডাকবা

এই চাঁদমুখেই !”

বলেই বেরিয়ে যায়।

কামিনীর চোখ দুটো জলে ওঠে। ইচ্ছা করে উনানের ওপাশ থেকে একখান চেলাকাঠ তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয়। কিন্তু বিষ্টুপদ তার আগেই বেরিয়ে যায়। রাস্তার মোড় থেকে বলে, “লালুবাবুরে ডাইক্যা আনতেছি বোঁ !”

কামিনী পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

বিষ্টুপদ রাস্তাঘরের চোকাঠ ধরে দাঁড়ানো বধূটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ডাক্তার ডাকতে যেতে তার মন সরে না। উদাস দৃষ্টি-মেলা স্নগঠিত-তনু বধূটির সর্বাঙ্গ লেহন ক’রে ফেরে তার ক্ষুধিত দৃষ্টি। দক্ষিণ বাহুমূল অনাবৃত, হাঁটুর উপরে খানিকটা ফেঁসে গেছে শাড়িটা। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের আবরণীতে যৌবনকে শাসন করতে পারে নি মেয়েটি। বিষ্টুপদ কিছুতেই ফিরে যেতে পারে না। সাহস বেড়ে গেছে তার। ফিরে আসে পারে পারে। কামিনী টের পায় না—উদাস দৃষ্টিতে চেয়েই থাকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে !

বোঁ !”

চমকে ওঠে বধূটি।

“ডাক্তারবাবু বাইরের লুক। তোমার এ সজ্জা দেখলি মুনিঝরিরও মন টলে। কাপড়খান পালটে পর।”

কামিনী আর স্থির থাকতে পারে না। সে বোঝে তার অসহায়তাকে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে ব্যাক করতেই ফিরে এসেছে লোকটা। সামনের দুটো দাঁত নেই। পানরস-সিক্ত জিহ্বাটা দেখা যায় মুখের গহ্বরে। চোখে একটা সরীসৃপস্বলভ লুঙ্গ দৃষ্টি। এই ক্লোক্ত সরীসৃপটা তাকে ধীরে ধীরে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে—এটা বুঝতে কামিনীর কষ্ট হয় না। কঠিনস্বরে বলে, “আপনিও তো বাইরের লোক। আর শাড়ি থাকলে আপনার সামনেও এ বেশে বের হতাম না নিশ্চয়।”

“কি কও ! আমি তো ঘরেরই লুক। আমার আর দেখনের বাকি আছে কি। কত ছাখলাম, ফিরাবার কত ছাখবাম।”

হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বিষ্টুপদ।

ওঘর থেকে অনিমেষের আর্ত কণ্ঠ ভেসে আসে। রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে লোকটা। কামিনী ওর পাশে গিয়ে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে বুঝতে পেরেছে এই বার তার চরম পরীক্ষা এসে গেছে। সোনা দানা যা ছিল ঘরে অনেকদিনই ফুরিয়েছে তা, ষটি বাটিও নিঃশেষিত হয়েছে। যেটুকু সম্পদ নিয়ে সে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এসেছিল তিলে তিলে তা নিঃশেষিত হয়েছে। বাকি

মাছে হাতের একজোড়া মাথা আর সীমস্তে এক ফোঁটা সিঁদুর। ঐ নিঃশেষিত-প্রাণ রোগজীর্ণ মানুষটার বুকের একটু ধুকধুকানি। এই সে ভেবে এসেছিল এতদিন। আজ হঠাৎ বিষ্টুপদর লুক চোখের আরশিতে দেখেছে আরও এক সম্পদ আছে তার। সে সম্পদ তার নারীত্ব—তার পূর্ণ-যৌবনা দেখানি। পরীক্ষা, পরীক্ষা! সমস্ত জীবনভর কঠিন পরীক্ষাই দিয়ে চলেছে সে। মাথা উঁচু ক’রে দেবতার সমস্ত অভিষাপই গ্রহণ করেছে। দুঃখরাত্রে সংসার-তরীর হাল ধরে দক্ষ নাবিকের মতো পাড়ি জমিয়েছে এতদিন। আজ বোধ হয় চরমতম পরীক্ষা দেবার ডাক এসেছে ওর। নিষ্ঠুর পাষণ-দেবতা যেন এইবার ওকে ডেকে বলছেন ‘বেছে নাও, তোমার স্বামী-পুত্র একধারে, আর অগ্রধারে তোমার সত্যীত্ব ধর্ম। কাকে চাও তুমি, বেছে নাও।’

ছুটে গিয়ে কামিনী দেওয়াল থেকে টেনে নামায় কালিঘাটের পটখানাকে; বলে, “তুমিও না মেয়েমানুষ! হতে পারো দেবতা—তবু মেয়েমানুষ তো তুমি? বল, বল রাঙ্গুসী—তোমাকে এ পরীক্ষায় ফেললে তুমি কী জবাব দিতে? তোমারও তো স্বামী পুত্র আছে—তুমিও তো মহাসতী!”

“মা! আমার ভয় করছে!”

মায়ের উদ্ভাদিনী মূর্তি দেখে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে গোরা।

কামিনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে: “ভয় কি মানিক? এই তো আমি। কোন ভয় নেই। ঘুমাও। খিদে পেয়েছে?”

গোরা নিজীবের মতো শুয়ে মাথা নাড়ে: না!

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কামিনীর। কাল রাত্রেও গোরা কিছু খায় নি। বিকালে খেয়েছিল আধখানা পেঁপে। আজ এত বেলাতেও ওর খিদে পায় নি। অতটুকু ছেলে পর্যন্ত বুঝেছে মায়ের অসহায়তা। ঘরে কিছু নেই। মাকে করুণা ক’রে মিথ্যা বলেছে সে। আর ঐ বিষ্টুপদ, ঐ নিষ্ঠুর ভগবান—তার অসহায়তা নিয়ে উল্লাস করে, বাদ্র করে। সে মানে না,—ঈশ্বর নেই! মা-কালী নেই! ফটোখানা সে নামিয়ে রাখে।

ওর মনের মধ্যেও জেগে উঠেছে বুঝি কালাপাহাড়—“খাহক্লেও তুমি বোবা, তুমি কানা!”

“বৌ!”

উঠে বসে কামিনী। বিষ্টুপদ ফিরে এসেছে। বিষ্টুপদ ওকে ‘বৌ’ বলে ডাকে কেন?

“ডাক্তারবাবু এসেছেন?”

“না আয়েন নাই। এখান্ পইড়্যা লও!”

বিষ্টুপদর হাতে একটা লালপাড় তাঁতের শাড়ি।

কামিনী স্থির হ’য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

“লও লও! আর মশ্করা ক’র না!”

“না!”

“না ক্যান? কাপড় পরবা না?”

“না।”

জিবের ভগাটা বেরিয়ে আসে বিষ্টুপদর। বলে, “ঐ বস্ত্রহরণের গোপনারী সাজ্যাই থাকবা?”

মাথার মধ্যে বিম্বিম্ব করতে থাকে কামিনীর। একটা অসহায় আক্রোশে ফুলতে থাকে।

বিষ্টুপদর সাহস বেড়ে যায়। থপ্ ক’রে কামিনীর হাতখানা ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। গুঁজে দেয় শাড়িখানা গুরু শাঁখাসর্বস্ব হাতে।

কামিনী আর সহ্য করতে পারে না। ঠাস ক’রে মায়ে এক চড় বিষ্টুপদর গালে। বিষ্টুপদ এতটা আশঙ্কা করে নি। একটা অসহায় মেয়ে, বিবস্ত্রপ্রায় বধূর এতটা দুঃসাহস হবে তা সে কল্পনাই করতে পারে নি। এগিয়ে আসে একপা। হাত বাড়ায় ঐ নারী-মাংসের দিকে। কামিনী চিৎকার ক’রে উঠতে যায়। এক বিন্দু শব্দ বার হয় না তার কণ্ঠনালী দিয়ে। সভয়ে দু’হাতে মুখ ঢাকে সে। পরমুহূর্তেই একটা ক্লেদাক্ত জান্তব আলিঙ্গনের আশঙ্কায় সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই চিৎকার ক’রে ওঠে গোর। “—মা!”

বিষ্টুপদ চমকে ওঠে! অনিমেষের অবশ্র ঘুম ভাঙে নি; কিন্তু ঐ এক-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের আওয়াজটার ঘরটা গম্গম্ করতে থাকে। সোজা হ’য়ে দাঁড়ায় কামিনী। তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে। সে নিঃসহায়া নয়! সে শুধু অসহায়া বধু নয়—সে জননী! সম্ভান লেকথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার মাতৃ-সম্বোধনে। বিষ্টুপদ কামিনীর চোখে দেখতে পায় সেই হিংস্রতা—যেটা ফুটে ওঠে নরহত্যা-কারীর চোখে চরম মুহূর্তের পূর্বকণ্ঠে! বিষ্টুপদ গোরার উপস্থিতিতে আত্মসংবরণ করতে বাধ্য হয়। বলে, “থাহ্ কল তোমার শাড়ি। ডাক্তারের প্রয়োজন বুঝল্যা আমারে খবর দিয়া; জ্বাংটো হয়্যা আসবা না। শাড়িখান পইড়্যাই আসবা।”

চলে যায় বিষ্টুপদ!

গোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছু ক’রে কঁদে ওঠে কামিনী।

“আমার ভয় কি! আমার গোরাদান বতকল আছে ততকল কেউ পারবে না

আমার গারে হাত দিতে ।”

জননী আর পুত্রের অশ্রুশ্রোত মিশে যায় ডিম্বকের একটা জীর্ণ কুটিরের একান্তে !
ছুনিয়া সে খবর রাখে না ।

নমিতার দিনগুলিতে যেন নতুন স্বর লেগেছে । মাঝে মাঝে গুণ্ণুগুণ্ণু করে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে । মনে পড়ে ঘুরে ফিরে ঐ একটা লোকের কথাই । ওর হাতের কাজ যে গিয়ে বিক্রি করছে কলকাতার বাজারে । স্থল থেকে ফিরে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ফর্সা শাড়িটা ছাড়ে না । গামছা দিয়ে রগড়ে মুখটা মোছে । কপালে পরে একটা লাল টিপ । পাউডার মাখা ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন । নতুন করে কিনতে লজ্জা করে—লতু কি ভাববে ।

সপ্তাহ কয়েক ঘন ঘন আসছে ভূষণ । এ সপ্তাহান্তেও আবার এল । এসেই বলে, “কই আপনার বোন কোথায় । ভাকুন তো তাকে ।”

একটু ঘাবড়ে যায় নমিতা—কেন কি হয়েছে ?

“আরে বাপরে বাপ্ ! ঠান্দিদি বলেছি বলে কি এ রকম রসিকতা করতে হয় ? মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি সেদিন ।”

কথাটা অতিরঞ্জিত নয় । নমিতার তৈরি জামা-ফ্রকগুলো নিয়ে ভূষণ দোকানে রাখে । এ সপ্তাহে বিক্রি ভালোই হয়েছে । একদিন এক ভদ্রমহিলা দোকানে এসে ত্রিশ ইঞ্চি ব্লাউজ খোঁজেন । ভূষণ নমিতার তৈরি করা ব্লাউজের বাঙিলটা বের করে দেয় । প্রথমটা খুলেই ভদ্রমহিলা একখণ্ড কাগজ আবিষ্কার করেন । সেটি দেখে তাঁর মুখ চোখ বেগুনি হয়ে ওঠে ;—কাগজখানা দেন তিনি সন্দের ভদ্রলোককে । তিনি মারতে আসেন আর কি ! খন্দেদের সঙ্গে রসিকতা ! প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম । শেষে পাশের দোকানদারেরা রক্ষা করে । ভূষণ হাত জোড় করে দাঁজির দোকান থেকে বাঙিল-বাঁধা জামা এনেছে, ভিতরে কি কাগজ আছে সে জানে না । অনেক বকাবকা করে গুঁরা চলে যান । ভূষণ তখন কাগজ-খানা তুলে নিয়ে দেখে তাতে লেখা আছে :

ভূষণী কাকের মতো চেহারাটি প্রভু ।

আরশি সামনে ল’য়ে দেখেছেন কতু ?

খরিকদার ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মহিলাটি এসেছিলেন তাঁর তহুদেহখানি ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । গাত্রদাহ হবার এটাই হয়তো কারণ ।

লতুকে খুঁজে পাওয়া গেল না ।

ভূষণ বলে, “একদিন আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ি । পিসীমা আপনাকে

দেখতে চান।”

“বেশ তো, যাব।”

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে ভূষণ। বিন্দুবাসিনী কখন উঠে যান। আজ লতুও বাড়ি নেই। হরিপদ মাস্টারও অস্থপস্থিত। দু’জনে ঘনিষ্ঠ হ’য়ে আসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। বন্ধুত্ব স্থাপিত হ’য়ে যায়। ভূষণ বলে,—কি যে করি, সপ্তাহে দুদিন মাত্র বাড়িতে থাকি। একা একা মিঠুয়াটা সারা সপ্তাহ কাঁদে। আমাদের পাড়ায় গুর সময়সী নেই। পিসীমার সঙ্গে আর কী খেলা করবে। ও মেয়েটাকে মাহুষ করাই কঠিন হ’য়ে উঠেছে।”

“আপনার বোন-টোন নেই?”

এ প্রশ্নের মধ্যে হাসির কি আছে? ভূষণ মিটিমিটি হাসতে থাকে।

নমিতা অস্বস্তি বোধ করে। ভূষণ অবশেষে বলে, “ছিল, মারা গেছে।”

“ও! তা হ’লে আবার একটা বিয়ে ক’রে কেলুন।”

“আবার!”—হাসে ভূষণ। এবার প্রকাশ্যেই।

“হাসি নয়। মেয়েটাকে তো মাহুষ করতে হবে।”

“সতীনের মেয়েকে যত্ন করবে কিনা—বুঝ কি ক’রে? তার চেয়ে এ ভালো। দুই গরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভালো।”

“সব মেয়েই কিন্তু অমাহুষ নয়। আপনি আগে থেকেই গুরুত্ব ভাবছেন কেন? বহু জায়গায় তো ঘোরা ফেরা করেন—দেখে পছন্দ ক’রে বিয়ে করুন।”

ভূষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নমিতার দিকে। নমিতা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। ভূষণ ধীরে ধীরে বলে, “আমি পছন্দ করলেও সে আমাকে পছন্দ করবে কিনা তার স্থিরতা কি? আমার চেহারাটা তো দেখছেন—উপার্জনও এই সামান্য—লেখা-পড়াও খুব কিছু একটা শিখি নি—তার উপর দোজবরে!”

নমিতা জবাব দিতে পারে না। জবাব একাটা দেওয়া উচিত—প্রতিবাদ করাটাই এক্ষেত্রে ভদ্রতা; কিন্তু ভূষণের ঐ স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি আর কাটা কাটা কথায় বেচারী কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। ভূষণই আবার বলে, “আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?”

“আমি? আমি কি সাহায্য করব?”

কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে নমিতার! বুকের ভিতর দুম্ দুম্ ক’রে কে যেন ঘা মারে। পঁচিশ বছরের কুমারী মেয়েটির মনে লেগেছে ঝড়ের স্পর্শ। এখুনি হয়তো ভেঙে পড়বে একেবারে। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে যায় অতিক্রান্ত যৌবনের অনাদৃত ইতিহাস। দেশে থাকতে বাবার আগ্রাণ চেষ্টা ছিল নমিতাকে পাত্রস্থ

করার। অনিমেষের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে হওয়ার কথা তার। সে বিয়ে স্থগিত রাখতে হয়েছিল পাত্র অস্থস্থ হয়ে পড়ায়। অস্থ হওয়ার পর পাত্রের পিতা গ্রহণ করতে রাজি হন নি নমিতাকে। যার আগমন সম্ভাবনাতেই তাঁর পুত্র অস্থস্থ হ'য়ে পড়ে—সে মেয়ের বিষনিঃশ্বাস সহ্য হবে না তাঁর পুত্রের! তারপর থেকে হরিপদ পণ্ডিত মাঝে মাঝে নিয়ে আসতেন অপরিচিত ভ্রমলোকদের। বিন্দুবাসিনী সাজিয়ে দিতেন মেয়েকে মনের মতো ক'রে। এক রাজ্যের লজ্জা নিয়ে নমিতা গিয়ে বসত পরিদর্শকদের সম্মুখে। গুঁরা খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করতেন, নাম জিজ্ঞাসা করতেন, হাতের লেখা দেখতে চাইতেন, হস্তরেখা দেখতেন। গুঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অস্থভূতি জাগতো, মনে হ'ত একটা মাত্র উত্তরের উপর হয়তো নির্ভর করছে তার জীবন, যৌবন—আশা আকাঙ্ক্ষা সব! তারপর গুঁরা চলে যেতেন। মেয়ে পছন্দ হয় নি কথাটা মোলায়েম ক'রে জানিয়ে দিতেন চিঠি লিখে।

সেই বিন্দুতপ্রায় অস্থভূতিটা জেগেছে আবার। নমিতার হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে ফিরে এসেছে সেদিনের সেই শিহরণ! নমিতা,—পঁচিশ বছরের অতিক্রান্ত-যৌবনা উদ্বাস্ত মেয়েটি!

ভূষণও একটু ইতস্তত ক'রে বলে, “আপনার খোঁজে আছে নাকি ঐ রকম কোনও মেয়ে?”

প্রশ্নটা সরল রেখায় সোজা পথে না এসে—একটু তির্যক্ গতিতে আসায় নিঃশ্বাস ফেলে নমিতা। একটু সহজ বোধ করে। হেসে বলে, “দেখি খোঁজ ক'রে। কিন্তু মিঠুকে আনার কথা ছিল যে আজ আপনার?”

“আচ্ছা নিয়ে আসব এর পরের দিন।”

নমিতা প্রশ্নটা বদলে নিতে চায়। জিজ্ঞাসা করে ঠাকুরদার কথা। গণকল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ অধুনাতিম সংবাদটি জ্ঞাপন করে। ভূষণ আর নিতাইপদ ওয়েলফেয়ার-অফিসারকে জানিয়েছিলেন গুঁদের সেদিনকার মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত। তিনি সে সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হন নি। তখন গুঁরা গিয়েছিলেন কলকাতার উপরওয়ালার কাছে। সেখানে গিয়ে শুনে এসেছেন কলোনীতে আসছেন একজন নূতন অফিসার—আডমিনিস্ট্রেটর উদয়নগর কলোনী। তিনি এসে নূতন ক'রে সব ব্যবস্থা করবেন। এ কলোনীতে নাকি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হবে। সেইজন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এখানেই এসে থাকবেন। এখন গুঁরা অপেক্ষা করছেন সে ভ্রমলোকেরই।

নমিতা অধীর আগ্রহে সব শোনে।

পরদিন সকালে আবার অনিমেঘের জরটা কমে আসে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলে সে। দুর্বল হ'য়ে পড়েছে বটে আরও।

বলে, “আজ বোধহয় জরটা ছাড়ল, নয়?”

কামিনীরও মনে হয় জরটা খুব কমে গেছে। শুকনো মুখে হাসি ফুটে ওঠে ওর।

অনিমেঘ বলে, “আচ্ছা এর মধ্যে কেউ আসে নি?”

কামিনী চুপ ক'রে থাকে!

অনিমেঘ বলে, “আমি স্বপ্নেও ভাবি নি এ রকমটা হ'তে পারে। আর সকলের কথা ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু বাবলু? সেও এল না একবার?”

কামিনী যোগ দেয়, “তা ছাড়া বাবলুকেও যে গুঁরা আটকে রাখলেন—এ সংসারটা তাহ'লে কি ক'রে চলবে সেটা গুঁরা ভেবে দেখলেন না?”

অনিমেঘ বলে, “আর বাবা যে ব'লে গেলেন নমিতা মাসে মাসে টাকা পাঠাবে—তাও তো পাঠাল না নমিতা।”

“ঠাকুরঝি টাকা পাঠিয়েছিল—পনের টাকা।”

“পাঠিয়েছিল? নিজে আসে নি? কে এনেছিল লতু না বাবলু?”

“না, মনিঅর্ডার পিয়ন!”

অনিমেঘ চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না। হঠাৎ অনিমেঘই আবার বলে, “উঃ! এরপরেও বেঁচে থাকতে হবে। ছোটবোনের এভাবে অবজ্ঞায় ছুঁড়ে ফেলা ভিক্ষা অয়ে জীবন ধারণ করতে হবে! কি করব? আমি অস্থূল, স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দেবার আমার ক্ষমতা নেই।”

কামিনী বলে, “সে টাকা আমি নিই নি গো। মনি অর্ডার ফেরত গেছে।”

অনিমেঘ চমকে ওঠে: “নাও নি? তবে সংসার চলছে কি ক'রে?”

কামিনী বলে, “কই আর চলছে বল? কিন্তু তবু টাকাটা নিতে পারি নি আমি। ছোট বোন, ছোট ভাই এদের কারও হাতে পাঠাতে পারত টাকাটা—নিজে না এসেও। মনিঅর্ডার করেছেন! কুপনে কিছু লেখা নেই! আমি নিতে পারি নি টাকাটা!”

অনিমেঘ অশ্রুমনস্ক হ'য়ে যায়। টাকাটা ফেরত দেওয়ার সে খুশী হয়েছে কি দুঃখিত হয়েছে তা বোঝা যায় না।

সে একমনে কি ভাবতে থাকে।

কামিনী বলে, “কি ভাবছ অমন করে?”

“গুঁরা কত দিন গেছেন বলতো?”

“আজ সত্তের দিন।”

“সতের দিন!”—আর কোনও কথা বলে না। চোখ বুজে শুয়ে থাকে। কামিনী উঠে যায়। ঘরের কাজকর্ম করতে থাকে। গোরাকে বলিয়ে দেয় বাপের মাথার কাছে। বলে মাথায় হাওয়া করতে। ছোট্ট গোরা একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করে অনিমেষকে।

অনিমেষের মস্তিষ্ক খুব ভালো কাজ করছে না। জ্বর ভোগ ক’রে দুর্বল লাগছে নিজেকে। তবু সে ভাবছিল ঐ একটা কথাই। সতের দিন চলে গেছেন গুঁরা? যতদূর মনে পড়ে গুঁরা চলে যাওয়ার সময় সংসারের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—আর্থিক অবস্থাটা। তারপর সতের দিন চলেছে সংসার? তিনটি প্রাণীর সংসার বিনা উপার্জনে চলতে পারে এতদিন? নমিতা টাকা পাঠিয়েছিল—আর তা প্রত্যাখ্যান করেছে কামিনী? কিসের জোরে সে প্রত্যাখ্যান করে এ অর্থ? অভিমান? যার স্বামী মৃত্যুশয্যায়—শিশুসন্তান অনাহারে শুকিয়ে আগছে তার আবার অভিমান! তবে কি—?

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করতে থাকে অনিমেষের। বাবা, মা, নমিতা, লতু, বাবলু—এতগুলি লোক একবার খোঁজও নিতে এল না? বিষবৎ পরিত্যাগ ক’রে যায় কেন সবাই? আর সবার কথা ছেড়ে দিলেও, বাবা? তিনি কিসের ভরসায় ছেড়ে গেলেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে, একমাত্র বংশধর নাতিকে? যাবার দিনে কেন বলে গেলেন ‘...উপার্জনের অনেক পন্থা আছে অম্মু?’

গোরার হাতখানা টেনে নেয় অনিমেষ, বলে, “আর হাওয়া করতে হবে না।”—পাখাখানা রেখে দেয় গোরা।

“হাঁরে গোরা। আমি যখন ঘুমাই তখন কেউ এ বাড়িতে আসে?”

“না তো বাবা।”

“কেউ আসে নি? এ ক’দিনের মধ্যে কেউ আসে নি?”

“বিষ্টু দোকানি এসেছিল একদিন।”

বিষ্টু পদ! সেই চরিত্রহীন বদমায়েসটা!

“মাকে মারছিল বাবা! আমি কেঁদে গুঁঠায় ছেড়ে দিল।”

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হ’তে থাকে অনিমেষের। এটুকুই বোধহয় বাকি ছিল! এর চেয়ে ছোট বোনের শিক্ষা-অন্নে জীবনধারণ করা কি ভালো ছিল না!

দুপুরে আবার প্রবল জ্বর এল অনিমেষের।

কামিনী দিশেহারা হ’য়ে পড়ে।

ক’দিন পরে ভুষণ আবার এল। এবার মিঠুকে নিয়েই। নমিতা দেখলে অবাক হয়ে

বাপের সঙ্গে চেহারার মিল নেই। ভূষণ কালো, মেয়েটি ফুটফুটে। বোধহয় মায়ের রূপ পেয়েছে। অল্লেই নমিতার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। নতুন জামা পেয়ে মিঠু খুব খুশী। লতু আজও পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। হরিপদ পণ্ডিত জানতে চাইলেন গণকল্যাণ-সমিতির কথা। ভূষণ বলতে থাকে সব কথা বুঝিয়ে। নতুন অ্যাড-মিনিস্ট্রেটর কার্ভভার বুঝে নিয়েছেন। কলোনীতে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি। নিতাই ঠাকুরদা আর ভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বলতে গিয়েছিলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দৈর্ঘ্য ধরে তাঁদের বক্তব্য বিষয় শুনেছেন বটে তবে আশা প্রদ কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নি। ঠাকুরদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বর্তমান পঞ্চায়েতের উপর কলোনিবাসীর কোনও আস্থা নেই। ওরা সাধারণ লোকের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখছে। তাই নয়া পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে। নির্বাচনে স্থির করতে হবে নতুন পঞ্চায়েতের সভ্য।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব বলেছেন, “আপনি যা বলছেন তাই যে কলোনিবাসীর সবাই চায় তার প্রমাণ কি?”

নিতাই ঠাকুরদা মিটিঙের কথাটা উল্লেখ করেন। মিটিঙে যে সব প্রস্তাব পাস করানো হয়েছিল সেগুলো পেশ করেন।

বাগচিসাহেব বলেন, “কলোনীতে দশবারো হাজার লোক। মাত্র সাত-আট শো লোক একটা সভা ক'রে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসেন সেটাকে সমস্ত কলোনীবাসীর ইচ্ছা বলে ধরে নেওয়া যায় না।”

“কিন্তু মিটিঙে যদি এর চেয়ে বেশী লোক না আসে তাহ'লে আমরা কি করতে পারি?”

“আপনারা কিছু করতে পারেন না; কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় আপনাদের আহ্বানে মাত্র সাত-আটশো লোকই সাড়া দিচ্ছে। ওতে প্রমাণ হয় আপনাদের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া এ মিটিঙে আপনাদের বর্তমান পঞ্চায়েতের কেউ উপস্থিত ছিল না। তাঁদের বক্তব্যও শোনেন নি আপনারা।”

ভূষণ বলেছিল, “আমরা তাদের ডেকেছিলাম। তাঁরা কেউ আসেন নি। সে দোষও আমাদের নয় নিশ্চয়ই।”

নিতাই ঠাকুরদা বলেছিলেন, “আপনি যা বলছেন তাতে আপাত যুক্তি থাকলেও সে যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। মিটিং ডেকে বড় বড় রেসলুশন এতবার নেওয়া হয়েছে—যে মিটিঙের ডাকে এরা আর সাড়া দেয় না। স্তোকবাক্য আর আশ্বাস ওরা আর শুনতে চায় না। সুতরাং মিটিং ডেকে আমরা কলোনীর পাঁচ ছয় হাজার লোককে যোগাড় করতে পারব না—এটা সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।”

বাগচি বলেন, “তা হ’লে আপনি মেনে নিচ্ছেন অধিকাংশ লোক আপনার সঙ্গে একমত নয়?”

“মোটাই তা নয়। আমি বলছি অধিকাংশই আমার পক্ষে। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে আপনি বর্তমান পঞ্চায়েতকে বলুন কলোনীর সামগ্রিক ভালোমন্দ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটা মিটিং ডাকতে। সেখানে আমরাও আসব। আমাদের অভাব অভিযোগ পেশ করব। নথি-পত্র-সাক্ষী প্রমাণ সব নিয়ে আসব আমরা। ঠরা জবাবদিহি ক’রে যদি আমাদের তুষ্ট করতে পারেন তাহ’লে ভালোই।”

‘আর. ও.’ যতীশবাবু বলেন, “না না সেসব হবে না! তাহ’লে সে সভাতেই একটা গণ্ডগোল হবে—মারামারি বেধে যাবে।”

বাগচি বলেন, “তা কেন হবে? আমরা দরকার হ’লে আগে থেকে পুলিশ এনে রাখব।”

‘আর. ও.’ বলেন, “প্রথমেই এটা করবেন না স্ত্রার।”

“কেন বলুন তো?”

নিতাই ঠাকুরদা বলেন, “কেন তা উনি আমাদের সামনে বলতে পারবেন না। হয়তো আমরা চলে গেলেও পারবেন না। তবে কারণটা যে কি তা উনিও জানেন। আমরাও জানি। আপনি সম্ভবত জানবেন দুদিন পরে—যদি জানবার চেষ্টা করেন।” অকুণ্ঠিত হয় বাগচি সাহেবের।

ঠাকুরদা একভাবেই বলেন, “আপনি রাগ করবেন না স্ত্রার। কথাটা সত্যি। আপনিই বরং একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে হাজির করুন আপনার পঞ্চায়েতের মেম্বারদের। আমরাও হাজির করব আমাদের অভিযোগ। নথি-পত্র-সাক্ষী-প্রমাণ। আপনি নতুন লোক। সব হয়তো বুঝবেন না, তাই আমরা অনুরোধ করব যে সভায় আর. ও.-সাহেব যেন উপস্থিত থাকেন।”

আর. ও. বলে ওঠেন : “আমি তো আগেই বলেছি মিটিং হবে না।”

ঠাকুরদা বলেন, “আপনার আমলে হয় নি সে তো জানিই স্ত্রার। ঐর আমলে হবে কিনা তাই জানতে চেয়েছি।”

বাগচি বলেন, “আচ্ছা আমি দুদিন সময় নিয়ে জানাচ্ছি আপনাদের।”

ঠাকুরদা বলেন, “বেশ। তাই দেখুন।”

ঠরা আগ্রহ ভরে এই নবীন পরিবেশের কথা শোনেন ভূষণের কাছ থেকে। হরিপদ পণ্ডিত, বিন্দুবাগিনী আর নমিতা। গণকল্যাণ সমিতির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভূষণ বলে এরপর থেকে নমিতাকেও আসতে হবে। এভাবে পাগিয়ে বেড়ালে চলবে না। আলোচনা জমে ওঠে। হঠাৎ একসময় নমিতা লক্ষ্য করে কখন উঠে

গেছেন গুর বাবা আর মা । মিঠুও পাশের ঘরে একা একা বসে খেলা করছে ।
ভূষণ বলে, “সত্যিই আপনার সেলাইয়ের হাতটা ভারী সুন্দর । আপনার কাটগুলো
খুব পছন্দ করছে লোকে ।”

নমিতা বলে, “সে কৃত্তিছ আমার নয় । কাটগুলোর আবিষ্কার তো আমি করি
নি—কোনও একজন ঐ রকম প্রথম চালু করেছেন । আমি দেখে অহুঙ্করণ করেছি
মাত্র ।”

“ও ভাবে বললে তো সব কিছু সম্বন্ধেই যুক্তি দেখানো যায় । অমুক ভালো গান
গায় বললে আমরা ধরে নিই না যে সে নিজে গানটা লিখেছে বা স্বর দিয়েছে ।
কারও দেওয়া স্বর নকলই করতে হবে গান গাইতে গেলে ।”

“আপনি বুঝি গান রাজনা খুব ভালোবাসেন ।”

“বাসতাম এককালে ।”

“অর্থাৎ এখন আর বাসেন না ।”

“এখনও হয়তো বাসি ;—কিন্তু সময় আর সুযোগ নেই—তাই ভালোবাসাটা
গানবাজনা থেকে অস্ত্র-কিছুর উপর এসে পড়েছে ।”

নমিতা একটু চুপ ক’রে থাকে । তারপর বলে, “তা হ’লে বলব আপনি কোনও
দিনই গান বাজনা ভালোবাসতেন না ।”

“কেন ?”

“সত্যিকারের ভালোবাসলে কখনও সেটা ফুরিয়ে যেত না ।”

ভূষণও একটু চুপ ক’রে থাকে । তারপর বলে, “আপনি যে কথা বলছেন ওটা
মেয়েদের তরফের কথা । পুরুষমাহুষ ও-কথা কোনও দিন স্বীকার করে না ।”

নমিতা কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে যায় ।

ভূষণ বলে, “আমি জানি আপনি কি ভাবছেন । আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা
তো ?”

নমিতা চমকে উঠে । আশ্চর্য ! ঠিক ঐ কথাই সে ভাবছিল ।

ভূষণ হোহো ক’রে হেসে ওঠে ।

নমিতা অবাক হয়ে বলে, “হাসছেন কেন ?”

ভূষণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, তারপর শূন্যের দিকে চেয়ে বলতে থাকে, “আমার
প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন মারা যায় তখন ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি ফুরিয়ে গেল !
রোজ সন্ধ্যাবেলায় একটা ক’রে ধূপকাঠি জ্বলে দিতাম ওর ফটোর পাশে । কবে
যে সেটা অত্যন্ত পরিণত হ’য়ে গেছে জানি না । এখনও যন্ত্রচালিতের মতো একটা
ক’রে ধূপকাঠি জ্বলে যাই—কিন্তু দিনান্তে একবারও তার কথা মনে পড়ে না ।

আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কত নীচ, কিন্তু এটাই বোধহয় জীবনের ধর্ম!”

নমিতা বলে, “না, এর জন্তে আপনাকে দোষ দেব কেন? আমি তো সেদিন নিজেই বললাম আবার বিয়ে করা উচিত।”

ভূষণ যোগ করে : “হ্যাঁ আর সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে আমার জন্তে পাত্রীর খোঁজ করবেন।”

নমিতা হেসে বলে, “করছিই তো।”

“এখনও খুঁজে পান নি কাউকে।”

“কই আর পাচ্ছি বলুন।”

“তবে আর খুঁজে কাজ নেই।”

“কেন?”

ভূষণ বলে, “কেন তাও কি বলে দিতে হবে? আচ্ছা বলছি। খোঁজের দরকার নেই কারণ সে রকম একটি মেয়ের খোঁজ আমি নিজেই পেয়েছি।”

নমিতা মুখ তোলে। চোখোচোখি হয় ভূষণের সঙ্গে। ভূষণের ওষ্ঠে হাসির রেখা। মুখ নীচু করে নমিতা।

“শুধু আমার মতো দোজবরে ছেলেকে তার পছন্দ হবে কিনা এটাই জানা হয় নি।”

নমিতা চুপ করে থাকে। হঠাৎ খুব নীচু স্বরে ভূষণ প্রশ্ন করে : “তুমি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবে?”

নমিতা ধরা গলায় বলে, “আমি? বারে, কি করে জানব কার কথা বলছেন আপনি?”

“আচ্ছা তবে থাক। আমি নিজেই না হয় জিজ্ঞাসা করব। করব?”

নমিতার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বহে যায়। জবাব দিতে পারে না। ও ঘর থেকে মিঠু চিংকার করে ওঠে : “মাছি আমার ভয় করে।”

নমিতা স্বেযোগের সন্ধ্যাবহার করে। তাতাতাড়ি উঠে যায় ওঘরে। তেল-পোকাটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মিঠুকে কোলে তুলে নেয়। দু’হাতের আলিঙ্গনে বুকের মাঝে পিষতে থাকে মিঠুকে।

মিঠু হাঁপিয়ে ওঠে, বলে, “ছেলে দাও!”

“না দেব না। আগে আমাকে ‘মা’ বল।”

“বলব না। তুমি তো মাছি!”

“না, মা! বল শিগগির, নইলে—”

চুমায় চুমায় অস্থির করে তোলে মিঠুকে।

ওঘর থেকে ভূষণ ডাকে—আর মিঠু বাড়ি যাই।

মিঠু এঘর থেকে বলে, “ছালে না যে।”

বিন্দুবাসিনী একবাটি চা দিয়ে আসেন ভূষণকে। নমিতা নামিয়ে দেয় মিঠুকে। সে ওঘরে ছুটে যায়। নমিতা আর কিছুতেই ওর সামনে যেতে পারে না। রাজ্যের লজ্জা এসে ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে।

কিছুক্ষণ পর ভূষণ চলে যায় মিঠুকে নিয়ে।

আজ লতু সমস্তক্ষণই অল্পপস্থিত।

লালু ডাক্তারের ডিম্পেন্সারীটা পোস্ট অফিসের উষ্টো দিকেই। সবাই চেনে সেটা। সকাল থেকেই লালুবাবুর ডিম্পেন্সারীতে রোগীর ভিড়। আর যে কোনও জিনিস দুখাপা হোক রোগ আর রোগীর অভাব নেই কলোনীতে। লালু ডাক্তারের দুখ এইটুকুই—রোগীদের যদি সেই অল্পপাতে ‘কি’ দেবার ক্ষমতা থাকতো! দুবেলায় মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশটা রোগী দেখেন তিনি। সবাই আসে ঠর ডিম্পেন্সারীতেই। বড়ো মাহুষ, বয়স হয়েছে। বাড়ি গিয়ে রোগী দেখা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। রোজগার হয় সত্যিকারের ওষুধ বিক্রি থেকেই। ভিজিট দেবার ক্ষমতা আর কটা লোকের আছে? উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন বটে কিন্তু রোজগার কই? কোনও ছোট শহরে যদি গিয়ে বসতেন আর এর চার ভাগের একভাগ পসার হ’ত তাহ’লেও সম্বলভাবে সংসার চলে যেত তাঁর। এক একবার মনে হয়—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবেন; কিন্তু হয়ে ওঠে না।

ধর্মভীরু লোক লালু ডাক্তার। কালীসাধক তিনি। অ্যালোপাথ। সাত সকালে ঐতিহাসিক সেরেগরদখানা প’রেই এসে বসেন ডাক্তারখানায়। সাত জাতকে ছুঁতে হয়। গরদ প’রে থাকলে সুবিধা আছে। তেষ্ঠা পেলে গঙ্গাজলটুকু অন্তত খাওয়া চলে। ডাক্তারখানায় একটা ডিস্টিল্ড ওয়াটারের বোতলে গঙ্গাজল রাখা আছে আলাদা ক’রে।

ভোরবেলা থেকেই রোগী আসতে শুরু করে। কুগী, কুগী আর কুগী। অবশ্য অপেক্ষা করতে হয় তাদের। লালুবাবু গলায় চাদর দিয়ে যুক্তকরে দেওয়ালে প্রলম্বিত পটের ছবিগুলির তলায় মাথা ঠোকেন আর বিড়বিড় ক’রে মন্তোচ্চারণ করেন। বাইরে রোগীরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু উপায় কি? ঘরের ভিতরে দেওয়ালের দেবতারাপ্রাণ যে কিউ দিয়ে আছেন। কোন দেবতাকেই চটাবার সাহস নেই ধর্মভীরু লালু ডাক্তারের।

কথাবার্তা হচ্ছিল বাইরের অপেক্ষমাণ জনতার মধ্যে। নিতাই বৈরাগী জন্মার্দন

হুগীকে জিজ্ঞাসা করে : “আজকাল করতাহোড়া কি ?”

“করবাম ফিরাবার কি ? বইয়াই আছি !”

“ব্যাপারীর ব্যবসাটা ?”

মাথা নাড়ে জনার্দন। তার মানে হতে পারে ভালো চলছে না। অথবা ছেড়ে দিয়েছে। সকলেরই এই অবস্থা। কর্মসংস্থানের যে কটা পথ ওরা দেখতে পেয়েছিল কলোনীতে এসে তার মধ্যে ব্যাপারীর ব্যবসাটাতেই লোক ঝুঁকেছিল বেশী। কালনা-ঘাট অথবা নবদ্বীপ থেকে চালের বস্তা কিনে সাইকেলের পিছনে বেঁধে নিয়ে এসে এ পারে বিক্রি করা। দু’ মণি বস্তা অনায়াসে ভারসাম্য রক্ষা ক’রে নিয়ে আসতো ওরা কেরিয়ারে বেঁধে। জ্যোৎস্না রাত্রে সার দিয়ে চলতো সাইকেলের কারাভান—একদলে ত্রিশ-চল্লিশটা সাইকেল। জেলার সীমান্ত-রেখার এপার ওপার। মাইল সাত-আট পথ। পিচঢালা পরিষ্কার পথ। মণকরা চার আনা তো বটেই—ক্ষেত্র বিশেষে আট-দশ আনাও লাভ থাকে। দিনে চার-পাঁচ খেপ মারতে পারলেই হ’ল। অবশ্য সীমান্তের দু’ পারেই খরচ আছে। তা থাক—খরচখরচা বাদেও ওতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটাও হ’য়ে যেত। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে কণ্ট্রোলার ব্যবস্থাটা গেল উঠে ! ব্যবসাটাও উঠে গেল ফলে।

এ ছাড়া আর একদল করতো তরকারীর ব্যবসা। গ্রাম থেকে সস্তা দামে সজ্জা কিনে কলোনীর বাজারে বেচা। কিন্তু ছুটি কারণে এ ব্যবসাটাও উঠে যেতে বসেছে। প্রথমত কলোনীতে ক্রেতার অভাব আর দ্বিতীয়ত বহু লোক ঢুকে পড়লো এ কাজে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় বেশী এ ব্যবসায়ে। নামমাত্র একটা বাজার টিমটিম করছে কলোনীতে। কিছু লোক জনমজুর খাটতে যায় সদর শহরে অথবা জংসনে। ওরা যায় সকাল সাতটার লোকালে। ফেরার ঠিক নেই। যে কোন ট্রেনে ফিরলেই হ’ল। সব ট্রেনই উদয়নগরে থামতে বাধ্য। টাইম-টেবিলে যাই লেখা থাক না কেন—সবাই জানে সব গাড়িকেই দাঁড়াতে হবে উদয়নগরে। সে মেলই হোক আর আর এক্সপ্রেসই হোক। কামরায় কামরায় শেকল আছে না ? সুপরাপ ক’রে নেমে পড়ে ওরা। প্রথম প্রথম মেলট্রেনের ড্রাইভার অথবা গার্ড অপরাধীকে ধরার চেষ্টা করত—ক্রমশ তারাও এটা মেনে নিয়েছে স্বতঃসিদ্ধভাবে। একদল আছে হকার। হাজারো রকম সওদা নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ফিরি ক’রে ফেরে। ভিক্ষাজীবীও যথেষ্ট।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে শিক্ষিত লোকদের। উদয়নগর মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর কলোনী। শ্রমজীবী সংখ্যালঘিষ্ঠ। শিক্ষিত বেকার যুবকদেরই হয়েছে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। না পারে তারা গায়ে খাটতে, না পার চাকরি, না পারে হাত পাতে। চেষ্টার

ক্রটি নেই ওদের। নৈতিক বালাই যাদের অল্প তাদের মধ্যে কিছু লোক একটা ভালো ব্যবসা ফাঁদলো। রাজনীতির ব্যবসা! মিটিং ক'রে, বক্তৃতা ক'রে, বাগা ঘাড়ে নিয়ে প্রশংসা করলো তারা। গড়ে উঠলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। এসব দলের দলপতিদের যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লোন পাইয়ে দেবে বলে এরা সাধারণ মানুষের মুকুর্ষি সাজে। ট্রেডলোনই বল, ল্যাট্রিন লোনই বল আর ম্যারেজগ্রান্টই বল—কোনরকম সরকারী সাহায্য পেতে হ'লে নাকি খরচ করতে হয়। এ কথাটা সাধারণ কলোনীবাসী লোকমুখে শুনে শুনে ক্রম সত্য বলে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু খরচটা কিভাবে করতে হয় অনেকে জানে না। আন্ডাজ করে হয়তো, তবে সাহস পায় না অনেক ক্ষেত্রে। তারা তখন মুকুর্ষি খোঁজে। এরা সাহায্য চায় এমন লোকের যে গট্‌গট্‌ ক'রে তুকে যেতে পারে আর. ও. সাহেবের অফিস ঘরে স্লিপ না দিয়েই! সরকারী অফিসার হঠাৎ জীপ থামিয়ে যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলেন, “অমলবাবু—আপনাদের ব্লকের সেই টি. বি. ক্লগীটির একটা বেড পাওয়া গেছে। আপনি একবার দেখা করবেন আমার সঙ্গে অফিসে।”

এই জাতীয় অমলবাবু, শিশিরবাবু প্রভৃতি জননেতার শরণাপন্ন হয় কলোনীবাসী। যারা এ জাতীয় জননেতা হয়ে উঠতে পারে নি তাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত যুবক রোজগার করত শুধু দরখাস্ত লিখে দিয়ে। ফুলস্কাপ কাগজে লিখে দিত তারা আবেদন-পত্র। পত্র পিছু মজুরী হুঁ-আনা!

ঘরের ভিতরে লালুবারুর সামনে বসে ছিলেন জঙ্গনের ডাক্তার সেন। সেন শহরের ডাক্তার। নামডাক আছে। ক্লিনিক খুলেছেন একটা। ডাক্তার সেন বলছিলেন, “আপনি কিন্তু আমার দিকটা একেবারেই দেখছেন না ডাঃ দত্ত। এ মাসেই অন্তত দু'বার কন্সালটেশনে ডেকেছি আপনাকে আমি।”

ডাক্তার দত্ত এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট ড্রয়ার থেকে বার ক'রে এগিয়ে দেন সেনের দিকে। বলেন, “ধরান। আমিই কি তা অস্বীকার করছি মশাই! কিন্তু কী করব বলুন। সে রকম কেস আমি পাই কই?”

“এটা কি বিশ্বাস করতে বলেন? কলোনীতে এত ক্লগী—আপনার চেম্বারে এত ভিড়—আর ক্লিনিক্যাল কেস পান আপনি? কলোনীতে টি. বি. কেসও হয় না?”

“আরে হবে না? প্রতি তিনখানা বাড়ি অন্তর একটা লোক ধুকছে। ক্লিনিক্যাল কেস অন্তত দু'শ' পাঠাতে পারি আমি আজই। সকলেরই পরীক্ষা করানো দরকার। কিন্তু কেটে ফেললেও এক বেটার কাছ থেকে সিকিটা আদায় করতে

পারবেন না। নামেই রাজরোগ, হয় যত বেটা হাড়হাভাতের! লোন পাবার জন্য টাকা খরচ করছিল—কার্ডের লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্যে খরচ করছিল—আর শুধু ডাক্তারকে ফি দেবার সময়ই ‘বড় গরীব স্ত্রার, মাপ করন লাগবো’?”

ডাক্তার সেন চুপ ক’রে থাকেন। কি বলবেন তিনি?

শেষে বলেন, “আচ্ছা, আজ আসি।”

লালুবাবু বলেন, “আরে বন্ধন, বন্ধন চা আনতে দিয়েছি।”

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরান। লালুবাবুর দেওয়া কাঁচিট্টিনয়—রেড অ্যাণ্ড হোয়াইট। নিজের পকেট থেকেই বার ক’রে ধরান। একরাশ ঘোঁরা ছাড়েন মুখ দিয়ে।

বাইরে থেকে নকুল নিবেদন করে: “ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না স্ত্রার।”

“আচ্ছা একে একে পাঠাও স্লিপ দিয়ে।”

ডাক্তার সেন হাসেন: “বেশ আছেন মশাই আপনি। কিউ দিয়ে রুগী দাঁড়িয়েছে।”

আধুলি ক’রে দিলেও তো টাকা দশেক হ’য়ে যাবে এ বেলাতেই।”

ডাক্তার দত্ত বলেন, “দুঃখ তো তাই। ডবল পরস্যা হিসাবেও দেবে না বেটোরা।

আধুলি তো দূরের কথা। উটে ওষুধ চেয়ে বসে ধারে। আর এখানে আমার প্রেস্ক্রিপশান শুধু ধারাই কাটে—মানে আমার গলা পর্যন্ত!”

একে একে রুগী প্রবেশ করে। নকুল, ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার তথা সহকারী।

রোগীর নাম ধাম রেজিস্ট্রিতে তুলে স্লিপ দিয়ে ভিতরে যাবার ছাড়পত্র দেয়।

পরীক্ষা চলে। ওষুধ লেখা হয়। ওদিকের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায় ওরা।

বাইরে একটা গুণ্ডগোল ওঠে।

লালুবাবু বিরক্ত হ’য়ে বলেন, “কি হচ্ছে কি ওখানে, নকুল? এত গুণ্ডগোল কিসের?”

“এই দেখুন না স্ত্রার। স্লিপ না নিয়েই জোর ক’রে চুকতে চায়। সত্যিই জোর ক’রে চুকে পড়ে কামিনী ডাক্তারের ঘরে। লালুবাবু একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে গিয়ে থেমে যান। রক্ষকেশা, স্থলিতবাসা, ঢাকাই বেনারসী পরা মেয়েটিকে দেখে সামলে নেন নিজেকে। নকুলকে বলেন, “তুমি বাইরে যাও।”

“ও স্ত্রার স্লিপ নেয় নি।”

“সে তো শুনলাম। এখন তুমি বাইরে যাও।”

হতাশ নকুল হাত ছুঁতে উণ্টে দেয়। অর্থাৎ কর্তার মর্জি বোঝা ভার। বাইরে যেতে হয় তাকে। লালুবাবু চায়ের পাথর বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে মেয়েটিকে অপাঙ্গে একবার দেখে নেন আপাদমস্তক।

“এখানে জোর ক’রে ঢুকলে কেন তুমি?”

কামিনী একেবারে মরিয়া হ’য়েই এসেছিল। আব্দেন, অমুনয়, ভিক্ষা তো অনেক হ’ল। এবার সে দাবি জানাতে এসেছে। পথের মধ্যে একটা মানুষ আছাড় খেয়ে পড়লে আর পাঁচজনে তাকে ধরে তোলে। পথচলতি মানুষের এ একটা অলিখিত ধর্ম! জীবনের পথেই বা এ আইনটা প্রযোজ্য নয় কেন? মানবশ্রমের প্রতিবেশীর কাছে এটুকু দাবি করতে পারে। সভ্যজগৎ এ দাবি মেনে নিতে বাধ্য। বলে, “আমার স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ। বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।”

ডাক্তারবাবুর উত্তর দিতে একটু দেরি হয়। তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন ওকে। মেয়েটির মস্তিষ্কবিকৃতি নেই তো? চোখদুটো টকটকে লাল, মাথার চুলগুলো রক্ত—হয় বহুদিন তেল মেখে স্নান করে না অথবা সাবান দিয়ে মাথা ঘষেছে। পরিধানে একখানা ঢাকাই বেনারসী। মাঝে মাঝে ফেসে গেছে। ড্রেসিং-রে পরে নি কিন্তু। সাধারণ ভাবেই পরেছে।

লালুবাবু বলেন, “এটা দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। ডাক্তারবাবু প্রাপ্য না দিয়ে তুমি জোর ক’রে ঢুকলে কেন তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।”

“আপনার প্রাপ্য দেবার ক্ষমতা আমার নেই।”

“কিন্তু আমি তো দানছত্র খুলি নি। এটাই আমার জীবিকা। তোমরা যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দাও—”

“দেব না কে বললো? দেব। তবে এখন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।” ডাক্তারবাবু একটু অবাক হন। মেয়েটির কণ্ঠস্বরে করুণা ভিক্ষার কোনও আভাস নেই। যেন বিনা পারিশ্রমিকে রুগী দেখাই লালু ডাক্তারের কর্তব্য—সে কথাটাই সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

“ধরে কারবার করি না আমি। তুমি যেতে পার।”

হঠাৎ কামিনীর সব উৎসাহ ফুরিয়ে যায়। মুখরার মতো এতক্ষণ এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলতে পেরেছে এটাই আশ্চর্য ওর মতো ঘরের বধূর পক্ষে। ঐ একটি মাত্র কথায় বেচারী একেবারে নিভে যায়। বেদনার্ত হ’য়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। অশ্রুভারাক্রান্ত হ’য়ে ওঠে : “ডাক্তারবাবু, আমরা বড় গরীব।”

এটা চেনা স্বর লালু ডাক্তারের কাছে। এতক্ষণে বাধা গতে ফিরে এলেছে কথো-পকথন—ভাবেন লালু ডাক্তার।

“আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব। আপনি আমার স্বামীকে ভালো ক’রে দিন। আমি আপনার বাড়িতে যিয়ের কাজ ক’রে শোধ দেব।”

লালুবাবু বলেন, “রোজ বিশপচিশটা মুমুর্ রোগী দেখি আমি। তারা সবাই গরীব। তারা সকলেই বলে ঝিয়ের কাজ ক’রে শোধ দেব আপনার ঋণ! ত্রিশটা ঝি তো লাগবে না আমার বাড়িতে।”

কামিনী বসে পড়ে গুঁর পায়ের কাছে। লজ্জাশরম ত্যাগ ক’রে হাত বাড়ায় গুঁর ফিতে বাঁধা জুতোর দিকে।”

“আহ্! এ মেয়েটা তো জ্বালালে দেখছি!” লাফ দিয়ে সরে যান ডাক্তারবাবু।

হঠাৎ আত্মসম্মান ফিরে আসে কামিনীর। তড়িৎপৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়ায় সে!

ডাক্তার সেন হেসে বলেন, “অবনত্বাস! হাউ ডেয়ার শী এক্সিবিট হারসেলফ্‌ ইন সচ্‌ এ ট্রান্সপারেণ্ট ট্রেসিং ক্লথ? সায়াও নেই হায়াও নেই!”

কামিনী বুঝতে পারে না গুঁর ইংরাজি রসিকতা; কিন্তু শেষ কথাটির আন্দাজ করতে পারে অল্লীল ইঙ্গিতটা। জলে ওঠে গুঁর চোখ। বলে, “কী! কী বললেন?”

জবাব দেন লালুবাবুই: “কি করবে বল? কোরব সমায় দ্রোপদী নারায়ণকেই স্মরণ করেছিলেন। ডাকো, ভগবানকে ডাকো। পারলে তিনিই ভালো ক’রে দেবেন তোমার স্বামীকে। না হয় নিয়ে এসো তাকে একটা ওষুধ দেব’খন দেখে শুনে। এবার যাও দেখি!”

“যাচ্ছি, যাচ্ছি, নারায়ণকেই ডাকব আমি! মনে ভাববেন না আমার সে ডাক ব্যর্থ হবে। ভগবান না করুন বিনা চিকিৎসায় যদি আমার স্বামীর কিছু হয় তখন দেখবেন এ দ্রোপদীর অভিশাপও ফলবে। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন আপনারা! ভুলে যাবেন না কোরবকুল নির্বংশ হয়েছিল ঐ দ্রোপদীর অপমানেই!”

এক ফোঁটা জল নেই আর কামিনীর চোখে। কাঁপতে কাঁপতে সে বেরিয়ে আসে। লাল বেনারসী শাড়ি পরা নববধূর সজ্জায় সেজেছে সে। মনে হচ্ছে গুঁর সারা দেহে যেন আগুন ধরে গেছে। সে আগুনের শিখায় জলে উঠেছে গুঁর দেহ-মন-অন্তরাঙ্গা!

বাড়িতে ফিরে এসে দেখে অনিমেষ তখনও আচ্ছন্নের মতো পড়ে। গোরা বসে আছে গুঁর বাপের মাথার কাছে! বেলা বেশ বেড়ে উঠেছে। রোজ কড়া হয়েছে। কামিনী ঘরে ঢুকে গোরাকে প্রশ্ন করে: “হাঁরে, তোর বাবা উঠেছিল এর মধ্যে?” “হাঁ মা, একবার আমাকে বললে, ‘কোথা থেকে টাকা পাচ্ছিস?’ আমি তো মা টাকার কথা জানি না কিছু।”

“ও কিছু নয় বাবা!”

“বড় খিদে পেয়েছে মা—পেঁপে আর আছে?”

কামিনী ইতস্তত করে। ঘরে গিয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে। বিক্রয় করার

মতো, বাধা দেওয়ার মতো কিছুই নজরে পড়ে না। তাছাড়া সে ব্যবস্থাই বা করবে কে? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে বেনারসী শাড়ির জরিণ্ড বিক্রয় হয়। হোক পুরানো শাড়ি—তবু ওর জরিণ্ডলোর কিছু একটা দাম হবেই। কাপড়টা ছেড়ে—শাড়িখানা হাতে নিয়ে ইতস্তত করে। পুরানো কাপড়খানাই আবার পরেছে। এটা পরে, আর যাই হোক পথে বার হওয়া যায় না।

“হাঁরে গোরা, তুই মেয়েস্কুলের হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি চিনিস?”

গোরা জানায় সে চেনে।

কামিনী হাঁক ছেড়ে বাঁচে : “একবার যা তো তাঁর কাছে।”

শাড়িখানা একটা কাগজে জড়িয়ে দেয়। গোরার হাতে দিয়ে বলে—এখানা নিয়ে যা। একখানা চিঠি লিখে দেয় সে হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীকে। লেখে তার স্বামীর অবস্থার কথা, অর্থহীনতার কথা। পরিণেবে লেখে ‘এখানা আমার বিয়ের বেনারসী। পুরানো হ’লে এসেছে যদিও, তবু জরিণ্ড দাম একটা কিছু হবেই। একটা রেখে আপনি যদি গোটা পাঁচেক টাকা ছেলেটির হাতে পাঠান তাহ’লে ওকে কিছু কিনে খেতে দিতে পারি।’

গোরা বলে, “কিছু নেই? একটা কিছু খেয়ে গেলে হ’ত?”

কামিনী ওর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বলে, “এই চিঠিখানা নিয়ে হেড-মিস্ট্রেসের কাছে গেলে উনি পাঁচটা টাকা দেবেন। তখন ফেরার পথে বরং চার আনার সন্দেশ কিনে খাস। দেখিস, হারাস না যেন টাকাটা।”

ছোট্ট গোরা ঘাড় নাড়ে। হারাবে কেন? ঐ তো হেডমিস্ট্রেসের বাড়ি—ফুটবল খেলার মাঠের পাশে। আর খাবারের দোকান তো গলির মুখেই। ঠিক পারবে সে।

গোরা চলে গেলে কামিনী স্বামীর মাথার কাছে গিয়ে বসে।

“কোথায় গিয়েছিলে সাত সকালে?”

কামিনী চমকে ওঠে। অনিমেষ যে জেগে আছে বুঝতে পারে নি সে। বলে, “ডাক্তারবার কাছে?”

“সত্যি বলছ?”

“মিথ্যে বলব কেন?”—অবাক হয় কামিনী।

গম্ভীর হ’লে যায় অনিমেষ। চোখ দুটি বুজে আসে।

দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে।

কামিনী এসে খুলে দেয়।

লালু ডাক্তার!

“তোমার স্বামীকে একবার দেখতে এলাম। কোথায় সে?”

কামিনী বিস্মিত হওয়াও ভুলে গেছে। যজ্ঞচালিতের মতো অনিমেষকে দেখিয়ে দেয়। লালুবারু এসে অনিমেষের নাড়ি দেখেন। চোখ বুজে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে সে। ঠেঁখে দিয়ে বুক দেখেন। পরীক্ষা শেষ ক’রে জানতে চান কতদিনের অস্থ—অজ্ঞাত বিবরণ। মোহগ্রস্তের মতো জবাব দিয়ে যায় কামিনী। ডাক্তারবারু জানতে চান—বাড়িতে আর কে আছে। কামিনী জানায় সে একাকী।

“কি বুঝলেন আমার বলুন। অনেক সছ করেছি ডাক্তারবারু—সব খুলে বলুন—আমি সছ করতে পারব। লুকোবেন না কিছু।”

লালুবারু ধস্ধস ক’রে একটা প্রেস্‌কপসান লিখে দেন : “দিনে তিনবার খাবে এটা।”
“কি হয়েছে ঠর ?”

“হয়েছে অনেক কিছুই। রোগীর অবস্থা ভালো নয়। তবে যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে না বেঁচে ওঠার কোনও কারণ নেই।”

“ডাক্তারবারু আমি আপনার কেনা হ’য়ে থাকব—”

ডাক্তারবারু যজ্ঞপাতিগুলি গুছিয়ে তোলেন নীরবে।

“প্রেস্‌কপসান লিখে দিলেন—কিনব কি ক’রে আমি? আমার হাতে কি একটা পয়সা আছে?”

“তার আমি কি করতে পারি বল? আমি চিকিৎসক—পরামর্শই দিতে পারি শুধু।”

কামিনী চটে যায় : “ওষুধ কেনার ক্ষমতা যে আমার নেই একথা তো জানতেন আপনি। তা হ’লে এলেন কেন?”

লালুবারু বলেন, “এক শিশি ওষুধ খাওয়ালেই তো চিকিৎসা শেষ হবে না। তা যদি হ’ত না হয় নিজের পকেট থেকেই ওষুধের খরচটা দিতাম আমি। এ রোগীর সমস্ত চিকিৎসার ভার তো আমি নিতে পারব না।”

“তবে কি বিনা চিকিৎসায় লোকটা শেষ হ’য়ে যাবে?”—তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে কামিনী।

লালুবারু চুপ ক’রে থাকেন। কি বলতে পারেন তিনি। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকায় অনিমেষ। ঘোলাটে-লাল দুটো চোখ। কেউ খেয়াল করে না। কামিনী কি যে করবে ভেবে পায় না। তারপর যেন সমস্ত বিশ্ব-জগতের উপর তার নিরুদ্ধ আক্রোশ ভেঙে পড়ে লালুবারুর উপর।

“চিকিৎসা করলে লোকটা বাঁচতে পারে—তবু তাকে দেখবে না কেউ? বাপ-মা দেখবে না—ভাই-বোন দেখবে না! তারা সবাই টাকা চিনেছে! লোকটা বেকার! আপনিও ওকে বাঁচিয়ে তুলবেন না! ও যে বেকার আজ! বেশ মরুক তবে ও!

কিন্তু দেখবেন আপনি—এতে কখনও ভালো হবে না আপনাদের!”—কৈদে ফেলে সে।

লালুবাবু যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, “ভূমি অভিণাপ দিও না মা।”

“দেব না? কেন দেব না?”—উম্মাদিনীর মতো চীৎকার ক’রে ওঠে কামিনী।

- ধীর কণ্ঠে লালুবাবু বলেন, “বেশ দাঁও! আর আমার ভয় নেই। একটা কথা বলি মা—কিছু মনে ক’র না। আমি তোমার বাপের বয়সী! এখন যে শাড়িখানা পরে আছ তাতে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। আমার ডাক্তার-খানায় গিয়েছিলে দেখলাম পাতলা একখানা ঢাকাই বেনারসী পরে—চোঁকির নিচে ধুলোয় লোটাচ্ছে দেখছি একখানা পাট-না-ভাঙা আনুকারা নতুন তাঁতের শাড়ি! অথচ তোমার হাতে ওষুধ কেনার টাকা নেই বলছ; এ থেকে যদি কেউ... থাক্ মা! ঘরে অচৈতন্ত স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই—মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের বধু ছিলে একদিন। এভাবে কি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে তোমার স্বামীকে?” কামিনীর ছুঁচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এতকণ্ঠে সচেতন হয় সে নিজ দেহ-সজ্জার দিকে। সঙ্কোচে মরমে মরে যায়। বলে, “বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু—” লালুবাবু হাত ছুটি জোড় ক’রে বলেন, “থাক্ মা ও কথা। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নি আমি। মনে ভেবেছিলাম—হয়তো ঘরে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই—ভদ্রঘরের কোন সতী মেয়ের অভিণাপ লাগবে আমার। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি আমি। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। সারা গা ঢাকার মতো নতুন শাড়ি মেঝেতে লুটাচ্ছে তবু যে মেয়ে—যাক্ ও কথা! ডাক্তারের কর্তব্য আমি ক’রে গেলাম। আর আমাকে ডাকতে যেও না যেন।”

কোনদিকে না তাকিয়ে গটগট ক’রে বেরিয়ে যান ডাক্তার লালমোহন দত্ত। কামিনী মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। হু হু ক’রে কৈদে ওঠে। এত লোক এতবার তাকে অপমান করেছে—রুঢ় ভাষায় সে প্রতিবাদ ক’রে এসেছে এতদিন। এবার ধীর স্থির কণ্ঠে যে লজ্জাকর কথাগুলি বলে গেলেন ডাক্তারবাবু তার প্রতিবাদ করার ভাষা যোগালাে না ওর মুখে। কোনও জবাব দিতে পারলে না। মনে হ’ল সবই বুঝি ফুরিয়ে গেল। স্বামীকেও বাঁচাতে পারলো না—সতীত্বের অভিমানও হ’ল ভুলুষ্ঠিত। হঠাৎ খাটের নীচে থেকে নতুন তাঁতের শাড়িটা টেনে বার করল। এটাকে এখনই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শাড়িটা এ বাড়িতে এখনও রয়েছে বলেই অপদেবতার স্পর্শ লেগে রয়েছে এর রঞ্জে রঞ্জে। ঐ শাড়িটা দিয়েছিল একটা নারী-মাংসলোলুপ কামুক জানোয়ার। দাঁদন দিয়েছিল সে—একটা নারীদেহের প্রতি

অগ্রিম দাবি জানিয়ে। এটার সমাপ্তি করতে হবে এখনই।

হঠাৎ ওর হাত চেপে ধরে অনিমেঘ। উন্মাদের মতো চেহারা হয়েছে তার। কামিনী এতক্ষণ খেয়াল করে নি—অনিমেঘ কতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছে ওকে। কঠোর কণ্ঠে অনিমেঘ বলে, “এ শাড়ি কোথেকে এল?”

কামিনী ভয় পেয়ে যায়, বলে,—ছাড়ো।

“ছাড়বো? কক্ষণও ছাড়ব না। বল্ হারামজাদি—এ শাড়ি কোথায় পেলি তুই?”

কাঠের পুতুলের মতো কামিনী বলে থাকে। একটা কথাও বলতে পারে না। ঠাস করে একটা চড় মেরে বসে অনিমেঘ।

“লজ্জা করে না তোরা! এতদূর অধঃপতন হয়েছে! আমি মরতে বসেছি—আর তুই...? ওঃ!”

আবার শুয়ে পড়ে অনিমেঘ। চোখ দুটো বুজে যায়। আচ্ছন্ন হ’য়ে পড়ে সে। কামিনীর সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে গেছে। কোনও উৎসাহ নেই তার। আর সে বাঁচতে চায় না। বাঁচাতে চায় না অনিমেঘকে! ওর শেষ সশ্বলটুকুও যখন রইল না তখন কি হবে আর যুদ্ধ ক’রে। অনিমেঘের মুখে চোখে বোধহয় এখন ওর জলের ঝাঁপটা দেওয়া উচিত! দেখবে চেষ্টা ক’রে জ্ঞান ফেরানো যায় কিনা? কি লাভ? জ্ঞান ফিরে এলেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীর কথাটা মনে পড়ে যাবে। নিরুদ্ভ আক্রোশে আরও কষ্ট পাবে বেচারী। প্রাণেই যখন বাঁচবে না তখন যে কটা মুহূর্ত বেঁচে আছে থাকনা অজ্ঞান অচেতন হ’য়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে উঠে আসে কামিনী। জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণই যেন নেই আর। চুপ ক’রে বসে থাকে। দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছায় পথের উপর। বেলা অনেক হয়েছে। গুমোট গরম। একটা ধুলোর ঝড় উঠল! দমকা বাতাসে ধুলোর একটা ঘূর্ণি উঠে গেল আকাশের দিকে। আগুন-বরা আকাশে উচুতে—বহু উচুতে ভেসে চলেছে দুটো চিল। তীক্ষ্ণ চীংকার ক’রে উঠল একটা। কামিনী বসে বসে তাই দেখছিল। হাতে তার কোনও কাজ নেই। কাজ আছে অনেক, কিন্তু কাজ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। উৎসাহ নেই। সে বুঝি ফুরিয়ে গেছে। জলে ডোবা মাছুষ নাকি এক মুহূর্তে জীবনের আদি-অন্তটা একসঙ্গে দেখতে পায়। কামিনীর মনে হ’ল ফেলে আসা দীর্ঘজীবনের দৃশ্যগুলো মনের পটে তেমনি একসঙ্গেই ভেসে উঠল বুঝিবা। ছেলেবেলায় বাপের খুব আদরে মেয়ে ছিল। অল্পকিছু হ’লেই অভিমানে ঠোট দুটি তার ফুলে উঠত। মা বলতেন—মেয়েমাছুষের অত আদিখ্যেতা ভালো নয়। বাবা হাসতেন। আদরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন—পাগলী! আজকের এ ঘটনার সঙ্গে সে দৃশ্যের কোনও সামঞ্জস্য নেই। তবু ওর মনে পড়ে

গেল সেই ছেলেবেলার কথা। কৈশোরে ছোটোছুটি করেছে যেসব বান্ধবীদের সঙ্গে তাদের যেন স্পষ্ট দেখতে পেল কামিনী এই অকাজের দুপুরবেলায়। তারপর ওর বিয়ের সম্বন্ধ হ'ল। নিজের সংসার! বর! সেসব স্বপ্নের কথা আজ কেন মনে পড়ছে ওর? মাহুষ আত্মহত্যা করবার আগে কি এমনভাবে ফেলে আসা দিন-গুলোর পাতা উন্টে নেয়? কামিনী কি আত্মহত্যা করবে? এ বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ আর নেই তার—সে কথা সত্য। কিন্তু তাই বলে সরে দাঁড়াবে সে? লোকে বলবে—পাপের এই পরিণাম! সে পরাজয়—সে মানি কেন নিয়ে যাবে সে মাথার ক'রে। মৃত্যু নাকি মহান! কিন্তু এ মৃত্যুতে যে মহিমার কণামাত্রও নেই। তাছাড়া গোরা! সেই অনশনক্লিষ্ট এক ফোঁটা ছেলোটা? সে কি অপরাধ করল? তাকে কেন ছেড়ে রেখে যাবে এই ছুনিয়ার অরণ্যে একেবারে নিঃসহায় ক'রে?

“বাড়িতে কে আছেন?”

উঠে দাঁড়ায় কামিনী। অপরিচিত কণ্ঠস্বর। নিজ দেহের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় দ্বারের ওপাশে। আড়াল থেকে বলে, “ভিতরে আসুন।”

দ্বার খুলে ভিতরে আসেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। খালি গায়ে মলিন একখানা এণ্ডির চাদর। তলা দিয়ে উপবীতটা দেখা যায়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেকদিন কামানো হয় নি। খালি পা। ঘরের এদিক ওদিক দেখে বৃদ্ধ বসে পড়েন অনিমেষের মাথার কাছে। জরতাপ দেখেন। নাড়ি পরীক্ষা করেন। তারপর বলেন, “কামিনী কার নাম?”

আড়াল থেকে কামিনী বলে, “আমি! বলুন কি বলছেন।”

“আমি তোমার স্বামীকে দেখতে এসেছি। আমাকে লজ্জা ক'র না দিদি। বাইরে এস! অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এস এদিকে।”

তবু বা'র হ'তে পারে না কামিনী। লালু ডাক্তারের কথাগুলো মস্তিষ্কের রক্তে রক্তে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। বলে, “আপনি ওখান থেকেই বলুন। আমি শুনতে পাচ্ছি।”

“কিন্তু তা তো হবে না দিদি। আমি নিতাই ঠাকুর্দা। আমার সঙ্গে কলোনীর সব মেয়েরই ঠাকুর্দা নাতনী সুবাদ। কলোনীর সব মেয়েই আমার সামনে বের হয়। এস তুমি এ ঘরে।”

ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে আসেন। নিতাই কবিরাজ! ঠাকুর্দা! কোথা থেকে এলেন উনি? কামিনী জানতো উনি কলোনীতে নেই। গণ-কল্যাণ সমিতির কাজে দরবার করছেন অকল্যাণে। কবে ফিরে এলেছেন তিনি? তার স্বামীর সুবাদই

বা পেলেন কি ক'রে ? নিতাই কবিরাজ কি সত্যই অস্ত্রধারী ?

ঘরের কাছ পর্যন্ত এসে ভিতরে উকি দিয়েই উনি ফিরে যান : “ও ! তা বলতে হয় । ঠাকুরদার কাছে আবার লজ্জা কিরে পাগলী ? নে এটা গায়ে জড়িয়ে আয় এ ঘরে ।”

গায়ের এস্তির চাদরটা ছুঁড়ে দেন তিনি কামিনীর উদ্দেশ্যে । সেটা গায়ে জড়িয়ে কামিনী এবরে আসে । ভক্তিমত্তে প্রণাম করে নিতাই কবিরাজকে । তৈলবিহীন ক্লক চুলের গোছায় ঢেকে যায় ঠাকুরদার ধূলিমলিন চরণ যুগল ।

ঠাকুরদা বলেন, “তোমার চিঠি নিয়ে একটি ছোট ছেলে যখন হেডমিস্ট্রের বাড়ি গেল—আমি তখন সেখানে । সুরেখা বাড়ি ছিলেন । চিঠিখানা আমাকে তিনি দেখতে দিলেন । আমি তাই নিজেই চলে এলাম ।”

“গোরা কই ?”

“গোরা কে ?”

“ওই ছোট ছেলেটি ।”

“তোমার ছেলে বুঝি ? গোরা ! তাকে সুরেখা বসিয়ে খাওয়াচ্ছে ।”

কামিনীর বুকের পাষণভার নেমে যায় ।

ঠাকুরদা বলেন, “এর তো রীতিমতো চিকিৎসার দরকার । বাড়িতে আর কে আছে ?”

কামিনী জানায় আর কেউ নেই ।

“তবে তোমাকেই খুলে বলি । রোগ কঠিন । রীতিমতো যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করালে ভালো হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । তোমার এখানে থেকে তো তা হবে না । আমি এখন একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই । জংনের হাসপাতালে । তুমি যদি সঙ্গে যেতে চাও—তবে যা হোক দুটি ভাতে ভাত খেয়ে নাও ।”

“হাসপাতাল ! সেখানে শুনেছি—”

“ভুল শুনেছ । পাড়ারগেয়ে ভূত ! বাঁচলে ঐ হাসপাতালেই বাঁচবে—তোমার ঝাঁচলের তলায় নয় ।”

“না, আমি শুনেছিলাম সেখানে সীট পাওয়া যায় না । বিশেষত কলোনীর রোগী হ'লে—”

“ঠিকই শুনেছ তুমি—যেত না ! কিন্তু তার পরেরকার খবরটা তুমি শোন নি । এখন থেকে পাওয়া যাবে । অন্তত নিতাই কবিরাজ যে কেস নিয়ে যাবে তার একটা ব্যবস্থা হবেই । তুমি বোধহয় জানো না তোমাদের ঠাকুরদা একটা কেঁট বিটু হ'য়ে উঠেছেন সম্প্রতি এ অঞ্চলটার । তুমি তৈরী হ'য়ে নাও !”

“আমি তৈরীই।”

“খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?”

“আপনি রওনা দেবার ব্যবস্থা করুন।”

ঠাকুর্দা একবার ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে উঠে যান। রান্নাঘরের শিকল খুলে একবার ভিতরে ঊকি মারেন। ফিরে এসে হাতখানা রাখেন কামিনীর পিঠে : “কতদিন জালিস না উনান? হাঁরে?”

কামিনী জবাব দেয় না।

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন একটু পরেই। তাঁর হাতে এক ঠোঙা খাবার। ওর হাতে দিয়ে বলেন, “খা! খেয়ে জল খেয়ে নে। আমি একটা রিক্শা ডাকি। একটা চল্লিশের ট্রেনটা ধরতে পারব বোধহয়। গোরা ও বাড়িতেই থাক। যাবার সময় সুরেখাকে বলে যাব’খন।”

কামিনী বলে, “খেতে আমি পারব না ঠাকুর্দা। আপনি রিক্শা ডাকুন।”

ঠাকুর্দা রওনা দিয়েছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, “জ্যাং, একটা কথা তোকে বলে রাখি। আমার কথা বিনা প্রতিবাদে যে শোনে না তার সঙ্গে আমার কোন সুবাদ নেই। আজ একাদশী। এভাবে নিরসু উপোস করে মরণাপন্ন স্বামী নিয়ে হাসপাতাল যেতে আমি দেব না তোকে। রিক্শা ডেকে আনছি আমি। কিন্তু এসে যদি দেখি একটা টুকরোও পড়ে আছে পাতে তাহলে ঐ রিক্শা চেপেই একা ফিরে যাবো আমি। মনে থাকে যেন!”

ঠাকুর্দা বেরিয়ে যান। চোখ ছাপিয়ে জল আসে কামিনীর। এত স্নেহের কথা কেউ বলে না তাকে। বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তিনিও এমনি করে স্নেহের ধমক দিতেন। এ কী ঈশ্বরদত্ত আশীর্বাদ পেল সে? কামিনী এক শ্লাগ জল গড়িয়ে নিয়ে বসে পড়ে। খাবারের ঠোঙাটা টেনে নেয়।

হঠাৎ নজরে পড়ে খাটের নিচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একখানা বাঁধানো ছবি। আজ অনেকদিন হয়ে গেল—ওটা ওভাবেই রয়েছে। কামিনী হাতটা ধুয়ে ফটোখানা তুলে নেয়। আঁচল দিয়ে কাঁচের ধুলোটা মোছে। টাঙিয়ে দেয় সেটাকে স্বস্থানে। তারপর ছবির নীচে গলার আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলে!

ঠাকুর্দার বাড়ি থেকে ফিরছিল ভূষণ আর নমিতা। কথা ছিল গণ-কল্যাণ সমিতির কয়েকটা বিষয়ে জরুরী আলোচনা হবে ঠাকুর্দার ঘরে বিকালে। সমিতির এখনও তিনজনই মাত্র সভ্য। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেব ওদের জানিয়েছেন যে

সেদিনকার দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন। নূতন পঞ্চায়ত গঠন করা হবে। এতে পাঁচটা ব্লকের পাঁচজন সভ্য নির্বাচিত করতে হবে। রীতিমতো গণ-ভোট! অবশ্য ভোটের অধিকার থাকবে শুধু পরিবার পিছু একজনেরই। ষাঁর নামে প্লট। একদল আপত্তি করেছিল। তাদের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই ভোট থাকা উচিত। যোগেন, ভূষণ প্রভৃতি নব্যপন্থীরাও এই মতের সপক্ষে ছিল। ঠাকুর্দা কিন্তু এটা মেনে নেন নি। তিনি বলেন—জিনিসটা অতবেশী ব্যাপক করলে গণ্ডগোল বাড়বে। চোরাই ভোট দেবার চেষ্টা হবে। হিসাবও বড় হ'য়ে পড়বে। প্লট হোল্ডারের সংখ্যা জানা আছে—তাদের পাকা লিস্ট আছে। অন্তত এবারের মতো তাদের ভোট নিয়েই পঞ্চায়ত গঠন করা হোক। বাগচি সাহেব ঠাকুর্দার মতই মেনে নিয়েছেন। যোগেন, কানাই অথবা ভূষণও আর আপত্তি করে নি।

সেই ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করছেন অফিসের তরফ থেকে বাগচি সাহেব। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ঠাকুর্দা সকলের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোন্ ব্লকে কাকে প্রতিনিধি হিসাবে গণ-কল্যাণ সমিতি নমিনেশন দেবে। শুধু নমিতা আর ভূষণ নয়—একজ্ঞ কানাই, যোগেন, জীবন প্রভৃতি আরও সাত আটজনকেও তিনি ডেকেছিলেন। ওরা এসে বসে রইল। অথচ ঠাকুর্দাই অস্থপস্থিত। শেষে কে একজন এসে বললে ঠাকুর্দাকে দুপুরের ট্রেনে কলকাতাগামী একটা গাড়িতে উঠতে দেখেছে। আর একজন বললে একটি অস্থস্থ লোকও নাকি ছিল তাঁর সঙ্গে। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ওরা ফিরে এল।

যোগেন স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। বলে, “ভূষণদা, এসব কাজ ও বুড়ো মানুষ দিয়ে হবে না। আপনি আসুন। আমরা সবাই মিলে আপনাকে সভাপতি করি।” দেখা গেল আরও কয়েকজনের সমর্থন আছে এ প্রস্তাবে।

ভূষণ বলে, “কিন্তু ঐ বুড়ো মানুষটাকে মেনে চলে সবাই। আমার কথাও হয়তো সবাই শুনবে—কিন্তু সেটা ভয়ে। গুঁর কথা শুনবে ভালোবেসে, শ্রদ্ধায়।”

“কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন। ঠাকুর্দার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এতগুলো লোককে নিমন্ত্রণ করেছেন জরুরী মিটিং। নমিনেশন মিটিং। আর নিজেই চলে গেছেন কলকাতায়।”

নমিতা বলে, “কিন্তু ঐ অস্থস্থ লোকটাকে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ কঠিন অস্থথের কোনও রোগী দেখতে গিয়ে এটা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে বোধ হয়।”

ভূষণ প্রতিবাদ করে : “হতে পারে। সেটা অন্য কারও উপর ভার দিতে পারতেন।

কাউকে বলতে পারতেন একে হাসপাতালে পৌছে দাও। উনি যে কাজটা করতে গেছেন সেটা দলপতির কাজ নয়—যে-কোন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। আর যে কাজটা না করে চলে গেছেন সেটা একমাত্র দলপতিরই কাজ।”

নমিতা জবাব দেয় না।

ধীরে ধীরে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

যোগেনও আসছিল ওদের দু’জনের সঙ্গে। বললে, “অনেক ঘাটের জল! তো খাওয়া হ’ল ভূষণ—এবার পাকাপাকিভাবে যাতে এখানে মানুষের মতো বাঁচতে পারি সে চেষ্টা দেখুন। সব ক’টি শক্তিকে এক ঝাণ্ডার তলায় না আনতে পারলে চলবে না। এর মধ্যে রাজনৈতিক আমরা আনতে দেব না। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই আমরা সম্পর্ক রাখব না। বাইরের নেতৃত্ব চাই না আমরা। আমাদের দাবি শুধু পুনর্বাসন। কাজ করে মানুষের মতো বাঁচতে চাওয়ার দাবি। এটাকে সফল করতেই হবে।”

ভূষণ বললে, বাগচি সাহেব লোক ভালোই হবেন মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরদাকে দিয়ে কি চলবে এ কাজ?”

“আমিও তো তাই বলছি। ঠর রক্ত ঠাণ্ডা হ’য়ে গেছে। বুড়ো হ’য়ে গেছেন। তাছাড়া দলপতি হবার যোগ্যতা বোধহয় ঠর কোনও দিনই ছিল না। অত ভালো মানুষ হ’লে পলিটিক্স হয়? একদিকে পাজি-পুঁথি তিথি-নক্ষত্র—আর অগ্নিদিকে সব মানুষের দেহেই ষনারায়ণ আছেন এই থিয়োরি! যতীশবাবু প্যাচ কষছেন তিনিও নারায়ণ আর যেটা হারামজাদ বদমাইসি করে বেড়াচ্ছেন তিনিও নারায়ণ!”

নমিতা বলে, “কিন্তু ঐ বুড়ো-হাবড়া মাঝখানে আছেন বলেই আপনাদের মধ্যে এখনও দলাদলি বাধে নি। উনি স’রে গেলে ব্যাণ্ডের ছাতার মতো অসংখ্য নেতা দেখা দেবে কলোনীতে—এও দেখে নেবেন!”

ভূষণের ভ্রু কুঞ্চিত হয়। বলে, “রাজা মারা গেলেও রাজ্য চলে নমিতা দেবী।”

“অরাজকতাও চলে অনেক সময়ে। আমি বলছিলাম গণ-কল্যাণ সমিতির হাতে এখন লক্ষ কাজ। কত বিষয় চিন্তা করবার আছে, কাজ করবার আছে। আপনারা কিন্তু দেখছি একটি মাত্র চিন্তাতেই বিভোর—কি করে দলপতিকে গদিচ্যুত করা যায়।”

যোগেন রাগ করে বলে, “আপনি ভুল করছেন নমিতাদি।”

“ভুল বলেই যেন বুঝতে পারি ভাই এটাকে। আমিই তাহ’লে খুলী হব সবচেয়ে বেশি। সত্যিই আমি ভাবতে পারছি না যে—সমিতি ভালো ভাবে গড়ে ওঠার

আগেই তার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা করতে বসে যাবে দারা-হুজা-ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ !”

যোগেন হেসে বলে, “এটা আপনার হিস্তি টীচারের মতো কথা হ’ল নমিতাদি !”
নমিতাও হেসে বলে, “আমি তো টীচারই। দুঃখ তো সেখানেই যোগেন ভাই ! ইতিহাস আমরা পড়ি আর পড়াই। সাল তারিখ মুখস্থ করি। ইতিহাসের শিক্ষা কি আমরা গ্রহণ করি জীবনে ? তাজমহল না গড়ে উঠতেই বুড়ে শাজাহানটাকে আগ্রা ফোর্টে বন্দী করবার মতলবে আছি আমরা।”

ভূষণ ঐকটা কথাও বলে না। সে অবাক হ’য়ে যায় নমিতার পরিবর্তন দেখে। দশটা দিন আগে মেয়েটা চোখ তুলে কথা বলতে পারতো না। মিটিঙে ওর নাম প্রস্তাব করলেন হেডমিস্ট্রেস—উঠে দাঁড়িয়ে কি বলতে গেল—কথা ফুটল না তার মুখে। সেই মুক মেয়েটি এ কয়দিনেই কেমন মুখর হ’য়ে উঠেছে। যোগেন নায়েকের বয়স বছর কুড়ি বাইশ হবে। অনায়াসে তার দিদি হ’য়ে উঠেছে। ইতিহাসের শিক্ষা দিচ্ছে ! ভূষণ বুঝতে পারে যোগেনকে বললেও আসলে নমিতা আঘাত করতে চাইছে ভূষণকেই। নমিতা বোধহয় ভাবে নিতাইপদর আসনের প্রতি মোহ আছে ভূষণের। কলোনীর অবিসংবাদিত নেতা হওয়াটা গৌরবের সন্দেহ নেই—কিন্তু মোহের বশে ভূষণ তা পেতে চাইছে না। সে নিজে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হ’তে চায় না। সে চায় একজন দৃঢ়চেতা জননায়ক ! সমস্ত কলোনীর ভালোমন্দ দেখবার ক্ষমতা যে রাখে। লোকগুলো শ্রোতের মুখে তৃণথণ্ডের মতো ভেসে ভেসে বেরিয়েছে আজ ছয় সাত বছর। ট্রানসিট ক্যাম্প, পি. এল. ক্যাম্প, শেয়ালদা স্টেশন, হাওড়া ময়দান, স্ট্রাণ্ড রোড, এমন কি বিহার মধ্যপ্রদেশের অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে ওরা। যেখানে গিয়েছে উইপোকার মতো ছোট ছোট টিপি গড়ে তুলেছে। মাথার উপর এক টুকরো ছাদ ! ভেঙে দিয়েছে কে যেন ! আবার আশ্রয়হীন হ’য়ে পড়েছে ওরা। এতদিনে এসে পৌঁছেছে এই উদয়নগর কলোনীতে। এইবারই বোধহয় ওদের শেষ চেষ্টা। এখানে যদি মাহুঘের মতো বাঁচবার অধিকার পায় তবেই লোকগুলো আবার সামাজিক জীব হ’য়ে উঠবে—না হ’লে আর আশা নেই। এই দশ পনের হাজার লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার মতো ক্ষমতাশালী নেতা নন নিতাইপদ এটা বিশ্বাস করে ভূষণ। কিন্তু তাঁর বদলে দ্বিতীয় কোনও নেতার সম্ভাবনা সে পায় নি আজও। কলোনীর দাবি দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে—সে দাবির পিছনে শুধু যুক্তি আর জোর থাকলেই চলেবে না—থাকা চাই খানিকটা ঔদ্ধত্য ! অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিতে হবে। প্রেসেশন ক’রে বিধানসভায় গিয়ে পিকেটিং করবার ভয় দেখাতে হবে—

না হ'লে ওদের দাবি মেনে নেবে না কেউ। সে সব কাজ ঠাকুরদাকে দিয়ে হবে না!

ভূষণ কিন্তু কোনও কথা বলে না।

নমিতাও বলে না কোন কথা।

সেও ভাবছিল ঐ একই কথা—তবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নিতাইপদকে সে ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছে। ঐ নগ্নগাত্র শুভ্রকেশ অমায়িক বৃদ্ধটির মধ্যে সে দেখেছে একজন সত্যিকারের দরদী মানুষকে। সে বুঝেছে যে এই লোকটিকে নেতৃত্বপদে রাখতে পারলে সামগ্রিক উন্নতি হ'তে পারে কলোনীর। নিতাইপদ সত্যিই দেখেছেন তাজমহলের স্বপ্ন—সে স্বপ্নও প্রেমের-মন্দির। মানব-প্রেমের। এ কলোনীর সাম্রাজ্যের মাঝখানে ঐ একক বৃদ্ধকে মনে মনে এরা কেউ চাইছে না। নমিতা আজকাল বড় বড় কথা ভাবতে শিখেছে।

পায়ে পায়ে ওরা যখন বাড়িতে এসে পৌছায় তখন নমিতা লক্ষ্য করে কখন অলক্ষ্যে যোগেন চলে গেছে নিজের পথে। নমিতা আর ভূষণ বাড়ি ঢুকতেই লতু এসে ভূষণকে বলে, “আপনি তো বেশ লোক, মিঠুকে কানাইদার বাড়িতে একলা রেখে দিয়ে কোথায় কোথায় আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছেন।”

ভূষণ হেসে বলে, “একলা রেখে যাব কেন? ঠান্দির চার্জে রেখে গেলুম তো ওখানে।”
“ও! ঠান্দি আপনার মাইনে-করা বাদী কিনা। দায় পড়েছে আমার।”

লতুর কোলে ঘুমন্ত মিঠুয়া।

নমিতা রীতিমতো বিস্মিত হয়। ভূষণকে বলে, “লতুর সঙ্গে তো বেশ ভাব হ'য়ে গেছে দেখছি আপনার।”

ভূষণও বিস্মিত হয়: “কেন আপনি জানতেন না? ঠান্দি তো প্রায়ই যায় আমাদের বাড়ি। মিঠু ওকে ছেড়ে থাকতেই চায় না! পিসীমার সঙ্গে লতুর খুব ভাব হ'য়ে গেছে। আপনিই যান না বলে অহুযোগ করছিলেন তিনি। কই আপনি তো একদিনও গেলেন না।”

নমিতা অগ্নমনস্ক হ'য়ে পড়ে। লতু ভূষণবাবুদের বাড়ি প্রায়ই যায়। পিসীমার সঙ্গেও লতুর আলাপ হ'য়ে গেছে? কই এসব কথা তো ঘূণাক্ষরেও জানায় নি লতু? কেন জানায় নি। এটা গোপন করার কারণটা কি হ'তে পারে?

ভূষণ লতুর দিকে ফিরে বলে, “ঠান্দি, তোমার অর্ডারি জিনিস এসে গেছে—দেওয়া হ'য়ে ওঠে নি—তুমি কাল যাও নি বলে।”

ভূষণ পকেটের ভিতর হাত ঢালায়।

লতু তাড়াতাড়ি বলে, “আচ্ছা সে হবে'খন।”

চলে যায় সে পাশের ঘরে—মিঠুকে কোলে নিয়ে।

লতু লক্ষ্য করেছে নমিতার ভাবান্তর। ও যে ভূষণবাবুদের বাড়ি গিয়ে আলাপ ক'রে এসেছে এটা না জানানোতে দিদি অবশ্য রাগ করতেই পারে। দুই বোনের মধ্যে লুকোচুরির স্থান নেই। কিন্তু কি জানি কেন এ সত্যটা স্বীকার করতে লতু সঙ্কোচ বোধ করেছে প্রতিবারই। অনেকবার বলতে চেয়েছে—কিন্তু দিদি হাসবে মনে হওয়ায় বলা হ'য়ে ওঠে নি। এখন দিদির চুপ ক'রে বসে থাকার ভঙ্গিটার সেজন্ত অসুশোচনা হয়। লতু মনে মনে স্থির করল ভূষণদা চলে গেলেই দিদির গলাটা জড়িয়ে ধরে বলবে, “দিদি রাগ করেছিস?”

দিদি বলবে, “রাগ করব কেন? রাগ করি নি।”

“নিশ্চয়ই করেছিস। তোকে না বলে ভূষণদাদের বাড়ি গেছি বলে?”

“গেছিস তো বেশ করেছিস।”

“ঐ তো রাগের কথা। রাগ করিস নি তো হাস দিকিন।”

দিদি হেসে ফেলবে তখনই। এটুকু বিশ্বাস লতুর আজও আছে—দিদির উপর।

ঘরের পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে সে ভূষণের প্রস্থানের অপেক্ষায়।

ভূষণ এক জোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি বার পকেট থেকে। রেখে দেয় টেবিলের উপর।

নমিতা এতক্ষণে কথা বলে, “এটা কিন্তু আপনার অম্মায়।”

‘কোনটা?’

‘এভাবে ওকে উপহার দেওয়া!’

‘কি বলছ নমিতা! লতু এখনও ছেলেমানুষ।’

‘ছেলেমানুষ যে নয়—সেটা আমিও বুঝি, আপনারও না বুঝবার কোনও কারণ নেই।’

ভূষণ একটু অবাক হ'য়ে যায়। এ কথার মানে? একটু অপমানিতও বোধ করে নিজেকে। তবু হেসে জিনিসটা লঘু করে। বলে, “একবার যখন দিয়ে ফেলেছি তখন আর আপত্তি নাই করলে। তাছাড়া ওর সঙ্গে দুদিন পরেই তো একটা নিকট এবং মধুর সম্বন্ধ হ'তে যাচ্ছে—স্বতরাং এটা এমন কিছু বড় অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।”

নমিতা উঠে দাঁড়ায়। যাবার সময় বলে যায়, “আপনি ভুল করছেন ভূষণবাবু। যে নিকট এবং মধুর সম্পর্কের ইঙ্গিত করছেন আপনি তা হবার নয়। আমি রাজি নই! তবে যে উপহার ও নিজমুখে চেয়েছে—আর যা আপনি মনে ক'রে কিনে এনে বাড়ি বয়ে দিয়ে গেলেন তা ফেরত নিয়ে যেতেও বলছি না আমি।”

নমিতা দ্রুতপদে চলে যায় ওঘরে।

স্বস্তক বিন্ময়ে মুক হ'য়ে বসে থাকে ভূষণ। মুখটা স্নান হ'য়ে আসে ওর। সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে লতু। দুম ক'রে নামিয়ে দেয় মিঠুকে। আর টেবিল থেকে প্লাস্টিকের চুড়ি দুটো তুলে হুঁহাতের চাপে ভেঙে ফেলল সেটা। কোন কথাই বলে বের হ'য়ে গেল ফের।

ভূষণ মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

সি-রকে সুরেখা দেবীর বাড়িটিই বোধহয় কলোনীর সব চেয়ে সুসজ্জিত বাড়ি। দামী আসবাবে তার আভিজাত্য নয়। সুকচির পরিচয়েই সেটি সুশোভিত। দরজা জানালায় পর্দা টাঙানো। কয়েল্ড স্প্রিংয়ের সঙ্গে লাগানো কুঁচি দেওয়া হালকা নীল পর্দা। শয়নকক্ষ একটি মাত্র। বসার ঘরও এটাই। তার একদিকে একটি চৌকি পাতা। সাদা ধবধবে একটা পাটভাঙা চাদর টানটান ক'রে বিছানো। ঘরের এককোণে একটি মাটির কলসি আর কাঁচের গ্লাস। কয়েকটি শান্তিনিকেতনী মোড়া। সূচের কাজ করা নকশা কাটা ঢাকনি। এক কোণে আপাদমস্তক নীল কাপড়ে ঢাকা একটা সেতার। টেবিলের উপর ফুলদানিতে কয়েকগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ফুল সুরেখা দেবীর বাগানেই হয়। ফুলদানির পাশে ক্রেমে-বাঁধানো একখানা ফটো। বছর বাইশেক বয়সের একজন যুবক।

যে ঘরে সুরেখা দেবীর প্রাক্‌বিবাহ জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে তার তুলনায় যদিও এ গৃহশয্যা অকিঞ্চিৎকর—তবু কলোনীর ছন্নছাড়া জীবনে এটাকেই হঠাৎ মরুভূমির মাঝখানে মরুত্বানের মতো মনে হয়। কঞ্চির বেড়া দিয়ে বাড়ির চারদিক ঘেরা। সঙ্ঘামালতী আর অপরাজিতার গাছ লাগানো হয়েছে—যদিও বাড়িতে পায় নি সেগুলি বথেষ্ট। আগামী বর্ষার পর হয়তো ছেয়ে ফেলবে ওরা কঞ্চির বেড়াকে। সুরেখা দেবী শুধু সম্পন্ন ঘরের মেয়ে নন—রীতিমতো ধনীর কন্যা তিনি। বিবাহও হয়েছিল ধনীর ছুলালের সঙ্গে। ভাগ্যবিপর্যয়ে তিনি পিতৃগৃহ-স্বামীগৃহ দুইই ত্যাগ ক'রে এসে কর্মসংস্থান করছেন উদয়নগর কলোনীতে। যারা বলে তাঁর শখের চাকরি—তাঁরা ওর জীবনের সব কথা জানে না বলেই ঐ ভুল কথাটা বলে।

জানালা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস দেখতে পেলেন—নমিতা কঞ্চির গেট খুলে ভিতরে আসছে। নমিতা মেয়েটিকে তিনি স্নেহ করেন। স্কুলের অগ্রাগ্রা শিক্ষয়িত্রী এ নিয়ে একটা গোপন অভিযোগ ছিল। আর সেটা অজানাও ছিল না তাঁর।

“এসো নমিতা—কি খবর?”

“আপনি আমাকে এ কী ফ্যাসাদে ফেললেন বলুন দেখি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায়

কলোনীর মেয়েরা আমার কাছে আসতে শুরু করেছে। কারও ফ্রি র্যাশন বন্ধ হয়েছে—তাতে আপত্তি। কেউ পি. এল. ক্যাম্পে যেতে চায় তার আজি, কেউ কাজ। যত বুঝিয়ে বলি এসব বিষয়ে কোনও ক্ষমতা নেই আমার—ওরা বোঝে।”

ওর ছেলেমাছুষি আর আবদার করার ভঙ্গিতে সুরেখা দেবী কৌতুক বোধ করেন। বয়সে বোধহয় দু’জনে প্রায় সমবয়সী। কিন্তু শিক্ষা ও পদমর্যাদায় তিনি অনেক উঁচু মঞ্চ থেকে বড়বোনের মতোই ওকে উপদেশ দিলেন—প্রথম প্রথম এ সব অসুবিধা একটু হবেই। ওদের অভিযোগগুলো আপাতত শুনে যাও। নোট বইতে লিখে রাখ। নিতাইবাবুর গণকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে কলোনীতে শীঘ্রই নানারকম কাজ শুরু হবে। তুমি তখন সত্যিই পারবে এদের নানাভাবে সাহায্য করতে।”

নমিতা বলে, “ও, আপনি জানেন না বুঝি। আমাদের গণকল্যাণ সমিতি কর্তৃপক্ষের ‘অ্যাপ্রভাল’ পেয়েছে। প্রত্যেক ব্লকের প্রতিনিধি গণভোট নিয়ে নির্বাচন করা হবে। তাদের দিয়েই নতুন পঞ্চায়েত গড়া হবে। আগের পঞ্চায়েত বাতিল হয়ে গেছে।”

সুরেখা দেবী বলেন, “গেছে নয় বল যাবে। নতুন কমিটি কার্যভার নিলে পুরানো পঞ্চায়েত তখনই বাতিল হবে।”

“না! ওটা বাতিল হয়েই গেছে। এখন আমাদের অ্যাডহক্ কমিটিই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।”

“অর্থাৎ তুমি আর ভূষণবাবু?”

“আর নিতাই ঠাকুরদা।”

“তিনি তো বুড়ো মানুষ। তোমাদের দু’জনকেই সামলাতে পারছেন না—সারা কলোনীর এতগুলি লোককে তিনি ঠেকাবেন কি করে?”

“মানে?”—বিস্মিত হয় নমিতা।

সুরেখা দেবী মিটিমিটি হাসেন।

“যাক। তা কি বলতে এসেছ বল?”

নমিতা একটু ইতস্তত করে তারপর বলে, “আমি কিন্তু এ কমিটিতে থাকব না। আপনি অগ্ন কাউকে এ ভার দিন।”

“সেকি, কেন বলত?”

“ঐ যে বললাম—সারাদিন আমায় বিরক্ত করে।”

“জনকল্যাণের কাজ করবে—আর তোমার কাছে কেউ কিছু বলতে এল বিরক্ত

বোধ করবে, এতো হয় না নমিতা। হবেও বা—আমিই হয়তো ভুল করেছি। সত্যিই যদি বিরক্ত বোধ ক’রে থাক তবে পদত্যাগ করাই উচিত তোমার। তবে সে কথা আমাকে বলতে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিতাইবাবুকে বল।”

“বারে! আপনিই তো আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন।”

“ভুল করেছিলাম নমিতা। আমি তোমাকে অল্প জাতের মানুষ ভেবেছিলাম।”

হু’জনেই চুপ। সুরেখা দেবী জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। নমিতা নখ দিয়ে টেবিলক্লথটা খুঁটতে খুঁটতে বলে, “আপনি রাগ করেছেন।”

“রাগ ঠিক করি নি। তবে দুঃখ পেয়েছি। মানে আমি সত্যি ঠিক আশঙ্কা করি নি এটা। তোমার আসল আপত্তিটা কি বলত?”

নমিতা তখনও ইতস্তত করে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলে, “এ কমিটির সঙ্গে আমার কাজ করা পোষাবে না।”

“কেন বলত? তোমাদের নিতাই ঠাকুরী শুনেছি খুবই ভালোমানুষ। ভূষণবাবুর সঙ্গেও তো তোমার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা।”

“অন্তরঙ্গতা? মানে?”

“ও এতক্ষণে বুঝেছি! মান অভিমানের পালা চলছে বুঝি?”

নমিতা রীতিমতো বিব্রত হ’য়ে পড়ে: “না, না! মানে এসব কি বলছেন আপনি?”

সুরেখা দেবী কোতুক বোধ করেন, স্মিতহাস্তে বলেন, “কিছু কিছু আমি অবশ্য শুনেছিলাম—শোভনা দেবীর কাছে। স্কুলের সামনে কয়েকদিন ভ্রলোককে ঘোরানুরি করতে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তারপর জানতে পারি উনি তোমার খোঁজেই আসেন। কি একটা ঘোঁথ ব্যবসা নাকি চালাচ্ছ তোমরা। তখনও এতটা বুঝি নি।”

নমিতা চুপ ক’রে থাকে। প্রতিবাদ করাটা উচিত মনে হয়; কিন্তু কি ভাবে প্রতিবাদ করলে জিনিসটা অস্বীকার করা যায় বুঝে উঠতে পারে না।

হেডমিস্ট্রেসই বলেন, “উনি তোমাদের কমিটিতে থাকাই কি তোমার আপত্তির কারণ?”

“সেও একটা কারণ বটে; তাছাড়াও মানে—”

“অর্থাৎ তা ছাড়াও কোন কারণ উদ্ভাবন করতে পারো তুমি। আচ্ছা তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু প্রথম কারণটাই বিস্তারিত শুনি আগে।”

নমিতা মরিয়া হ’য়ে বলে ফেলে, “ভূষণবাবুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি। সেলাইয়ের কারবারও বন্ধ ক’রে দিচ্ছি। অল্প স্ত্রেও কোন যোগাযোগ রাখতে চাই না।”

সুরেখা দেবী গভীর হ'য়ে বলেন, “এতদূর ? যদি আপত্তি না থাকে তবে গভীরতর কারণটা ব্যক্ত করতে পারো তুমি। অবশ্য তোমাকে বলতে বাধ্য করছি না আমি। ব্যবস্যাটা বন্ধ করার কারণ অর্থনৈতিক নাকি ?”

“না না, টাকা পরসার ব্যাপারে উনি খুব পার্টিকুলার।”

“ভূষণবাবু চরিত্রবান সং প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়েছে আমার—”

“আমিই কি তা অস্বীকার করছি ?”

“তবে কারণটা অর্থনৈতিক নয় আধিভৌতিকও নয়—সুতরাং ধরে নিতে পারি কারণটা হৃদয়ঘটিত।”

নমিতা রীতিমতো লাল হ'য়ে ওঠে : “এভাবে জোর করলে আমি জবাবই দেব না।”

প্রাণ খুলে হাসেন সুরেখা দেবী : “ক্ষেপেছ ; আমার কি এটুকুও রসবোধ নেই। হৃদয়ঘটিত ব্যাপার শোনার পরেও জেরা করব আমি ? কিন্তু ওসব হচ্ছে শরতের মেঘ ! ওর জন্তে ‘মেজর’ কোনও ‘ডিসিসন্’ নিতে নেই।”

নমিতা তবু তর্ক করে : “কিন্তু আপনিই তো এখুনি বলছিলেন ঠেকে আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আপনারই সন্দেহ হয়েছিল—এবং খবর নিয়ে জেনেছেন যে একটা অর্থনৈতিক কারণেই আমরা মেলামেশা করি। সাধারণ লোকে তো এটাকে অগ্র চোখেও দেখতে পারে। আমার একটা বদনামও হ'য়ে যেতে পারে।”

“অগ্র লোক কেন আমি তো ওটা অগ্র চোখে দেখেছি। কে বললে আমি বিশ্বাস করেছি তোমাদের মেলামেশাটার আসল কারণ ব্যবসা ঘটত ?”

নমিতা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে।

“বোকার মতো দেখছ কি ? বেশ তো, বদনাম যদি খুব বেশী হ'য়েই পড়ে তখন একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। ভূষণবাবুকে বললেই সে এক ফোঁটা সিঁদুর দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ ক'রে দেবে। তা সে পারবে। তুমিই বলে দেখো না।”

ঐ এক ফোঁটা সিঁদুরই বুঝি ছড়িয়ে পড়ে নমিতার সারা মুখে।

আর কিছু বলতে পারে না।

নমিতা বাড়ি ফিরে এল হাল্কা মন নিয়ে। অনেকদিন পরে আবার গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। সুরেখাদি লোকটি কিন্তু ভারী অলভ্য। এমন মিটিমিটি হেসে কথা বলেন যে প্রতিবাদ করারও অবস্থা থাকে না। বাড়ি এসে পৌছাতে লতু ওকে একগাদা ছিট এনে দিল। বললে, “একটি ছোট ছেলে এগুলো দিয়ে গেছে। বলেছে এই মাপে জামাগুলো বানিয়ে রাখতে। পরের

সপ্তাহে এসে নিয়ে যাবে।”

“ছোট ছেলে? কে রে?”

“কি জানি, চিনি না।”

নমিতা হতাশ হয়। সে ভেবেছিল সপ্তাহান্তে ভূষণ একবার আসবে। আজ শনিবার। ভূষণের আসার কথা। এ কয় সপ্তাহ অবশ্য সে সপ্তাহের মাঝেও এসেছে। আজ শনিবারে জামা দেবার অছিলায় ভূষণ একবার এ বাড়ি আসবে এটা অহুমান করেছিল নমিতা। মনে মনে ওর আগমনের যে প্রতীক্ষা করছিল সেটা টের পেল আশাভঙ্গের পর। তবে ভূষণকেও দোষ দেওয়া যায় না। সেদিন ওকে যে রকম কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে তাতে ওর অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক। কেমন যেন লজ্জা বোধ করে নমিতা। সেদিন হঠাৎ ওরকম রুঢ় ব্যবহার করার সত্যিই কি কোনও কারণ ছিল? ভূষণ তো কোনও অজ্ঞায় করে নি! লতুই বা অজ্ঞায়টা করল কোথায়? লতু যদি কিছু বুঝতে পেরে থাকে? কিন্তু বুঝবারই বা কি আছে এতে? নিজেকেই নমিতা ধমক দেয়। লতুর সঙ্গে ভূষণের যদি ঘনিষ্ঠ আলাপ হ’য়ে থাকে, অথবা ভূষণ যদি লতুর জন্তে মনে করে একজোড়া প্লাস্টিকের চুড়ি কিনে আনে তাতে নমিতার কষ্ট হবার তো কোনও কারণ নেই! লতুকে এ নিয়ে হিংসা বা ঈর্ষা করবে কেন নমিতা? ঈর্ষা! কথাটা মনে হতেই ঠাস ক’রে একটা চড় মারে নমিতা মনের গালে! কী পাগলের মতো ভাবছে সে? লতুকে ডাকে : “লতু শোন।”

লতু এসে চুপটি ক’রে দাঁড়ায়।

“হ্যারে, সেদিন বকেছিলাম বলে রাগ করেছিল? তুই কেন বলিস নি আমাকে যে ভূষণীকাকের সঙ্গে তোর ভাব হ’য়ে গেছে? কেন বললি না যে ওদের বাড়িতে তুই যাতায়াত করিস?”

লতু জবাব দেয় না।

“কী? এখনও অভিমান গেল না? তুই কী রে? নিজে দোষ করলি আর আমার উপর রাগ করছিল? আমি কি বারণ করেছি ওদের বাড়ি যেতে?”

লতু গম্ভীর হ’য়ে বলে, “ওকথা থাক দিদি! আমি তো আর যাই না।”

“কেন? যাস না কেন? আমি বারণ করেছি? তোর যদি ভালো লাগে যাস যত খুশী ভূষণীকাকের বাসায়।”

“থাক দিদি। ও রসিকতা আমার ভালো লাগে না।”

লতু ধীরে ধীরে চলে যায়। নমিতা ভেবেছিল লতুকে পাঠিয়ে ভূষণকে ডেকে পাঠাবে। সেলাইয়ের ‘কার্ট’ সংক্রান্ত কথাবার্তা শুক ক’রে সেদিনের ব্যাপারটা

মিটিয়ে ফেলবে। কিন্তু লতুর ভাবগতিক দেখে ও একটু অবাক হয়। লতুর এতটা গম্ভীর ভাব তো স্বাভাবিক নয়। ব্যাপার কি ! সেদিন বাইরের লোকের সামনে ও-কথা বলায় বোধহয় অপমানিত বোধ করেছে খুব। দুঃখ হয় নমিতার। আবার ডাকে : “লতু শোনু !”

আবার এসে দাঁড়ায় লতু।

“তোর কি হয়েছে বলতো ? কথাই বলছিস না ভালো ক’রে ?”

লতু একবার তাকায় দিদির দিকে। চোখোচোখি হয়। তৎক্ষণাৎ সে চোখ নিচু করে। অশ্রুটে বলে, “কিছু হয় নি। আর কিছু হ’য়ে থাকলে তা তুমিও জানো, আমিও জানি।”

বলেই বেরিয়ে যায়।

নমিতা রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। আর কিছু বলে না।

রাত্রে আহারাদির পর নমিতা সেলাই নিয়ে বসেছিল। আঙুলি কয়েকটা জামা কেটে রাখতে হবে। লতু ঘুমিয়েছে পাশেই। নমিতা আর লতু এক বিহানাতাই শোয়। বিন্দুবাসিনী এসে বসলেন, “নমু, তোর বাবা একবার ডাকছে তোঁকে।”

হাতের কাছটা গুঁহিয়ে রেখে নমিতা এসে বসে বাপের পাশে।

বুদ্ধ একটু ইতস্তত ক’রে বলেন, “হাঁরে অম্বর কোনও খবর পেয়েছিস ?”

“না বাবা।”

“খবর নেবার চেষ্টা করেছিলি ?”

“না। মনিঅর্ডার ফেরত আসার পর আমি আর চেষ্টা করি নি।”

বুদ্ধ মাথা নাড়েন, “মনিঅর্ডার ফেরত আসবে এটা আমি জানতাম। সে বড় অভিমানিনীয়ে।”

বিন্দুবাসিনী ঝাঁজের সঙ্গে বলেন, “তুমি আর অবিকোতা ক’র না। টাকা ফেরত দেওয়া হ’ল। বাবলুকে আটকে রাখা হ’ল। তিনি হ’লেন অভিমানিনী ! আমার রোগা ছেলেরা কেমন আছে বাবলুকে পাঠিয়ে তা একটা খবরও দিতে পারল না এতদিনে ? আর সে ছেলেরাই বা কেমন ? মা-বাপের কথা মনেও পড়ে না ?”

নমিতা বলে, “সে নিশ্চয়ই আসতে চায়—বৌদি আসতে দেয় না।”

হরিপদ বলেন, “সে যাই হোক। তোকে আর একটি কথা বলব বলে ডেকেছি। ভূষণের কথা !”

নমিতা ব্যস্তে পারে প্রশ্নটা কি। হেডমিস্ট্রেস্ যেটা অত সহজেই ব্যস্তে পেরেছেন—সেটা যে বাবা-মার চোখ এড়াবে না এটা বোঝা সহজ। হঠাৎ এ প্রশ্নটার সে

লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে পড়ে। বাপের স্নেহমাথা কণ্ঠস্বরে নমিতার শরীর অবশ হ'য়ে আসে। মনে পড়ে যায় তার অতীত যৌবনের ইতিহাস। ওকে পাত্রস্ব করার কী প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল বৃদ্ধের। তাঁর নমিতা মায়ের কদর কেউ বুঝল না—এ অভিযোগ তাঁর বরাবরই ছিল দু'নিয়ার উপর। শেষ দিকে নমিতা যখন জানিয়েছিল যে সে বিয়ে করবে না তার পর থেকে বৃদ্ধ এখনও এ প্রসঙ্গ তোলেন নি। আজ দীর্ঘদিন পরে উঠে পড়েছে সেই আলোচনা। পঁচিশ বছরের উদ্ভাস্ত মেয়েটি ইতস্তত করে। কি ক'রে সে স্বীকার করবে যে ঐ মা-হারা মেয়েটির বাপকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। তার আজীবন কুমারী থাকার প্রতিজ্ঞাটা ভাসিয়ে দিয়েছে ঐ বলিষ্ঠ গঠন যুবকটি এক নিমেষে! অনিবার্য প্রকৃতির প্রত্যাশায় উদ্বেগ-হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে নমিতা।

বৃদ্ধ বলেন, “ভ্রমণ কি বিবাহের কোন প্রস্তাব এনেছিল?”

নমিতা চুপ ক'রে থাকে।

রুদ্ধ স্বরে বৃদ্ধ বলেন, “আর তুমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল?”

নমিতা এবারও নীরব। বাপের রুদ্ধ স্বরে প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই তার অন্তর্নিহিত কারণটা মনে পড়ে যাওয়ায় আর রাগ থাকে না। রাগ বাবা-মা করতে পারেন বটে। মেয়েকে সংপাত্রে দান করতে কে না চায়—তাছাড়া তাকে পাত্রস্ব করতে কী অপরিণীম চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। সেই বাস্তবিত অতিথিটি আজ নিজেকে থেকে দ্বারে এসে উপস্থিত আর নমিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ কথা জানবার পর রাগ করতে পারেন বটে ঠা। কিন্তু নমিতা কি ক'রে বলবে যে ক্লগিক মনোবিকলনে সে হঠাৎ প্রত্যাখ্যান ক'রে বসেছে বটে তবু ওর সমস্ত অন্তঃকরণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে বসে আছে তার ফিরে ডাকার প্রতীক্ষায়? কবে এসে সে তাকে বলবে—‘তোমার প্রত্যাখ্যান আমি মানি না। তুমি আমার! আমি জোর ক'রে তোমাকে নিয়ে যাবো আমার বাড়ি! আমার ভালোবাসাকে আমি বার্থ হ'তে দেব না তোমার খামখেয়ালির জগ্গে।’

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলেন, “এটা তুমি ভালো কর নি নমিতা!”

নমিতা একটু চমকে ওঠে ঠর কণ্ঠস্বরে। হঠাৎ ‘তুমি’ লঙ্ঘোদন এবং ‘নমিতা’ ডাকটা কানে বাজে ওর। বলে, “কেন বাবা?”

“তোমার উচিত ছিল আমাকে জিজ্ঞাসা করা। তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা।”

নমিতা জবাব দেয় না। বৃদ্ধ বাপের অভিমানের একটা অর্থ খুঁজে পায় সে। ও

হাসে মনে মনে। মনে পড়ে স্বরেখা দেবীর কথাগুলি : “ও সব হচ্ছে শরতের মেঘ।”

“নিজের সঙ্কল্পে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো। তোমার উপার্জনে বেঁচে আছি আমরা। তুমি নিজে বিয়ে করতে চাও নি—আমি বাধা দিই নি। কিন্তু লতুর বিবাহ সঙ্কল্পে কোনও অভিমত জানানোর আগে তোমার উচিত ছিল বাপের সঙ্গে পরামর্শ করা—তা হোক সে বাপ অন্ধ, পন্থ!”

“কি বলছ বাবা!”

“ঠিকই বলছি নমিতা! আজ সন্ধ্যাবেলা ভূষণের পিসীমা এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে। তিনি বললেন ভূষণ নাকি লতুর সঙ্গে বিবাহের একটা প্রস্তাব এনেছিল—আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। কারণটা তিনি জানতে এসেছিলেন তোমার মায়ের কাছে।”

নমিতা আশ্চর্য হয়ে বললে, “ভূষণবাবু লতুর সঙ্গে বিয়ের একটা প্রস্তাব এনেছিলেন?—আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি? একথা বললেন তাঁর পিসীমা।”

“তাই তো বললেন।”

“তিনি তা জানলেন কি করে?”

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে কথা বলেন, “আমি তা জানতে চাই নি। সম্ভবত ভাইপো নিজেই জানিয়েছে তাঁকে। আমি বলেছি আমাদের আমলে ছেলেমেয়ের বাপ-মায়েরই কথাবার্তা চালিয়ে এসেছে। আপনার ছেলে যখন বাপ-মার বদলে পাত্রীর দিদির কাছেই প্রস্তাব তুলেছে—তখন সেই দিদির কাছ থেকেই জবাবটা শুনবেন। উপার্জনকম ছেলেমেয়ের গলগ্রহ বই তো নই?”

নমিতা বলে, “কি করে এ কথা রটেছে জানি না। রাগ অভিমান তোমরা করছ কর; বার বার উপার্জনকম বলে আঘাত দিচ্ছ দাও—তবে একটা কথা জেনে রাগ কর। ভূষণবাবু গুরুকম কোন প্রস্তাব আমার কাছে করেন নি, আর আমিও তা প্রত্যাখ্যান করি নি তোমাদের না জানিয়ে। গালাগাল দিচ্ছ দাও, তবে পরের মুখে মিথ্যা কথা শুনে না দিয়ে—নিজের কানে সত্যি কথাটা শুনে তারপর গাল দাও!”

“আর নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি দিদি?”

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় নমিতা।

লতু উঠে এসেছে শয্যা ছেড়ে। দাঁড়িয়ে আছে ঝারের পাশে। নমিতার মাথার মধ্যে কিম্বিকিম্বিক করতে থাকে? বলে, “কী? কি বললি?”

“বলছি যে নিজের কানে যদি মিথ্যা শুনি তখনও কি চুপ করে থাকব? আমি যে

নিজের কানে শুনেছি দিদি ! উনি বললেন—লতুর সঙ্গে তো আমার একটা নিকট আর মধুর সম্পর্ক হ'তে চলেছে, আর তুমি ঈর্ষায় জ্বলে উঠে বললে—‘সে নিকট সম্পর্ক হবার নয়—আপনি ভুল করছেন ভ্রমণবাবু—আমি রাজি নই !’ ”

রুঢ় স্বরে হরিপদ পণ্ডিত গর্জন করে ওঠেন, “নমিতা ! কোনটো সত্যি ? একথা তুমি বলেছিলে ?”

হরিপদ পণ্ডিতের এ কণ্ঠস্বরকে চিরকাল শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে চক্রবর্তীপরিবার । শুধু নমিতা নয়, পরিবারের প্রত্যেকটি লোকই । কামিনীকে ত্যাগ ক'রে আসার দিনও নমিতা উপার্জন-সম্বন্ধে কি একটা বাঁকা ইঙ্গিত করায় অমনি গর্জন ক'রে উঠেছিলেন পণ্ডিত । সেদিন সে কণ্ঠস্বরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল নমিতা । আজ কিন্তু নমিতা একটুও বিচলিত হ'ল না ও স্বরে । সেটা লক্ষ্য করেছিলেন বিন্দুবাসিনী । এই দৃঢ় কণ্ঠস্বরের পরিণাম তিনি অন্তত ভালো ক'রেই জানেন । দীর্ঘ চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে এ স্বর তিনি শুনেছেন মাত্র কয়েকবারই । সে কয়েকবারই লক্ষ্য করেছেন তিনি, জীবনে এসেছে একটা বড় রকমের পরিবর্তন । আজ নমিতা এ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল না দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিন্দুবাসিনী । নমিতা কি এতদূর বদলে গেছে ? রোজগার করছে বলে ? চাকরি পেয়েছে বলে ? গণ-কল্যাণ না কি সমিতির নেতা হয়েছে বলে ? নইলে কেন সে এ আহ্বানে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল না ?

আসল কারণটা তিনি আন্দাজই করতে পারেন নি । নমিতার কানে গর্জনটা প্রবেশই করে নি । লতুর একটা ছোট কথা তখন লৌহ শলাকার মতো তার কর্ণপটাহ বিদৌর্ণ ক'রে মর্মস্থল পর্যন্ত দগ্ধ ক'রে দিয়েছিল । আর কিছু সে শুনতে পায় নি ।

আর্তস্বরে নমিতা লতুকে প্রশ্ন করল : “কি বললি ? ঈর্ষায় ?”

“না তো কি ? ছোট বোনের বিয়ের সম্বন্ধ আসছে, অথচ বড়—”

“বাস্ চুপ !”—গর্জন ক'রে ওঠে নমিতা ।

লতুর নীচ অন্তঃকরণের ক্রোধান্ত পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছে সে । একটা কথা বলবার স্পৃহা হয় না তার । কী লজ্জা ! লতুর মনে এই ছিল ? মাতালের মতো টলতে টলতে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায় ।

একটু দূরেই শুয়ে আছে লতু । প্রাণ খুলে সে কান্দতেও পারে না । কি জানি যদি সবাই ভাবে এ কান্নাও উপেক্ষিতা, অনাদৃত্য, বিগত-যৌবনা নারীর ! এ কান্না যে কতবড় দুঃখের কান্না তা তো কেউ জানতেও পারবে না ।

বৃদ্ধ হরিপদও যেন ফুরিয়ে গেছেন । তাঁর ঐ রুঢ় গর্জনের সামনে চক্রবর্তী পরিবার

চিরদিনই মাথা নত ক'রে এসেছে। এটি ছিল তার ব্রহ্মাস্ত্র। আজ তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর শেষ অস্ত্র! এখন কি করবেন তিনি? বঙ্গবিভাগটা আগাগোড়া ভুল জেনেও যেমন নীরবে মেনে নিয়েছিলেন—তেমন ক'রেই কি মেনে নেবেন যে এ পরিবারের অভিভাবকের গদি থেকে চ্যুত হয়েছেন তিনি? আতঁকষ্টে তিনি ডেকে ওঠেন : “নমু, লতু!”

কেউ সাড়া দিল না।

বিন্দুবাসিনী বৃদ্ধকে শুইয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

ওদিকে সারারাত ছটফট করছে নমিতা। ঘুম হয় নি তার একরত্তি। এ কী কাণ্ড! লতু ধরে নিয়েছে ভূষণ তার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এনেছিল—আর তার দ্বিধা দ্বিধিতা হ'য়ে প্রত্যাখ্যান করেছে সে প্রস্তাব? যে লতুর জন্তে তার ভালোবাসার অস্ত্র নেই, চিন্তার বিরাম নেই,—যার স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে সে এতদিন তার কাছ থেকেই কৃতজ্ঞের মতো এই অভিযোগ আসায় ওর বেদনার পরিসীমা ছিল না! লতু, ছোট লতু—প্রায় মায়ের মতো মানুষ করেছে যাকে? ওর চেয়ে দশবছরের ছোট ছিল লতু। ভুল মানুষ মাত্রেই হয়—লতুর পক্ষেও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিশোরী মেয়েটির পক্ষেও ভূষণের আচরণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা অসম্ভব নয়। নাটক-নভেল প'ড়ে প'ড়ে, আর পাড়ার যত অকালপক্ক বকাটে মেয়েদের সঙ্গে মিশে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। তাই তার ধারণা হয়েছে ভূষণ তার আকর্ষণেই আসে এ বাড়ি। সব মেনে নেওয়া যায়—কিন্তু লতু কি ক'রে ভাবতে পারল যে নমিতা ঈর্ষান্বিতা হ'য়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে? দ্বিধিকে এত ছোট ক'রে ভাবল কি ক'রে সে? আর সে কথা বাবা-মার সামনে প্রকাশ্যে বলতেও সঙ্কোচ হ'ল না তার? রাগে দুঃখে অভিমানে সারারাত শুধু এপাশ ওপাশ করল। এক ফোঁটা ঘুম এল না।

মাঝে মাঝে অহুভব করলে যে পাশেই লতু জেগে রয়েছে। কাঁদছে সেও। বালিশে মুখ গুঁজে দিয়ে কান্না চাপবার চেষ্টা করেছে। বাইরে তার প্রকাশ সবই টের পায় কিন্তু কী করতে পারে সে? লতু বিছানায় শুয়ে কাঁদছে জেনেও তাকে সাহসনার কথা বলতে পারলে না। জীবনে এই বোধহয় প্রথম। অনেক দুঃখ রজনীই অতিক্রম করেছে ওরা বিনিত্র নয়নে। পাশাপাশি শয্যায়। লতুর কান্না দেখলে সে কোনদিনই স্থির থাকতে পারে না। নিজের চোখ মুছে গিয়ে বসে ওর মাথায় কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে শান্ত করে এই দুঃস্থ বোনটিকে।

আজ কিন্তু একতিল উৎসাহও অবশিষ্ট ছিল না।

কী লজ্জা ! নমিতা ভাবে, একই পুরুষকে ভালোবেসেছে ওরা। আজ থেকে ওরা
আর সহোদরা নয়—একই পুরুষ। প্রশংসাকাজী প্রতিষেধী নারী !

কথাটা মনে হ'তেই একটা ছিঁছিকারে ভরে যায় সারা মন !

পরদিন সকালে উঠতে নমিতার বেগ দেখি হ'ল। সারারাত্রি জেগে—ভোর রাতে
কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে দেখে বেগ বেলা হয়ে গেছে। আজ রবিবার—স্কুলে
যাবার তাগাদা নেই। রবিবারটা ভালোই লাগে ওর। সপ্তাহান্তে একটি দিন
ছুটি। তাছাড়া এই দিনে প্রায়ই ভূষণও আসে সপ্তাহান্তের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে
দিতে। আজ কিন্তু রবিবার হওয়ায় বিব্রতই বোধ করল সে। স্কুলে বেরিয়ে যাবার
উপায় নেই। সারাদিন বাড়িতেই থাকতে হবে সবার চোখের সামনে। লতু কখন
উঠে বেরিয়ে গেছে। মা উলুনে আগুন দিয়েছেন।

নমিতা দৈনন্দিন কাজে আত্মনিয়োগ করে। মশারিটা টেনে নামায়। লেঙ্ক ক'রে
কাচবে সেটা অঞ্জ। প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ প্রয়োজনটা মশারি ছিল না,
ছিল নমিতার। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে দিনটা কাটিয়ে দিতে চায়। হরিপদ
বসেছিলেন বাইরের দাওয়ার। বিন্দুবাসিনী বালতিটা তুলে নিয়ে জল আনতে
বেরিয়ে যান।

বৃদ্ধ ডাকেন : “নমু, এদিকে শোন।”

নমিতা হাতের কাজ রেখে এসে দাঁড়ায়।

“লতু কোথায় রে?”

“জানি না বাবা। সকালেই কোথায় বেরিয়েছে।”

“আর তোর মা?”

“জল আনতে গেছেন।”

“ও। তুই ব'ল এখান। তোর সঙ্গে কথা আছে।”

আবার সেই কালকের মানিকর আলোচনা হবে। বিরক্ত বোধ করে নমিতা। চুপ
ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

“কই এখানে এসে বস। রাগ করে আছিস নাকি যে আমার উপর?”

নমিতা ধীরে ধীরে বাপের পাশে এসে বসে।

“রাগ করিস না মা। তুই রাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা? অন্ধ বুড়ো মানুষ
না হয় রাগের মাথায় দুটো কড়া কথাই বলে ফেলেছি।”

নমিতা কথা বলে না। উদগত অশ্রু গোপন ক'রে নতমুখে বসে থাকে। বৃদ্ধ বলতে
থাকেন : “কাল তুই রাগ করলি কেন বলত? আমি তো অন্ডায় কিছু বলি নি।
যখন দেশে ঘরে ছিলাম তোকে পাত্রস্থ করবার কম চেষ্টা করি নি। ওরা মুখ

ঘুরিয়ে চলে যেত আর আমি ভগবানকে অভিণাপ দিতাম। এখন মনে হয়—
ভগবান বোধহয় ভালোর জন্তেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। যদি সে সময়ে তোর
বিষে হ'য়ে যেত—তাহ'লে আজ আমাদের না খেয়ে মরতে হ'ত। বৌমার অত-
কাণ্ডের পর—”

“জানি বাবা।”

“তুই তো সবই জানিস মা! আমি অন্ধ হ'য়ে পড়ার পরেও যশোরের রাস্তা বাড়ি
থেকে তোর সন্ধান আসে—তখন তুই বলেছিলি ‘বাবা আমি বিয়ে করব না—
আমি স্বস্তরবাড়ি চলে গেলে তোমাকে কে দেখবে?’ তখন রাগ করেছিলাম।”

নমিতা বুঝতে পারে ভুল বলছেন হরিপদ পণ্ডিত। সে সময় গুর বাবাও অন্ধ হন
নি—সেও আপত্তি জানায় নি। কিন্তু প্রতিবাদ করে না। হয়তো ঘুলিয়ে
ফেলেছেন বুড়ো মানুষ—না হয়তো মনকে ঐ রকমই একটা প্রবোধ দিতে দিতে
সেটাই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। বৃদ্ধ বলেই চলেন, “পরে ভেবে দেখছি
—মা তো আমার ঠিক কথাই বলেছে। সে যদি বিয়ে না করতে চায় নাই করল।
কত মেয়েই তো লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করছে। তারপর থেকে আর ও
কথা আমি বলি নি। কিন্তু লতুর কথা তো অল্প রকম। ওটাকে পার করতে
পারলে তো তোর দায়িত্বই হাল্কা হয়। ভূষণ যখন নিজেকে থেকে ওকে বিয়ে করতে
চায়—”

“ভুল করছ বাবা, ভূষণবাবু লতুকে বিয়ে করতে চান নি।”

“কিন্তু ঐ যে লতু বলল কাল রাত্রে?”

“আমি মিছে কথা বলি না বাবা।”

বৃদ্ধ চুপ করে যান। ঘটনার সূত্র বোধহয় হারিয়ে যায় বৃদ্ধের কাছে। কোথায়
কি যেন একটা ভুল হচ্ছে। নমিতা জেনে শুনে মিথ্যা কথা বলবে না। অন্তত তার
বাপের কাছে নয়। এদিকে লতু স্পষ্টই মুখের উপর বলে গেল যে সে নিজের কানে
শুনেছে। ভূষণের পিসীমাও শুনেছেন ভূষণের কাছে। তাহ'লে ব্যাপারটা কি?
হরিপদ পণ্ডিত অগ্নাদিক থেকে শুরু করেন : আচ্ছা বেণ, তোর কথাই মেনে
নিলাম। ভূষণ প্রস্তাব করে নি এখনও। কিন্তু সে যে লতুকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক
এটা তো মিছে কথা নয়? ওদের দু'জনের মধ্যে যখন একটা অমুরাগ সঞ্চারিত
হয়েছে তখন প্রস্তাবটা আমরাও তুলতে পারি।

“ওদের দু'জনের মধ্যে যে অমুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে এটা তুমি জানলে কি ক'রে?
প্রস্তাব করলে ভূষণবাবুই যে পিছিয়ে যাবেন না তাই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?”

“আমি অন্ধ হ'লেও কিছু কিছু বুঝতে পারি মা। কাল দুপুরে যখন ভূষণ এল তখন

তোমার মা ঘুমচ্ছে। আমিও চুপ করে শুয়ে আছি। তুই তখনও ইঞ্চল থেকে ফিরিস নি। লতুর সঙ্গে ওদের ভূষণ অনেকক্ষণ ধরে ফিসফিস করে আলাপ করল। মাঝে মাঝে ওদের চাপা হাসিও কানে এল আমার। ওরা মনে করেছে আমিও বুঝি ঘুমাচ্ছি।”

নমিতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে : “কাল ভূষণবাবু এসেছিলেন? ঠিক জানো তুমি?”
 “জানি না? আমি শুনলাম ভূষণ লতুকে বললে ‘তোমার দিকিকে বল একটা ছোট ছেলে এসে জামা কাপড়গুলো দিয়ে গেছে। আমি এসেছিলাম তা বলবে না কিন্তু।’ লতু জবাবে বলল, ‘অতই বোকা কিনা আমি।’

নমিতার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ধরে আনে ভূষণকে। চিংকার করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল—কেন সে এভাবে খেলা করছে ওদের দু’জনকে নিয়ে। কী সে চায়? ওদের স্নেহের সংসারে এভাবে ভাঙন ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কি? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে বলে কি এভাবে পুতুল খেলা করবে তাদের নিয়ে ভূষণ? বাপ আজ মেয়েকে বিশ্বাস করে না—বোন দিদির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বুদ্ধ আর্ত কণ্ঠে ডাকেন : “নমু?”

“আমারই হয়তো ভুল হয়েছিল বাবা। বেশ তো লতুর বিয়ের যোগাড় দেখ। আমি এতসব কথা জানতাম না।”

“সে তো আমি জানিই। তুই ইঞ্চলে বেরিয়ে যাবার পর লতুও বেরিয়ে যায় ওদের বাড়ি। কখনও ভূষণ আসে এ বাড়ি।”

নমিতা চুপ করে থাকে।

“তাহলে আজ ও বেলা তোমাকে নিয়ে ভূষণদের বাড়ি যাস। ওর পিসীমার সঙ্গে কথা বলে আসিস। আর ঐ সঙ্গে অম্বর ওখানেও একবার যাস। ওরা ওদের কর্তব্য না করলেও আমাদের তো খোঁজ নেওয়া উচিত। বোনের বিয়ে। অম্বরকে তো এ সময় আলাচা সরিয়ে রাখতে পারি না।”

নমিতা কোন কথাই বলে না। তাই সে করবে। যৌবনসীমাস্তবর্তিনী মেয়েটির ক্রোধ নেই আর। শুধু একবার ভূষণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে : এই যদি তোমার মনে ছিল তাহলে আমাকে নিয়ে ও নিষ্ঠুর খেলা কেন খেললে তুমি? মিথ্যা স্বপ্নজাল কেন বোনাতে আমাকে দিয়ে?

নিতাই কবিরাজ সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন তাঁদের দাবি। পুরানো পঞ্চায়েতের বদলে নতুন অ্যাডহক কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন ব্যবস্থা

চলছে। বিষ্টুপদ, গোকুল, নবীন পতিভূণ্ডি প্রভৃতি পুরানো পঞ্চায়তের যারা সভা তারা প্রতিবাদ করতে আসে নি। কালের গতি-কে মেনে নিয়েছে তারা। আসলে ওরা প্রতিবাদ করবার ভরসা পায় নি। পুরানো কান্ডুনি যে তাদের ঘাটতে হ'ল না এটাই যথেষ্ট। অভিযোগের ফিরিস্তি তারাও জেনেছিল। সেগুলোর যে অবাবদিহি করতে হ'ল না এই নগদ লাভ। জনসেবা করার মোহও ঘুচে এসেছিল ওদের। ডোলের ব্যবস্থা থাকলেও ডামাডোলের বাজার আর নেই। লোকগুলোও সচেতন হয়েছে। আর নূতন সব অফিসার যারা আসতে শুরু করেছেন তাঁরা এক একটি চাঁজ! কোথা থেকে যে এইসব অপোগণ্ডুলোকে আমদানী করা হচ্ছে ওরা ভেবে পায় না। নয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচিই একটি উদাহরণ। ইনি সন্নিধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুরানো ইতিহাসগুলি খুঁটিয়ে দেখছেন। কী যে উদ্দেশ্য তা তিনিই জানেন। দলিলপত্র থেকে কতটা কি উদ্ধার করেছেন বুঝবার উপায় নেই। তবে পুরানো দিনের অনেক ইতিহাসই যে ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন এটা বোঝা যায়। ফলে ইদানীং সামলে চলতে শুরু করেছে বিষ্টু গোকুলেরাও।

যতীশবাবু অফিসের একজন পুরানো ঘাগী। বিষ্টুপদকে ডেকে আড়ালে একদিন বললেন, “আপনারা তো বাচলেন মশায়। জালা হয়েছে আমাদের। ঐ হারাম-জাদা নিতাই ঠাকুর্দা হয়েছে ঠর পরামর্শদাতা। সর্বদাই গুজ্জু ফুসফুস লেগেই আছে।”

বিষ্টু বলে, “আরে রয়েন। পেরথম্ ক'দিন ফৌস ফৌস করবই। তারপর ঠিক পোষ মানব। রার্বেকিষ্টো বুলি পড়ব। কত ঝাখলাম, কত ঝাখবাম্।”

যতীশবাবু বলেন, “আরে না মশাই সে জাতের লোক নয়। অতি বদমায়েস। ও কোনকালেই পোষ মানবে না।”

নামোল্লেখ না করলেও ছু'জনেই বোঝেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি সাহেবের কথাই আলোচনা হচ্ছে।

বিষ্টুপদ বলে, “এ্যাদিন আছিল কোই? ডেপ্টি?”

“ছাই! ডেপুটি হ'তে হ'লে লেখাপড়া করতে হয়। ঐর কোয়ালিফিকেশন জেল খেটেছেন! আরে বাবা খদ্দের টুপি পরলেই যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চালান যেত তাহ'লে ভাবনা ছিল না।”

বিষ্টুপদ বলে, “তা তো বটেই!”

“কাল আমার ডেকে কি বললে জানেন? বললে—‘ই’ রকের ত্রিনিবাসকে কুমিরের ছানা ক'রে আর কতদিন রাখবেন যতীশবাবু? ওটাকে এবার সত্যিই

পি. এল. ক্যাম্পে পাঠান।”

বিষ্টপদর চোখ বড় হয়ে যায়; বলে, “হেই কথাজ্ঞা কইলেন! কুমিরের পোলা? আপনে কি কইলেন?”

“আমি আর কি বলব? চূপ ক’রে রইলাম। কতটা জানে আর কতটা জানে না—তাই কি বুঝতে পারি? আমি শ্রেক চেপে গেলাম।”

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার ই-ব্লকের ত্রিনিবাসের রোজগারটা ছিল একটু বিচিত্র ধরনের। অভিনয় করেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হ’য়ে যেত তার। রক্তমন্ডের অভিনয় নয়, জীবন-নাট্যমঞ্চেই তাকে নিখুঁত অভিনয় ক’রে যেতে হ’ত বিভিন্ন ভূমিকা। ডিরেক্টার বার কয়েক রিহার্সাল দিইয়ে নিতেন আড়ালে। হুবহু নকল করত সে। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে যাওয়া হ’ত কর্তৃপক্ষের সামনে। কখনও কলকাতায়, কখনও কলোনীর অফিসেই। দাঁড়াতে হ’ত তাকে সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে যুক্তকরে। বিকলাঙ্গ তার দেহ। দুটো চোখই অন্ধ। ডান হাতখানা কনুই থেকে কাটা। মুখের একটা দিকে পুড়ে বীভৎস হয়ে গেছে। মিলে কাজ করত সে নারায়ণগঞ্জে না ঢাকায়। কারখানাতেই পা ফস্কে যায়—অগ্নিগর্ভ বয়লারটার জ্বাচে বালসে যায় চোখমুখ। হাতটাও পরে কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। পচনক্রিয়া শুরু হয়েছিল ঘা শুকোবার সময়। করুণার পাত্র ত্রিনিবাস। মেক আপের দরকার হ’ত না তার।

পরিদর্শনকারী উপরওয়ালা অফিসার প্রশ্ন করেন: “তোমার নাম হরেকৃষ্ণ দেবনাথ?” ত্রিনিবাস নন্দী বলে, “আইজ্ঞা হাঁ হুজুর।”

“পরিবারে আর কে আছে?”

“কেউ নাই হুজুব! বইবেটা কেউ নাই! এখন হুজুর না দেখলি মক্কে। নিচ্চই মক্কে।” কেঁদে মুলো বাড়িয়ে হুজুরের ফিতে বাঁধা জুতোটা জড়িয়ে ধরে। বিব্রত হন কলকাতার অফিসার ভদ্রলোক। করুণা হয়। হওয়াই স্বাভাবিক, বলেন, “ওঠ, ওঠ আচ্ছা স্টারভেসান ভোল পাবে তুমি। ফ্রি রাশানের কার্ড দেওয়া হবে তোমার নামে। সপ্তাহে-সপ্তাহে ক্যাস ভোল আর চাল-ভাল নিয়ে যাবে অফিস থেকে। বুঝেছ?”

ঘাড় নেড়ে ত্রিনিবাস জানান বুঝেছে। চোখ মুছতে মুছতে উঠে যায়। ওকে হাত ধরে ই-ব্লকে পৌঁছে দিয়ে আসে যতীশবাবুর কর্মচারী। বাড়ি পৌঁছানোর পর তার হাতে গুঁজে দেয় একটা ছুঁটাকার নোট। তাই দিয়ে সংসার চালায় ত্রিনিবাস। এছাড়া স্টেশনে ভিক্ষাও করে। সেটাই তার প্রধান উপজীবিকা। অভিনেতা হিসাবে সেটা উপরি রোজগার। একী মাছুষ। চলে যায় ভালোই। আবার এক-

দিন হয়তো ডাক পড়ে। আবার এসে দাঁড়ায় ক্যাম্প অফিসে। অপর একজন অফিসার প্রশ্ন করেন : “তোমার নাম জীবন পর্বত ?”

হুহু ক’রে কঁদে ওঠে শ্রীনিবাস : “আইজ্ঞা না হুজুর। জীবন আমার নাম নয় !”

চমকে ওঠেন যতীশবাবু ! বেটা আজ বলে কি ? এত রিহার্সাল বার্থ হয়ে গেল ? শ্রীনিবাস কিন্তু ভুল করে নি। ডিরেক্টরের উপর টেকা দিয়ে একহাত মৌলিক অভিনয় দেখিয়ে দেয়। সংলাপও তার নিজস্ব : “জীবন আমার নাম নয় হুজুর ! আমার নাম মরণ ; মরণ ! বাপে নাম দিছিল জীবন ! জীবন মইয়া গ্যাছে গা ! এখন আমি মরণ। হায় ঠাকুর, মরণও হয় না আমার !”

মেজের উপর বিকৃত মুখখানা ঠুঁকতে থাকে ও।

অফিসর যতীশবাবুর দিকে ফিরে বলেন, “ইটস্ এ পিটি ছাট যু ডিডন্ট রেকমেণ্ড হিস্ কেস আর্লিয়ার। পি. এল. ক্যাম্প গেলে দেখি যত জোয়ান মর্দ বসে বসে পার্মানেন্ট লায়াবেলিটি হ’য়ে ডোল খাচ্ছে—আর এদিকে সত্যিকারের সাফারার পড়ে আছে কলোনৌতে। আপনাদের ইনেক্সিসিয়েন্সির জন্য গোটা ডিপার্টমেন্টের বদনাম হয়।”

যতীশবাবু মুখটা কাচুমাচু করেন। এই কেসটা ইতিপূর্বে কেন পাঠানো হয় নি তার কারণ দেখাতে বলেন, “ও স্তার নতুন এসেছে কলোনৌতে।”

“আই সী ! কতদিন হ’ল এসেছো তুমি এখানে ?”

শ্রীনিবাস চুপ ক’রে থাকে। সে নিজে এসেছে বছর পাঁচেক ; কিন্তু এখন সে জীবন পর্বত। জীবনের নাম কবে থেকে কলোনীভূক্ত করা হয়েছে জানা নেই তার। বলে, “শেরাল নাই হুজুর !”

যতীশবাবু বলেন, “মাস দুই হবে ?”

চতুর শ্রীনিবাস সামলে নেয় : “হু কর্তা। তা হইব। ইটা তো অগ্রান ? পুজার সময় আইছি আজ্ঞা।”

“আচ্ছা যাও তুমি। ফ্রি ডোলের বন্দোবস্ত হবে তোমার।”

ফিরে যায় শ্রীনিবাস। জীবন পর্বতের অভিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে সে বাড়ি ফেরে।

সেই শ্রীনিবাস !

বাগচি সাহেব একেই বলেছেন ‘কুমিরের ছানা’। যতীশবাবুর ঘাবড়ে যাওয়া অকারণ নয়।

এমনি কত তুচ্ছ ইতিহাস !

বাগচি সাহেবের অল্প বয়স। অক্লান্তদার। সাদাদিন অফিস ক’রে যখন বাড়ি যান

তখন একগাদা ফাইলপত্র সঙ্গে নিয়ে যায় আদালি। পুরানো দলিল। সব উন্টে-পাণ্টে দেখছেন তিনি। যতীশবাবু দল শক্তিত হয়। খাতাপত্র অবশ্য ঠিকই আছে। তবে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কোথায় সাপ বেড়িয়ে পড়ে তার ঠিক কি? সন্ধ্যার পর বাগচি সাহেব নিজেই টাইপ করতে বসেন। সকালবেলা অফিসে এসে ডাকেন ডেসপ্যাচ ক্লার্ক মিহিরকে।

“ইন্স রেজিস্ট্রারখানা নিয়ে আসুন তো।”

ইন্স রেজিস্ট্রারে পাঁচ-সাতখানা মৌমা নাশ্বার নিজের হাতেই বসান। ‘সবজ্জৈ’এর ঘরে লিখে দেন ‘কন্ফিডেন্সিয়াল!’ পিয়ন শীলমোহর করে ঠরই সামনে। খাম-গুলোর উপর ডেসপ্যাচ ক্লার্ক কম্পিত হস্তে টিকিট আঁটে।

যতীশবাবু নিয়কণ্ঠে বলেন, “যাচ্ছে কোথায়? মিহির?”

“অকল্যাণ্ড।”

“সব ক’খানাই?”

“হ্যাঁ!”

“শালা!”

এ জাতীয় কথোপকথন প্রায়ই আজকাল হয় অফিসে। কাঁটা হয়ে আছে সবাই। মাঝে মাঝে আসতে শুরু করল বদলির অর্ডার। পুরানো অনেকেই চলে গেল। এল অচেনা ছেলের দল। এরা ডেপুটেশান দেয়। ফল হয় না।

মিহির বলে, “বাপার কি যতীশদা? খোল-নল্চে সবই কি বদলে যাবে নাকি।”

“বদলাবে না? না হ’লে নিজেদের ভাইপো ভাগ্নেগুলো চাকরি পাবে কি ক’রে? নিজেই বুঝবেন। সব পুরানো স্টাফ চলে গেলে ‘ওন্ড আন্ডিসাইডেড’ কেসগুলো কি ক’রে মেটান আমিও দেখব।”

“কেন সে তো আপনিই আছেন?”

“আমি? আমি কি বলব? কে কোথায় কি ক’রে রেখে গেছে তার সব জবাবদিহি করব আমি? দায় পড়েছে আমার।”

“তা দায় আপনার বই কি। আপনি তো অফিসের ওভার-অল ইনচার্জে ছিলেন।”

যতীশবাবু চীৎকার করে ওঠেন : “তাই বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? এই যে উনি আজ দিন সাতেক ধরে সি. আই. সীটের ফাইলটা আটকে রেখেছেন বাড়িতে—রেজিস্ট্রারখানাও নিয়ে গেছেন—আমি কি বুঝি না কি করছেন তিনি? যখন বললাম শীতলকে বদলি করবেন না—তখন তো শুনলেন না—সে থাকলে সেই ব্যক্তি পোয়াত। ধর যদি হিসাবে এখন কম-বেশী হয় কোথাও তবে কে জবাব দিহি করবে?”

মৃণাল বলে, “বেশী হ’লে আমাকে দায়ী করবেন দাদা! কম হ’লে অবশ্য মুগ্ধকিল।
কি বলিস মিহির?”

দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। বন্ধু ওরা দু’জন। পাপের কারবারে
ছিল না কোনদিন। শীতল ছিল স্টোরের চার্জে। যতীশবাবু প্রিয়পাত্র। বদলি
হয়ে গেছে সে। নতুন যে ছোকরা এসেছে—সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চার্জ নিয়েছে। চাবি
আছে যতীশবাবুর কাছে। মাল গুন্ডি ক’রে সে দায়িত্ব নেবে।

মিহির বলে, “শীতল বদলি হয়ে যাওয়াতে দাদার বড় অসুবিধা হয়ে গেল, না দাদা?”
যতীশবাবু চটে ওঠেন: “মেলা বকবক ক’র না দিকিনি। যা বোঝ না, তা নিয়ে
কথা বল না। যা করছ তাই কর। তোমার আর কি? বসে বসে খামের উপর
টিকিট ঝাটো! বইকে চিঠি লিখতে গিয়ে যদি সার্ভিস-স্ট্যাম্প কিছু সরিয়ে থাক
তা’লে সেই হিসাবটা মিলিয়ে রাখ বরং।”

মৃণাল বলে, “দাদা ভীষণ চটেছেন মনে হচ্ছে?”

শুধু মেরে বসে থাকেন যতীশবাবু।

মিহির বলে, “টিকিটের হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেব দাদা। কিছু ভাববেন না আপনি।
করোগেড টিনের হিসাবটাও যদি না মেলে তবে আপনার ধাবড়াবার কি আছে?
কেউ তো বলতে পারবে না ব্যারাকপুরের বাড়িগানা আপনি এই টিন দিয়ে
তুলেছেন—অথবা টিন বিক্রি ক’রে কিছু নগদ কারবার করেছেন আপনি।”

লাফিয়ে ওঠেন যতীশবাবু: “বলি কাজকর্ম করতে দেবে—না ভানর ভানরই
করবে সারাদিন? অফিসটা আড্ডাগানা নয় বুঝলে? এখানে মুগ্ধকিল কাজ করতে
হয়।”

বলে মুখবাদান ক’রে এক গোছা পান পুরে দেন গালে! ঘস্কে ক’রে কলম টানেন
তিনি নোট শীটে।

আবার দৃষ্টি বিনিময় হয় মৃণাল আর মিহিরের। কৌতুকদীপ্ত সহাস্ত-দৃষ্টি।

জঙ্গনের হাসপাতালে আজকাল একাই আসতে পারে কামিনী। নিতাই ঠাকুরদা
ভর্তি ক’রে দিয়ে যাবার দিন সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে আসেন
অবশ্য তিনি। খোজ খবর নিয়ে যান। নিতাই ঠাকুরদার বন্দোবস্তে একটা ফ্রি
র্যাশনের ব্যবস্থাও হয়েছে আজকাল। নিতাইপদর স্বেচ্ছাসেবকের দলের কয়েকটি
ছেলে মাঝে মাঝে খোজখবর নিয়ে যায়। গোরাকে নিয়ে কামিনীর দিন কেটে
যায় কোন রকমে। ধরে রোগী নেই। অর্ধেক কাঁচ কমে গেছে। ক্রমশ সূত্রে
উঠছে অনিমেয়। দু’তিন দিন বাদে গোরাকে নিয়ে কামিনী দেখা করতে যায়।

কখনও যোগেন নায়েক, কখনও অল্প কোন ছেলে থাকে সঙ্গে ।

বিষ্টুপদ কামিনী-কাঞ্চনের লোভ একেবারেই ত্যাগ করেছে। অনিমেষ হাস-পাতালে যাওয়ার খবরটা সে জানতো না। অনেকদিনই অপেক্ষা করেছিল সে—তার দেওয়া শাড়িগাণিতে তখনদেহ ঢেকে কামিনী এসে দাঁড়াবে তার দোকানে। সে এল না। কোতুহল হ'ল বিষ্টুপদর! ব্যাপারটা কি? অনিমেষ কি ভালো হ'য়ে উঠল? কিন্তু ওদের সংসারটা চলে কি ক'রে? উপষাচক হ'য়ে যাওয়া ভালো হবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না। তারপর একদিন লক্ষ্য করল ছোট ছেলেটির হাত ধরে কামিনী তার দোকানের সামনে দিয়ে দিবা গটগট ক'রে চলে গেল। সঙ্গে রয়েছে বাচ্ছু পাল। ঠাকুরদার এক চ্যালাচামুণ্ডা বিষ্টুপদ তাই আর দোকান থেকে নেমে এল না; কিন্তু অবাক হ'য়ে সে দেখলো মেয়েটার পরনে একখানা নতুন শাড়ি। তার দেওয়াখানা নয়—অল্প একটা। মুখ-চোখ দেখে অনশনক্লিষ্টা বলেও মনে হ'ল না অবাক হ'ল বিষ্টুপদ। তার অবর্তমানে তাহ'লে বাচ্ছু পাল এসে অবিকার করেছে মেয়েটাকে? বাচ্ছু পাল? ছেলেটাকে তো সে ভালো বলেই জানতো। আর মেয়েটাই বা কি। অসুস্থ স্বামীকে বাড়িতে একলা ফেলে পরপুরুষের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! অহুতাপ হয় বিষ্টুপদর। কেন বোকার মতো দূরে স'রে রইল সে?

ছুদিন পর বিষ্টুপদ আবার দেখল মেয়েটি বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে—ছেলের হাত ধরে। এবার সঙ্গী বাচ্ছু পাল নয়—যোগেন নায়েক। বিষ্টুপদ নিজের মনেই বলে, 'বা! এতো দেখি একেবারে পঞ্চপাণ্ডকেই গেঁথে ফেলেছে!'

আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না বিষ্টুপদর পক্ষে। পরদিন সন্ধ্যায় সে ঘুরঘুর করছিল কামিনীর বাড়ির আশেপাশে। ধরে ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতে সাহস হ'ল না ওর—কি জানি কোন পাণ্ডব আছেন ভিতরে কে জানে? ওপাশে স'রে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দেবার চেষ্টা করলে। চেষ্টা ফলবান হয় না। হঠাৎ ঘাড়ের উপর পড়ল একখানা লৌহকঠিন হাত। বিষ্টুপদ ঘুরে দেখে স্বয়ং মধ্যম পাণ্ডব যোগেন নায়েক। ঠাকুরদার স্বেচ্ছাসেবক দলের একটা গুণ্ডা।

যোগেন বলে, “এ বাড়িতে একজন মহিলা একা থাকেন।”

“হ জানি। কামিনী। তা হইছে কি?”

“হয়েছে এই যে তিনি আপনার রক্ষিতাও নন, অরক্ষিতাও নন। ফের যদি কোন-দিন এই জানালা দিয়ে মুণ্ড গলাতে দেখি তবে মুণ্ডখানা রেখে সেদিন বাড়ি যেতে হবে। বুঝেছেন?—যান!”

“কী কণ্ড! এত বড় আশ্চর্য! জান আমি লোকভা কে? আমি বিষ্টুপদ মহুমদার!”

“জানি আপনি বিটুপদ হারামজাদ! কলোনীতে আমাকে না চেনে কে? কিন্তু আপনি বোঝেন জানেন না সেই স্বনামগুণ বিটুপদ হারামজাদের মুণ্ডখানি এককিলে স্টেটে দেবার জন্তে কলোনীর শতখানেক ছেলের হাতের মুঠো নিস্পিস্ করছে—শুধু ঠাকুর্দার হুকুম পাই নি বলে পারছি না আর কি বলার আছে বলুন?” বিটুপদ জোয়ান যোগেন নায়েকের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জনশূন্য পথটার দিকে একবার দেখল। ওর কথাটা যে মিথ্যা নয় এটা আর যেই জাহুক না জাহুক স্বয়ং বিটুপদ হাড়ে হাড়ে জানে। এসব ছেলের অসাধ্য কাজ নেই। মিনমিনে গলায় বলে, “আমারে অপমান কর তুমি?”

“অপমান? অপমান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। আমার ইচ্ছা কীচক বধ করার। কিন্তু কী করব বলুন—ঠাকুর্দার হুকুম পাই নি। তবে আর একটি কথা বললে বিনা হুকুকেই কীচকবধ খতম করব। বিশ্বাস না হয় তবে আর একটা কথা বলে দেখুন।”

বিটুপদ সম্ভবত বিশ্বাস করে। মধ্যম পাণ্ডবের পক্ষে কীচকবধটা আর অসম্ভব কি? দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে স’রে পড়ে। প্রাণথুলে হাসতে থাকে যোগেন নায়েক।

কামিনী এতকথা জানতো না। সে শুধু দেখেছে বিটুপদ আর তার ছায়া মাড়ায় না। স্বেচ্ছাসেবক দলের অনেকগুলি ছেলেই আসে ওর কাছে। রাখাল, কানাই, যোগেন, বাচ্ছু! কলোনীরই সব ছেলে ছোট ভাইয়ের মতো এসে আবদার করে। গল্প করে। কোনদিন হয়তো একপাশ কাঁচা চিনে বাদাম এনে বলে, “বৌদি, ভেজে রেখে দেবেন। আমরা মাঝে মাঝে এসে খাব।”

কখনও লাউটা বেগুনটা এনে দেয়। বলে, “ওবেলা এসে একটু তরকারি খেয়ে যাবো বৌদি।”

হয়তো আসে। হয়তো আসে না।

ওদের ভালোবাসার দান গ্রহণ করতে বাধে না কামিনীর। সপ্তাহান্তে রাশনটাও ওরাই দিয়ে যায়। ঠাকুর্দা একখানা শাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের টাকায় নয়। সরকারী সাহায্যই এসে পৌঁছায় ওর ঘরে। এরা শুধু চিনির বলদ। কামিনী ভাবে এদেরও তো অভাব অননের সংসার। এরা তো চুরি করে না আগের ওদের মতো? আবার শ্রদ্ধা বাড়ে মানুষের উপর। মানুষ মাঝেই তাহ’লে পশু নয়! স্বার্থই সবার মূলমন্ত্র নয় তা হ’লে। ভালো খারাপের মেশানো এ দুনিয়া ভাবে কামিনী। এখানে বিটুপদও থাকে যোগেন নায়েকও থাকে, এখানে লালু ডাক্তারও প্রাক্টিশ করে, নিতাই কবিরাজও রোগী দেখেন, এ দুনিয়ায় যতীশ-

বাবুবাও সরকারী কাজ করেন, বাগচি সাহেবের মতো সরকারী অফিসারও আছে।

নমিতাকে একলাই আসতে হয় ভূষণের বাড়ি। লতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। বাড়ি থেকে অবশ্য বিন্দুবাসিনীকে নিয়েই বেরিয়েছিল; কিন্তু তিনি কিরে গেলেন মাঝ-পথ থেকে। বস্তুত তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে একাই এল নমিতা।

বিন্দুবাসিনীকে কিরতে হ'ল অবশ্য অল্প কারণে।

ঈরা ভূষণের বাড়ি যাবেন বলেই বেরিয়েছিলেন। পথে তিনি প্রস্তাব করলেন অল্পকে দেখে যাবেন। নমিতা প্রথমে রাজি হয় নি। কিন্তু বিন্দুবাসিনী অনেকদিন পর পথে বেরিয়ে মনটা বদলে ফেলেছেন। লতুর বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছেন। দুদিন পরেই হবে লতুর বিয়ে। বড় ছেলেকে তো তখন সরিয়ে রাখতে পারবেন না। খবরটা নিয়ে যাওয়াই ভালো। তাছাড়া অনিমেষের দোষটা কি? বাবলুকে পাঠিয়ে খবরটা দেয় নি বলে কিন্তু ত্যাজ্যাপুত্র করতে হবে না তাকে। নমিতা কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখে—সে বাড়ির ভিতরে যাবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিন্দুবাসিনী প্রতিবাদ করেন নি। তিনিও স্থির করেছিলেন কামিনীর সঙ্গে কথাও বলবেন না। অনিমেষকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে চলে আসবেন। বঁকে বুকে দেওয়া দরকার সম্পর্কটা শুধু পুত্রবধুর সঙ্গেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে। পুত্রের সঙ্গে নয়।

গলির মোড়টা ঘুরেই হাঁদের থেমে পড়তে হ'ল।

কামিনী সদর দরজায় তালা লাগিয়ে গোয়ার হাত ধরে কোথায় চলেছে। ওর সঙ্গে রয়েছে একজন ছেলে। বছর বিশেক বয়স। স্বন্দর স্বগঠিত চেহারা। নমিতা অনেকবার দেখেছে ওকে ঠাকুরদার গুথানে—নামটা জানা নেই। কলোনীরই ছেলে। কামিনীর মুখচোখ পরিষ্কার। একটু প্রসাধন করেছে বলে মনে হয়। পরিধানে একটা আনকোরা নতুন শাড়ি। খালি পা—আলতা পরেছে। কপালে একটা সিঁহরের টিপ। ড্রেস ক'রে কাপড় পরে নি যদিও—কিন্তু বাইরে যাবার জন্য বঁচি দিয়েই সাধারণ ভাবে পরেছে শাড়িখানা। ব্লাউজটাও নতুন নইলে নমিতা চিনতে পারত।

কামিনী গোয়ার এক হাত ধরেছে—ছেলেটি ধরেছে আর এক হাত। তার ও হাতে একটা গাঁদা ফুলের তোড়া। গায়ে টুইলের হাফশাট—পরিষ্কার ধুতি—পায়ের স্ট্রাওল।

নমিতারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কামিনী দেখতে পায় নি ওদের। বেশ সপ্রতিভ ভাবে নমিতার নাম-না-জানা যুবকটির সঙ্গে গল্প করতে করতে ওয়া

এগিয়ে গেল। নমিতা হঠাৎ লক্ষ্য করল ছেলেটি গোরাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল পানের দোকানের দিকে। দু'খিলি পান কিনে এনে একটা নিজের মুখে পুরে দিল—আর একটা দিল কামিনীকে। কি একটা কথা বলল সে। অনেক দূর থেকে বলে শোনা গেল না। ছ'জনেই হেসে উঠল কথাটার। এটা বোঝা গেল।

ওরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইল। ব্যাপার কি ?

নমিতা বলে, “বাড়িতে তালা দিয়ে ও কোথায় গেল? দাদা তাহ'লে কোথায়?”

বিন্দুবাসিনী জবাব দিলেন না। নিঃসন্দেহে অনিমেষ ভালো হ'য়ে গেছে। আলতাপরা সিঁদুর-মাথা পুঁত্রবধু যখন বাড়িতে তালা মেয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বার হচ্ছেন তখন অনিমেষ যে ভালো হ'য়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে এটা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু কামিনীর এতদূর অধঃপতন হবে? ছেলের হাত ধরে প্রকাশ্ত দিবালোকে সাক্ষাভ্রমণে বের হচ্ছে সে পরপুরুষের সঙ্গে ?

“আরে নমু যে! কই যাও?”

এগিয়ে আসে বিষ্টুপদ।

“দাদা বোদিয়া কোথায়?”

“তোমাগো বউদি? এই তো বাহির হইয়া গেল গা। দেখ নাই?”

“হাঁ, দেখলাম। সঙ্গে ওটিকে বলুন তো?”

“অরে চিন না? রাখাল। রাখাল দেবনাথ। মহা হারামজাদ ছুকরা!”

“কোথায় গেল বলুন তো ওরা।”

হাসে বিষ্টুপদ। ফোগলা দাঁতের মধ্য থেকে জিবটা বার হ'য়ে আসে। বলে,

“তোমারে আর কি কম, কও নমু। নিতি নূতন ছুকরা আসতেছে! সব কথা তো কণ্ডন যায় না। তোমাগো ভালোবাসি—তাই না কই।”

বিন্দুবাসিনী বিষ্টুপদের সঙ্গে কথা বলতেন না। এ সময়ে কিন্তু তিনি আর সঙ্কোচ না ক'রে প্রশ্ন ক'রে বসলেন : “কিন্তু অম্ব কোথায়? ঘরে তালা মার্সা কেন?”

বিষ্টুপদও লক্ষ্য করে ঝাঁপের দরজায় তার দিয়ে একটা রিং বানিয়ে তাতে তালা লাগানো আছে। অনিমেষ কোথায় আছে, কেমন আছে বিষ্টুপদ জানতো না। অনেকদিন এ পথ মাড়ায় নি সে। নিজের মতো দোকানে এসে কাজকর্ম ক'রে গেছে। এখন সে মনগড়া একটা জবাব দেয়।

“কই গেছে গা। অনিমেষডার যুদি লক্ষ্য থাকতো তাহ'লে কি বোড়ার এ দশা হয়।”

বিন্দুবাসিনী আর আলোচনা বাড়তে দেন নি। নমিতাকে বলছিলেন, চল “বাড়ি চল।”

“সে কি ; ওখানে যাবে না ?”

“না, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ থাক।”

নমিতা বাড়ি পৌছে দিয়ে এসেছিল বিন্দুবাসিনীকে। ব্যাপারটার বিন্দুবাসিনী যতটা আহত হয়েছিলেন নমিতা ততটা হয় নি। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেয়েছিল যেদিন সে ভোররাত্রে খিড়কির দরজায় কামিনীকে কার সঙ্গে টাকাকড়ি সম্বন্ধে কি যেন কথা বলতে শোনে। এই তো তার জানা দৃশ্য। এ দৃশ্য তার চরমক্ষে এতদিন পড়ে নি কারণ সে এ পথে আসে না। মনশ্চক্ষে এ দৃশ্য তার অজানা নয়। মা বোধহয় মনে মনে বিশ্বাস করতে পারেন নি। রাগারাগি ক’রে জেদেয় বশে পৃথক হ’তে চেয়েছিলেন। আজ হঠাৎ এ সংবাদে তাই বেশী কাতর হ’য়ে পড়েছেন।

নমিতা বলেছিল, “তুমি তাহ’লে বাড়িতে থাক। আমি একাই যাই ?”

বিন্দুবাসিনী বলেন, “আজ থাক না নমু। যাত্রাটা আজ শুভ নয়।”

“তুমিও যে ঠাকুরদার মতো শুরু করলে ! না আমি একাই যাই। অন্তত প্রাথমিক কথাটা পেড়ে আসি। ভুল বোঝাবুঝি যখন হয়েছে তখন যতশীঘ্র সম্ভব সেটা মিটিয়ে ফেলা দরকার। নাহ’লে পিসীমা অশ্রু অগ্রসর হ’তে পারেন।”

কথাটা ঠিক। বিন্দুবাসিনী রাজি হয়ে যান।

নমিতার অশ্রু গরজ ছিল আসলে। তার ভীষণ কোতুহল হচ্ছিল জানতে কি ক’রে পিসীমা জানতে পারলেন ভূষণ প্রস্তাব করেছিল নমিতার কাছে।

ভূষণ বাস করে একে ৭২৪ নং প্লটে। কলোনী আর পাঁচখানা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির এমন কিছু প্রভেদ নেই। টিনের চালা। দরমার বেড়া। ঝাঁপের জানালা-দরজা। বাড়ি তৈরির লোনের অনেক টাকাই ভূষণ বিনিয়োগ করেছে তার ব্যবসায়ে। তাই পাকা দেওয়াল তোলা সম্ভব হয় নি ওর পক্ষে। সে হিসাবে কলোনীর সাধারণ বাড়ির অল্পপাতে ভূষণের বাড়িটা কিছু নিকুঠই। তবু এ বাড়িতে চুকবার সময় নমিতার মনে হয়—এই সেই গৃহ যেটাতে বধুবশে আসবার স্বপ্ন দেখেছে সে এতদিন। এটা তার কল্পলোকের স্বপ্নরবাড়ি। কিন্তু না, ও চিন্তা আর নয়। মনকে সে শাসন করে।

ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করে চারদিক। সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি। দেওয়ালে খানকয় ছবি। ক্যালেন্ডারের প্রাচুর্য। অনেকগুলি গতবৎসরের। এক কোণে বিছানাটা গোটানো রয়েছে। গোটা দুই তোরঙ্গ। একপাশে একটা ভাঙা হারমনিয়াম—হয়তো এককালে ভূষণ বাজাতো কিংবা তার জ্বী। ও কোণে একটা ছোট জলচৌকি। দেওয়ালের গায়ে লাগানো। তার উপর লক্ষ্মীর আসন পাতা। পটের ঠাকুর।

সিংহের প্রাণেপে মুখখানা ঢাকা পড়েছে। পা দুটিও চন্দন মাখানো ফুলে ঢাকা। একটা ছোট পিতলের গেলাসে জল আর একটা রেকাবিতে বাতাস। কালো ভেঁয়ো পিঁপড়ের ছেকে ধরেছে বাতাসাটাকে। ঘরে লোক নেই।

ঘর পার হ'য়ে ভিতরের বারান্দায় আসতেই দেখা হ'য়ে গেল এক প্রৌঢ়া বিধবায় সঙ্গে। প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিলেন তিনি। নমিতা এসে প্রণাম করে : “আপনি তো পিসীমা ? আমি নমিতা।”

“ও, তাই বল। মুখখানা দেখেই চেনা চেনা লাগছে। তোমাদের দুই বোনের বেশ মিল আছে। এস মা বল।”

একটা আসন এগিয়ে দেন তিনি। নমিতা কলসটা সরিয়ে দেয়—মাটিতেই বসে পড়ে। বলে, “মিঠুকে দেখছি না। গেল কোথায় ?”

“ও মা, মিঠুকে এই মাত্র এসে নিয়ে গেল যে লতু।”

“লতু এসেছিল বুঝি বিকালে ?”

“হাঁ ওতো মিঠুকে না দেখে একদিনও থাকতে পারে না। রোজ আসে। এত ভালোবাসে মিঠুকে। আর মেয়েটাও ওকে পেলে যেন আর কিছু চায় না। কখন লতুমাসী আসবে তাই খালি জিজ্ঞাসা করে।”

নমিতা বলে, “হ্যাঁ, ছেলেপিলে বরাবরই খুব ভালোবাসে লতু।”

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন পিসীমা, “তাই দেখলাম। সেই জন্তই সেদিন গিয়েছিলাম আমি তোমার মায়ের কাছে। তুমি তখন বাড়ি ছিলে না। তা দাও না তোমার বোনকে ঐ মা-মরা মেয়েটাকে মাহুষ করার ভার।”

নমিতার হাতদুটি চেপে ধরেন পিসীমা। নমিতা বাস্তব হ'য়ে বলে, “সে তো আমাদের সৌভাগ্য পিসীমা। আমরাই কণ্ঠাপক্ষ, কোথায় আমরাই খোশামোদ করব আপনাকে—”

“না, তাই বলছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি আপত্তি করেছ, তাই ভাবলাম—”

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে নমিতা বলে, “আচ্ছা এই কথাটা রটলো কি ক'রে বলুন তো ? মাও তাই বলছিলেন সেদিন। আমি তো আপত্তি করি নি। আমি শুধু ভাবছিলাম ওদের বয়সের তফাতটা।”

“তা হোক। ওরা দু'জনেই যখন দু'জনকে পছন্দ করেছে...”

“তা হ'লে তো কোন কথাই নেই। কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় ছিল লতুকেই। দ্বিতীয়পক্ষের বর যদি ওর মনে না ধরে—”

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।—“দ্বিতীয় পক্ষ ! কি বলছ তুমি ? কে দোজবরে ?”

“কেন, ভূষণবাবু?”

হাসেন এবার পিসীমা : “কে বললো তোমায়? বাজে কথা।”

“বাজে কথা! মিঠুয়া তবে কে?”

“আমার নাতনী—”

“আর স্ত্রীবালা?”

“আমার ভাইঝি। মিঠুয়া হ’তে গিয়েই স্ত্রীবালা মারা যায়। মিঠুয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছে। তা করবে না কেন বল? মিঠুয়া আমার হাতেই মাহুষ হচ্ছে; কিন্তু আমি বুড়ো মাহুষ আর সামলাতে পারি না। ভূষণকে বলি একটা বিয়ে করে বউ আনতে—তা ছেলে কানেই তোলেনা—”

নমিতার কানেই যাচ্ছিল না কথাগুলো! সে ভাবছিল কেন তবে মিথ্যা কথা বললো ভূষণ। সত্যকথা বলা কি ওর ধাতে নেই? প্রয়োজন অপ্রয়োজনে শুধু প্রতারণা করাই তার পেশা?

পিসীমা তখন এক নাগাড়ে বলেই চলেছেন নিজের কথা।

লতু মেয়েটির যাতায়াত বরাবরই ছিল এ বাড়ি। ভূষণের সঙ্গে প্রথমটা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া হ’ত। লতুর ছেলেমাহুষি নিয়ে ভূষণ তাকে ক্যাপাতো। ডাকতো ‘ঠানুদি’ বলে। লতুও ছেড়ে কথা বলতো না। এসে নালিশ করতো পিসীমার কাছে : “তোমার ঐ ভূষণগুণাকাক ভাইপোকে বারণ ক’রে দিও পিসীমা—যেন আমার পিছনে না লাগে।”

পিসীমা শুধু হাসতেন।

তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন মা-হারা মিঠুয়া ঐ মেয়েটার একান্ত বাধ্য হ’য়ে উঠেছে। লতুও মিঠুকে নিজের বুকুর পাজরের মতো ভালোবাসতে শুরু করেছে। একদিন মিঠুয়াকে না দেখতে পেলে সে অস্থির হয়—মিঠুয়াও কান্নাকাটি শুরু ক’রে দেয়। তখন পিসীমার মনে হ’ল ঐ মেয়েটাকেই যদি ভার দেওয়া যায় মিঠুয়াকে মাহুষ করার। স্ত্রীবালা যখন মারা যায় তখন মিঠুয়া এতটুকু। পিসীমা ভূষণকে বিয়ে করতে বলেছিলেন; কিন্তু ভূষণ হিসাবী লোক। ব্যবসাটা ভালো ভাবে না চলতে শুরু করলে সে সংসারে ভাগীদার বাড়িতে চায় না। বলে বলে হার মেনেছেন পিসীমা। ইতিমধ্যে তিনি আরও অশক্ত হ’য়ে পড়েছেন। ওপারের ডাক এসে পড়েছে তাঁর। ভূষণকে তিনি সংসারি দেখে যেতে চান। তাছাড়া মিঠুয়ার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা না ক’রে গেলে ওপারে গিয়ে ভাই-বোয়ের কাছে কৈফিয়ত দেবেন কি? এদিকে দুরন্ত মিঠুয়াকে সামলানোও দায় হ’য়ে উঠেছে আজকাল। এমন সময়ে দৈবপ্রেরিত জ্ঞানকর্তার মতো এল লতু। পিসীমা

রোজই ভাবেন ভূষণের কাছে কথাটা পাড়বেন, রোজই ইতস্তত করেন।

এত আকাঙ্ক্ষার জিনিসটা যদি প্রত্যাখ্যাত হয় সেই ভয়েই বলা হয়ে ওঠে না।

একদিন লতু বলে, “পিসীমা, মিঠুয়াকে নিয়ে যাই আমাদের বাড়ি?”

“ওমা এখন যে ও স্বান-খাওয়া করবে।”

“দিদি স্থলে চলে গেছে। আমিই স্বান করিয়ে খাইয়ে দেবো। তারপর দিদি ফিরে আসবার আগেই আবার দিয়ে যাবো ওকে।”

পিসীমা হেসে বলেন, “এতই যদি দরদ মিঠুয়ার ওপর—তবে নে না মেয়েটাকে একেবারে—তুইই মাছুষ করবি ওকে।”

লতু চোখ তুলে তাকায় পিসীমার দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়।

“আসবি আমার ঘরে? নিবি মিঠুয়াকে তুই?”

আনত নয়নে লতু বলে, “সে হবার নয় পিসীমা।”

“হবার নয়? কেন?”

লতু চুপ করে থাকে। পিসীমা কিন্তু চুপ করে থাকার পাত্রী নন। লতুকে বসিয়ে জেরার পর জেরা করতে থাকেন তিনি। প্রথমটা গোপন করবার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সব কথাই লতুকে স্বীকার করতে হয়। লতু জানায় যে সে নিজের কানে শুনেছে দিদি বলেছে ‘লতুর সঙ্গে কোন নিকট এবং মধুর সম্পর্কের যে প্রস্তাব আপনি করেছেন তাতে আমি রাজি নই।’ লতু আরও বলেছিল—সে যে এ বাড়ি আসে তা দিদি জানে না। সে লুকিয়ে আসে।

খবরটা শুনে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক পিসীমা উল্লসিত হ’য়ে উঠেছিলেন। তা হ’লে তো আসল বাধাটাই কেটে গেছে। ভূষণ নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছে। ভূষণ রাজি! ব্যাস্ আর ভাবনা নেই। নমিতা বা তার বাপ মাকে রাজি করানোর দায়িত্ব তিনি নিজেই নিতে পারবেন। ভূষণ আর লতু দু’জনে যদি পরস্পরকে বরণ করতে চায়—তবে কে ঠেকাবে সেই মিলন? সেইদিনই তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে।

সমস্ত ঘটনা শুনে গেল নমিতা স্তম্ভিত হৃদয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, “আমার আর কোন আপত্তি ছিল না। আমি ভাবছিলাম লতুর কথাই। ও নেহাত ছেলে-মাছুষ তো। ভূষণবাবুর সঙ্গে বয়সের তফাতটা একটু—”

“তা হোক। আমার মা চোদ্দ বছরের ছোট ছিলেন বাবার চেয়ে। কই অস্বাভী তো হন নি তাঁরা।”

“তা হ’লেই হ’ল। ভূষণবাবু রাজি থাকলে আর আপত্তি কি?”

“ভূষণ তো রাজি আছেই। বিয়ের কথাটা পেড়েছিলাম তার কাছেও। দেখলাম

সেও রাজি আছে। লজ্জায় মুখ ফুটে স্বীকার করলে না অবশ্য। বললে একটু ঘুরিয়ে—বেশ তো একা হাতে তোমার যদি কষ্ট হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে বই কি।”

নমিতা স্তব্ধরাজি হ’য়ে যায়। ভূষণবাবু যখন পিসীমাকে কষ্ট দিতে চান না তখন সে কেন বাধা দেয়। পিসীমা আরও বলেন, “ভূমি শুনলাম বিয়ে করবে না বলেছ। আর করবেই বা কি ক’রে? বুড়ো অন্ধ বাপকে তাহ’লে দেখবে কে? ভাই-টাই তো নেই—”

নমিতা প্রতিবাদ করে, “ভাই নেই কে বললে? এক বড় ভাই আছে একটি ছোট ভাইও আছে।”

“সে কি, ভূষণকে জিজ্ঞাসা করতে ও যে বললে—তোমার আর ভাই নেই ব’লে—ভূমি নাকি স্থির করেছ বিয়ে করবে না। বাপের সেবা ক’রেই কাটিয়ে দেবে জীবন?”

“উনি ঠিক জানেন না। দাশা আছেন, বৌদি আছেন তাঁর একটি ছেলেও আছে। ঠরাও সবাই আসবেন বিয়েতে। এখানে আমাদের বাড়িতে নেই বলে আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।”

“তা হবে।”

“আচ্ছা আজ তা হ’লে আসি পিসীমা।”

“ওমা সে কি হয়? একটু মিষ্টিমুখ ক’রে যাও। এমন শুভ সঘন্ট হ’ল আজ।”

“না পিসীমা, আজ থাক। আপনি বরং আমার মায়ের সঙ্গেই পাকা কথা বলতে যাবেন। আমি আজ উঠি।”

পিসীমা জোর ক’রে বসিয়ে দেন ওকে : “সে তো বলবই। কিন্তু সেদিনের কথাতেই বুঝেছি তোমার বাবা মার অমত হবে না। আর কারও আপত্তি শুনব নাকি আমি? আমি হলাম গিয়ে বরের ঘরের পিসী। আমার কথার দাম আছে না? তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ ক’রে যেতেই হবে।”

পিসীমা-ও ঘর থেকে রেকাবি সাজিয়ে মিষ্টি আনতে যান। নমিতা তখন উঠে পড়তে পারলে বাঁচে। ওর ইচ্ছা করছিল কোথাও পালিয়ে গিয়ে প্রাণ ভরে খানিক কৈদে নিয়ে মনটা হাফা ক’রে নেয়। সে সূর্যোগটা সে কোথাও পাচ্ছে না। আজ দুদিন ধরে কারাটা আটকে আছে বুকের মাঝখানে।

লাফাতে লাফাতে ঢোকে লতু মিঠুয়াকে কোলে নিয়ে। ওর চলার ডব্বই ঐ রকম। আশপাশে তাকায় না। দিকিকে দেখতে পাই নি। চিংকার করতে থাকে : “ও পিসী, পিসী তোমার নাতনীকে নাও। দুটুটা ঘুমিয়ে পড়েছে—”

তারপর হঠাৎ ভূত দেখার মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। নমিতা ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কিছু বলে না।

মিষ্টির খালাটা নমিতার সামনে নামিয়ে দিয়ে পিসীমা এগিয়ে যান লতুর দিকে। ওর কোল থেকে খুমন্ত মিঠুয়াকে নিয়ে নমিতার দিকে ফিরে বলেন, “তুমি বাপু অমন ক’রে তাকিও না আমার বোমার দিকে। বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না।”

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলে, “বকব কেন পিসীমা? লতু বুঝি বলে আমি শুধু বকাবকিই করি সারাদিন?”

“না। তা অবশ্য বলে না। দিদিকে ও খুবই ভক্তি করে। নে লতু পেদাম কর তোর দিদিকে। তোর বিয়ের সম্বন্ধ ক’রে গেল যে আজ তোর দিদি।”

লতু বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু ছ’জনের দিকে একবার তাকায়। তারপর হেঁট হ’য়ে প্রণাম করে দিদিকে।

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলে, “ওকি লতু? ঠেকেও প্রণাম কর।”

লতু লজ্জিত চরণে ভুল শুধরে নেয়। পিসীমাকেও প্রণাম করে।

মিষ্টিগুলো নমিতার গলা দিয়ে নামতে চায় না। মনে হয় একটা ষড়যন্ত্র ক’রে তাকে বঞ্চনা করছে সবাই। শুধু ভূষণকে নয়, শুধু মিঠুয়াকে নয়, লতুকেও এরা কেড়ে নিল তার কাছ থেকে—পর ক’রে দিল। আজ ভূষণের পিসীমা তাকে অনায়াসে বলতে পারলেন: ‘তুমি বাপু অমনি ক’রে তাকিও না আমার বোমার দিকে।’

বিয়ে না হ’তেই লতু আজ এঁদের বোমা হ’য়ে গেছে। দিদির বকাবকির কথা, অত্যাচারের কথাই বলেছে শুধু এ বাড়িতে এসে!

লতু! যে লতুর বিয়ে দেবে বলে কত কল্পনা ছিল নমিতার। একমাত্র বোন তার। কত আদরের লতু। নমিতা নিজে বিয়ে করবে না। বাপকে নিয়ে থাকবে সে আজীবন কুমারী। বাপের সেবাতেই কাটিয়ে দেবে জীবন। সংসার-স্বামী-পুত্র কিছু সে চায় নি। সে চেয়েছিল শুধু বাপের যষ্টি হ’য়ে জীবনটাকে বিকিয়ে দিতে। কিন্তু সত্যই কি তাই চেয়েছিল সে অন্তর থেকে? তাহ’লে আজ একটু-ছোঁয়া-পাওয়া ভূষণকে ছেড়ে দিতে এত ব্যথা জাগছে কেন বুকে। যে জিনিসের স্বাদ পাই নি সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ। মদ যে জীবনে-খায় নি তার পক্ষে মাতাল না হওয়াটা কোনও কৃতিত্বের নয়; কিন্তু মাদক রসে ভরা ডুব দিয়ে হঠাৎ একদিন নিজেকে স্তরাসর থেকে বঙ্কিত করার সঙ্কল্প করা শক্ত। যে নমিতা পুরুষের সান্নিধ্য থেকে চিরকাল দূরে থাকবে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে নমিতা আজ কোথায়?

সে কি জানত প্রেমাস্পদকে অপরের হাতে তুলে দিতে যাওয়ার ঝুঁকটা এতখানি ? কিন্তু সে যাই হোক, নিজের বিয়ের কথাটা সম্প্রতি ভাবতে শুরু করেছিল বটে তবু লতুর বিয়ের কথা সে ভেবেছে অনেক অনেক দিন আগে থেকে। বোনের বিয়ে দিতে হবে একটি ফুটফুটে লাজুক মুখচোরা ছেলের সঙ্গে। লতুর বর এসে ডাকবে ওকে দিদি বলে। সম্বন্ধ ক’রে এসে লতুর সামনে ধরবে একখানা ফটো। বাইশ চব্বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবকের ফটো। বড় বড় চোখ, উঁটানো চুল, চোখে সোনালী চশমা, গোঁফের তু কোণ সুরু ক’রে কাটা। বলবে : ‘আখরে লতু, পছন্দ হয় ?’

তু’হাতে মুখ ঢেকে লতু বলবে—‘খ্যাং’।

নমিতা ছোট বোনের মাথার হাত বুলিয়ে আদর ক’রে বলবে : ‘খ্যাং নয় রে। সত্যিই দেবদুতের মতো চেহারা। কলেজে পড়ছে। বাপ বেশ বড়লোক। সুখেই থাকবি তুই। আশীর্বাদ করছি আমি—ওকে নিয়ে সুখী হবি নিশ্চয়ই। আজ আমি আর দাদা এই ছেলেটির সঙ্গে তোর সম্বন্ধ ক’রে এলাম।’

সম্বন্ধ লতু মাথা হেঁট ক’রে প্রণাম করবে দিদির কাছে। ছোট বোনকে ও বুকে টেনে নেবে। কপালে ঐকে দেবে চুষনচিহ্ন। বলবে : ‘বর পেয়ে দিদির কাছে তুলে যাবি নি তো রে ?’

দিদির বুকে মুখ গুঁজে লতু বলবে : ‘কক্ষণও নয়। তুমি দেখে নিও।’

এই ছিল নমিতার স্বপ্ন। লতুর বিয়ের পরিকল্পনা। আজকের নয়। অনেক দিনকার। সে সব কিছুই হ’ল না। ভালোবেসে ‘লভম্যারেজ’ করল লতু। বাপ-মা, দাদা-দিদি কেউ জানতে পারল না—সে জয় ক’রে নিল একজনের হৃদয়। সে একজনও এমন একজন যাকে কেন্দ্র ক’রে নমিতার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও গুঞ্জন চলছে আজ কয়েক সপ্তাহ। কী লজ্জা! নমিতা ধরে নিয়েছিল ভূষণের ভালোবাসা সে পেয়েছে। বলিষ্ঠ গঠন ঐ লোকটি তার সঙ্গে যে ভাবে মিশেছে তাতে মনেও হয় নি সে এ ভাবে ধরা দিতে পারে একফোঁটা লতুর বাহুবন্ধনে। কী বিচিত্র এই সংসার ! কোথা থেকে কি ক’রে ব্যবস্থা হ’য়ে গেল লতুর বিবাহের। চেষ্টা করতে হয় নি নমিতাকে কিছুই। ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা ক’রে রেখেছে। আজ পিসীমা তাকে দিলেন কিছু উপদেশ—‘বাড়ি গিয়েও বকতে পারবে না কিন্তু’। আর দিলেন একখালা মিষ্টান্ন। ওর রাজি হওয়ার জন্ত উৎকোচ। পারমিট-পাওয়ার বাবুরা যেমন যাওয়ার সময় অফিসারের পিয়নকে দিয়ে যায় ছুঁচায় আনা বকশিশ, খুশী হ’য়েই। চোখ ফেটে জল এল নমিতার। এ জল চোখেই শুকিয়ে মারতে হবে। শুভকার্য ! লতুর বিয়ে। কীভাবে কেন নমিতা ?

নিতাই কবিরাজের ভাস্করখানায় বসেছে নতুন কমিটির প্রথম সভা। ‘গণকল্যাণ সমিতি’ নামই টিকে গেছে। প্রতি ব্লকে নির্বাচন ক’রে প্রতিনিধি স্থির করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে ছুঁজন ক’রে মেম্বার। সবস্বল্প দশজনের কমিটি। এতবড় বিরাট কমিটি নিয়ে কাজ করা যায় না। তাই তিনজনের একটা ওয়ার্কিং কমিটি করা হয়েছে। প্রমোদ পাল গালভারি নাম পছন্দ করে—সে এই কার্যকরী কমিটির নাম দিয়েছে ‘স্টিয়ারিং কমিটি’। কানাই, যোগেন, জীবেন, নমিতা, ভূষণ প্রভৃতি সকলেই সভা নির্বাচিত হয়েছে। তিনজনের কার্যকরী কমিটিতে আছে আগেকার অ্যাডহক কমিটিই। অর্থাৎ ভূষণ, নমিতা আর ঠাকুর্দা। আজ নির্বাচনের পর প্রথম সকলে মিলিত হয়েছেন বিস্তারিত আলোচনা ক’রে কর্মপন্থা স্থির করবেন ব’লে। পরিবেশটা ঠিক সভাকক্ষের মতো নয়। নিতাই ঠাকুর্দার ভাস্করখানাতেই বাড়তি একখানা বেঞ্চি ঢোকানো হয়েছে। সভারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। নিতাই ঠাকুর্দা যথারীতি একটা বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন।

যোগেন নারেক সি-ব্লকের নির্বাচিত সভা। বললে, “এবার সভার কাজ শুরু হোক ঠাকুর্দা!”

ঠাকুর্দা বলেন, “সবাই এসেছে? কই নমিতাকে দেখছি না?”

ও কোণ থেকে নমিতা সাড়া দেয় : “আমিও এসেছি ঠাকুর্দা।”

“বাস্ তবে তো শুরু করা যেতে পারে।”

ঠাকুর্দা সকলকে নির্বাচিত হবার জন্ত মামুলী অভিনন্দন জানালেন। তারপর বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন—কী উদ্দেশ্য এই গণকল্যাণ-সমিতির। আর কিভাবেই বা তা কার্বে পরিণত করা যাবে। ঠাকুর্দা বলেন, “সমস্যাটা কি? আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কর্মসংস্থান। আমরা যখন এদেশে প্রথম এসেছিলাম তখন আমাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রিসেপশন সেন্টারে, ট্রানসিট ক্যাম্পে অথবা পি. এল. ক্যাম্পে। সেখান থেকে আমরা, অর্থাৎ স্ত্রীসবল মানুষেরা পুনর্বাসতি পেয়ে চলে এলাম এখানে। জমি পেলাম, বাড়ি করার ঋণ পেলাম। ভালো কথা। জমি হ’ল, বাড়ি হ’ল। তারপর?”

এসব কাহিনী ওয়া জানে। এ ওদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা বিবরণ। দশ-বিশ হাজার লোক এক জায়গায় জমায়েত হ’লেই সেটা শহর হয়ে পড়ে না। হ’য়ে পড়তো যদি অন্তত কিছু লোকের হাতেও থাকতো কোনও উদ্বৃত্ত অর্থ। তা ছিল না। কোন শিল্প, বস্তুত গঠনমূলক কোনও প্রয়াসই হ’ল না। অনশন মৃত্যু শুরু হ’ল। মাঝে মাঝে টেস্ট রিলিফের কাজ হয়েছে। এই পর্যন্ত। সবাই বললে কাজ দাও, কাজ দাও। কাজ নাও—এ কথা কেউ বললে না। না কোন স্থানীয় লোক,

না এদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা কোনও কোঅপারেটিভ, না স্বয়ং সরকার।

ঠাকুরদা বুঝিয়ে বলেন, “কলে, কলোনী ছেড়ে পি. এল. ক্যাম্পে ফিরে যাবার জন্য দরখাস্ত আসতে লাগলো গাদা গাদা। ক্যাসডোল, স্টারভেসান ডোলের আবেদন-সংখ্যা বাড়লো। তাতে একদল লোকের সুবিধাই হ’ল। এই সুবিধাবাদী লোকের দলটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। সে সমস্যা আর নেই। আমাদের নতুন কমিটি কার্যভার নিয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক সমস্যা রয়েই গেছে তা সন্দেহ। সেই মূল সমস্যার সমাধান করতে নাকি সরকার বিরাট পরিকল্পনা করছেন।”

যোগেন বলে, “আবার পরিকল্পনা! সেই জরীপের লোক এসে বনবাদাড় ভেঙে চেন-টানাটানি করবে—আর ঘরে ঘরে গিয়ে পরিসংখ্যান না কি যেন সংগ্রহ ক’রে বেড়াবে।”

কানাই যোগ দেয় : “ঐ পরিকল্পনা কথাটা শুনলেই আমাদের আতঙ্ক হয় ঠাকুরদা।” ঠিক এইসময়ে দরজার সামনে এসে থামে একখানা জীপ? তার থেকে নামেন দু’জন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। ঠোঁট সসম্মুখে আমন্ত্রণ জানান।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাগচি, হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবী আর একজন অপরিচিত স্থগিষ্ঠিতভূম্ব যুবক। ঐকি প্যাণ্ট আর বুগ কোট পরা। চোখে সানগ্লাস, পায়ে গাম্বুট। বাগচি সাহেব বলেন, “আমরা অনিমন্ত্রিতই এসেছি। যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাহ’লে আর বসব না। একটা কথা বলেই চলে যাব।”

“ওরা বলে, বিলক্ষণ! আপনারাই তো এ মস্তের হোতা। আহ্নন আহ্নন।”

বাগচি সাহেব জম্যাটি লোক। সকলের সাথেই মিশতে চান নিজেকে। অফিসার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অদৃশ্য ব্যবধান ছিল সেটা ভেঙে ফেলতেই বোধকরি ঠোঁট এ প্রচেষ্টা। সুরেখা দেবীকে অবশ্য ওরা আপনার লোক বলেই ভাবে চিরদিন।

ঠাকুরদা বলেন, “আমরাই অগ্রায় করেছি। এ দক্ষরাজার শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছিল। কিন্তু কিছু মনে করবেন না বাগচি সাহেব। দোষ শুধু এক তরফাই নয়। ইতিপূর্বে আমাদের এইসব ঘরোয়া মিটিঙে ডাকলেও আপনারা আসতেন না। আপনি নন—আপনার পূর্ববর্তীরা। কাজেই ভুলটা আমাদের হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয়।”

সুরেখা দেবী বলেন, “শাক, সৌজন্য তো হ’ল। এবার কাজের কথা হোক।

ঠাকুরদা বলেন, “হ্যাঁ, কাজের কথা। ঐরা বলছিলেন আমাদের উদয়নগর কলোনীর লোকদের কর্মসংস্থানের যে পরিকল্পনা তার স্বরূপটা কি।”

বাগচি বলেন, “ভালো কথা। তবে আপনাদের এ প্রস্তাব আমি দেব না। দেবেন আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোক। এর নাম বীরেন্দ্র মৈত্র। ইনি এসেছেন ঐ সরকারী পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার উনি। সরকারী অফিসার, তার উপর শুনেছি উনি লেখকও। স্বতরাং বেশ গুছিয়েই বলতে পারবেন উনি নিশ্চয়।”

বীরেনবাবু উঠে দাঁড়ান! ফর্সা রঙ। উন্নত নাশা, বলিষ্ঠ গঠন। লম্বা চওড়া চেহারা। মাথার চুলগুলি উল্টো ক’রে ফেরানো। কথা বলবার সময় হাত নেড়ে যৌক দিয়ে কথা বলেন। একটু বক্তৃতার ঢঙ এসে পড়ে। উনি বুঝিয়ে দেন পরিকল্পনাটা। উদয়নগরের পূর্বদিকে ডি-রক থেকে শুরু ক’রে ই-রক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মাঠটার কোনও প্লট নেই। ফাঁকা মাঠ। প্লটে ভাগ হয় নি ওটা। এখানে একটা কারখানা হবে। তাঁত কল, লেদ-মেশিন, মাঠ চেরাইয়ের কল, ট্যানারী সেকসন, পটারী সেকসন, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ—নানান ব্যবস্থা থাকবে এখানে। প্রায় দশবারো রকমের ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হবে। বছর দুই ধরে শিক্ষার্থীরা কাজ শিখবে এটাতে। মাসে মাসে বিলটাকা ক’রে ভাতা পাবে। ওদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রয় হ’লে লভ্যাংশও পাবে। এর নাম হবে উদয়নগর-ট্রেনিং কামপ্রডাকসন-সেন্টার।

কানাই প্রশ্ন করে : “কত ছেলে শিখবে এখানে?”

“ধরুন আড়াই শো।”

“সে তো প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এখানে বেকার সংখ্যা মাত্র আড়াই শ’ নয়।”

“মানলাম। আমার বক্তব্য কিন্তু শেষ করি নি আমি।”

“আচ্ছা, বেশ বলুন।”

বীরেনবাবু বলতে থাকেন পরিকল্পনার অন্ত্যন্ত দিক। এই শিক্ষাকেন্দ্রের আপাত উদ্দেশ্য হবে আড়াই শ’ ছেলের কর্মসংস্থান করা—গভীরতর উদ্দেশ্য হ’ল ওদের এক ওদের উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির চিরকালের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার ওপাশে অনেকটা জমি অ্যাকোয়ার করা হচ্ছে। সেখানে একটা কাগজের মিল তৈরি করছেন সরকার। এর অর্থেকের কিছু বেশী মূলধন থাকবে সরকারের—বাকি অর্থেকের জন্তু শেয়ার বিক্রয় করা হবে। এ অঞ্চলে একরকম ঘাস জন্মায় যা থেকে কাগজ তৈরি হ’তে পারে। বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা ক’রে দেখেছেন। কাগজের কারখানা তৈরি হ’তেও বছর দেড়েক লাগবে। সেই সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঐ ঘাসের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে অস্তুত হাজার দুই মেহনতি মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

পরিকল্পনার তৃতীয় দিক হ'ল—এর আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। পাকা রাস্তা, নলকূপ, প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, বাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি।

যোগেন প্রশ্ন করে : “এসব সত্যি সত্যি হবে স্তার ?”

“নিশ্চয়ই। আমি এসেছি এগুলো আপনাদের দিয়ে করিয়ে নিতে।”

ঠাকুরদা বলেন, “আপনি যা বললেন সে তো খুবই আশার কথা—কিন্তু কিছু মনে করবেন না আপনি। আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গরু। দেখেছি তো আপনাদের ব্যাপার! প্লান তৈরি হয় তো এক্টিমেট হয় না, এক্টিমেট হয় তো স্ত্রাসন নেই, স্ত্রাসন হ'ল তো আডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রভাল হয় না, সব যখন মিটল তখন দেখা গেল এ বছর অ্যালটমেন্ট পাওয়া যায় নি বলে কাজ হ'ল না! এমনি অনেক স্কন্ডর শিশু পরিকল্পনাকে আপনাদের অফিসে লালফিতের উদ্বন্ধনে ঝুলতে দেখেছি কিনা—”

বাগচি হেসে বলেন, “নিতাইবাবু, আপনার শিবহীন দক্ষবজ্ঞের উপমাটির অর্থ বুঝি নি তখন। এখন বুঝছি। অনিমন্ত্রিত শিবানী পতিনিন্দার দেহত্যাগ করেছিলেন। আমাকে অন্তত সভাত্যাগ করতে হয়।”

নমিতা বলে, “সরকার কি আপনার স্বামী ?”

“নিশ্চয়ই। সেই অল্পদাতার সেবাদাসীই তো আমি।”

সবাই হেসে ওঠে।

কানাই বলে, “কিন্তু ঠাকুরদা যা বললেন তা কি সত্য নয়? কেন স্বীকার করবেন না আপনি ?”

“শিব ছাই মেখে থাকেন, ভাঙ খান, তাঁর গলায় সাপ, স্ত্রাংটো তিনি—এগুলো কি মিথ্যা কথা? কিন্তু তাই বলে শিবানী কি সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন ?”

বীরেনবাবু মিটিমিটি হাসছিলেন। বাগচি সাহেব কি রকম কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন তা দেখে একটা কোতুক বোধ করছিলেন তিনি।

ঠাকুরদা বলেন, “আচ্ছা তা যেন হ'ল। কিন্তু আপনার ফ্যাক্টারি আর প্রডাকসন সেক্টার হ'তে তো বছরে দুই লাগবে। ইতিমধ্যে লোকগুলো করবে কি? খাবে কি ?”

বীরেনবাবু বলেন, “ফ্যাক্টারি, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতি যা কিছু এখানে করা হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। এখানকার মিস্ত্রি, মজুরেরা সব কাজ করবে আমার তত্ত্বাবধানে। আপনারা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হ'য়ে যাবেন। প্রতি গ্রুপে থাকবে দু'জন মিস্ত্রি আর আট দশজন মেহনতি মানুষ। আমরা কাজ দেখে নেব।”

যোগেন প্রশ্ন করে : “মজ্জু, রাজ, ছুতার এদের রোজ কত ক’রে হবে ?”

“রোজ কারও থাকবে না। এক একজন গ্রুপ-লীডার যেন একজন ঠিকাদার। মাপ হিসাবে যা পাওনা হবে তাই গ্রুপ-লীডারের মাধ্যমে পাবে সকলে। সব কাজ ফুরানো হবে। প্রতি আইটেমের রেট থাকবে। সপ্তাহান্তে গ্রুপ যে কাজ করেছে তাকে তার মূল্য দেওয়া হবে। মজুরেরা যত পাবে তার দেড়া পাবে রাজ ও ছুতার। গ্রুপ-লীডার পাবে ডবল। বেশী কাজ করলে বেশী পাবে—কম করলে কম পাবে। গ্রুপ-লীডারদের কিছু আগাম টাকা দেব আমরা প্রথম অবস্থায়—মালমসলাও কিনে দেবো।”

পরিকল্পনার নানান দিক আলোচনা হ’তে লাগলো খুঁটিনাটি সব। কি ভাবে গ্রুপ-লীডার বেছে নেওয়া হবে। তারা মূলধন পাবে কোথায়। যন্ত্রপাতি, মালমসলা যদি তারা নিজেরা কিনতে চায়? বীরেনবাবু একে একে সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যান। সকলেই আলোচনায় যোগ দেয়। একমাত্র ভূষণ রায় ছাড়া। আজ এতবড় জরুরী মিটিঙে সে একবারও কথা বলে নি। তীব্রদৃষ্টিতে সে শুধু লক্ষ্য ক’রে যাচ্ছিল নমিতাকে। আশ্চর্য! মেয়েটার কোনও পরিবর্তন হয় নি!

সব আলোচনা শেষ ক’রে, সবার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বীরেন মৈত্র বললেন, “আশা করি সকলের সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি আমি। আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?” নমিতা বলে, “আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। কলোনীর কর্মহীনা মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের পরিকল্পনা কি বলছে?”

বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি বলেন, “ও ইয়েস্। ও কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।” হেডমিস্ট্রেট বলেন, “সেইটেই তো আমাদের ভয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমাদের দিকটা প্রায়ই ভুলে যান আপনারা। এ অভিযোগ আছে আমাদের—”

বাগচি সাহেব পাদপূরণ করেন : “চিরন্তন নারীর পক্ষ থেকে শাস্ত পুরুষের বিরুদ্ধে!”

আবার হেসে ওঠে সবাই।

বীরেনবাবু বলেন, “আমিই বলতে ভুলেছি। আমাদের পরিকল্পনাকার ভোলেন নি। মেয়েদের জগ্গেও প্রডাকসন সেন্টারে কয়েকটি বিভাগ থাকবে স্টাশিল্ল, আচার তৈরি করা, পুতুল বানানো প্রভৃতি।”

যোগেন বলে, “এ পরিকল্পনার জগ্গ আপনাদের ধন্ববাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি প্র্যাকটিকাল মাল্টি, ঠাকুরদার ভাষায় ঘরপোড়া গরু। পরিকল্পনাটা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া পর্যন্ত তাই আমি অভিনন্দনটা মূলত্ববী রাখছি।”

বীরেন মৈত্র বলেন, “ধন্ববাদ বা অভিনন্দন নিতে আমি আসি নি এখানে। কাজকে

আমিও ভালোবাসি কথার চেয়ে। স্ততরাং কাজের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতা পেলেই আমি বেশী খুশী হব।

বাগচি বলেন, “আমি কিন্তু ধগুবাদটা মূলতুবী রাখব না। যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আপনারা আজ আলোচনা করলেন তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতির রোমন্থন না করে আপনারা যে গোড়া থেকেই গঠনমূলক চিন্তা করছেন একান্ত আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি নতুন কমিটিকে। সভাপতি অল্পমতি করলে এবার আমরা উঠতে পারি।”

ঠাকুরদা সবার শেষে বলেন, “আমিও বাগচি সাহেবের সঙ্গে একমত। অভিনন্দনটা মূলতুবী রাখতে চাই না। তবে আমি মৈত্র সাহেবের মতো প্র্যাকটিকাল মানুষও —তাই মৌখিক অভিনন্দন না জানিয়ে সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই। আপনারা কিছু মিষ্টিমুখ করে যান।”

সবাই হেসে ওঠে আবার।

ব্যবস্থা করাই ছিল। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক চা-খাবারের প্লেট নিয়ে ঢোকে।

হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবীও লোক পরস্পরায় শুনলেন কথাটা। প্রথমটা বিশ্বাস করেন নি। এতবড় ভুল হবে তাঁর? তিনি যে স্পষ্ট দেখেছেন নমিতার মুখে প্রথম প্রেমে পড়া লাজুক চাহনি। ভূষণের বিষয়ে যে অনেক কথা হয়েছ নমিতার সঙ্গে তাঁর। সেই নমিতা নিজের ছোট বোনের সঙ্গে ভূষণের বিয়ে দেবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছে? স্বয়ং গিয়ে ভূষণের মাসি না পিসীর সঙ্গে কথা বলে এসেছে? খবরটা অবিশ্বাস্য। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এতবড় ভুল হ’তে পারে তাঁর?

তারপর হঠাৎ টেবিলের উপর ক্রেমে বাঁধানো একটা কটোর দিকে নজর পড়তেই রান হাসি হাসেন সুরেখা দেবী। মানব চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কি অথরিটি? প্রেমে পড়া লোক দেখলেই চিনতে পারার ক্ষমতা আর যারই থাক সুরেখা দেবীর নেই নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে ভুল তো তাঁর আজকে প্রথম হচ্ছে না। আরও একবার বিরাট ভুল হ’য়ে গেছে তাঁর। সেবারও একজন লোককে দেখে মনে হয়েছিল লোকটা প্রথম-প্রেমের বস্তার ভেসে যাচ্ছে বুঝি। নিমজ্জমান লোকটাকে হাত ধরে তুলতে গিয়েছিলেন। কি হ’ল ফলে? দুদিনেই বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। ঈশপের গল্পটা মনে পড়ল তাঁর। তাঁকে ভর করে নিমজ্জমান লোকটি উঠে গেল কুপের উপরে। তিনি পড়ে রইলেন অন্ধকূপে। সেই ভুলেরই মাশুল দিয়ে চলেছেন তার পর থেকে।

মিটি ভেঙে গেলে ওরা বেরিয়ে আসে। যে যার বাসার দিকে পা বাড়ায়। জীপে ক'রে সরকারী অফিসার দু'জন চলে যান। নমিতাও অগ্রসর হয় বাড়ির দিকে। মিটিঙে ভূষণ এসেছিল। নমিতা ওর দিকে একবারও তাকায় নি। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে যেন তাকে। সেই ছেলেটিও এসেছিল। রাখাল। কামিনীর সঙ্গে সেদিন যে ছেলেটিকে সাক্ষাৎরূপে যেতে দেখেছিল। ভূষণের পাশেই বসে ছিল। নমিতা সেদিকে দেখেও নি মুখ তুলে। দ্রুতপথে সে বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকালে একপসলা বৃষ্টি হয়েছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। গুরুপঙ্কের চাঁদ উঠেছে। স্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে। গোখুলির আলো মুছে যেতেই এক বলক চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সন্ধ্যা ধোওয়া করোগেটেড টিনের ছাদে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে। জল জমে আছে এখানে সেখানে। বড়রাস্তা ধরে ফিরছিল সে। বাঁক ঘুরতেই নজরে পড়ল বড় মাঠটা। লরিতে ক'রে মাল আসতে শুরু করেছে। ইট নামছে লরি থেকে। থাক দিয়ে রাখছে। এখন লোকজনের ছুটি হয়ে গেছে অবশ্য। এখানেই তৈরি হবে কারখানাটা। কলোনীবাসীর অল্প সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে। অন্তত সেই রকম কথাই শোনা গেল আজ। নমিতা মনশ্চক্ষে দেখতে পেল মাঠ জুড়ে উঠেছে প্রডাকসান্‌ সেন্টারের বাড়ি। লম্বা লম্বা শেড। সেখানে কাজ শিখছে আগামী দিনের কারিগরেরা। কত ব্যবসা শিখছে তারা। উদ্যাস্ত পরিশ্রম করছে। করবে না? তাদের মুখ চেয়ে রয়েছে যে কত বাপ মা-স্বামী-পুত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে কে ডাকে : “ভুলুন।”

নমিতা দাঁড়িয়ে পড়ে। যে ডেকেছিল এগিয়ে আসে সে। ভূষণ।

“আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।”

নমিতা নির্বিকারভাবে বলে, “বলুন।”

“এখানে? অনেক কথা বলার ছিল। কোথাও বসলে হয় না?”

চারিদিকে তাকিয়ে নমিতা দেখল বসবার মতো কোনও স্থান নেই। সন্ধ্যা বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় সব জায়গাই ভিজে।

“আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসবেন?”

“না, আমি নিরিবিলিতে বলতে চাই। চলুন না—স্টেশনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসি?”

“স্টেশন? সে যে অনেকখানি।”

“আপনার তাড়া আছে?”

“না, তাড়া নেই কিছু। আচ্ছা চলুন।”

পাশাপাশি দু'জন হেঁটে চলেছে। কোনও কথাবার্তা নেই। ভূষণ আজ দিন পনের

পর এসেছে। এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। পনের দিন অবশ্য সময় বেশী কিছু নয় কিন্তু দু'জনেই যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে।

নমিতাই প্রথমে কথা বলে, “এবার মনে হচ্ছে কলোনীতে উন্নয়নের কাজ কিছু হবে।”

ভূষণ অশ্রুমনস্কের মতো বলে, “হুঁ!”

“আপনার কি মনে হয় কলোনীতে সত্যিকারের কাজ কিছু হবে?”

“দেখা যাক।”

“আমার তো ভরসা হয় না। এঁদের ব্যাপার তো জানা আছে। আঠারো মাসে বছর।”

ভূষণ জবাব দেয় না। নমিতা ইচ্ছা করেই বেশী কথা বলে। সে যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে; তার মনে যে ঝড়ের স্পর্শ লাগে নি এটা প্রতিপন্ন করতে চায় সে।

ভূষণ চুপ ক'রে থাকায় আবার বলে, “আপনি জবাব দিলেন না যে?”

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভূষণ: “এখন এইসব কথা ভাবতে পারছেন আপনি?”

“কেন এখন কি হয়েছে?”

“আমার মনে এখন এসব চিন্তা নেই।”

“ও।”

আবার দু'জনে চলতে শুরু করে।

স্টেশনের প্র্যাটফর্মে জনমানব নেই। ওরা দু'জনে গিয়ে বসে একটা খালি বেঞ্চিতে। মাথার উপরে দোচালা থাকায় ভেঙ্গে নি সেটা। বেঞ্চির তলায় শুয়ে ছিল একটা কুকুর। উঠে যায় সেটা। ভূষণ একটা বিড়ি ধরায়। দু'জনেই চুপচাপ।

সত্ত্ব ধরানো বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ভূষণ, বলে, “দেখুন, যতই কেন না ভাব দেখান যে আপনি আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন না—আমি জানি আপনি আমার প্রশ্নের কথা জানেন। তাই প্রশ্নটা আমি করব না। আপনি কি জবাব দেবেন?”

আঁচলের চাবির রিঙ থেকে একটা চাবি অকারণে খুলতে খুলতে নমিতা বলে, “বারে, প্রশ্নটা আপনি বলবেন না—উত্তর দেব আমি?”

“হ্যাঁ দেবেন। কেন আপনি গিয়ে আমার পিসীমাকে ঐ অদ্ভুত প্রশ্নাবলী ক'রে এসেছেন?”

“অদ্ভুত? অদ্ভুত কেন? ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেছেন। ওর মনে অহুয়াগ সঞ্চারিত করেছেন, আপনার পিসীমা থেকে শুরু ক'রে পাড়ানুহুৎ সকলে ধারণা করেছে আপনাদের বিবাহে এ মেলামেশার স্বাভাবিক পরিণতি হবে—আর এখন

“আপনার কাছে এটা অদ্ভুত লাগছে?”

ভূষণ একটু কাছে সরে এসে বলে, “দেখুন, আর কেউ একথা বললে আমাদের জবাবদিহি করতে হ’ত। কিন্তু আপনার কাছে তো সে জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। লতুকে আমি কি চোখে দেখেছি—আর কেউ না জানুক আপনার তো তা অজানা নেই।”

“আমি? না, আমি তা জানব কোথেকে? আমি তো সর্বস্ব নই। আমি ছুপুয়ে পড়াতে যাই স্থলে। আপনি তখন লতুকে এসে কি চোখে দেখেন সে তো আমার জানার কথা নয় ভূষণবাবু। তাছাড়া আপনি নিজেই আসেন, না কোন ছোট ছেলেকে দিয়ে জামা-কাপড়গুলো পাঠিয়ে দেন তাই কি জানা সম্ভব আমার পক্ষে?” ভূষণ চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে বসে: “আপনাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলার দরকার।”

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলে, “কিন্তু হয়তো শোনার প্রয়োজন নেই আমার। কি দরকার? কেনই বা আমাদের দোজবরে বলে মিথ্যে পরিচয় দিলেন, কেনই বা লতুর সঙ্গে গোপনে দেখা করে তাকে মিথ্যে বলতে শেখালেন—তা শুনে আমার কি লাভ?” দু’জনেই কিছুটা চুপচাপ। তারপর ভূষণ ধীরে ধীরে বলে, “আশ্চর্য মাহুষের মন। এ নিয়ে আপনি পর্যন্ত যে আমাদের ভুল বুঝবেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি।”

“কিন্তু ভুল বোঝার তো কিছু নেই ভূষণবাবু।”

“জানি না আপনি সত্যিই ভুল বুঝেছেন—না ভুল বোঝার অভিনয় করে সরে যেতে চাইছেন। আমার মানসিক অবস্থা আপনি বুঝতে পারেন নি এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।”

একটু থেমে আবার বলে, “আপনি পরিষ্কার ভাষায় আমাদের প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু কি জানি কেন আমার মনে হয়েছিল সেটা আপনার অন্তরের কথা নয়। তাই আমি বার বার আসতাম আপনাদের বাড়িতে। লুকিয়ে দেখতাম আপনাকে। সামনে আসতে সাহস হ’ত না। সঙ্কোচও হ’ত। তারপর ভাবলাম, কেন আপনি হঠাৎ আমাদের প্রত্যাখ্যান করলেন তার কারণটা জানতে হবে। তাই লতুর সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতাম। জানতে চেষ্টা করতাম আপনি কি করেন, কি বলেন। আমি গোপনে যে আপনাকে অনুসরণ করে চলেছি এটা আপনাকে জানতে দেব না বলেই লতুকে বারণ করতাম আপনাকে জানাতে—আমার আশা যাওয়ার কথা। আমার সঙ্গে লতুর বয়সের তফাত দেখেও অন্তত আপনার বোঝা উচিত ছিল ওকে আমি ছোটবোনের মতোই ভালোবাসি। আপনি কি করে এতবড় ভুলটা করলেন?”

নমিতার জবাব দিতে দেরি হয়, বলে, “কিন্তু আমিই তো দুনিয়ার একমাত্র লোক নই। সমাজ আছে, সংসার আছে। তারা যদি ভুল বোঝে—”

ভূষণ প্রায় চিংকার করে ওঠে: “আমি স্বীকার করি না। তুমি তো জানতে নমিতা সমাজ সংসার আমার কাছে বড় কথা ছিল না। আমার চোখে তুমিই ছিলে সেদিন সংসারের একমাত্র লোক। আজও আছে।”

নমিতা বলে, “কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন আপনার জন্ত একটি পাত্রী দেখে দিতে।”

“কী প্রশ্নে বলেছিলাম, কেন বলেছিলাম তা তো তোমার মনে থাকার কথা নমিতা। আমি চেয়েছিলাম তোমার দক্ষ হাতে আত্মসমর্পণ করতে। তোমার অঙ্ক বাপের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম আমি—বিনিময়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার মামরা বোনঝিটাকে মাহুষ করার ভার। তুমি তা নিলে না। আমার ভালোবাসাকে অবহেলা করলে তুমি; কিন্তু তা নিয়ে ব্যঙ্গও যে করতে পারো তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।”

নমিতা চুপ করে থাকে। কী বলতে পারে সে? এখন যে সে অনেকদূর অগ্রসর হ’য়ে গেছে। লতু কী ভাববে? পিসীমা, বাবা! না, এখন আর সম্ভবপর নয়। যাক ভূষণ তাহ’লে জানতে পারে নি নমিতার মনেও জেগেছিল গভীর অহুসারাগ। ভূষণ যতখানি উদ্গ্রীব ছিল নমিতাকে পাওয়ার জন্ত ততখানি আগ্রহ নিয়েই যে নমিতা এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে এ খবরটা তাহ’লে ভূষণ জানে না। মনে মনে আশ্বস্ত হয় সে। জানলে আরও লজ্জায় পড়তে হ’ত। ছোট-বোনের সঙ্গে যার বিয়ে দিতে হবে সে যদি জানতে পারে তার প্রতি গোপন অহুসারাগ আছে নমিতার তাহ’লে লজ্জা রাখার স্থান থাকবে না।

ভূষণ হঠাৎ বলে, “আমার একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?”

“বলুন।”

“আমাকে সেই সন্ধ্যায় কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি?”

“এটা নেহাত ব্যক্তিগত কথা।”

“হোক। তবু জানতে চাই আমি।”

“কী আশ্চর্য। এ বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে?”

“জবাবদিহি। আচ্ছা থাক তবে।”

নমিতা বুঝতে পারে ভূষণকে যা হোক একটা কিছু বোঝানো দরকার। না হ’লে লতুকে সে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারবে না। আবার পরমুহূর্তেই মনে হয় লতু ছেলেমানুষ। ভূষণের প্রতি তার অহুসারাগ থাকতে পারে না। ওটা তার নেহাতই

ছেলেমাছুষি। নভেলি ভালোবাসার ব্যর্থ অত্মকরণ! জলের দাগ মুছে যাবেই। লতুর সম্মুখে পড়ে আছে যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। কত ভ্রমর আসবে সে বসন্তের যৌবনে। নতুন ক'রে সত্যিকারের ভালোবাসতে শিখবে সে। আর নমিতা? যৌবনের প্রাস্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে কেউ তাকে এসে ডাকে নি। অনাহৃত, অনাদৃত কেটে গেছে শতাব্দীর চতুর্থাংশ। ভূষণ এসে গুর হাত ধরতে চাইছে। গুর অন্ধ পক্ষু বাপের দায়িত্ব নিতে চাইছে। এ সময়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার নেই নমিতার। জীবনকে অস্বীকার করা পাপ। আজ যে ভালোবাসাকে সে জোর ক'রে অস্বীকার করছে—সে প্রেম মরে যাবে না। শিশু মহীকুহের মতো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই একদিন। তখন সব জ্ঞানাজানি হয়ে যাবে। হয়তো অনাদর করবে ভূষণ লতুকে! সংসার ছারখার হ'য়ে যাবে। “তুমি কি আমাকে তোমার যোগ্য মনে কর না?”

নমিতা মন স্থির ক'রে ফেলে। মিথ্যা কথাই বলবে সে। লতুর দিকে গুর মনটা ফিরিয়ে দিতে হবে। লতুর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিজে ক'রে আসার পর আর তার পক্ষে সম্ভব নয় বধূবেশে ভূষণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া দাদা-বৌদির কাছে কোনদিনই ফিরে যাবেন না হরিপদ পণ্ডিত। অস্তিত্ব সেদিন যে দৃশ্য সে দেখেছে তাতে সে আশঙ্কাই দৃঢ় হয়েছে তার। বাপের দায়িত্ব তাকেই তুলে নিতে হবে। ভূষণকে সে তুলতে পারবে না? কেন পারবে না। দুদিন আগে তো সে চিনত না তাকে। বলে, “আমার সঙ্গে অল্প একজনের বিয়ে আগে থেকেই স্থির হ'য়ে আছে।”

ভূষণ চমকে ওঠে। বলে, অল্প একজন? কে সে? কবে থেকে?”

“আপনি চিনবেন না। ছেলেবেলা থেকে।”

“মিথ্যাকথা।”

“মিথ্যা কথা?”

ভূষণ জোর দিয়ে বলে, “নিশ্চয়ই। যেদিন প্রথম তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম হাত—সেদিন তুমি আমার হাত ধরবার জন্তে উদগ্রীব ছিলে। তোমার চোখের কম্পনে, তোমার মুখের সলজ্জ রক্তমাভায় তুমি ধরা পড়ে গিয়েছিলে। অত সহজে এড়ানো যায় না নমিতা। আমি স্থির জানি সেদিন তুমি আমার বাহুবন্ধনে ধরা দেবার জন্তে উন্মুখ ছিলে। আজ কেন তা নেই তাই শুধু জানতে চেয়েছিলাম আমি।”

নমিতার পক্ষে আর কথোপকথন চালানো শক্ত হয়ে পড়ে। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। একবার ধরা পড়লেই আর ফেরা যাবে না। তাই মনে মনে শক্ত

হবার চেষ্টা ক'রে বলে, “আপনি ভুল বুঝছিলেন। কোনদিনই আমি ওভাবে দেখি নি আপনাকে।”

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে : “কোনদিন নয় ? মুহূর্তের জন্তও নয় ? যখন মিঠুয়াকে আমার মেয়ে ব'লে ভুল ক'রে বুকে চেপে ধরে বলছিল ‘আমাকে মা বল’—তখনও নয় ! নমিতা, কী নির্ভর তুমি !”

দু'হাতে মুখ ঢাকেন নমিতা। বলে, “ওগো, আর নয়, চুপ কর তুমি।”

কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। ভূষণ ওকে টেনে নেয় নিজের দিকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নমিতার সমস্ত সংযম ভেঙে পড়ে। আর প্রতিবাদ করা নিফল একথা বোঝে সে।

অনেকক্ষণ পরে ভূষণ বলে, “এই যদি তোমার মনের কথা তাহ'লে লতুর বিয়ের কথা কেন বলতে গেলে তুমি ? কেন প্রত্যাখ্যান করলে আমাকে ?”

নমিতা বলে, “এখন আর ফিরবার পথ নেই। লতু জানে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বাবা, পিসীমা সবাই বিয়ের আয়োজন করছেন। তোমার পিসীমা পরশু এসে মায়ের সঙ্গে পাকা কথাও বলে গেছেন। এখন আর অমত ক'র না তুমি।”

ভূষণ বলে, “সে অসম্ভব। লতু ছেলেমানুষ—সহজেই সৎপাত্রে তার বিয়ে দিতে পারব আমরা। তুমি তো বুঝতে পার এ বিয়ে হ'লে তুমি আমি কেউই স্বখী হতে পারব না। লতুও স্বখী হ'তে পারে না—আমাকে পেয়ে।”

“কিন্তু এখন আর উপায় কি বল। না না, ছি ছি, সে আমি কিছুতেই পারব না।”

“তোমাকে পারতেই হবে। আমি পিসীমাকে বলব—তোমার বাবাকে বলব।”

“আর লতু ? না গো—সে হয় না ! ওই কারা আসছে এদিকে। ওঠ, চল যাই।”

ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজে। আটটা সতেরোর লোকাল আসছে ! টিকিটঘর খোলা হ'ল। একে একে লোক জমছে স্টেশনে। ওরা উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে দু'জনে চলে যায় ছুঁদিকে।

কাজে নেমে অবস্থার গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ার বীরেন মৈত্র। বস্তুত এ জাতীয় পরীক্ষা কখনও কোথাও হয়েছে কিনা জানা নেই তাঁর। কলকাতার চীফ-ইঞ্জিনিয়ার এবং উপদেষ্টার কাছে যখন কাগজে কলমে এই স্বীকৃতি দেখেন তখন উল্লসিত হয়েছিলেন তিনি। মনে হয়েছিল এভাবেই হয়তো গড়ে তোলা যাবে নতুন এক সমাজ। সরকারী কাজের ঠিকাদারী ক'রে মুষ্টিমেয় কতকগুলি ঠিকাদার ক্ষীণ হয় বছর বছর। যদি ঠিকাদার নিযুক্ত না ক'রে ডিপার্টমেন্ট থেকে সরাসরি এইসব উদাস্ত মানুষদের কাজে লাগানো যায়—এবং

ঠিকাদারের মোটা মুনাফা লভ্যাংশ হিসাবে তাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া যায় তা হ'লে ভালোই কাজ করা যাবে এদের দিয়ে। কর্মহীন এই কলোনীর লোকগুলি শিখে নেবে নানান কাজ। ক্রমশ দক্ষ হ'য়ে কলোনীর বাইরে গিয়েও কাজ যোগাড় করতে পারবে।

যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ চালু করলেন মৈত্র সাহেব। প্রথম কাজের সূচনা করতে এলেন কলকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সকলে জমায়েত হলেন ইস্কুলের মাঠটার ঐখান থেকেই রাস্তার কাজ শুরু হবে। সর্বপ্রথমেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার সকলকে ডেকে বললেন, “আজকে আমরা যা এখানে চালু করছি তার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাদের এবং আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়, সকলের সততায় এবং আন্তরিকতায় তা অদ্ভুত সাফল্য লাভ করতে পারে—আবার আপনারা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বড় ক'রে দেখেন তা হ'লে এ পরিকল্পনা অন্ধুরেই শুকিয়ে যেতে পারে। স্থির হয়েছে—এ কলোনীতে যা কাজ হবে তা আপনারাই করবেন। বাইরের কোনও ঠিকাদার আসবে না। মিস্ত্রি, মজুর, ছুতোর সমস্ত লাগানো হবে কলোনী থেকেই এ কাজে হয়তো সবাই অভ্যস্ত নন। তাই তাড়াতাড়ি ভালো কাজ আমি মোটেই আশা করছি না—আমি বরং আশা করছি সততার সঙ্গে আপনাদের ঐকান্তিক চেষ্টা। খারা ভালো কাজ শিখতে পারবেন তাঁদের এ কলোনীর বাইরে নিয়ে গিয়েও ছোটখাট কাজ দেব আমি। একটা কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন, টেণ্ডার ডেকে বাইরের ঠিকাদার লাগালে এ কাজগুলি আরও সম্ভায় করা যেত। আমরা সেটা করছি না শুধু আপনাদের নানান কাজে শিখিয়ে তুলব ব'লে। এট সুরোোগে কাজগুলো শিখে নিন আপনারা। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেরাই ফাঁকে পড়বেন। আপনাদের সম্ভাবনাই ভবিষ্যতে বলবে—বাবা কাকারা দুটো পরসার লোভে সর্বনাশ ক'রে গেছে আমাদের।

পুনর্বাসন বিভাগের আর একজন বড় অফিসর বললেন : “আমাদের ইচ্ছা আছে ঐখানে আপনাদের দিয়ে ইট পোড়াবে—টালি বানাব। আজও আমাদের এ রাজ্যে ইট-প্রস্তুতি-শিল্পে বাইরে থেকে পাঠেরা-মিস্ত্রি আনতে হয়। আপনাদের এ সব ব্যবসায় নেমে পড়ায় দেশটা উপকৃত হবে।”

ঠাকুর্দা অভাগতদের স্বাগত জানান।

মেয়েরা শাঁখ বাজায়।

চীফ-ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে আসেন উদ্বোধন করতে।

যতীশবাবু একটি ছোট রূপার কর্নিক এগিয়ে দেন তাঁর দিকে। এটি যোগাড় ক'রে রাখা হয়েছিল আজকের জন্তে।

চীফ ঠর হাতখানা সরিয়ে দেন। তারপর সামনের একজন শ্রমিকের হাত থেকে লোহার কোদালটা টেনে নিয়ে মাটিতে মারেন প্রথম কোপ।

দিন সাতেক কেটে গেছে তারপর।

এই সাত দিনেই বীরেন মৈত্র হাঁপিয়ে উঠেছেন। প্রথম সমস্তাই হ'ল গ্রুপ-লীডার নির্বাচন। বেছে নিতে হবে সেইসব লোক যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের—যারা পরিচালিত করবে সাধারণ কর্মীদের। যাদের লভ্যাংশ হবে সাধারণ কর্মীদের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রায় দু'শ আবেদনপত্র এল গ্রুপ-লীডার হবার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রমাদ গুললেন? বাগচি বলেন, “বেশ তো মশাই—আপনি বলুন না ক'জন গ্রুপ-লীডার চাই আপনার?”

বীরেনবাবু বলেন, “তার আগে আপনি বলুন কলোনীতে কাজ করতে নামবে কত লোক?”

বাগচি বলেন, “আপাতত ধরুন হাজার।”

নিতাইপদ বলেন, “আমার মনে হয় প্রথমে শ'তিনেকের বেশী লোক পাবেন না। উদয়নগর হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের কলোনী। এরা মেহনতী মানুষ নয়। একে অনভ্যাস তায় চক্ষুলাঙ্কা। শ'তিনেক লোক পেতে পারেন প্রথমে।”

বাগচি বলেন, “বেশ, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা যাক তিনশো।”

বীরেন বলেন, “গ্রুপে পনের জন ক'রে লোক কাজ করলে গোটা কুড়ি গ্রুপ হবে সর্বসমত।”

যতীশবাবু বলেন, “দু'শ আবেদনপত্র থেকে মাত্র কুড়িটি লোক বেছে নিলে তো বিরাট দলাদলি মারামারি বেধে যাবে।”

বাগচি দৃঢ়ভাবে বলেন, “দলাদলি মারামারি যাতে না বাধে তা আমাদের দেখতে হবে। আপনি কুড়ি জনকেই কাজ দিন। নিতাইবাবু দরখাস্ত দেখে বলুন কোন্ কুড়ি জনকে প্রথম কাজ দেওয়া যায়।”

ঠরা সকলে মিলে বেছে বেছে বার করলেন কুড়িটি আবেদনপত্র। সবচেয়ে যারা দুঃস্থ তারাই পেল অগ্রাধিকার।

এদের নিয়েই কাজ শুরু হ'ল।

কাজে নেমে মৈত্রসাহেব অল্পভব করলেন অস্থবিধাটা। এসব বাধা বিষয়গুলি লক্ষ্য হয় নি এতদিন। নিঃস্ব বেকারের পক্ষেই গ্রুপ-লীডারশীপ পাওয়ার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল কিছু মূলধন না থাকলে ঠিকাদারী করা চলে না। দিনের শেষে সাধারণ মেহনতী মানুষ দৈনিক খোরাঙ্কি দাবি করে।

কয়েকজন গ্রুপ-লীডার চড়া স্বরে টাকা ধ'র করল ;—জড়িয়ে পড়ল ঝগড়ালে ।
কয়েকজন গোপনে বিক্রি ক'রে দিল গ্রুপ-লীডারশীপ—যেমন ক'রে সিমেন্ট আর
টিনের পারমিট বিক্রি হয় । বেনামিতে চলল সে গ্রুপের কাজ । কেউ বা নিজের
থেকেই এসে শরণাপন্ন হ'ল বীরেনবাবুর । দরকার নেই ঠিকাদারীতে । চাকরি যদি
দিতে পারেন কিছু তাই দিন ।

বাগচি বলেন, “কাজ চালাবার জগ্গে গ্রুপ-লীডারদের কিছু আগাম দেওয়া যায় না ?”
বীরেনবাবু হতাশ হ'য়ে মাথা নাড়েন । বিনা জামানতে আগাম দেওয়ার ব্যবস্থা
নেই সরকারি আইনে ।

“দৈনিক মাপ ওঠানো যায় কি ?”

“সেও এক রকম অসম্ভব ।”

সারাদিন মৈত্র কাজ দেখেন ঘুরে ঘুরে । শুধু রাস্তার কিছু কাজ বিতরণ করেছেন ।
অগ্ন্যাগ্ন বড় কাজগুলি শুরু হয় নি । একজন ওভারসিয়ারও জয়েন করেছে কাজে ।
ছোট একটি ঘর ভাড়া ক'রে অফিস খুলেছেন । চেয়ার বেঞ্চি খাতাপত্র কিছুই
আসে নি এখনও । ধারে চলেছে কারবার । প্রায় শ' চারেক লোক কাজ শুরু
করেছিল । দৈনিক খোরাকির টাকা না পেয়ে কিছু লোক কাজ বন্ধ রেখেছে ।
এখন শ'তুই লোক খাটছে বিভিন্ন রাস্তায় । কোথাও ‘বরোপিট’ থেকে মাটি কেটে
এনে রাস্তা উচু করছে, কোথাও নয় ইঞ্চি গভীর ‘বক্সকাটিং’ চলছে । কোথাও
সোলিং বিছানো শুরু হ'য়ে গেছে । লক্ষ্য করলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব—যারা কাজ
করছে তারা প্রায় সবাই ভদ্রসন্তান । ওপারে ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকুরে,
শিক্ষক অথবা জমিদারী সেরস্তার বিভিন্ন কাজে লিপ্ত । ঘোষ, বোস, মল্লিক, নন্দী
তো আছেই—তাছাড়া রায়, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলী, ভট্টাচার্য্যিও আছে ।

বাগচি উৎসাহিত হ'য়ে বলেন, “এই সব ভদ্রলোকের ছেলে যে মাটি কাটার কাজে
এগিয়ে আসবে তা কিন্তু ভাবাই যায় নি ।”

মৈত্র বলেন, “আপনি এতে খুসী হয়েছেন ?”

“নিশ্চয়ই । জানেন কাল রাত্রে কি হয়েছে ?”

গল্পটা শোনান বাগচি সাহেব । গতকাল কলোনীর কাজ সেয়ে সন্ধ্যা গাতটার
লোকালে জংসনে ফিরছিলেন উনি । কলোনীতে এখনও হুঁর কোয়ার্টার্স হয় নি ।
তাই রোজ যাতায়াত করেন । হঠাৎ বাগচির নজরে পড়ে রাস্তার মধ্যে লণ্ঠন জ্বলে
জনা পাঁচ-ছয় লোক কি করছে । ইট চুরি করছে না তো ? উনি এগিয়ে আসেন ।
লোকগুলি উঠে দাঁড়াল । জনা কয়েক পুরুষ । তিনটি রমণী । দুটি বধূ একটি অনুচা

যুবতী ।

একজনকে বাগচি চিনতে পারেন—শোভনাদেবী । স্থলের একজন শিক্ষয়িত্রী ।

“কি করছিলেন এখানে ?”

ওরা জবাব দেয় না ।

যুবতী মেয়েটির হুঁহাতে হুঁখানি থান ইট ।

“ইট নিয়ে যাচ্ছেন কোথায় ?”

শোভনাদি হেসে বলেন, “চুরি করি নাই । আমরাই ইট সাজাইতেছিলাম ।”

বস্ত্রত রাস্তায় সোলিং বিছিয়ে দিচ্ছিলেন ওরা । শোভনাদি, তাঁর ছোট বোন, মা আর বাবা । প্রকাশ্য দিবালোকে কাজ করা সম্ভব নয় বলে রাত্রে লঠন জেলে কাজটা এগিয়ে রাখাছিলেন । শোভনাদির বাপ নগেনবাবু একজন গ্রুপ-লীডার ! বাগচি বলেন, “বুঝতে পারছেন বাপারটা ? এ সঙ্কেচ আর ক’দিন ? সকলেই যদি চক্ষুজ্জ্বার ভয়ে রাত্রে লঠন জেলে কাজ করে তবে রাত্রেই সবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে । সকলেরই চক্ষুজ্জ্বা ভাঙবে ।”

মৈত্র বলেন, “তা না হয় মানলাম । কিন্তু ঐ ভদ্রপরিবারটিকে শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত করার কেন এত আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন আপনি ? হৃদয়ের পক্ষে সত্যিকারের মেহনতি মানুষ হওয়া কি সম্ভব ? আর সম্ভব হ’লেও কি সেটা বাঞ্ছনীয় ?”

বাগচি বলেন, “তাও ভালো মশাই তাও ভালো । বিশ্বাস না হয় ওদেরই জিজ্ঞাসা ক’রে দেখুন । ভদ্রলোক সেজে কি লাভ হয়েছে ওদের ? কতকগুলো বাড়তি চক্ষুজ্জ্বা ছাড়া কি দিয়েছে ওদের—সমাজ ? শ্রমের মর্যাদাটা বিকৃত করার নজির বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে । আপনাদের ভদ্রলোক ছোটলোকের বিচার নিয়ে আপনারা থাকুন । এরা গায়ে খেটে হুঁপয়সা রোজগার করুক ।”

তারপর উনি বলতে থাকেন ঐ পূর্ব অভিজ্ঞতা । এর আগে উনি কিছুদিন ছিলেন বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্পের চার্জে । সেখানকার ইতিহাস ব’লে যান উনি ।

“জোয়ান মর্দগুলো মশাই বসে বসে ডোল খেত । নড়ে বসবে না । তার চেয়ে এই ভালো নয় ? তাছাড়া ঐ শোভনাদেবী অথবা তাঁর বাবা—ওঁরা আজ এভাবে হুঁপয়সা বাড়তি রোজগার করছেন বই তো নয় । আপনার এখানে আজ যারা কাজ করছে তাদের অনেকে হুঁপয়সা জমিয়ে আবার ফিরে আসবে মধ্যবিত্ত সমাজে । শুরু করবে অন্ত্র ব্যবসা ।”

“আর মধ্যবিত্ত সমাজ যদি তাদের অপাংক্তেয় করে ?”

“তাতে ব্যয়ই গেল । আপনাদের সো-কল্ড ভদ্রলোকের চেয়ে মেহনতী মানুষদের অবস্থা আজ বেশী খারাপ নাকি ?”

আর একটি সমস্তার দিকে নজর পড়েছিল মৈত্রশাহেবের। সেটাও আলোচনা করেন। ঠন্দের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিস্ত সমাজ থেকে গ্রুপ-লীডার বেছে নেবেন। তারা কাজ শিখে ভবিষ্যতে হবে ঠিকাদার। নিজে হাতে কাজ করা না শিখলেও চলবে—তাদের জানতে হবে ঠিকাদারী বিজ্ঞা। হিসাব রাখা, মালপত্র যোগাড় করা, লোক খাটানোর কাজ। আর নিম্নশ্রেণীর লোক শিখবে মিস্ত্রির কাজ, মজুরের কাজ প্রভৃতি। কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল এ কলোনীতে ষ্ট্রট হোল্ডার সকলেই মধ্যবিস্ত-শ্রেণীর ভদ্রলোক। উচ্চ মধ্যবিস্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিস্ত। মৈত্র তাই বাগ্‌চির দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন। বাগ্‌চি বলেন, “আমরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলকেই গ্রুপ-লীডার করব।

“তা তো সম্ভব নয়। যে গ্রুপ-লীডার হবে তাকে শিখতে হবে ঠিকাদারী বিজ্ঞা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকেই যদি ঐ বিজ্ঞা শেখাতে যাই তা হ’লে আসলে কেউই কিছু শিখবে না। তাছাড়া কলোনীর সবকটি লোকই ভবিষ্যতে ঠিকাদার হোক—এও নিশ্চয়ই চাই না আমরা। ওদিকে যারা গাঁথনির কাজ শিখবে, মজুরের কাজ শিখবে—তাদেরও লেগে থাকা চাই নিজ নিজ লাইনে।”

“অর্থাৎ আবার সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সমাজব্যবস্থা? ক্ষত্রিয় বেদপাঠ করতে পারবে না—মজুর গ্রুপ-লীডার হ’তে পারবে না? ক্লাসলেস-সোসাইটি থেকে যাবে স্বপ্ন কথা?”

বীরেনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, “ক্লাসলেস সোসাইটি বলতে আপনি যদি মনে করেন যে প্রতিটি মানুষ রাস্তা বাঁটা দেওয়া থেকে অ্যাসেম্ব্লির স্পীকার হওয়া পর্যন্ত সব কাজ একসঙ্গে করবে—তাহ’লে সেটা স্বপ্ন কথাই থাকবে বটে।”

“আমি কিন্তু তা বলি নি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। আমি বলছি যে লোক আজ সত্যিই বাঁটা হাতে রাস্তা সাফা করছে কাল সে উপযুক্ত হ’লে কেন তাকে বসাবেন না অ্যাসেম্ব্লির স্পীকার ক’রে? আজ যে মজুর কাল সে ঠিকাদার হ’তে পারবে না কেন—বিশেষত সবাই যখন মধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের লোক।”

বীরেনবাবু উত্তেজিত হ’য়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বাগ্‌চি আবার বলেন, “যাক্ কাজের এই প্রথম অবস্থাতেই অত কথা আমাদের না ভাবলেও চলবে।

মৈত্র দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়েন : “না বাগ্‌চি সাহেব। এখানেও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। ভাবতে হ’লে এখনই এসব কথা ভেবে নিন। এরপর আর ভাববার সময় পাবেন না। কাজের তাড়ায় এগিয়ে যাবো আমরা একমুখে। কাজ অনেকটা ক’রে যখন অগ্রগতি বিষয়ে আশ্চর্য্যজনক করতে বসব তখন হয়তো দেখা

যাবে অগ্রগতি হয়েছে বটে তবে আমাদের মুখটা ছিল লক্ষের বিপরীত দিকেই। একটা কথা আমাদের ভুলে চলেবে না যে আমরা এখানে যে এক্সপেরিমেন্ট করছি সেটা আগে কোথাও পরখ করা হয় নি। এই লোকগুলোই শুধু নয়—এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্যও নিরূপণ করছি আমরা। আমাদের একটা ভুলে হয়তো ভুগতে হবে এদের তিনপুরুষ ধরে।”

বাগচি সাহেব বীরেন মৈত্রের পিঠে একখানা হাত রেখে বলেন, “জানি মিস্টার মৈত্র, জানি। কলোনীর এই লোকগুলোকে দিয়ে আমরা পত্তন করছি এক নতুন সমাজ। এখানে সৃষ্টি হচ্ছে এক খুদে পৃথিবী। এরা সবাই এখন নরম কাদার তাল। শিব গড়া অথবা বাদর গড়া নির্ভর করছে আমার আপনার উপরেই।”

বীরেন মৈত্র জবাব দেন না। দু’জনে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেন অফিসের দিকে। পথের দু’ধারে কর্মব্যস্ত মানুষ। ইঁট আসছে লরী ক’রে। মাটি কাটছে উদ্ভাস্তরা—সোলিং বসাচ্ছে রাস্তায়। খোয়া ফেলছে। রোলার এখনও এসে পৌঁছায় নি। রেল লাইনের ওপাশে ইঁটখোলার ‘কিলন’ কাটা হচ্ছে। সেখানেও মাটি কাটছে উদ্ভাস্ত শ্রমিক। মাস্টার-রোল-লেবার। নীরবেই পথটা অতিক্রম করেন দু’জনে। মৈত্রসাহেব ভাবছিলেন কি ক’রে এইসব পুঁজিহীন নিঃস্বদের দিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা যায়।

মনে আছে কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা হেসেছিল পরিকল্পনা শুনে। সরকারের ঠিকাদারী বিভাগ! যতসব বোগাস! সহপাঠী ঋতব্রত বলেছিল, “মায়ের কাছে আর মাসীর গল্প ক’র না ভাই। আমার জানা আছে সব। সদাশয় সরকার বাহাদুরের এইসব পোষাপুত্রেরা চেনে শুধু দুটি জিনিস ‘লোন’ আর ‘ডোল’। খেটে খাওয়া! মাপ করন লাগবো!”

সবাই হোঁচো ক’রে হেসে উঠেছিল।

মৈত্র প্রতিবাদ করেন নি। উদ্ভাস্তদের মধ্যে ইতিপূর্বে কাজ করেন নি তিনি। এখন তাঁর মনে হচ্ছে বাঙলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে তিনি যে পরীক্ষা ক’রে চলেছেন আজ, তার সংবাদ জানে না বৃহস্তর পৃথিবী; হয়তো জানবেও না কোনদিন যদি তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ না করে। যদি স্বার্থসন্ধানী উদ্ভাস্ত দলনেতা আর উৎকোচ-লোভী সরকারী কর্মচারীদের যড়যন্ত্রে এ পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ’য়ে যায়! কিছু ক্ষমতা অবশ্য দিতেই হবে স্থানীয় কর্মচারীদের। গ্রুপ-লীডারের সংখ্যা যত বাড়বে—অর্থনৈতিক বণ্টনব্যবস্থা ততই সামোর রূপ নেবে। অথচ বেশী গ্রুপ-লীডার হ’লে উৎকোচলোভী কর্মচারীর সুযোগ যাবে বেড়ে। রামের মাপ জামের খাতায় ঝিল কিনা তখন আর ধরা যাবে না। দ্বিতীয়ত যে কোন সাধারণ

ঠিকাদারের যেটুকু ক্ষমতা আছে তাঁর তা নেই। একজন সং ওভারসিয়ারকে তিনি পাঁচ টাকা মহিলা বাড়িয়ে দিতে পারেন না—অসং জেনেও আর একজনের ‘পে-বিল’ আটক করতে পারেন না। যারা সততার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে নিরলস পরিশ্রমে তাঁর ‘কণ্ট্রাক্ট ডিভিসনকে’ লাভবান করবে তাদের কোন বোনাস—কোন পুরস্কার দেবার ক্ষমতা তার নেই ;—শুধু তাঁর কেন এমনকি চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পর্যন্ত নেই। আবার আইনের ফাঁক দিয়ে হাতে নাতে ধরা না পড়ে কেউ পুকুর-চুরি করলেও কিছু করণীয় নেই—হাত কামড়ানো ছাড়া। তাহ’লে কি ক’রে ভালো কাজ করা যাবে ?

আচ্ছা, এদের সমস্যা নিয়ে একটা উপস্থাপনা লিখলে কেমন হয় ? পড়বে না কেউ সে বই ? বিশ্বাস করবে না পড়ে ? চিন্তা করবে না এর সমাধানের ? যারা পারে তাঁর সমস্যাকে সরল করতে তারা এগিয়ে আসবে না ? কে জানে ! নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিপূর্বে একটি কাহিনী রচনা করেছিলেন মনে আছে। আর এও মনে আছে একটি বিখ্যাত প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকায় তাঁর পরিচয় হয়েছিল কল্পনাবিলাসী বলে। সমালোচনায় সমালোচক বলেছিলেন ‘অমুক চরিত্রটা অবাস্তব !’ হাসি পায়, যখন তাঁর মনে পড়ে চরিত্রটা তাঁর কলমের মুখে জন্মায় নি—সেটা তাঁর চোখে দেখা !

বাগচিও মনে মনে ভাবছিলেন প্রায় একই কথা। পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। এর আগে তিনি ছিলেন একটা পি. এল. ক্যাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সেই বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প-বাসীদের সঙ্গে এই কলোনীর লোকগুলোকে মনে মনে তুলনা করছিলেন তিনি। বাঁচবার জন্তে এদের কী অপরিমিত আগ্রহ। অনভ্যস্ত হাতে কাজ করছে—চড়া রোঙ্গে দাঁড়িয়ে। বাঁচবে, ওরা বাঁচবে, নিশ্চয়ই মানুষ হ’য়ে উঠবে আবার। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আবার সামাজিক মানুষ হ’য়ে উঠবে ওরা। বিরাট পরিবর্তন হ’য়ে যাচ্ছে ওদের মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে। এ পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবেই। অনেক প্রতিকূলতা দেখা দেবে। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে তারাই আসবে বাধা দিতে। বড় বড় ঠিকাদার এ ব্যবস্থাটা পছন্দ করবে না ; পছন্দ করবে না যারা বড় ঠিকাদারের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে অভ্যস্ত। কাস-ডোলের ব্যবস্থায় যাদের বে-আইনী সুবিধা হচ্ছিল তারাও আসবে বাধা দিতে। কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করতে হবে। সব সরকারী কর্মচারীই কিছু অসং নয়—তারা নিশ্চয়ই প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে বাগচির আর মৈত্রের।

চোখের সামনে বাগচি ভাঙাগড়ার নতুন ইতিহাস শুরু হ’তে দেখেছেন। ওপারে

ওদের সমাজ বিভক্ত ছিল জাতের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ কার্যে বৈশ্ব জল-অচল জাতের গণ্ডিতে। কর্মগত জাতিভেদও ছিল। ব্যবসায়ী, চাকুরে, ভূস্বত্বভোগী, ভূমিহীন চাষী অথবা ভাগচাষী। এ পারে এসে সবাই দাঁড়িয়েছে এক সমতলে। সবাই বেকার—সবাই উদ্বাস্ত! কর্মগত ভেদ হারিয়েছে তার সীমারেখা। এখন বরং জেলাগত গোষ্ঠী গড়ে উঠছে ওদের মধ্যে। যশোর, পাবনা, মৈমনসিং, কুষ্টিয়ার লোকেরা নিজের জেলার লোকের মধ্যে অল্পভব করে একটা স্বল্প আত্মীয়তা-বোধ। এক গ্রুপে কাজ করছে যারা তারা এক পাড়ার বা ব্লকের লোক নয়—এক-প্রাক্তন-জেলাবাসী। দু' পাঁচ বছরে না হোক—কালে ওরা সকলেই হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী। চট্টলা নোয়াখালী, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী হারাবে তাদের ভাষাগত বৈষম্য। ভাবেন বাগচি,—দিয়ে আর নিবে, মিলাবে মিলিবার দেশে এক দেহে লীন হ'য়ে ওরা রচনা করবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়!

পরিকল্পনার কাজ ক্ষুদ্র এগিয়ে চলেছে। নিতাই ঠাকুরদা, ভূষণ, যোগেনদের আর নাওয়া খাওয়ার বিরাম নেই। কুড়িজন গ্রুপ-লীডার বিশটা রাস্তায় কাজ করছে। নতুন গ্রুপ আর লাগানো হয় নি। সাতদিনের মাথায় বিল দেওয়া হয়েছে। মাথা পিছু মেহনতী মাহুষেরা পেয়েছে দৈনিক আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। লীডাররা পেয়েছে পাঁচ থেকে ছয় টাকা। এটা একেবারে আশাতীত। গ্রুপ-লীডাররা বেশী পাচ্ছে। স্মরণ্য সবাই গ্রুপ-লীডার হ'তে চায়! জীবন বেনামিতে একজন গ্রুপ-লীডারের কাজ চালাচ্ছে। গোপনে কিনে নিয়েছে সে গ্রুপ-লীডার-শীপট। ফলে তার বিড়ি ফ্যাকটরির কাজ বন্ধ হ'তে বসেছে। যারা বিড়ি বানাতো তারা এসে অহুযোগ করল ঠাকুরদার কাছে। এ জাতীয় অহুযোগ অভিযোগ লেগেই আছে।

এদিকে ফ্যাক্টরি তৈরি, প্রডাকসন সেন্টার তৈরি আর ইট-খোলা করার শ্রাসন এসে গেছে। মৈত্র খবরটা গোপনে জানালেন বাগচি সাহেবকে। এ কাজ তিনটি বড় কাজ—প্রত্যেকটিই লাখটাকার কাছাকাছি। এর জন্তে ভালো গ্রুপ-লীডার চাই। মানে শুধু সং হ'লেই হবে না—একেবারে অত্যাধিকারী লীডারও চলবে না। কি ভাবে গ্রুপ-লীডার বেছে নেওয়া হবে সেটা জানবার জন্তে মৈত্র সাহেব নির্দেশ চেয়েছিলেন উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। চীফ-ইঞ্জিনিয়ার রহস্য ক'রে ছাড়া কথা বলতে জানেন না। বলেছিলেন, “তোমরা দুই বায়েশ্বেই সেটা ঠিক কর। আমাকে বাদ দিলেও যথেষ্ট ঘোলা হবে জল।”

বাগচি সাহেব নিতাইপদকে মোখিক বলেছিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে।

নিতাইপদ সেরকম লোক খুঁজে পান নি। কলোনীতে যে কটি লোকের মূলধন আছে তারা বিশ্বাসযোগ্য নয় মোটেই। অথচ বেশী টাকার কাজ সাধারণ লোকের মধ্যে কাউকে দেওয়াও যায় না। ক’দিন আপন মনেই ব্যাপারটা ভেবেছেন নিতাইপদ। শেষে এক বুদ্ধি বার হয়েছে তাঁর মাথা থেকে। ‘মালটি-পারপাস কো-অপারেটিভ’ তৈরি করতে হবে একটা। তার শেয়ার হোল্ডার হবে কলোনীর যত দুঃস্থ বেকার লোক। দশটাকা বা একশ টাকার শেয়ার কিনবে সবাই। সোসাইটির কর্মপরিষদে রাখতে হবে কয়েকজনকে—যাদের গঠনমূলক কাজের অভিজ্ঞতা আছে। ভূষণ, যতীন, রাখাল প্রভৃতি কয়েকজনকে মনে মনে স্থির করলেন নিতাইপদ।

গোড়া বেঁধে কাজ করার অভ্যাস ঠাকুরদার। তিনি স্থির করলেন গোটা কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা থাকা উচিত তাঁর গণকল্যাণ সমিতির। এটা থেকে তিনি স্থির করবেন কে কে শেয়ার হোল্ডার হবে। সরকার থেকে যদি কো-অপারেটিভ লোনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে তো সোনার সোহাগা। কর্মীদের লাগিয়ে দিলেন তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ ক’রে আনতে। কেন, কি বৃত্তান্ত, সেটা গোপন রাখলেন আপাতত। স্বেচ্ছাসেবকগুলিও ওসব প্রশ্ন করে না কখনও। অক্লান্ত পরিশ্রম ক’রে যায় তারা।

ঠাকুরদা বসে আছেন তাঁর বৈঠকখানার চেয়ারে। অনবরত লোকজন যাতায়াত করছে। এটাই এখন গণকল্যাণের অফিস। অফিসেই মাঝে মাঝে ঠাকুরদা কারও নাড়ী দেখে ওষুধ দেন। সেটাও গণকল্যাণের কাজ।

“বিহারী তোমার ব্লকের স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টটা হ’য়ে গেছে?”

“হ্যাঁ ঠাকুরদা এই নিন।”

একগাদা কাগজ সে এগিয়ে দেয় ঠাকুরদার দিকে। পাতা উন্টে দেখতে দেখতে ঠাকুরদা বলেন, “প্রত্যেক বাড়ি গিয়েছিলে?”

“প্রত্যেক বাড়ি। ক’জন লোক, কত বয়স, কি করে, সব লিখে এনেছি। ছককাটা ঘরে লিখে দিয়েছি—যেমন চেয়েছিলেন।”

রিপোর্টটা ঠাকুরদা এগিয়ে দেন নমিতার দিকে : “নাও ধর। কতগুলি ব্লক হ’ল?”

নমিতা বলে, “চারটে হয়েছে। শুধু ভূষণবাবুর ব্লকের রিপোর্টটা আসে নি এখনও।”

“শেষ পর্বস্ত ভূষণই লাস্ট? নাঃ, ডোবালে দেখছি ছেলেটা। ওতো এমন ছিল না।

কি হয়েছে বলত আজকাল ওর? কই ভূষণ কই?”

“ভূষণবাবু আজ আসেন নি।”

“দেখ দিকিনি কাণ্ড। ভূষণের রিপোর্টটা এলেই আমি কম্পাইল ক’রে ফেলতে

পারতাম।”

স্বপ্নের কর বলে, “কিন্তু এ মহাভারত রচনা করে কি হবে ঠাকুর্দা?”

ঠাকুর্দা হাসেন : “সে কথা এখন বলব না।”

নমিতা বলে, “বা রে—আমরা খেটে মরব অথচ জানতে পারব না?”

তখন নিতাই ঠাকুর্দা আসল কথাটা ভেঙে বলেন। ঠর ইচ্ছা আছে একটা মালাটি-পারপাস্ কো-অপারেটিভ গড়ে তোলা। বড় বড় তিনটি কাজের স্টাংসন এসেছে ; —প্রডাকসন সেন্টার, ফ্যাক্টরী আর ইটখোলা। এ তিনটি কাজই নেবে এই কো-অপারেটিভ।

রাখাল বলে, “তার সঙ্গে এ স্ট্যাটিসটিক্সের কি সম্বন্ধ?”

“বুঝি না? কলোনীর প্রত্যেকটি পরিবারের নাড়ি-নক্ষত্র থেকে গেল আমাদের কাছে। কোন পরিবারে ক’জন লোক, কত আয়। কো-অপারেটিভ হবে স্তন্যদেয় সবাই চাইবে মেসার হ’তে। আমরা তখন বেছে নিতে পারব এই চার্ট দেখে।”

নমিতা যোগ দেয় : “আচ্ছা ঠাকুর্দা; রিলিফ অফিস থেকেও তো গতবার ইকনমিক্যাল সার্ভে করানো হয়েছিল। সে সব কাগজ কোথায়? ভূষণবাবুর ব্লকের খবর তো সেখান থেকেও সংগ্রহ করা যায়।”

“তা তো যায়, কিন্তু মুণ্ডলি হয়েছ কি বাগচি সাহেবের মায়ের অস্থখ। দিন দশেক ছুটি নিয়েছেন তিনি। যতীশবাবু অফিসিয়েট করছেন। তিনি বলছেন সে সব কাগজ কোথায় তা একমাত্র বাগচি সাহেবই বলতে পারেন।”

“অসম্ভব। বাগচি সাহেব তো নতুন এসেছেন। পুরানো রেকর্ড কোথায় আছে তিনি ছাড়া অফিসে কেউ জানে না? রেকর্ড কোথায় থাকে তা রেকর্ড ক্লার্ক জানবে না—জানবে অফিসার?”

ঠাকুর্দা বলেন, “যতীশবাবুকে তো চিনি। আমাদের ছ’ চোখে দেখতে পারেন না। কী মতলব আঁটছেন তা তিনিই জানেন।

হৃদয়ঙ্গ হ’য়ে ঘরে ঢোকে যোগেন নায়েক, বলে, “ঠাকুর্দা, কী কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ঘরে বসে। বাইরে আসুন। ওদিকে সর্বনাশ হ’তে বসেছে।”

“কি, হয়েছে কি?”

উঠে পড়ে সবাই।

“ভূষণ! আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—আপনার ঘর থেকে আনতে। ফ্যাক্টরীর মাঠটার একদল নতুন রিক্সি এসে উঠেছে। যে স্টোর গোডাউনটা নতুন তৈরি হয়েছে—সেটা রিক্সিতে ভরে গেছে। মাঠেও এসে বসেছে অনেক। মৈত্র সাহেবও এসেছেন। ওরা উঠবে না বলছে।”

“নতুন রিকুজি ? কই চলতো দেখি।”

ফাকা মার্চটার কাছে এসেই ওরা দেখতে পেলেন ফ্যাকটারির জন্তে যে বিস্তীর্ণ জমিটা নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। অস্তুত দু’শ, পরিবার। ককালসার মানুষ। নরনারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুতবংসা নারী, সন্তান ক্রোড়ে সত্ত জননী। এরা কারা ? এল কি ক’রে ?

এরা নবীন অতিথি। এ দেশের লোক নয়—ভিনদেশী মানুষ। নবীনতম প্রতিবেশী রাজ্যের প্রবীণতম অধিবাসী। যে দেশে এরা এতদিন ছিল সেটা সম্প্রতি স্বাধীন হয়েছে। ওদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকে এই পরাধীন দেশে বাস করে এসেছে ওরা। সম্প্রতি সেখানে ওরা আবিষ্কার ক’রে বসল যে হাটের বাজারে চাল নেই, চাকরির বাজারে স্থান নেই, পথে ঘাটে মর্ষাদাটুকু পর্যন্ত নেই। তাই ওরা চলে এসেছে সে দেশ ছেড়ে এদেশে। পড়ে ছিল শেয়ালদ’ স্টেশনে শ’য়ে-শ’য়ে হাজারে হাজারে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ! পাসপোর্ট, ভিসা মানে না। অস্ত্রায় করে থাকি—জেলে দাও। বে-আইনি কাজ ক’রে থাকি—আইন-মার্কিন্ শাস্তি দাও। জেলেও ‘খাতি দেয়’।

ওদের জেলে দেওয়া হয় নি। তাই সংখ্যায় বাড়ছিল ওরা শেয়ালদ’ স্টেশনে। বাক্স-তোরঙ্গ-পোর্টলা সাজিয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারের শ্রোত থেকে রক্ষা করত নিজেদের। দেশে থাকতে যেমন পদ্মার জলশ্রোতের দিকে সজাগ সশঙ্ক দৃষ্টি রাখত—এখানেও তেমনি দশটা-পাঁচটার জনশ্রোতের দিকে মেলে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। ওদের ভিড় ঠেলে গেটে পৌছাতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের লাগে পনের বিশ মিনিট। ওদের ভিঙিয়ে মাড়িয়ে ছোটে তারা গেটের দিকে। দোষ দেওয়া যায় না তাদেরও। মনটা পড়ে থাকে অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারের দিকে। পাঁচ মিনিট পরেই সেটা চলে যাবে সেকসানাল বড় সাহেবের ঘরে। সেখানে গিয়ে সহ-করা মানে যে কি তা খারা জানেন না তাঁদের তা বোঝান বুখা চেষ্টা। আর খারা জানেন তাঁদের তা বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য। এই জোয়ারের জল আবার ফিরে আসে সাড়ে পাঁচটা—ছটায়, তাঁটার টানে। আবার ওরা মাতুরটাকে উঁচু ক’রে বসে বসে তাকিয়ে দেখে।

এরই মধ্যে উনান জালিয়ে ভাত ফোটায়, স্নান করে, খায়, ভিজ্জে কাপড় নেড়ে শুকিয়ে নেয়। তারপর কি ক’রে সেখানে খবর রটে গেল উদয়নগর কলোনীতে কাজ করলে খেতে পাওয়া যায়। সরকার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ কর, খাও নাও ! এর চেয়ে সুখবর আর কি হ’তে পারে। এই তো চায় ওরা। ওঠাও মালপত্র।

“ই টেরেন কই যাবো গো ? উদয়নগর ইন্সটিশানে ধরব ?”

একবার যদি কেউ বলে বসে ‘হ্যা’। বাস্। আর দেখতে হবে না। পিল্ পিল্

ক'রে লোক ওঠে ট্রেনে। টিকিট লাগে না ওদের। বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠেছি ? হাজতে দেবে ? দাও। হাজতেও খেতে পাওয়া যায়। গ্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। দলে দলে লোক নেমে পড়ে উদয়নগর স্টেশনে।”

“কই গো কি কাজ করুম কও। খাতি দাও।”

বাপার দেখে ঠাকুর্দা বিচলিত হলেন। অস্তুত দু'শ পরিবার এসে উপস্থিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ককালসার নরনারী। প্রডাকসন সেন্টারের সাইটে যেসব বাণ টিন এসেছে সেগুলো খাড়া ক'রে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন তুলতে চায়। নতুন গুদামঘর যেটা তৈরি হয়েছিল—তার মধ্যে তিল ধারণের স্থান নেই। বীরেন মৈত্র নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। ভূষণও দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

নিতাইপদ মৈত্র সাহেবকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

মৈত্র সাহেব বলেন, “এ কী নতুন ফ্যাশাদ বলুন দেখি। ওরা এসে জোর ক'রে উঠেছে এখানে।”

নিতাইপদ বলেন, “ওরা এল কখন ?”

কে একজন বললে কাল রাত্রি থেকেই লোক আসছে। আজ সকালের লোকালেই এসেছে অধিকাংশ লোক।

মৈত্র বলেন, “কি করা যায় বলুন তো ? বার ক'রে দিতেও পারছি না। সতাই ওরা যাবে কোথায় ?”

ঠাকুর্দা বলেন, “তা তো বটেই।”

আর সহ্য হয় না ভূষণের। বলে, “ফিরতি ট্রেনে ওদের জোর ক'রে তুলে দেওয়া হোক। না হ'লে আপনার যে মরিতে মাল আসছে সেগুলো তো খালিই ফিরছে—তাতে বসিয়ে দেওয়া হোক।

নিতাইপদ বলেন, “ছি ভূষণ ; ওদের আজকে যে অবস্থা হয়েছে একদিন তোমার আমারও ঐ অবস্থা হয়েছিল। সেটা ভুলে যেও না।”

“তাই বলে, আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে ?”

“বন্ধ হ'য়ে যাবে কেন ? যেসব ডেসার্টার্স প্লট খালি আছে সেগুলিতে ওদের বন্দোবস্ত দিতে হবে।”

ইঞ্জিনিয়ার বলেন, “কিন্তু ঐ দু'তিন শ' পরিবারের পিছনে যে দু'তিন হাজার পরিবার আসছে না—তাই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ?”

ঠাকুর্দা চুপ করে রইলেন। কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

ভূষণ মৈত্র সাহেবকে লক্ষ্য ক'রেই বলে, “প্রথম থেকেই যদি কঠিন না হন স্ত্রী— তা হ'লে কিছুতেই এদের ঠেকাতে পারবেন না। আর প্রথম দলটিকে আমরা

যদি আমরা জোর ক'রে ফেরত পাঠাতে পারি তাহ'লে আর কেউ এখানে আসবে না।”

নিতাইপদ ধীর কণ্ঠে বলেন, “যারা এসেছে আমাদের এখানে অতিথি হিসাবে— ঘাড় ধরে তাদের বার ক'রে দেওয়াটায় আমার মত নেই।”

যোগেন উত্তেজিত হয়েছে, বলে, “বেশ তবে আপনার কি মত তা বলুন? এরা না হয় থাকল—যারা আসছে তাদের ঠেকাবেন কি ক'রে?”

ভূষণ বলে, “আর ঘাড়ে হাত দিয়ে তো সত্যিই ওদের তাড়ানো হবে না। আপনি অল্পমতি দিন, আমরা ওদের বুঝিয়ে—”

“অতি সযত্নে গাড়িতে তুলে দিই। ভূষণ, গণকল্যাণ সমিতি গঠনে তুমি ছিলে আমার ডান হাত। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি—আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। যারা এসেছে তারা অতিথি, তারা নারায়ণ!”

নিতাইপদ চলতে শুরু করেন।

ভূষণ বিরক্ত হয়ে পিছন থেকে বলে, “তবে চলুক আপনার অতিথি সেবা। আমাদের পরিকল্পনা যাক বানচাল হয়ে। মরুক কলোনীর বাসিন্দা। নারায়ণ সেবা তো বন্ধ হ'তে পারে না!”

নিতাইপদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। এ আঘাতটা বোধ হয় অপ্রত্যাশিত। তিনি নিজে বোধ হয় জানতেন না—তাঁর আদর্শ এরা মনে প্রাণে নিতে পারে নি। এরা বাধ্য হ'য়েই তাঁকে দলপতি ক'রে রেখেছে। নিজ সেনাপতিকেই এখন বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেন। বলেন, “ভূষণ! এতটা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর মন যখন তোমার—তখন তোমার উচিত হয় নি গণকল্যাণ সমিতির সভ্য হওয়া।”

ভূষণ বলে, “কিন্তু এতটা সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে আপনারই কি উচিত হয়েছে সেই সমিতির কর্ণধার হওয়া!”

“দলপতি আমি নিজে হই নি। এই সেন্টিমেন্টাল ফুলকে তোমরাই দলপতি নির্বাচিত করেছিলে।”

“আমিও সভ্য নিজে হই নি ঠাকুরদা। এই সঙ্কীর্ণচেতা স্বার্থপরকে কলোনীর পাঁচ জনেই নির্বাচিত করেছে।”

নমিতা আর স্থির থাকতে পারে না, বলে, “কার সঙ্গে তর্ক করছেন ভূষণবাবু।”

“তোমাদের নারায়ণভক্ত দলপতির সঙ্গে নমিতা!”

ভূষণ ফিরে চলল।

কে একজন বললে, “ভাঙ্গন ধরল মনে হচ্ছে গণকল্যাণ সমিতিতে।”

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র বলেন, “আপনি উত্তেজিত হয়েছেন নিতাইপদবাবু। কিন্তু ভূষণবাবু

কামিনী একেবারে হতভয়।

প্রথম নার্স বলে, “তাছাড়া আপনি কথা ফেরাচ্ছেন। প্রথমে আপনি হাসপাতালের কর্তাদের কথা মোটেই বলেন নি। বলেছিলেন ‘আপনারা ছেড়ে দিলেই নিয়ে যাই!’ সেখানে আপনারা মানে—আমরা। নার্সরা। হাসপাতালের কর্তারা নয়।”

কামিনী আমতা আমতা করে।

মতিদি ধমক দেয় : “ঠিক ক’রে বলুন হাসপাতালের কর্তারা না গিন্নিরা? আমরা হলাম হাসপাতালের গিন্নি। আর মেট্রন ঐ প্যাঁকাটি হচ্ছে হেডগিন্নি মানে মুণ্ড-গিন্নি। দেখছেন না খ্যাংরা কাঠির উপর আলুর দমের মতো মুণ্ডটাই শুধু আছে ওর।”

বলেই হোহো ক’রে হেসে ওঠে দু’জন।

তাহ’লে সবটাই রসিকতা! কামিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, “আপনারা এমন ভয় লাগিয়ে দেন।”

“আবার ভয় কি ভাই? ভয়ের রাজ্য তো পার হ’য়ে এসেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে অনিমেসবাবুকে। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার দিন আমাদের খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু।”

“নিশ্চয়ই। কি খাবেন বলুন? রসগোল্লা না সন্দেশ?”—কামিনী খুশীতে উচ্ছল।

“না, এমন কিছু যা রেখে থাওয়া যায়। আচার, কাশুন্দি, আমসন্ত কিংবা বড়ি। কিন্তু আপনার নিজের হাতের তৈরি হওয়া চাই। আমাদের মেসের ঠাকুরটার রান্না একেবারে অখাদ্য। খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ তো দোকানে গেলেই পাওয়া যায়।”

কামিনী অবাক হয়ে যায়। এই স্নসজ্জিত মেয়েগুলির পাঁচভাঙা পোষাকের তলায় আছে নাকি ঘরোয়া বাঙালী মেয়ে? আচারের নামে যার জিবে জল আসে, কাশুন্দি দিয়ে শাক মেখে খেতে যে ভালোবাসে, বড়িভাজা যার প্রিয় খাদ্য?

সিঁড়ি দিয়ে গট্‌গট্‌ ক’রে উঠে আসেন একজন ডাক্তার। কামিনী স’রে দাঁড়ায়। ডাক্তার ডাকেন : “নার্স!”

“স্তার?”

“জমাদারকে মর্গ খুলতে বল! ডেডবডি এসেছে।”

“ইয়েস স্তার।”

নার্স দু’জন তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের নিজের কাজে। কামিনীও অনিমেষের বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। অনিমেষ আজ উঠে বসেছে। পিঠের দিকে একটা

বালিশ দেওয়া। বলে, “অত কি গল্প করছিলে ওদের সঙ্গে? দেখলাম জানালা দিয়ে।”

“জিজ্ঞাসা করছিলাম কবে ছেড়ে দেবে। ওমা জানো কি অসভ্য? আমার কথার উল্টো মানে ক’রে আমাকে দিয়ে বলাতে চায় যে তোমাকে নাকি ওরাই আটকে রেখেছে।”

অর্থগ্রহণ হয় না অনিমেঘের। বলে, “তার মানে?”

“মানে মশ্‌করু আর কি!”

“তা ভালো। গোরাকে আনলে না যে আজ?”

“গোরা তার রাখালদার সাথে ফুটবল খেলা দেখতে গেল।”

ঘরোয়া গল্প শুরু হয়ে যায়। কামিনী বলতে থাকে কলোনীর কথা। নিতাই ঠাকুরদার দলের লোকেরা কেমন যত্ন করছে তাকে। এবার থেকে সত্যিকারের দুঃস্থ লোকেরাই শুধু সাহায্য পাবে। কোনও পক্ষপাতিত্ব চলবে না। চালাক দেখি কে পারে? ঠাকুরদার কাছে চালাকি চলবে না। ও দিকে কি যেন একটা বিরাট কারখানা হবে। তার যন্ত্রপাতি সব আসতে শুরু করেছে। বিরাট পাঁচিল গাঁথা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তা ঘাটের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ইট আসছে ট্রাক বোঝাই। নতুন টিউব-ওয়েলও বসবে অনেকগুলি। অনিমেঘ আগ্রহের সঙ্গে সবকথা শোনে। আবার অনিমেঘ বলে এ দিকের গল্প। কালরাত্রে নিমুনিয়া রোগীটি মারা গেছে। ওধারের বিষ খাওয়া লোকটা কাল খালাস পেয়েছে। তার বিছানায়? এসেছে নতুন একজন। ওর পেটে নাকি পাথর আছে।

কামিনী বলে, “পাথর? খেয়ে ফেলেছে বুঝি ভুল ক’রে?”

“না গো। ভাত ডালই খেয়েছে—পেটে গিয়ে শুধু পাথর হয়েছে।”

“ও মা সে কি, তাই আবার হয় না কি?”

“তাই তো বললে নার্সরা। শুধু ভাত ডাল খায় আর পেটে পাথর জমে। অনেক রোগী আসে নাকি এ রোগের।”

কামিনী ভাবে—কই অত সকলেও তো ভাত-ডাল খায়—পেটে পাথর তো জমে না। তারপর নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দেয়—তবে আর ভবিতব্য বলেছে কেন?

অনিমেঘ অনেক কথা বলতে থাকে। এবার কলোনীতে ফিরে গিয়ে আর সে রিকশা চালাবে না। এবার সে একটা ঠিকাদারী কাজ যোগাড় করবে। বাড়ি ঘর তৈরি করা শিখবে। রাস্তা বানাবে, নলকূপ বসাবে। নিজে হাতে অবশ্য করবে না। মিস্ত্রি মজুরদের খাটাবে।

কামিনী অন্তমনস্ক হ'য়ে পড়ে। সে শুনছিল বারান্দায় দুটি ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড্যান্টের কথোপকথন।

“কেটে গেছে? একেবারে দু' আধখানা?”

“না তো বলছি কি? পেট বরাবর চলে গেছে চাকা।”

“আহা ষাট ষাট,—কার বাছা গো। মা-বাপ বোধহয় জানেও না এতক্ষণ। কত বড় হবে গো?”

“দুধের বাছা। না তো বলছি কি!”

কামিনীর মাতৃহৃদয় তুলে ওঠে। অনিমেষকে বলে, “ব'স শুনে আসি।” বাইরে এসে জানতে পারে—মর্গে যে মড়াটা এসেছে তার সষম্ভেই কথা বলছে ওরা।

কামিনী প্রশ্ন করে, “কতটুকু ছেলে গো? কাটা পড়ল কি ক'রে?”

“দুধের বাছা গো, দুধের বাছা। ট্রেনে কাটা পড়েছে। একেবারে দু-আধখানা।”

কামিনী বলে, “তবু কত বয়স হবে?”

“বছর দশ বারো। উদাম গা। তলার আধখানায় একটা খাঁকি হাফ প্যান্ট রক্তে ভেসে গেছে। ট্রেনে নাকি চানাচুর ফিরি করত। কলোনীর ছেলে।”

ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত? কলোনীর ছেলে!

মাথার মধ্যে তুলে ওঠে কামিনীর। হাসপাতালটা তুলতে থাকে। পড়ে যায় সে।

“ও মা, এ আবার কি হল গো!”

“ভির্মি গেছে—দেখছ না?”

একটু পরেই জ্ঞান হয় কামিনীর। মতিদি বলে, “হঠাৎ কি হল বলুন তো?”

কামিনী ধীরে ধীরে বলে, “যে ছেলেটি কাটা গেছে তার নাম কি?”

মতিদি বলে, “নাম তো পাওয়া যায় নি। এখনও বেওয়ারিস। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। কেন বলুন তো?”

ডুগরে কঁদে ওঠে কামিনী।

লোক জমে যায়।

নার্স ধমক দেয় : “কী ছেলেমানুষী করছেন! আপনার ছেলেকে আমি চিনি। সে তো চার পাঁচ বছরের। এ অন্তত বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে ট্রেনে চানাচুর ফিরি করত। হঠাৎ পা ফস্কে পড়ে যায়। আপনার কেউ নয়।”

কামিনী কঁদতেই থাকে : “আমারই! ও আর কেউ নয়। ও বাবলু! আমার দেওয়।”

নার্স ওকে জোর ক'রে উঠিয়ে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। মুখে চোখে জল দেয়। নিজের টুলের উপর বসিয়ে পাখাটা পুরো দমে খুলে দেয়।

“আপনি এ কী শুরু করলেন বলুন তো। কাকে কান নিয়ে গেছে শুনেই কান্না, কে বললে আপনার দেওর ?”

“সেও যে চানচুর বিক্রি করে ট্রেনে। বছর এগারো বয়স।”

একটু থমকে যায় মতিদি। বলে, “ডেডবন্ডি দেখবেন ?”

কামিনী প্রবলভাবে মাথা নাড়ে : “না না, কাটা ছেলে আমি দেখতে পারব না। আমার বাবলুরে !” মতিদি এবার ভাবিত হ’য়ে পড়ে। হ’তেও পারে ওর সন্নেহটা ঠিক। বলে, “এখানে চুপ ক’রে বসে থাকুন, আসছি।”

মতিদি উঠে যায় ডাক্তারকে খবর দিতে। ব্যাপারটা এখন কর্তৃপক্ষকে জানান উচিত। নিজের দায়িত্বে আর রাখা ঠিক না। ডাক্তার সমস্ত শুনে নার্সকে সঙ্গে ক’রে আসেন এ ঘরে। সেখানে কেউ নেই। পাখাটা পুরো দমে ঘুরেছে। কামিনী উঠে চলে গেছে। অনিমেষের কাছে যায় নি। হাসপাতালের আশেপাশেও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। ডাক্তার নার্সকেই ধমক দিলেন : “ওকে এ রকম একলা রেখে যাওয়া ঠিক হয় নি আপনার। অববড় শক পেয়েছেন—কোথায় গেল মেয়েটি কে জানে ! আবার না নতুন কোনও ফ্যাসাদ বাধে।”

মতিদিও নিজের ভুল বোঝে। একলা রেখে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত হয় নি।

এ দু-তিনদিন ভূষণ কোনও কাজে মন দিতে পারছিল না। কলকাতার দোকান থেকে খবর এসেছে—সেখানেও যাওয়া দরকার। ধারে কারবার করতে হয় ভূষণকে। তার তাগাদা-পত্র আছে। এদিকে কলোনীতে জনপ্রবাহ আসতে শুরু হওয়ায় পরিকল্পনার কাজও ব্যাহত হয়েছে। ঠাকুরদা কলকাতায় গেছেন—ফেরেন নি এখনও। বাগটি সাহেবও অস্থপস্থিত। এখানেও ভূষণের অনেক কিছু করণীয় ছিল। ঠাকুরদার অস্থপস্থিতিতে বস্তুত সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছে এতদিন গণকল্যাণ সমিতিতে। এবার কিন্তু সে নিজে থেকে যেতে পারল না। ঠাকুরদা নাকি যাওয়ার সময় নমিতাকেই তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত ক’রে গেছেন। নমিতা তাকে ডেকে পাঠায় নি। যোগেন নায়ক এসে খবরটা জানিয়ে গেছে। নমিতা ভূষণের সাহায্য-ভিক্ষা করে নি। কেন করবে ? ঠাকুরদার পরিত্যক্ত আসনে উন্নীত হ’য়ে নমিতা নিশ্চয়ই এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। শুধু দারা-সুজা-ওরঙ্গজেব আর মুরাদই নয় তাহ’লে স্বয়ং জাহানারাও সিংহাসনের একজন দাবিদার ? যোগেন বলে এক-দল স্তাবক জুটেছে নাকি নমিতার। মক্ষিরাগী হয়েছেন তিনি !

একবার মনে হয়েছিল ফুৎকারে নমিতাকে সরিয়ে দেয়। এ কী ছেলেমানুষী ! এতবড় একটা কলোনীর এত হাজার লোকের ভাগ্য কি খেলার জিনিস ? ঠাকুরদা

নিজেই রাজনীতির কিছু বোঝেন না—তিনি আবার দিয়ে গেলেন শাসনদণ্ড এমন একটি মেয়ের হাতে মাসখানেক আগে যে ছিল তাঁড়ারঘরের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দি নারী। তাও আবার এমন একটি সময়ে দিয়ে গেলেন যখন সমূহ সঙ্কট চলছে কলোনীর ভাগ্যাকাশে। ভূষণ জানতো নমিতা চব্বিশ ঘণ্টাও এ দায়িত্ব বহিতে পারবে না—তাকে ডেকে পাঠাবে। এ বিপদে ভূষণ ছাড়া আর কাকে ডাকতে পারে সে?

নমিতা কিন্তু তাকে ডাকতে পাঠালো না।

নিজের ঘরেই উস্খুস করে ভূষণ। এদিকে পিসীমাকেও লতুর ব্যাপারটা জানানো হয় নি। তিনি যথারীতি বিবাহের আয়োজন ক'রে চলেছেন।

পিসীমা এসে বলেন, “তুই যে সকাল থেকে বিছানা ছেড়ে উঠলি না? ব্যাপার কি?” ভূষণ মনগড়া একটা জবাব দেয় : “শরীরটা ভালো নেই।”

পিসীমা এসে ওর ললাট স্পর্শ করেন। না, বেশ ঠাণ্ডা। বোধহয় ছেলে লজ্জা পেয়েছে। বয়স হয়েছে তো। বন্ধুবান্ধবেরাও হয়তো পিছনে লাগছে। তাই বাড়ি থেকে বার হয় নি আজ। পিসীর কিন্তু আজ একটু গরজ ছিল, তাই বললেন, “শরীর বাপু তোমার ভালোই আছে। আজ একবার বাজারে যেতে হবে। একটু ভালো মাছ আর মিষ্টি আনতে হবে।”

“কেন আজ কি?”

“না কিছু নয়, আজ লতুকে আর নমুকে দুপুরে এখানে খেতে বলেছি।”

ভূষণ খুশী হয়। এ ভালোই হয়েছে। এই সূত্রে নমিতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। নমিতা ঠাকুরদাপন্থী—ভূষণ উগ্রপন্থী। সে যাই হোক এ বিপদের দিনে সে স'রে থাকতে চায় না। নমিতার সমস্ত দায় সে নিজ স্বন্ধে তুলে নিতে চায়,—নিজে যেচে গিয়ে সেটা বলা ভালো দেখায় না। কিন্তু আজ বাদে কাল যাকে ঘরের বধু ক'রে আনবে এই বিপদের দিনে তার পাশটিতে না দাঁড়ানোও অস্বাভাবিক। এই স্বযোগে পিসীমাকেও বলে দেওয়া দরকার যে বিয়ে করতে সে পশ্চাৎপদ হবে না, শুধু—

ভূষণ ইতস্তত করে। কি ভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারে না। পিসীমা সেটা লক্ষ্য ক'রে বলেন, “আমায় কিছু বলবি ভূষণ?”

“হ্যাঁ পিসীমা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ বিয়ে আমি করতে পারব না।”

পিসীমা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

“বলিস্ কি রে! তুই তো এমন অস্থিরমতি ছিলি না।”

“তুমি আমাকে না জানিয়ে ঠন্দের কথা দিলে কেন?”

“তোকে না জানিয়ে ? মানে ? তুইই তো নিজে থেকে প্রস্তাব করেছিলি নমিতার কাছে ।”

ভূষণ উত্তেজিত হয়ে বলে, “কে বললে ?”

“কে আবার বলবে ? নমিতা বলেছে । লতুও শুনেছে ।”

“কিন্তু—”

“ছাখ ভূষণ ! আমাকে আর পাগল ক’রে তুলিস না । এতদূর এগিয়ে আসার পর তুই যদি এখন বৈকে দাঁড়া—তাহ’লে সত্যি বলছি গলায় দড়ি দেব আমি—তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস তুই—”

হন্থন ক’রে পিসীমা বেরিয়ে যান ।

ভূষণ শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে । নমিতা নাকি আজ আসবে এ বাড়ি । ওর অবর্তমানেও নাকি একদিন এসেছিল । আজই সমস্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা ক’রে ফেলতে হবে । কিন্তু লতুটা যে উপস্থিত থাকবে । ওর সামনে কি ক’রে ব্যাপারটা মেটানো যায় এটা বুঝে উঠতে পারে না ।

মিঠু এসে বলে, “লতু মামিমা আজ আমাদের বাড়িতে আসবে না মামা ? ভূষণ বিরক্ত হ’য়ে বলে, “লতু মামিমা কি ? লতুকে তুমি দিদি বলবে ।”

“না দিদি বলেছে—ও মামিমা হয় ।”

“না লতুদি ।”

“বা রে । আমি লতুমামিকে লতুদি বলব কেন ? ওতো আমার মামি হয় ।”

ভূষণ হঠাৎ ঠাস্ ক’রে এক চড় মেরে বসে ।

আদরের মিঠুয়া মামার হাতে কখনও মার খায় না । কেঁদে ওঠে সে । ভূষণ স্থির করে আর অগ্রসর হ’তে দেওয়া নয় । এখনই রান্নাঘরে গিয়ে পিসীমাকে বলে আসা দরকার যে সে লতুকে বিয়ে করতে পারবে না । কিছুতেই নয় । রাজি হ’লে সে নমিতাকেই গ্রহণ করবে । না হ’লে যেমন চলছিল সংসার তেমনই চলুক ।

রান্নাঘরের সামনে এসে দেখে পিসীমা নেই । টিউবওয়েল থেকে জল আনতে গেছেন । লতু বসে তরকারি কুটছে । কাজের বাড়ি,—পিসী একা মাছ—তাই বোধহয় এই সাত সকালেই নমিতা পাঠিয়ে দিয়েছে বোনকে । একখানা খয়েরি রঙের লালপাড় তাঁতের শাড়ি পরেছে লতু । সন্ধ্যা জ্ঞান করেছে । চুলের নিচে একটা গি’ট বেঁধে পিঠের উপর ফেলে রেখেছে ভিজা চুল । একটু প্রসাধন করেছে—বেশ বোঝা যায় । কপালে একটা খয়েরের টিপ । সৰু করে কাজলপরা চোখ দুটি তুলে ভূষণের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু ক’রে একাগ্রমনে তরকারি কুটতে লাগল ।

“ভূষণ বলে, “পিসীমা কই ?”

“জল আনতে গেছেন।”

“ও।”

ভূষণ বাজারের থলিটা তুলে নেয়। একবার ভাবে কথাটা লতুকে বললেই বা কেমন হয়? হুদিন আগে হ’লে ভূষণ হয়তো এ অবস্থায় বলত—‘নেমন্তনের গন্ধে বুড়ি ঠানদি এই সাত সকালেই এসে জুটেছ? কি নোলা বাপু!’ লতুও তৎক্ষণাৎ হয়তো জবাব দিত ‘ভাত না ছড়াতেই আজ ভূষণীকাক রান্নাঘরের কাছে এই সাত সকালেই ঘুরঘুর করছে কেন? হ্যাংলা একেই বলে।’

আজ এ জাতীয় কথোপকথন যেন নিতান্তই অসম্ভব।

মিঠুয়া কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। লতুকে জড়িয়ে ধরে বলে, “মামিমা—মামা মেরেছে।”

লতু বাঁটিটা কাত ক’রে রেখে মিঠুয়াকে কোলে তুলে নেয়।

ভূষণ এক পা এগিয়ে আসে। বলে, “তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।”

লতুর মুখে কে যেন একমুঠি আবীর ছুঁড়ে মারে। লজ্জার লাল হ’য়ে ওঠা ঐ পনের বছরের মেয়েটি কি বুঝলে তা সেই জানে। নীচু স্বরে বললে, “পাগলামো ক’র না। পিসীমা এখনই ফিরে আসবেন। মিঠুও জেগে রয়েছে।”

বলেই দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে।

ভূষণ অবাক হ’য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে চলে যায় বাজারের দিকে।

ভূষণের উপস্থিতিতে আজ নমিতা প্রথম আসবে ওদের বাড়ি। ঘুরে ঘুরে বাজার থেকে ভালো ভালো জিনিস কেনে ভূষণ। পিসীমার যেমন কাণ্ড! কাল বললে জঙ্গনের বাজার থেকে ভালো জিনিস নিয়ে আসতে পারত। নমিতার সঙ্গে ব্যবহারে ভূষণ তাকে বুঝিয়ে দেবে যে গণকল্যাণ সমিতির দলাদলির জন্তে তার মনে কোনও রেখাপাত করে নি। হ’তে পারে সেখানে নমিতা আর ভূষণ ভিন্ন মতাবলম্বী। ভূষণ, যোগেন এরা হ’ল নব্যপন্থী। কত ধানে কত চাল তারা বোঝে। ঠাকুরদা গত শতাব্দীর রাজনীতি আঁকড়ে পড়ে আছেন। গত শতাব্দীই বা কেন ও তো হ’চ্ছে খ্রীষ্টচতুস্তমের খিয়োরি। মেরেছ কলসি কানা! নমিতা ভাগ্য-চক্রে ঠাকুরদার অবর্তমানে উঠে বসেছে তাঁর শূন্য গদিতে। ভূষণ কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেবে যে রাজনীতি আর জীবননীতি দুটো পৃথক জিনিস। গণকল্যাণ সমিতির কার্যকরী মিটিঙে সে নমিতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে;—কিন্তু সমিতির বাইরে এই বিদ্রুত জীবনের ক্ষেত্রে সেজন্ত কোনও ক্ষোভ নেই ভূষণের। সেখানে সে চায় নমিতার হাত ধরে চলতে। নমিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। একথাটা তাকে বুঝিয়ে

দেওয়া দরকার। তাছাড়া তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি আর ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা মারাত্মক ভুল। সরলতা যদি ধর্মের ভিত্তি হয় তবে শঠতা হবে রাজনীতির মেরুদণ্ড। চাণক্য থেকে চার্চিল সব বিখ্যাত রাজনীতিবিদই একথা প্রমাণ করে গেছেন। গান্ধিজী? তিনি ঐ বুদ্ধ চৈতন্যের দলে—রাজনৈতিক তিনি ছিলেন না।

বাজারে বেশ উত্তেজনা। ফ্যাক্টোরির ময়দানে না কি গুণ্ডাগোল হয়েছে। পুলিশ ভ্যান এসেছে। শুনে ভূষণ একটু বিচলিত হয়। পুলিশ এসেছে? কেন?

বি. ব্রকের হারাণ দেবনাথের ভাইপো নয়ান দেবনাথ বলে, “ভ্যানে কর্যা ঐ রিক্সজিদিকে লয়্যা যাবে গা।”

হেমেন নন্দীমজুমদার বলে, “ও! ছাইলার হাতের মোয়া নয় হে! পুলিশ কইলেই উয়ারা উঠব গাড়িং?”

“এমনিতে না উঠে ঠেলার নামে উঠব।”

ভূষণ রীতিমতো বিচলিত হয়। নমিতা হয়তো ওখানেই আছে। বাগচি নাই, ঠাকুরদা নাই, ভূষণ, যোগেন সবাই স’রে দাঁড়িয়েছে। একলা মেয়েটি কি করতে পারে এখন? এ সময়ে স’রে দাঁড়ানো অস্বাভাবিক। হ’তে পারে তার সঙ্গে ওর মতের মিল নেই—তবু এ সময়ে যদি ওর পাশে গিয়ে না দাঁড়ায় তবে সে কেমন সহযাত্রী। শুধু উৎসবের দিনে বন্ধুর আয়োজন নয়। দুঃখ রাত্রেই তার প্রয়োজন বেশী। আর আদর্শের ছুতো ক’রে বিপদ থেকে স’রে দাঁড়ানো কাপুরুষতা। নমিতা ভাবতে পারে বিপদ দেখে ছুতো ক’রে ওরা সরে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ঠাকুরদার ঐ নারায়ণ-সেবা-মার্কা ভাবালুতায় নমিতাকে ভেসে যেতেই বা দেবে কেন ভূষণ? এটা গণতন্ত্রের দেশ। নিজের বিশ্বাস অপরকে বুঝিয়ে নিজের দলে টেনে আনার অধিকার এখানে প্রত্যেকেরই আছে। নমিতা, যে তার জীবনসঙ্গিনী হবে তাকে সে বুঝিয়ে-সুজিয়ে স্বমতে আনতে পারবে না? এত বুদ্ধিমতী নমিতা,—সে বুঝবে না যে ঠাকুরদার অতিথি-নারায়ণের আদর্শবাদ কলোনীর জগৎ নয়—ওঁর উচিত বেলুড়মঠে গিয়ে রাজনীতি করা? হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নবীন পতিভূক্তির সঙ্গে।

“এই যে ভূষণবাবু। আপনি কোন্ দলে?”

“কোন্ দলে?”

“বিতরণ পক্ষে না আমন্ত্রণ পক্ষে?”

“মানে?”

“শোনেন নি? আপনাদের দলেই যে ভাঙন ধরে গেছে। আপনাদের ঠাকুরদা নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করছেন। ভাতে পরিকল্পনা ভেসে যায় বাক। আর

যোগেন, কানাই, তাছাড়া আমরা সবাই চাই যেমন ক'রে হোক কাজ চালিয়ে যেতে। নমিতাই এখন আপনাদের রাজধানী হয়েছেন। কয়েকজন চ্যাঙড়া স্তাবক তাকে চামর ঢোলাচ্ছে এখন।”

কে একজন বলে, “আরে নবীনদা আপনি যে মায়ের কাছে মাসির গল্প শুন করলেন। বিতাড়ন পক্ষের কাণ্ডারী হচ্ছেন ভূষণবাবু!”

এ আলোচনা ভালো লাগছিল না ভূষণের। দ্রুতপদে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। পিসীমার রান্না সারা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেলা একটা বাজে। ভূষণ নিজের বিছানার চিত হয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবছিল। ফ্যাকটারির মাঠে তার যাওয়া হয় নি। সে ভেবেছিল নমিতা এলে খাওয়া দাওয়ার পর দু'জনে একসঙ্গেই যাবে সেখানে। নমিতাকে আগে বোঝাতে হবে পরিস্থিতিটা। না বুঝতে পারার মতো জটিল নয় সমস্যাটা। মিঠু খেয়ে দেয়ে মামার পাশে চুপটি ক'রে শুয়ে পড়েছে। কর্মব্যস্ত লতু মাঝে মাঝে ঘরবার করছে দু'একবার চোখোচোখিও হয়েছে ভূষণের সঙ্গে। কথাবার্তা হয় নি আর কিছু। নমিতা এতবেলাতেও আসে নি।

পিসীমা এসে ডাকেন : “তুই এবার খেয়ে নে ভূষণ।”

“সে কি ? আর তোমরা ? নমিতা দেবী তো এলেনই না এখনও।”

“নমিতা খবর পাঠিয়েছে সে আসতে পারবে না।”

“ও ! গরীবের বাড়ির নিমন্ত্রণ রাখা বুঝি সম্ভবপর হ'ল না।”

পিসীমা ধমক দেন : “তোরা যেমন কথা। ওর এখন কত কাজ।”

“তা তো বটেই। উনি হচ্ছেন গণকল্যাণ সমিতির কর্ণধার, আর আমরা সামান্য কাটা কাপড়ের কারবারী।”

গামছাটা কাঁধে ফেলে টিউবওয়েলের দিকে পা বাড়ায় ভূষণ।

হরিপদ পণ্ডিত একা বসেছিলেন দাওয়ায়। মনটা ভালো নেই তাঁর। লতু সকালে উঠেই গেছে ভূষণদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ আছে তার। নমিতাও বেরিয়ে গেছে সাত সকালে। স্কুলে যায় নি। গেছে গণকল্যাণ সমিতির কাজে। দুপুরেও ফিরবে না—তারও নিমন্ত্রণ আছে ভূষণদের ওখানে। বিন্দুবাসিনী দু'জনের জন্ম ভাতে ভাত রাধতে বসেছেন রান্নাঘরে। সংসারটা যেন ক্রমশই নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। নমিতাকে এতটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। হাজার হোক মেয়েমহুষ। কাল রাত্রে ফিরেছে রীতিমতো রাত্রে। আজও ভোরবেলা উঠে গেছে।

বাপসা চোখের দৃষ্টিতে মনে হ'ল কে যেন বাগানের গেট খুলে ভিতরে আসছে।

সচকিত হন বৃদ্ধ। কে এল? লোকটি এগিয়ে এসে বসে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে।
“কে?”

উত্তর দেয় না কেউ।

বৃদ্ধ হাতটা ধরেন।

“কে লতু? নমু?”

জবাব পাওয়া যায় না। তারপর অশ্রুবৃদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বলে ওঠে : “বাবা!”

“কে বোমা! বোমা তুমি! এস এস মা—অম্ম কেমন আছে?”

অভিমান, আশঙ্কায় কামিনী খরখর করে কাঁপতে থাকে! জবাব দিতে পারে না।
কি করে যে সে হাসপাতাল থেকে পথ চিনে এতটা এসেছে তা শুধু সেই জানে।
হাসপাতাল থেকে প্রথমে পাগলের মতোই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। একবারও
পিছন ফিরে তাকায় নি। প্রতিমুহুর্তে মনে হয় পিছন পিছন ছুটে আসছে মতিদি।
কোলে তার দলিত পিষ্ট এক খণ্ডিত বালকের উর্ধ্বাঙ্গ। মতিদি যেন কেবলই
পিছন থেকে প্রশ্ন করে চলেছে : দেখুন তো এই কি আপনার দেওর?

কামিনী ছুটেতে থাকে।

কোথায় যাবে সে? হাসপাতাল থেকে শুধু স্টেশনের পথটাই সে চেনে। নিজের
অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের নির্দেশে এসে পৌঁছায় স্টেশনে। উত্তর-মুখী একটা
ট্রেন ছাড়ছে। কলোনীর দিকেই যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে মনস্তির করে ফেলে। সে
যাবে তার খবরের কাছে—যেখানে থাকে বাবলু। হয়তো গিয়ে দেখবে বাবলু
বাড়ির সামনে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ড্যাংগুলি খেলছে—অথবা বেলায় ঘুমিয়ে
রয়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মনটা হুহু করে ওঠে তার। ভগবান, বাবলুকে যেন সে
দেখতে পায় ও বাড়ি। আর কিছু সে চায় না!

একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যায় অন্ধের। চিংকার করে ওঠেন তিনি:

“কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন তুমি?”

কামিনীর চোঁট দুটি নড়ে ওঠে। কিছু বলতে পারে না।

কামিনীর হাতের উপর দ্রুত হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বলেন : “আঃ! কথা বলছ
না কেন তুমি? বোমা! এটা কি শাঁখা, না প্র্যাস্টিক?”

কামিনী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে : “উনি ভালো আছেন।”

“ভালো আছে! আঃ, বাঁচালে তুমি। অনিমেষ ভালো হয়ে গেছে? ওগো শুনছ?”
ও পাশ থেকে বেরিয়ে আসেন বিন্দুবাসিনী। তাঁর দু’হাত হরিদ্রারঞ্জিত। কামিনীকে
দেখে অকুণ্ঠিত হয় তাঁর। সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। স্বামীর
কাছেও গোপন রেখেছিলেন তিনি সে কথাটা।

“এই দেখ বোমা এসেছেন। অল্প ভালো হ’য়ে গেছে। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।”

কামিনী বিন্দুবাসিনীকে প্রণাম করে। উপুড় হ’য়ে পড়ে পায়ের উপর। বাবলুর কথাটা প্রথমেই প্রশ্ন করতে মন সরে না। বলে : “ঠাকুরবি কোথায় ?”

“নমু? সে বেরিয়ে গেছে। ক্যাকটারির মাঠে নাকি পুলিশ এসেছে। সেখানে গেছে।”
“আর লতু ?”

“ভূষণদের বাড়ি গেছে নেমস্তন খেতে।”

“আর, আর বাব ?”

“বাবলু ?”

“আমার বাবলু কোথায় ?”

“সে তো তুমিই জানো। সে তো তোমার ওখানে থাকে।”

“আমার কাছে থাকে ? কতদিন এ বাড়ি আসে নি সে ?”

“কোনদিনই আসে নি। বাবলু তো এখানে নেই।”

“নেই ! বাবলু নেই !” আর্তনাদ ক’রে কঁদে ওঠে কামিনী। পা দু’খানা জড়িয়ে ধরে বিন্দুবাসিনীর। কি হ’ল ? সবাই ছুটে আসে। প্রতিবেশীরাও। কামিনীকে তুলতে গিয়ে দেখে—সে অজ্ঞান হ’য়ে গেছে।

সমস্ত শুনে স্তব্ধ হ’য়ে বসে ছিলেন হরিপদ মাস্টার। ঘরে এসে জমায়তে হয়েছে প্রতিবেশীরা। নানা রকম মন্তব্য।

“খোঁড়ার পাই খানায় পড়ে গো। আহা অন্ধ মাছুষের কোলের ছেলোটা।”

“হৃদয়ের বাছারে ক্যান পাঠান বাপু চানাচুর বিক্রি করনের লগে ?”

হরিপদ পণ্ডিত শূন্তের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর চোয়ালসর্বস্ব গাল বেয়ে ঝরে অব্যবহার্য ধারায় অশ্রু। বলেন, “বাবলুকে তুমি পাঠাতে চানাচুর ফিরি করতে ? আমাদের বল নি কেন ?”

কামিনী মাথাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বলে, “আমি, আমিই মেরে ফেলেছি বাবলুকে।”

কে একজন তাড়াতাড়ি ওকে ধরে তুলতে যায়।

বিন্দুবাসিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উন্মাদিনীর মত চেহারা হয়েছে তাঁর। কামিনীর কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলেন, “ভয়েছে ? তোর অভয় পেট ভয়েছে ? রাক্ষসি ! তোর ছায়া ছেড়ে পালিয়ে এলাম—তবু কেড়ে নিলি আমার ছেলেকে ?”

একজন এসে ছাড়িয়ে দেয় ওদের। কামিনী নিজীবের মতো পড়ে থাকে। প্রতিবাদ করে না। সেই যে মেরে ফেলেছে বাবলুকে !

আর একজন বলে, “আরে চানচুর বিক্রি করে তো কত ছেলে। এ যে আপনাদের বাবলুই তা আগে থেকে ধরে নিচ্ছেন কেন ?”

হরিপদ বলেন, “আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাবা। এ বাবলুই। আর কেউ নয়। এ আমার পাপেই হয়েছে। আমার সতী লক্ষ্মী মাকে আমি মিথ্যা সন্দেহ করে-ছিলাম। সেই পাপেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। ওঃ ভগবান !”

ছেলেটি তবু বলে, “ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন। চলুন আমার সঙ্গে হাস-পাতালে। সেখানে নিজে দেখে যা হয় করুন।”

পণ্ডিত বলেন, “চলো, শেষকৃত্য তো আমাকেই করতে হবে।”

কামিনী ওঠে : “আমিও আসব বাবা ?”

“এস।”

বিন্দুবাসিনী এতক্ষণে শয্যা নিয়েছেন। প্রতিবেশিনীরা তাঁর শুক্রবায় লেগেছেন। একজন খবর দিতে যায় নমিতাকে ফ্যাকটারির মাঠে। আর একজন যায় ভূষণদের বাড়ি থেকে লতুকে ডেকে আনতে। ছেলেটি বলে, “এই রিকশায় উঠুন। স্টেশনে দিয়ে আসবে।”

হরিপদ বলেন, “রিকশা লাগবে না বাবা। আমরা হেঁটেই যাবো। ঐ তো স্টেশন। এটুকুর জন্তু আর রিকশা চাই না।”

রিকশা-ওয়ালা ধমক দেয় : “আরে চুপ করেন বুড়াকর্তা। ভাড়া ছাওন লাগব না আপনার। ওঠেন বোমারে লয়া।”

হরিপদ তবুও ইতস্তত করেন।

রিকশা-ওয়ালা বলে, “আরে পাগল হইছেন নাকি আপনে বুড়াকর্তা ? অনিমেষ রিকশাআলার ভাই—আমি কি ভাড়া লইবার পারি ?”

হরিপদ পণ্ডিত কামিনীকে নিয়ে রিকশায় ওঠেন, প্রশ্ন করেন, “অনিমেষকে তুমি চেন বুঝি।”

“চিনি না, তবু সব রিকশাআলাই তো সবার ভাই। মানেন তো সে কথা। আমার ঘরেও তো ভাই-বুইন আছে।”

রিকশা চলল রাস্তা দিয়ে। এ রাস্তায় রিকশা চালানো এখন কঠিন হয়ে উঠেছে। দশফুট চওড়া ক’রে এক বিঘ্ন পরিমাণ মাটি কাটা হয়েছে। ‘বক্স-কাটি’ না কি যেন বলে ওরা। কোথাও আবার তার উপর ইট বিছিয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক যেখানে সেই বিছান ইটের উপর ছড়িয়ে রেখেছে খোয়ার টুকরা। হহ ক’রে কাজ

করছে লোকগুলো। সরল রাস্তাকে—রিকশাওয়ালার মতে—দুর্গম ক’রে তুলছে প্রতিমুহূর্তে।

কামিনী কাঁদছিল। নীরব অশ্রুপাত।

পণ্ডিত গুর মাথায় ডান হাতখানা রাখেন। স্নেহস্পর্শে ধবধব ক’রে কঁপে ওঠে কামিনী।

“কৈদে মনটা হাল্কা ক’রে নিচ্ছ বোমা? কাঁদ। আমি তো জানি বাবলুকে শুধু গভৈই ধরেছিলেন তোমার শাশুড়ী। ওঃ! এভাবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল!”

রিকশাওয়ালা আবার ধমক দেয়: “ওই, ওই, আবার ঐ কথা কইতে আছেন?”

“এই কথাই যে বলব বাবা সারাজীবন। এ আমারই পাপের ফল। সংসারের আর নেই—অথচ বোমা বাজারের টাকা দিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই। সে অন্ন আমার গলা দিয়ে নামতো না। তারপর, তারপর সে রাত্রে—”

কামিনী বলে, “থাক বাবা।”

হরিপদও বলেন, “থাক মা থাক। সে রাত্রেই ভুল বোঝাবুঝির কথা আর বলব না আমি। কিন্তু তুমি কেন বললে না আমাকে ডেকে যে বাবলুর রোজগারে খাচ্ছিলাম আমরা?”

কামিনীকে চুপ ক’রে থাকে।

হরিপদ মাস্টার মাথা নেড়ে বলেন, “না, আমরাই ভুল হচ্ছে। তুমি বলতে চেয়েছিলে। আমিই শুনতে চাই নি। না বোমা?”

কামিনী আর্তকণ্ঠে বলে, “ও কথা থাক বাবা।”

“থামতে তো আমিও চাই। কিন্তু পারছি কই? আমার যে প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছে আমার সতীলক্ষ্মী মাকে মিথ্যা সন্দেহ ক’রে বাবলুকে মেরে ফেলেছি আমি। আমি সন্তান হত্যা করেছি!”

কামিনী ব্যথাবিধুর কণ্ঠে বলে, “না বাবা, আপনি নয়। দুরন্ত অভিমানে আমিই দূরে সরে গিয়েছিলাম। পাপ আমারই—”

কথাটা শেষ হয় না, ডুগরে কৈদে ওঠে আবার।

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে নেমে পড়ে। বলে, “করেন, আপনারা বিচার ক’রে রায় দান তারপর ফির চালাইবাম।”

হরিপদ বলেন, “কি হ’ল?”

“যে ছেলে মরে নাই—সে কার পাপে মরল স্থির করেন তারপর যাইবাম।”

হরিপদ বলেন, “আচ্ছা বাবা আর কোনও কথা বলব না আমরা।”

আপন মনে গজগজ করতে করতে রিকশাওয়ালা প্যাডলে বসে।

খাওয়া দাওয়া সেয়ে ভূষণ এসে আবার শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়। 'ডি'-রকের দিক থেকে একটা মিলিত কোলাহল ভেসে আসছে। গুণগোল বেশী হচ্ছে মনে হয়। অনাহুতই হয়ে যাবে নাকি একবার ভূষণ? সেও তো সমিতির একজন কার্য-করী সভ্য? তারও তো একটা দায়িত্ব আছে। ঠাকুর্দা নেই, বাগচি সাহেব ছুটিতে। এত বড় দায়িত্বে নমিতার পাশে গিয়ে তার দাঁড়ানো উচিত। নাই বা ডাকলো নমিতা। বিপদের দিনে না ডাকতে যে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সেই তো বন্ধু। এটা অভিমান করার সময় নয়। বিপদ কেটে গেলে যখন সকলে নমিতাকে অভিনন্দন জানাবে তখন অভিমান ক'রে সরে থাকার তবু মানে হয়।

আবার ভাবে ভূষণ—কিস্তি বিপদটা কি স্বখাত-সলিল নয়? নমিতা কেন যাচ্ছে ঐ গুণগোলের মধ্যে মাথা গলাতে। যোগেন, কানাই অথবা সে যা বলেছে সেটাই তো ঠিক কথা। এ সোজা কথাটা বুঝে না কেন নমিতা। ওদের জোর ক'রে উঠিয়ে না দিলে পরিকল্পনা কিছুতেই সার্থক হ'তে পারে না। কলোনীর যদি আর্থিক উন্নতি হ'তে থাকে, কলোনীবাসীর এই উইটিপিশুলিকে যদি এবারকার মতো বাঁচানো যায় দুর্দৈবের আক্রমণ থেকে—তখন আরও লোককে আমরা স্থান দিতে পারব। বর্তমান বেকারদের যদি কর্মসংস্থান হয় তা হ'লে কলোনীর উন্নতি হবে। ফাঁকা প্লটগুলোয় আমরা ডেকে আনতে পারব ওদের। আর ওরা যদি সেই সূদিনের অপেক্ষা না ক'রে, আজই এখনই এসে আমাদের জীবনধারার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় তাহ'লে অতিথি নারায়ণদের কঠিনভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা স্বার্থের কথা নয়, মুক্তির কথা। গোটা দেহটাকে বাঁচাতে যেমন পচনশীল একটা অঙ্গকে কেটে বাদ দেন সার্জেন এ তেমনিই। দেশের মুক্তি, জাতির মুক্তির জন্তে আপাত-নিষ্ঠুর আদেশ দেন সেনাপতি। রণাঙ্গনে একদল প্রাণ দিতে ছোট্টে,—আর একদল তার ফলভোগ করে উত্তরকালে। যুদ্ধ থেমে যায়, গৃহাগত সৈনিক-দের তখন আবার ঠাঁই হয় গ্রামে নগরে। নেতাকে হ'তে হবে দূরদর্শী। তিনি শুধু বর্তমানের কথাই ভাববেন না। সেণ্টিমেন্টের উর্ধ্বে উঠবেন তিনি। তাঁকে হ'তে হবে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য জাহ্নবীর ভগীরথ! তাঁর দায়িত্ব অনেক। ঠাকুর্দা সেণ্টিমেন্টাল হ'তে পারেন, নমিতা তাঁর অঙ্ক অল্পসারী হ'তে পারে—তবু সমগ্র কলোনীর লোকে যা চাইছে তাই মঙ্গলের পথ। ভূষণ যদি এখন গিয়ে দাঁড়ায়ও নমিতার পাশে সে কেমন ক'রে সাহায্য করবে তাকে? নৈতিক সমর্থন তো সে দিতে পারবে না।

এবং সেটা জানে বলেই তাকে নমিতা ডাকে নি—ভাবে ভূষণ। ঐ মেয়েটি ভালো-ভাবেই জানে যে ভূষণ প্রাকৃতিকাল মাহুষ। দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরুপায় নিরন্ন নবাগত

লোকগুলোর প্রতি যতই সহানুভূতি থাক ভূষণের—সমগ্র কলোনীর বৃহত্তর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ওরা এখন বাধারূপে উপস্থিত। সমূলে ওদের উৎপাটিত করতে ভূষণ কুণ্ঠিত হবে না। এখানে সে বিচারকের মতোই অনন্ত, বজ্রস্বকণ্ঠিন। তার এ পরিচয় অন্তত নমিতা জানে। তাই সে ডাকে নি ওকে।

হঠাৎ পায়ের কাছে একটা স্ফুটন্ত লাগার ভূষণ উঠে বসে। লক্ষ্য করে লতু এসে ওর পায়ের কাছে নিবেদন করছে একটা সলজ্জ প্রণাম !

“একি ? হঠাৎ কি হ’ল ?”

ওকে হাত ধরে তুলতে গিয়ে ভূষণ লক্ষ্য করল একটি জিনিস।

লতুর দু’হাতে দুটো মকর-মুখো বালা।

এটা চিনতে কষ্ট হয় না। এ বালা শৈশবে দেখেছে সে মায়ের হাতে ! এ বংশের মাসুলিক অলঙ্কার !

“আমাকে আশীর্বাদ করলে না ?”

“আশীর্বাদ ! ও, ই্যা করলাম বই কি !”

মিঠু একটু বেকায়দায় শুয়ে ছিল। লতু তাকে সরিয়ে ঠিক ক’রে শুইয়ে দিল। মাথার নিচে বালিশটা টেনে দেয়। তারপর পানের বাটাটা এগিয়ে দিল ভূষণের দিকে। লতুরও খাওয়া হ’য়ে গেছে। নিজে এক খিলি পান তুলে নিল মুখে। একবার কোতুকদীপ্ত চোখে ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলে, “কী গোপন কথা বলবে বলছিলে তখন ?”

প্রশ্নটা করে মাটির দিকে তাকিয়েই।

ভূষণ জবাব দিতে পারে না।

হঠাৎ হেসে ফেলে লতু। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, “তুমি কী গো ? বিয়ে না হ’তেই গোপন কথা শোনাবে ?”

বলেই ছোট্টে দরজার দিকে।

ভূষণ ডাকে—“লতু শোন।”

ভুলটা এখনই ভেঙে দিতে চায়। এ কী অত্যাচার। এ মেয়েটা কেন ধরে নিয়েছে যে ঐ একফোঁটা লতিকাস্নানরীর জন্তে ভূষণের প্রেম একেবারে উৎলে উঠেছে ! স্বামীর কাছ থেকে লতু বলে, “ঈস্। আমি তোমার বিয়ে করা বৌ নাকি ? ছপুর বেলায় বন্ধ ঘরে ডাকছ যে আমায় ? শুনব না আমি।”

পিসীমা হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকেন : “ভূষণ !”

“কি পিসী ?”

“বন্দুকের আওয়াজ না ?”

তাই তো! দু ছবার ফায়ার হ'ল! পর পর। তারপর একটা মিলিত কোলাহল
ভেসে আসছে 'ডি'-ব্লকের দিক থেকেই।

এক লাফে উঠে পড়ে ভূষণ! পাঞ্জাবিটা তুলে নেয় আলনা থেকে। লতু ছুটে এসে
জড়িয়ে ধরে ওকে : “না, আমি যেতে দেব না। ওখানে গুলি চলছে।”

“কী ছেলেমানুষী করছ লতু? তোমার দিদি রয়েছে ওখানে।”

“না নেই। তুমি যেও না। দিদি নিশ্চয়ই পালিয়ে আসবে।”

“তোমার দিদি পালিয়ে যাবার মেয়ে নয় লতু। তোমার চেয়ে তাকে বেশী চিনি
আমি। ভয়টা আমার সেজন্তেই। ছাড় আমাকে।”

জোর ক'রে লতুর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে ছুটে বেরিয়ে যায়। পিসীমা
পিছন থেকে ডাকেন : “ভূষণ, শোন, যাস্নে!”

“এখনই ফিরে আসছি আমি।”

আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেও দুর্দৈবকে নমিতা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ঠাকুর্দা নেই,
বাগচি সাহেব ছুটিতে,—যোগেন, কানাই প্রভৃতি প্রকাণ্ডে বিরুদ্ধাচরণ করছে।
ভূষণবাবু বিরোধী পক্ষের পাণ্ডা। সমস্ত কলোনিবাসী চাইছে এই লোকগুলোকে
এখান থেকে সরিয়ে দিতে। এই ব্যাপারে, আশ্চর্য, ভূষণবাবুর দল হাত মিলিয়েছে
বিষ্টপদ গোকুল নবীনের সঙ্গেও। কলোনীর কর্তৃপক্ষও ওদের সরিয়ে দেওয়াই মনস্থ
করেছেন। বাগচি সাহেবের অস্থপস্থিতিতে যতীশবাবু অফিসিয়েট করেছেন।
তিনি খবর পাঠিয়ে পুলিশ ভ্যান আনিয়েছেন। মারামারি গুণ্ডাগোল হ'লে শাস্তি-
শৃঙ্খলা রক্ষা করবে তারা। বিষ্টপদ নবীন যোগেন কানাই গোকুল হাতে হাত
মিলিয়ে কাজ করছে। বেশরকারী লরি যোগাড় হয়েছে খানকয়েক। বিতাড়নপর্ব
চলেছে নির্বিবাদে।

মুষ্টিমেয় অহুচর নিয়ে ঠাকুর্দার বৈঠকখানায় নমিতা গুম্বরে মরছিল আপন মনে।
এদের স্থানান্তরিত করা উচিত কি অহুচিত এটা সে ভেবে দেখে নি। সে যে
নিতাই ঠাকুর্দার আদেশ অহুযায়ী কাজ করতে পারছে না এটাই তার ক্ষোভ।
ওর দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর্দার একটা গঠনমূলক পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে। এ লোক-
গুলোকে তিনি কলোনীতে রাখতে চান। তার মানে এ নয় যে পরিকল্পনা ব্যর্থ
হয়ে যাক। উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে সেটা নিতাই
ঠাকুর্দাকেই যে সবচেয়ে আঘাত করবে—এ বিষয়ে নমিতার তিলমাত্র সন্দেহ
ছিল না।

কিন্তু একা সে কি করতে পারে?

ঠিক এই সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন হেডমিস্ট্রেস সুরেখা দেবী।

“ভেঙে পড়লে তো চলবে না নমিতা। আমাদের বাধা দিতে হবে। ঠাকুরী যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ যাতে একটি লোকও স্থানত্যাগ না করে তা আমাদের দেখতে হবে। দরকার হয় আমরা পিকেটিং করব।”

“আপনিও? কিন্তু আপনি যে সরকারী চাকুরে—”

“বাজে তর্ক কর না। এস আমার সঙ্গে—”

ওরা দু’জনে গিয়ে দেখা করে ইঞ্জিনিয়ার বীরেন মৈত্রের সঙ্গে।

মৈত্রসাহেব বলেন, “আপনারা দু’জনে আর কি বাধা দেবেন? বাধা হ’য়ে দারোগা আপনাদের আরোষ্ট করবে। জনসাধারণ তো দূরের কথা গণকল্যাণ সমিতিও যখন আপনাদের পিছনে নেই, তখন, কিছু মনে করবেন না আপনারা—এটা নেহাতই ছেলেমানুষি হবে।

ওরা দু’জনে ফিরে আসে। কথাটা মিথ্যা নয়। তবু নমিতার ইচ্ছা নৈতিক আপত্তি জানাতেও ওদের দু’জনের যাওয়া উচিত। যে লোকগুলি এখানে এসেছিল, যাদের জোর ক’রে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা জাহ্নক, তারা বুঝে যে কলোনীতে অস্তুত দু’জন লোকও ছিল যারা চেয়েছিল তাদের স্থান দিতে।

হঠাৎ ছুটে আসে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। ওদের সঙ্গে রয়েছে কানাই বাচ্চু রাখাল। প্রমোদ বলে, “নমিতাদি খবর শুনেছেন?”

“কি?”

“রিফুজিদের সরাবার জন্তে যে লরিগুলি এসেছে সেগুলো জংসন থেকে ভাড়া ক’রে এনেছে বিষ্টুপদ আর গোকুল। একলরি লোক পাঠানো হ’য়ে গেছে। ওরা দাঁড়িয়ে থেকে লোক বোঝাই করাচ্ছে।

সুরেখা দেবী বলেন, “এ খবরে তো আপনাদের উল্লসিত হওয়ার কথা প্রমোদবাবু। আপনারাই তো চাইছিলেন ওদের পত্রপাঠ বিদায় করতে।”

রাখাল বলে, “কিন্তু ভেতরে যে এই ষড়যন্ত্র চলছে তা জানব কি ক’রে?”

“ষড়যন্ত্র?”

কানাই বলে, “আসল কথাটা খুলে বল। ওঁরা বোধ হয় এখনও কিছু জানেন না।”

প্রমোদ পাল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।

রাস্তার কাজে জনা কুড়িক গ্রুপ কাজ করছিল এতদিন। এবার বড় তিনটে কাজের আংলান এসে যাওয়ার মৈত্রসাহেব নতুন গ্রুপ-লীভারের নাম চেয়ে পাঠান বাগচি সাহেবের অফিসে। অর্থাৎ যে কাজ কো-অপারেটিভের মাধ্যমে করাতে চেয়ে-

ছিলেন নিতাইপদ। ইতিমধ্যে বাগচি সাহেব ছুটিতে যাওয়ার যতীশবাবু পত্রের উত্তর দেন মৈত্রকে। তিনি তিনটি কাজের জন্য তিনটি নাম পাঠিয়েছেন। তাদের আর্থিক সঙ্গতির উল্লেখও করেছেন। মৈত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ক্যাম্প অফিসের নির্বাচিত গ্রুপ-লীডার তিনজনকে তিনটি কাজ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রডাকসন সেন্টার বানাবেন শ্রীবিষ্টপদ মজুমদার, ফ্যাকটারিটা তৈরি করবেন শ্রীগোকুল দাস ;—আর ইন্টখোলার কন্ট্রোল শ্রীনবীন পতিতুগিরি !

আপাদমস্তক জলে গুঠে নমিতার। সে আবার ফিরে যায় বীরেনবাবুর অফিসে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চায় সব কথা। বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, “একজন কাজ পেলেই অল্প একজন বলে অগ্নায় করা হয়েছে। আপনারা যদি কেউ পেতেন—ওরাও এসে বলত অগ্নায় হয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, কাজ করতে এসেছি। আপনারা দলাদলির মধ্যে আমি নেই।”

নমিতা বলে, “কিন্তু ঐ বিষ্টপদ, নবীন আর গোকুলবাবু কি বেকার? না অন্যভাবে ওদের পরিবার না খেতে পেয়ে মরছে?”

মৈত্র বলেন, “আপনি খামকা রাগ করছেন মিস্ চক্রবর্তী। আমি রিলিফ ডিপার্টমেন্টের লোক নই। আমার কাছে নবীন প্রাচীন, কেট-বিষ্টপদ সব সমান। কে অর্থবান আর কে বেকার তার আমি কি জানি?”

“তা হ’লে কিছু না জেনে কাজ ডিস্ট্রিবিউট করলেন কেন? আপনি জানেন না, কিন্তু আমরা তো জানি। আপনার উচিত ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা করা।”

“আমার কি উচিত ছিল তা আপনার সঙ্গে আলোচনা না করলেও চলবে। গণকল্যাণ আর গণনাশন সমিতিতে আমার চেনার কথা নয়। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিস থেকে নাম পেয়ে কাজ দিয়েছি।”

“আমি কি তা হ’লে ধরে নেব—এ ষড়যন্ত্রে আপনিও লিপ্ত আছেন?”

বীরেন মৈত্র পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন, “ষড়যন্ত্রটা আপনি কোথায় দেখলেন জানি না; কিন্তু সে যাই হোক, কোনও কাজের কথা যদি আপনারা বলার না থাকে তা হ’লে আসতে পারেন। আমার ইন্টগ্রিটি সম্বন্ধে আমারই ভিজিটার্স চেয়ারে বসে একটি মহিলার সঙ্গে আলোচনা করব—এটা আপনি একটু বেশী আশা করছেন মিস্ চক্রবর্তী।”

“বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু এর ফল ভালো হবে না মিস্টার মৈত্র।”

বীরেনবাবু একটু হাসলেন : “কলোনীর কাজে দলাদলি থাকবেই। এটা জেনেই আমি কাজে নেমেছি। দলাদলি করুন—ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আপনারা? যারা কাজ পেয়েছে হ’তে পারে

তারা আপনাদের বিপক্ষ শিবিরের লোক ; কিন্তু ওরাও এমন কিছু বড়লোক নয়। ওরাও কলোনীবাসী। ওরা কাজ ক'রে যদি পেমেন্ট পায় তবে সে-টাকা কলোনীতেই থাকবে। এত আপত্তিই বা কিসের ?”

“কেন আপত্তি শুনবেন ? দুদিন পরে আমরা বলতে আসব পাঁচজন কাজ করছে আর পঁচিশজনের হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কলোনীর বাইরে থেকে অল্পমজুরীর মিস্ত্রি মজুর এনে কাজ করানো হচ্ছে অথচ হিসাবে দেখানো হচ্ছে কলোনীর লোকের নাম। ভুল হিসাব দাখিল করে, সেই জাল করে ওরা তিনজনে টাকা আত্মসাৎ করছেন। আপনারা তদন্ত করতে আসবেন। আমরা পাঁচজন সাক্ষী হাজির করলে গুঁরা দশজন ভাড়া করা সাক্ষী হাজির করবেন। আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হ'লে যাবে। আপনারা ফলাও ক'রে খবরের কাগজে ছাপবেন—উদয়নগর কলোনীতে এত লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে, এত হাজার লোক কর্মসংস্থান করেছে—অথচ কলোনীর সত্যিকারের অর্থহীনেরা অনশনে মরতেই থাকবে।’বেকার আত্ম-হত্যা করবে। ক্ষীণ হ'বে মুঠিমের কয়েকজন লোক। এ আমরা আগেও হ'তে দেখেছি—এবারও দেখব !”

বীরেনবাবু বলেন, “বেশ তো, সে রকম অত্যাচার যদি হ'তে দেখেন তাহ'লে অভিযোগ জানাবেন। বিচারের প্রহসন হ'বে এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ?”

“এই তো অভিযোগ করছি। যতীশবাবু যে তিনজন লোকের নাম আপনার কাছে দিয়েছেন গুঁরা ছিলেন আগেকার কমিটির লোক—নানান অভিযোগ আছে আমাদের—গুঁদের বিরুদ্ধে। আপনি নতুন লোক তাই আমাদের এতকথা কিছুই জানেন না।”

“অর্থাৎ আপনার মতে—একমাত্র গণকল্যাণ সমিতিই সততার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। রিলিফ অফিস আর ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সবাই চোর—তারা সং লোকের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্রই করছে,—কেমন ? কিন্তু বলতে পারেন এতে আমাদের স্বার্থটা কি ?”

“খুব পারি। যতীশবাবু চায় না যে আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখি। ক্যাস-ডোল আর স্টারভেসন্ ডোলের ডামাডোলে তাদের স্ববোণ-স্ববিধা বেশী। উদ্বাস্তদের সত্যিকারের পুনর্বাসতি হ'লে তাঁদের চাকরিই থাকবে না—চোরাই কারবার চালানো তো দূরের কথা। আর আপনারা ? আপনারা পরসা-ওয়ারা বড় লোক ঠিকাদার দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাতে আপনাদের কি কি স্ববিধা হয় সে কথা প্রকাশে না বলাই ভালো—তবে কারণটা আপনি জানেন আমাদেরও বুঝতে কিছু বাকি নেই মিস্টার মৈত্র !”

মৈত্র সাহেব কি একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কানাই ঘরে ঢুকে বলে, “নমিতাদি শীগগির আসুন। ওখানে বোধহয় গুণ্ডগোল বেধেছে।” সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

পর পর দু’বার।

ওরা ছুটে বেরিয়ে এল। কে একজন বললে, “নমিতাদি আপনি এখনই বাড়ি চলে যান। আপনার মা অজ্ঞান হ’য়ে গেছেন। বাড়িতে ডাকছে।”

নমিতা একটু থেমে পড়ে। বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। খামোখা বিন্দুবাসিনীর অজ্ঞান হ’য়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। এখানে গুলি চলছে বলে বোধহয় ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নেবার কৌশল করেছেন।

ছেলেটিকে বলে, “তুমি বাড়ি যাও ভাই। মাকে একটু দেখ। আমি এখনই আসছি।”

কানাই এগিয়ে গিয়েছিল, বলে, “কি হ’ল নমিতাদি? দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আসুন শীগগির।”

“এই যে আসছি।”

দু’ব্যাচ লোককে জোর ক’রে লরিতে চাপিয়ে পাঠানো হয়েছে পি.এল. ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। লোকগুলো প্রতিবাদ করবার ভরসা পায় নি। যুনিফর্ম পরা বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে স্বয়ং দারোগা সাহেব উপস্থিত। তাছাড়া এই কলোনীর একজন লোকও চায় না ওদের এখানে রাখতে। কি আর করা যায়? ওরা বিনা প্রতিবাদে গাড়িতে ওঠে। যাবে, পি.এল. ক্যাম্পেই যাবে ওরা। তৃতীয় ট্রিপ লোক বোঝাই দেবার সময় বাধলো গুণ্ডগোল।

ইতিমধ্যে খবর রটে গিয়েছিল কাজ পেয়েছে বিষ্ণুপদ, গোকুল আর পতিভূক্তির দল। তাই ওদের এত উৎসাহ। সে জগ্গেই এ লোকগুলিকে কুকুর বেড়ালের মতো গাড়ি বোঝাই ক’রে পাঠানো হচ্ছে তাড়াতাড়ি। না হ’লে কাজ শুরু করতে পারছে না ওরা।

মুখে মুখে রটে গেল কথাটা। গণকল্যাণ সমিতির ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেছে। বেকার যুবকেরা নাম লিখিয়েছে। আশা করেছিল স্বাভাবিকভাবে কাজ হ’লে তাদের ডাক পড়বে। নিতাই ঠাকুরদার দলের কাজ করলে আর যাই হোক স্ববিচার পাবে। মজুরী ক’রে হাজিরাও পাবে। হঠাৎ এ খবরটায় ওদের সে আশা যেন নির্মূল হ’ল। এ কী অত্যাচার! যে লোকগুলো চুরি জুয়াচুরি ক’রে এতদিন সর্বনাশ ক’রে এসেছে কলোনীর তারাই

আবার কাজ পাবে ?

“দেব না ওদের কাজ করতে ।”

“বন্ধ থাক্ কাজ । যতদিন না ঠাকুর্দা ফেরে, বাগচিশাহেব জয়েন করে ।”

একদল উৎসাহী যুবক গিয়ে চড়াও হ’ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিসে । ঘেরাও করল অফিস । উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছে ।

“কই মশাই গ্রুপ-লীডার রেকমেণ্ড করনেওয়াল—একটু বেরিয়ে আসুন তো ।”

যতীশবাবু জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ক’রে নেন । চট ক’রে বাথরুমে ঢুকে পড়েন এবং ভিতর থেকে বন্ধ ক’রে দেন ।

“যতীশবাবুকে ডেকে দেন না মশাই । ঘরের বাইরে আসুন উনি । আমরা দেখা করতে চাই ।”

যতীশবাবু ততক্ষণে বাথরুমের ওদিককার দ্বার খুলে বেরিয়ে গেছেন । মৃণাল আর মিহির বেরিয়ে আসে ।

“কেন কামেলা করছেন অফিসের সামনে ? কি চাই আপনাদের ?”

“যতীশবাবুকে চাই ।”

যতীশবাবুকে পাওয়া গেল না অফিসে ।

একদল গেল তাঁর বাড়ির দিকে । একদল গেল স্টেশনে ।

মৃণাল মিহিরকে বললে, “ঘেমা ধরে গেল ভাই । বিয়ে যদি না করতাম—তোমায় বলছি মিহির, চাকরির মাথায় লাথি মেরে বাড়ি চলে যেতাম ।”

মিহির বললে, “সেটা কঠিন নয় । এর ভেতর থেকে যদি সত্যতার সঙ্গে কাজ করতে পার, তবেই না ক্ষমতা । কর্তা তো ভেগেছেন । একবার যাবে নাকি ফ্যাকটরির মাঠে ?”

মৃণাল ইতস্তত করছিল । হঠাৎ ঐ দিক থেকে বন্ধুকের আওয়াজ ভেসে আসায় উঠে পড়ে । হু’জনে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে ।

জনতা চলেছে ফ্যাকটরির মাঠে । অর্ধদণ্ড আগে যারা বলছিল ‘—হাঠাও বথেড়া, তাড়াও ঐ নতুন লোকগুলোকে’, তারাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে । তাঁটার টানের মুখে হঠাৎ এসে পড়েছে কোটালের বান ।

একদল উৎসাহী বেকার যুবক এসে সমবেত হ’ল ময়দানে । সেখানে পূর্বেই উপস্থিত ছিল যোগেন তার কয়েকটি অলুচর নিয়ে । নিরুদ্ভ আক্রোশে ফুলছিল যোগেন । ঠাকুর্দা নেই । ভূষণ বিপদের সময় সরে দাঁড়ালো ! কলোনীকে নেতৃত্ব দেবার একটা লোক নেই এই অসময়ে । দলটা এসে যোগেনের কাছেই স্ববিচার দাবি করল । এ অত্যাচার হ’তে দেব না ! যোগেন মুহূর্তে এগিয়ে এল নেতৃত্ব

দিতে। সে নিজেই তুলে নিল দলপতির ঝাণ্ডা ! সতীশের চায়ের দোকান থেকে একথানা টিনের চেয়ার টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিল—

“বন্ধুগণ”—

মিনিট কয়েক পরে ওদের দলটা এসে পৌঁছালো যেখানে মানুষগুলোকে লরিতে বোঝাই দেওয়া হচ্ছে সেখানে। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা আরও বেড়েছে ওদের দলে। বেড়েছে উদ্দীপনা আর অসন্তোষ। মানবো না এ অত্যাচার !

ওরা বাধা দিল।

দারোগাবাবু এসে ওদের সতর্ক ক'রে দিলেন। সরকারী কাজে বাধা দিলে তিনি বাধ্য হয়ে অ্যারেস্ট করবেন এদের।

ষোগেন জবাবে শুধু বললে ‘—ইনক্লাব—!’

পাদপূরণটা জানা আছে সকলের। ধ্বনিত হ'ল সেটা।

ওরা ঘিরে দাঁড়ালো লরিখানাকে।

“দেব না ওদের সরিয়ে নিতে।”

দারোগা জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। চলে যেতে বললেন। ওরা জবাবে একই কথা বললে আবার ‘—ইনক্লাব !’

দারোগা সশস্ত্র পুলিশদের কি যেন হুকুম দিলেন।

বন্দুকের আগুয়াজ শোনা গেল। পর পর ছু'বার।

বন্দুকের মুখ উর্ধ্ব আকাশের দিকে ! আঘাত করা ইচ্ছা নয়। এ বোধহয় একটা চরমতম সাবধান বাণী। অর্থাৎ প্রয়োজন হ'লে বন্দুকও চালানো হবে।

বিষ্টপদ দারোগাবাবুর কানের কাছে এসে বলে, “লাঠি চার্জ করেন ছার। আর ঐ হালা জগারে অ্যারেস্ট করেন।”

দারোগা একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন : “আপনি কে মশাই ? বেশী বাজে কথা বলবেন না—চালান দেব আপনাকে।”

বিষ্টপদ ঘাবড়ে যায়। এ বেটা তাঁকে চেনে না নাকি।

লোকগুলো ফাঁকা আগুয়াজে ভয় পায় না।

নিরুপায় উদ্ভাস্তগুলোও সাহস পেয়ে ফিরে দাঁড়ায়। যাদের ওঠানো হয়েছিল গাড়িতে তাদের কয়েকজন ফের ঝুপঝাপ ক'রে নেমে পড়ে। বিষ্টপদের দলের কয়েকজন ছুটে গিয়ে পাকড়াও করে ওদের।

ষোগেনদের দলের কয়েকজন গিয়ে বাধা দেয়। ফলে হাতাহাতি শুরু হ'য়ে যায়।

নমিতারা পৌঁছে গেল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

দারোগা ছইসিল বাজালেন। সব কাটি পুলিশ একত্র হ'ল নিমেষে।

বিষ্টপদ, গোকুল জানত এ জাতীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। সব রকম বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিল ওরা। বেশ কয়েকঝুড়ি বামা খোয়া গান্ধা ক'রে রেখেছিল এক কোণে। ঠিকাদারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আদলা-বামা-ব্যাটের এ উপ-কারিতাটা অজ্ঞাত ছিল না।

এক ঝাঁক ঢিল এসে পড়ল কোথা থেকে।

কানাই আহত হ'ল, দারোগা সাহেবের কপালে এসে লাগলো একটা। বাঁ হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বসে পড়লেন তিনি।

একজন সাব ইন্সপেক্টর এসে তাঁকে ধরতেই পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত পড়ছে থাঁকি শার্টের উপর।

লাঠি চার্জ করবার হুকুম দিলেন তিনি। বে-আইনী জন সমাবেশ ভেঙে দিতে বললেন।

ওদিকে ষষ্টিবর্ষ তার আগেই শুরু হয়ে গেছে। বিষ্টপদের ভাড়াটে গুণ্ডার দল এলোপাতাড়ি মারতে শুরু ক'রে দিয়েছে যোগেন নায়েকের দলটাকে। এরা নিরস্ত্র এসেছিল বস্ত্রত মার খেয়ে পেছতে লাগলো।

পুলিসের এক ঝাঁক লাঠি পড়ল।

ছুটে পালাচ্ছে সবাই। কঙ্কালসার উদ্বাস্তগুলো এর জন্তে প্রস্তুত ছিল না মোটেই। বুড়োবাচ্ছা সামলে দাপাদাপি করছে সারা মাঠময়। যোগেনের কাঁধে লাগলো একটা লাঠি! পড়লো সে ঘুরে।

পুলিসের লাঠি নয়। বিষ্টপদের ভাড়া করা একটা লোক।

আবার উঠল লাঠি। সামনে একজন বৃদ্ধা উদ্বাস্ত!

দু'হাত উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট ক'রে চীৎকার করে উঠল সে ভয়ে। গগন বিদীর্ণকরা সে আর্তনাদে নমিতা আত্মহারা হ'য়ে পড়ল। কাঁপিয়ে পড়ল সেই ষষ্টিবর্ষের মধ্যে। ঠেলে ফেলে দিল বৃদ্ধাকে সবলে। বেঁচে গেল বুড়িটা।

লাঠিখানা সজোরে নামলো নমিতার মাথায়। খোঁপা সমেত মাথার পিছন দিকটা নেমে এল।

নমিতা পড়লো মাটিতে।

যোগেনের পাশেই।

হরিপদমাল্টার মশাই যখন গিয়ে পৌঁছলেন জঙ্গনের হাসপাতালে তখন মৃতদেহকে দাহ করবার জন্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলোনীর রিকশাওয়ালা কিস্তি সঙ্গে এগেছে। একা ছেড়ে দেয় নি অন্ধকে পুত্রবধূর সঙ্গে। শুধু কোতূহল নয়—কর্তব্য বলেই মনে

করেছে সঙ্গে আসাটা। রিকশাখানা রেখে এসেছে উদয়নগর স্টেশনে একজন জানা লোকের জিম্বায়। মৃত ছেলেটিকে সনাক্ত করা হয়েছে। তার তিনকুলে ফুট নেই। আছে এক বুড়ো কাকা। এসেছেন তিনি। উদয়নগর কলোনীরই একজন বাসিন্দা। মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে আসছে মর্টন, হাতকাটাতেল, তানসেন-গুলি প্রভৃতি। বাবলুও এসেছে। বৌদিকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না। সজল চোখ দুটি তুলে বললে, “মসলামুড়ি কাটা পড়েছে বৌদি।”

কামিনী ওকে টেনে নেয় নিজের কোলে। হরিপদ মাস্টার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন একটা। বাবলুর সর্বাঙ্গে ধুলো, বালি ময়লা। চিম্টি দিলে ময়লা উঠে আসে। খালি গা। প্যান্টটা এককালে থাকি ছিল এখন চেনা যায় না এত কালো। রক্ত চুল, শুকনো মুখ।

কামিনী বলে, “তুই আজকাল চানাচুর বিক্রি করিস না?”

“না, কে ভেজে দেবে?”

তবে কি করিস আজকাল? বাড়িতে থাকিস না যে?”

“কয়লা বাছি।”

উতোগী সিংহশাবক বাবলু। ‘বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী’ মন্ত্র তার। যে বয়সে ওর বাপ দাদারা অন্ধ ইংরাজি শিখেছে—সে বয়সেই ওকে শিখতে হয়েছে উপার্জন। বিনা মূলধনের ব্যবসায় এ বাজারে প্রায় অসম্ভব; কিন্তু অসম্ভবকে জয় করতেই ওর তারুণ্যের অভিযান। খুঁজে খুঁজে তেমনি একটা ব্যবসা বার করেছে সে। জংসন স্টেশনের ইয়ার্ডে গিয়ে ইঞ্জিনের রাবিস্ থেকে বেছে বেছে পোড়া কয়লা উদ্ধার করে। পোড়া ছাইয়ের স্তূপ থেকে কয়লার টুকরো খুঁজে বার করা আর হীরক-খনিতে কয়লার স্তূপ থেকে হীরকখণ্ড বেছে বার করার মধ্যে কোনও তফাত নেই। অন্তত পরিশ্রমের দিক থেকে, ধৈর্যের মাপকাঠিতে, অধ্যবসায়ের নিজিতে। তারপর বুড়ি ক’রে বেচে দিয়ে আসে বাজারের দোকানে। বৌদি যদি চানাচুর নাই ভেজে দেয়—তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে? বাবা মাকে মাছুষ করার দায়িত্ব আছে না? দাদার অসুখ সারিয়ে তুলতে হবে না? ওর বলবার ভঙ্গি দেখে এত দুঃখেও হাসে কামিনী। বলে, “থাকিস কোথায়? খাস কি?”

“থাকি ঐ ইয়ার্ডেই। থাই যা পাই। কত টাকা জমেছে জানো? আঠারো টাকা! পঞ্চাশ টাকা জমলেই আমি ফিরে যাবো কলোনীতে। তখন আর আলাদা থাকতে হবে না বাবা মাকে। সেখানে দোকান খুলব আমি।”

হরিপদ মাস্টার হঠাৎ টেনে নেন বাবলুকে! ধূলাবালি মাখা ছেলেটাকে বুকের

ভিতর টেনে নিয়ে শিরশ্চূষন করেন পণ্ডিত। বাবলুর সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ছিল তাঁর। তিরস্কার করেছেন, মেরেছেন, শাসন করেছেন এই ঘরপালানো ছেলেটিকে। সংসারের কোনও কাজ করে না, পড়াশুনায় মন নেই এ জন্ত মনে মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ একলবোর মতো একক সাধনরত শিশুটির অস্ত্র এক রূপ ফুটে উঠেছে অন্ধের দৃষ্টি-সম্মুখে। কয়লার গুঁড়ায় মলিন তার সর্বাঙ্গ কিন্তু তার সাধনা, তার তপস্শ্রা একনিষ্ঠ, অমলিন।

মর্টনদা ওকে ডাকে : “বাবলু যাবি না?”

বাবলু বলে, “যাই বৌদি, যাই বাবা? মসলামুড়িকে দাহ ক’রে আসি?”

কামিনী বলে, “এস ভাই। কিন্তু ওখান থেকে সোজা বাড়ি যাবে। বাড়িতে থেকেই ব্যবসা করতে হবে তোমাকে।”

বাবলু ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

ওরা এগিয়ে যায় ওদের এক প্রিয় বন্ধুর শেষকৃত্য করতে। কিশোর বন্ধুটির সঙ্গে ওরা ফেরি করতো নানান সওদা ডেলি প্যাসেঞ্জার ভর্তি রেলের কামরায়। বাঁ বাঁ রোদ্ধুরে যাতায়াত করত এ ঘর থেকে ওঘরে—রড ধরে ধরে। একসঙ্গে খেত বিড়ি—গাইত সস্তা সিনেমা সংগীত। সমব্যবসায়ীই শুধু নয়—জীবনের যাত্রাপথে ওরা সহযাত্রী, ঐ মসলামুড়ি হাতকাটাতেল মর্টন আর বাবলু। জীবন যুদ্ধের রণাঙ্গনে সংগ্রামরত বালসেনা! কমরেডস্!

হরিপদ মাস্টার তখন অস্ত্র কথা ভাবছেন। হারানো ছোট ছেলেটিকে পেয়েই মন গিয়েছে বড়ছেলেটির দিকে। একবার দেখা হয় না? ঐ তো ঐ ওয়ার্ডে আছে অনিমেস। যাকে বাঁচিয়ে তুলছে তাঁর বোমা ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সীমস্তিনীর একনিষ্ঠ সেবায় ফিরিয়ে এনেছে মৃতকল্প স্বামীকে—মৃত্যুর দ্বার থেকে।

ক্যাম্পের রিকশাওয়ালা ভেবেছিল বুড়াকর্তা যদি ছেলে ফিরে পায়—তবে সে একটা দাবি জানাবে। না ভাড়া নয়—একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার দাবি। সে কথা কিন্তু সে বলতে পারল না। ঐ একফোঁটা ছেলেটার দ্বিখণ্ডিত দেহ, ঐ হরিধ্বনি, এ সব তার মনটাও ভারাক্রান্ত হ’য়ে উঠেছে। বাবলুকে সে চেনে না—তবু বাবলু বেঁচে থাক এটাই সে মনে মনে প্রার্থনা করতে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে বাবলু বেঁচেছে বটে; কিন্তু মসলামুড়ি মারা গেছে। না, মসলামুড়িকেও সে চেনে না। মসলামুড়ির বংশে কেউ রিকশাওয়ালা আছে বলেও জানা নেই তার। তবু রিফুজি তো? সব রিফুজিই তো সন্সার ভাই, না কি কণ্ড? যুক্তিটা ওর এই জাতীয়। বলে, “আয়েন বুড়াকর্তা, লগ্না যাই।”

ফেরা কিন্তু হয় না তাঁদের।

আম্বুলেন্সখানা এসে পৌঁছায় ! পিছন পিছন একখানা জীপ । জীপ থেকে নামেন ঠাকুর্দা আর কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার । আম্বুলেন্স থেকে নামানো হ'ল নমিতা আর যোগেনকে । এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হ'ল ওদের ।

ঠাকুর্দা এসে হরিপদ পণ্ডিতের হাতখানা চেপে ধরেন ।

তিনি এসে পৌঁছেছেন কলকাতা থেকে । সোজা জীপে করে এসেছেন । সঙ্গে এসেছেন কলকাতা থেকে কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার । বাগচি সাহেবও ছুটি সস্ত্রোৎসবর পেয়ে এসেছেন ।

মারামারি গুণ্ডাগোল সব থেমে গেছে ।

নতুন উদ্বাস্তরা যাতে উদয়নগরে না আসতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে, শেয়ারলড' স্টেশন থেকে ওদের অন্ত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে । যারা এসে পড়েছে ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে বেছে বেছে কর্মঠ লোকের পুনর্বসতি দেওয়া হবে এখানেই । কিছু যাবে দণ্ডকারণ্যে । সেখানে গড়ে উঠবে এক নতুন উদ্বাস্ত রাজ্য । কলোনী নয়, রাজ্যই । বাকি লোক ফিরে যাবে ক্যাম্পে । সবই সুষ্ঠুভাবে মিটে গেছে । পরিকল্পনার কাজ কাল থেকে পূর্ণোত্তমে চালু হবে । নিতাইপদ লীডার বাছাই করা বিষয়ে কো-অপারেটিভ গড়ার প্রস্তাবটাও দাখিল করেছিলেন । বাগচি সাহেবও পূর্ণ সম্মতি জানান এ ব্যবস্থায় । বস্তুত কো-অপারেটিভ ক'রে কাজ বিতরণ করতেন না করলে কিছুতেই সুষ্ঠু ব্যবস্থা হ'তে পারে না । বেকার নিঃস্বকে গ্রুপ-লীডার করলে তারা কাজ করতে পারে না অর্থাভাবে । গোপনে তারা মহাজনের পক্ষপুটে আশ্রয় খোঁজে । এদিকে বিনা জামানতে, কাজ করার আগে দাদন দেওয়াও সম্ভব নয় সরকারী আইনে । যতীশবাবু চেয়েছিলেন এমন কিছু গ্রুপ-লীডার বেছে নিতে যারা প্রথম পর্যায়ে অর্থ বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রাখে । তাই তিনি বিষ্ণুপদ, গোবিন্দ আর পতিতুণ্ডির নাম রেকমেণ্ড করেছিলেন । বাগচি সাহেব তাতে রাজী নন । কলকাতা থেকে যে কজন অফিসার এসেছিলেন তাঁরাও চান না তেলমাথায় তেল ঢালতে । সুতরাং নিতাইপদের প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন সকলে । কাজ দেওয়া হবে কো-অপারেটিভকে—ব্যক্তিগত মুনাফার অবলুপ্তি ঘটল ! সমষ্টির লাভ লোকসান বুঝে নেবে শেয়ার হোল্ডাররা । কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চপদস্থ মাদ্রাজী অফিসারও এসেছিলেন ওদের সঙ্গে । অবিলম্বে কি ক'রে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তা তিনি সরজমিনে দেখতে এসেছেন ।

বিষ্ণুপদ-গোবিন্দ-নবীন পতিতুণ্ডির শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল । তাঁদের বড় মুকুবির স্বয়ং যতীশবাবুই যখন হালে পানি পাচ্ছেন না তখন তাঁদের আর আশা কোথায় ?

সুতরাং ওঁরা সরে দাঁড়ালেন। খিড়কির দরজা দিয়ে পুনঃপ্রবেশেরও আর পথ রইল না। ওঁদের হিতাকাঙ্ক্ষা যতীশবাবুই এখন সে পথ দিয়ে প্রস্থান করতে পারলে বাঁচেন। বদলি হ'লেই খুলী হন তিনি; কিন্তু ভাবে মনে হয় টিনের হিসাবটা না মিটানো পর্যন্ত বদলির কোনও আশা নেই।

সবই মিটে গেছে;—সবই সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে এনেছেন নিতাইপদ। এবার এই ছন্নছাড়া জীবগুলোকে নিয়ে নতুন পৃথিবী সৃজন করবেন ওরা। বন্দীকধর্মী মানুষ-গুলো শুধু বাড়ি করেই ক্ষান্ত হবে না—ওরা গড়ে তুলবে নতুন সমাজব্যবস্থা। পশ্চিম বাংলার আর পাঁচটা জরাজীর্ণ গ্রামে যা সম্ভব হয় নি—হবে না, তাই সফল ক'রে তুলবে ওরা। ওদের কলোনীতে নেই প'ড়ো ভাঙা মন্দির আর মজা পান-পুকুর। সমাজপতির আর্কফলার আন্দোলনকে ওরা ভয় করে না। কালো স্নেটে নতুন ক'রে পড়বে ওদের লেখা—নতুন পরিবেশে—মাঠের মাঝে গড়ে ওঠা এই গ্রাম নগরীতে। গ্রাম্যসমাজ জীবনের দোষত্রুটি সম্বন্ধে ওরা সচেতন—সেগুলি প্রথম থেকেই পরিহার করে চলবে। নিতাইপদ নবীন উৎসাহ নিয়ে তাই ফিরে এসেছেন বাগচি সাহেবকে সঙ্গে ক'রে কলকাতা থেকে।

কিন্তু যদি কয়েকঘণ্টা আগেও এসে পৌছাতে পারতেন—তাহ'লে এ শুভকাজের সূচনার রক্তপাতটা নিবারণ করা যেত।

পরের দিন প্রভাত।

জংসন হাসপাতালের সামনে একটা বিরাট জনতা।

মর্গ থেকে জনা চারেক লোক বার ক'রে আনল নমিতাকে।

হাসপাতালের প্রাক্কণ্ঠা ভরে গেছে লোকে। তিল ধারণের স্থান নেই। রাত্রি থাকতেই লোক আসছে। ফাস্ট লোকালেই এসেছে অসংখ্য লোক। কলোনীর বাসিন্দা। সমস্ত উদয়নগর কলোনী বুঝি সমবেত হয়েছে ওদের একটি মেয়েকে শেষ সম্মান জানাতে। এসেছে প্রমোদ, কানাই, রাখাল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যোগেন। দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। সত্য ফিরেছে সে ঋশান থেকে। প্রিয়বন্ধুর শেষকৃত্য ক'রে ফিরে এসেই শুনেছে এই দুঃসংবাদ। মটন আর হাতকাটা তেল ধরে আছে ওর দু'হাত। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। ঋশান বৈরাগ্য তার ছোট্ট দেহ-খানিতে মাখা। 'কাঁদছে না আর। অশ্রুর উৎস তার শুকিয়ে গেছে। গাজনের খুদে সন্ন্যাসী যেন একটা। জনতা নির্বাক!

নমিতাকে নামানো হ'ল হাসপাতালের প্রশস্ত প্রাক্কণ্ঠে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন নিতাই কবিরাজ। তাঁর ডানহাতখানিতে ধরা আছে অঙ্ক হরিপদ মাস্টারের

একথানা হাত। আর একথানা হাত ধরা আছে অনিমেঘের মুঠিতে। জরাগ্রস্ত পক্ষু
অন্ধ হরিপদ পণ্ডিত। বুদ্ধ হাতড়ে হাতড়ে মুখখানার নাগাল পেলেন। সারা
মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তার মধ্যে অপরাজিতা ফুলের মতো ফুটে রয়েছে পঁচিশ
বছরের কুমারী কালো মেয়েটির মুখখানি।

অন্ধ কোটরগত দু' চোখ দিয়ে নেমেছে দুটি ধারা। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথাটায় বার
কয়েক হাত বুলিয়ে দিলেন। মাথাটা নিচু ক'রে অন্ধুটে মন্তোচ্চারণের মতো কি
যেন বললেন তিনি।

আঘাতে আঘাতে পায়ণ পণ্ডিত আজ যদি আকাশ বিদীর্ণ-করা আর্তনাদ ক'রে
উঠতেন তাহ'লেও বুঝি এর চেয়ে আশ্বস্ত হ'ত লোকগুলো।

নিতাইপদ বলেন, “এবার ওদের নিয়ে যেতে দিন।”

হরিপদ পণ্ডিত আপত্তি করেন না। উঠে দাঁড়ান। অন্ধুটে বলেন, “আচ্ছা আয়
মা!”

স্বরেখা দেবী বিরাট দুটো ফুলের তোড়া এনে রাখলেন মুখখানির দু'পাশে।
আঁচলে চোখটা মুছলেন।

নমিতা আজ শহীদ!

—বলহরি, হরিবোল!

আর্তনাদ ক'রে নমিতার পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ল লতু। ফুলে ফুলে কাঁদ-
ছিল সে। ভূষণ ওর হাত দুটি ধরে তোলে। ফুলে ঢাকা মেয়েটি ওঠে জনতার
কাঁধে।

জীবনের প্রথম ফুলশয্যা।

শেষও!

বাগচি সাহেব ছুটে এসে বলেন, “নামাও, নামাও।”

নামানো হ'ল নমিতাকে।

বাগচি বলেন, “প্রেস ফটোগ্রাফাররা এসেছেন। নমিতার ফটো নেবেন। একথানা
এনলার্জ ক'রে রাখতে হবে আমার অফিসেও।”

ইঞ্জিনিয়ার মৈত্র সাহেব একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন মেয়েটির দিকে। গতকালও ছিল
এই মেয়েটির কত আশা আকাঙ্ক্ষা। সমস্ত কলোনীর ভালোমন্দ নিয়ে তর্ক ক'রে
গেছে তাঁর সঙ্গে। কত কটু কথা বলে গেছে তাঁকে!

ওরা এখান থেকে যাবে কলোনীতে—নমিতার বাসায়। বিন্দুবাসিনী আছেন
সেখানে। কামিনীও আছে তাঁর কাছে। সেখান থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে
গণকল্যাণ সমিতির অফিসে—অর্থাৎ নিতাই ঠাকুরদার সেই এক কামরার ঘরে।

সেখান থেকে হাতিপৌতার বিলে। উদয়নগর কলোনীর অস্তিম মণিকর্ণিকায়।
ওখানে ওদের অনেকেই গিয়েছে এতদিন দলে দলে, যাবে ভবিষ্যতেও—কিন্তু
এমন সমারোহ ক’রে শোকযাত্রা হয় নি কখনও হাতিপৌতায়।

অন্ধ হরিপদ পণ্ডিতকে হাত ধরে নিতাই ঠাকুর্দা নিয়ে এসে বসালেন একটা
রিক্‌শায়। পণ্ডিত তখনও নির্বাক। নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করেছেন নিতাইপদর
হাতে। নিতাইপদ ভাবছিলেন তাঁর ডান হাতখানাই ভেঙে গেল। তাঁড়ার ঘরের
আগল খুলে বেরিয়ে এসেছিল যে ঘরোয়া মেয়েটি—তাকে গড়ে তুলেছিলেন তিনি
আপন হাতে। মুখচোরা লাজুক মেয়েটির মধ্যোই ছিল স্তম্ভ বহিঃস্থ। জাগিয়ে
তুলছিলেন তাকে তিনি। সংগ্রামের শুরুতেই বিদায় নিল সেই দক্ষ সেনাপতি।
কিন্তু কলোনীর জীবন-উপস্থাসের এতো শেষ পরিচ্ছেদ নয়—এই যে শুরু। অন্ধ
হরিপদ যেন এই উদয়নগর কলোনীর একটা রূপক। নমিতাকে হারিয়ে বুকটা
ফেটে গেলেও আত্মনাদ করার সময় নেই। এর পরেও আছে আগামী দিনের
সমস্যা। রুটি চাই, অন্ন চাই। হরিপদ যেন সমগ্র কলোনীর প্রতীকরূপে নিতাই-
পদর হাতে করেছেন অন্ধ আত্মসমর্পণ।

কাজ! কত কাজ!

সে কাজ আরও কঠিন হ’য়ে উঠেছে নবাগতদের জন্ত। দলে দলে লোক আসছে
আরও। সার বেঁধে আসছে ও রাজ্য থেকে এ রাজ্যে। যেমন ক’রে খাইবার পাশ
দিয়ে এসেছিল এদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, যেমন ক’রে নিতাই-
পদ এসেছেন কয়েকবছর আগে—তেমনি ক’রেই আসছে ওরা। আত্মক ওরাও
আত্মক! নিতাইপদ কিছুতেই ওদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। এখানে জমি
নাই, এখানকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হ’য়ে যাচ্ছে বারে বারে, তবু ঠাকুর্দা ওদের বরণ
ক’রে নেবারই পক্ষপাতী। অতিথি সব অবস্থাতেই নারায়ণ!

গন্ধার জল পবিত্র। ভাজের ভরা গন্ধায় যখন বান ডাকে তখন দু’পারের গ্রাম
ভেসে যায় প্রাবনে। বন্যাবিক্রান্ত গৃহহীনেরা সে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দেখতে পায়
মৃত্যুর ছায়া। সে জলকে আমন্ত্রণ জানায় না কেউ। তবু সে ঘোলাজলও পূত
গন্ধোদক। তার মধ্যেও থাকে উর্বর পলিমাটির স্বর্ণরেণু। আজ যে জন-জাহ্নবীর
প্রাবনে ভেসে যেতে বসেছে নিতাইপদর দেশ—সেও পূত গন্ধোদকই। মম্বর পবিত্র
বংশধর এই গণ-গন্ধার প্রতিটি তরঙ্গ। সবার উপরে ওদের স্থান। অমৃতের পুত্র—
কঙ্কালাবেশ মমুক্ষাকৃতি জীবগুলো।

হয়তো ওদের ভাগ দিতে গিয়ে ভরপেট খাবার মিলবে না সকলের। তবু এদের

সাথে অন্নপান ভাগ ক'রে খেতে হবে। সে কষ্টটুকু স্বীকার ক'রে নিতে হবে হাসি মুখেই।

সেই হাসিরই একটু টুকরো লেগে আছে ঐ তাঁর ফুলে-ঢাকা নাতনীটির অধর-প্রান্তে।

অপরাজিতার হাসি।

আশান যাত্রীরা মোড় ফেরে বাঁয়ে।

বিরিটি শোকযাত্রা।

সকলের পিছনে পিছনে আসছিল ভূষণ। হাত ধরে নিয়ে চলেছে লতুকে। পাশে পাশে চলেছে লতু। কান্দছে সে। ভূষণের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। কি ভাবছে সে— তা সেই জানে। অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য উঠছে। ভূষণের চোয়ালের হাড় দুটো চেপে বসেছে। আশপাশের সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। চলেছে সামনের দিকে দৃঢ়মুষ্টিতে লতুর ডানহাতখানা চেপে ধরে।

খেরাল নেই ওর হাতের তালুতে ফুটেছে কাঁটা—ওর মায়ের হাতের মকরমুখো বালার সোনার কাঁটা!